পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৮৩
© শ্রীশিবপ্রসাদ হালদার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

মূল্য : ৩২'০০ টাকা

মুদ্রাকর :
কিঙ্কর কুমার নায়ক
নায়ক প্রিন্টার্স
৮১/১-ই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০৬

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীমান শিবপ্রসাদ হালদার প্রণীত 'পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য' গ্রন্থটির ভূমিকা লিখবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে আমার অনেক পুরাতন কথা মনে পড়ছে। বহুকাল পূর্বে তিনি আমার কাছে গবেষণা করে ডক্টর উপাধি লাভ করেছিলেন, তিনিই আমার প্রথম ছাত্র যিনি আমার কাছে গবেষণা করেছিলেন। এইজন্য তাঁর লেখাটি আবার পড়তে গিয়ে অনেক কথা মনে পড়ে গেল।

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর উপাধি পাওয়ার পর যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার প্রতি সাহিত্যরসিকেরা আদৌ আকর্ষণ বোধ করেন না। কারণ দ্বিবিধ। প্রথম, যে বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছে, পাঠক সে স্তরের লোক নন। যদি আপেক্ষিক তত্ত্ব বা বেদান্তবাদ সম্বন্ধে কোন গবেষণা গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, তাহলে আমাদের মতো 'অব্যাপারী' ব্যক্তি সে গ্রন্থ পাঠে আদৌ উৎসাহিত হবেন না। কারণ একটি বিজ্ঞান, আর একটি দার্শনিক তত্ত্ব। কিন্তু ঐ-সমস্ত দুরূহ ব্যাপারে প্রবেশাধিকার না পেলে গ্রন্থগুলিকে কি পরিত্যাগ করতে হবে? দ্বিতীয়, অনেক সময়ে গবেষণা গ্রন্থে অনেক তত্ত্ব কথা ও নব নব আবিষ্কার থাকলেও লিখনভঙ্গীর ত্রুটি ও বিন্যাসে শিথিলতার জন্য তা পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই সাহিত্যের গবেষণা অনেক সময়ে পাঠকের অনীহার কারণ হয়ে ওঠে। সুখের কথা, ডঃ হালদারের এই আলোচনা একটি সুসংহত বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল রচনায় পরিণত হয়েছে। এটি গবেষণা গ্রন্থ, কিন্তু নীরস ও তথ্যসর্বস্ব নয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিষয়টির উপস্থাপনা করেছেন। নানা উৎস থেকে এর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন, পরিশেষে চিন্তালব্ধ তত্ত্বকে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের মধ্যে অবধারণ করতে চেয়েছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ শুধু পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যের দান নয়, তার পশ্চাদপটে আছে পৌরাণিকতার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি—যা সচরাচর পাঠকের চোখে পড়ে না। পুরাতন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে পৌরাণিক ও লৌকিকের যে সংমিশ্রণ ঘটেছে তা লেখক দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন। পুরাতন বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাগৈতিহাসিক অন্-আর্য কৌমের নানা ব্রতকৃত্য প্রভাব বিস্তার করলেও সংস্কৃত ভাষাবাহী পৌরাণিক ঐতিহ্য, বিশেষতঃ দেববাদ ও ধর্মীয় অনুভাবনা এ সাহিত্যের মর্মমূলে রস সঞ্চার করেছে। কেউ কেউ বলবেন, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার-বর্জিত ব্রাত্যসংস্কারই বাঙালির মূলধর্ম। তান্ত্রিক সহজিয়া, কায়াবাদী নাথ-সম্প্রদায়, বৈষ্ণব সহজিয়া, হিন্দুতান্ত্রিকের ষটচক্রসাধন, রহস্যবাদী ও দেহতত্ত্বাত্মিক বাউল-ফকির-দরবেশের সাধনভজন এবং তাকে কেন্দ্র

করে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা সাহিত্য বলতে হবে। উত্তরাপথের ব্রাহ্মণাশ্রিত পৌরাণিকতা বাঙালির স্বভাবধর্ম নয়, তা হচ্ছে কৃত্রিমভাবে আরোপিত পরের ধর্ম। মৌর্যযুগের আগে আর্যধর্ম পূর্বাঞ্চলের অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ-বঙ্গাল দেশকে কোন প্রকারেই প্রভাবিত করতে পারে নি। মৌর্য যুগ, বিশেষতঃ গুপ্ত যুগ থেকে পূর্বভারতে আর্যপ্রভাব সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করে। শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তই বোধ হয় সর্বপ্রথম পৌরাণিক শৈবধর্মকে বাঙালির বৌদ্ধ সংস্কারের প্রবল প্রতিস্পর্ধী করে তোলেন। পরবর্তী কালের পাল রাজারা ধর্মমতে মহাযান বৌদ্ধ হলেও কখনো সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তাঁদের মন্ত্রণাসভায় অনেক ব্রাহ্মণ নেতৃত্ব করতেন, তাঁদের অন্তঃপুরেও রামায়ণ মহাভারতাদির বিশেষ প্রভাব ছিল, কোন কোন পট্টমহাদেবী পুরাণকথা শুনে ব্রাহ্মণ পাঠক-কথককে আপ্যায়িত করতেন নানাভাবে। বোধ হয় স্বল্পকাল স্থায়ী সেন বংশের শাসনে সমাজের উচ্চ স্তরে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য প্রভাব দৃঢ়মূল হয়েছিল। যে-কোন কারণেই হোক, বেদ-বেদান্তের চর্চা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয় নি। মুসলিম অধিকার স্থাপনের পর বাঙালি হিন্দুসমাজ কিছুকাল কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করলেও চৈতন্যাবির্ভাবের কিছু আগে থেকেই উপদ্রুত হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার প্রেরণায় কূর্মবৃত্তি ত্যাগ করে বৈতসীবৃত্তি গ্রহণ করল এবং ক্রমে সে সঙ্কোচ সংশয়ও তিরোহিত হল। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের শুধু কাব্যত্ব নয়, তার তত্ত্বাদর্শের মধ্যে হিন্দু বাঙালির নতুন আশ্রয় জুটল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে হিন্দুসমাজে পৌরাণিকতার বিচিত্র প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব না ঘটলে বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যে পৌরাণিকতার আদর্শ কতটা স্থায়ী হত তাতে সন্দেহ আছে। যাঁরা মনে করেন, পৌরাণিক প্রভাব বাঙালির কুলধর্মকে বিনাশ করেছে, তাঁরা বোধ হয় ঠিক কথা বলেন না। বাঙালির মনে পৌরাণিক প্রভাব না পড়লে এতদিন এ-জাতি নিজের সংহতি বজায় রাখতে পারত না, বাংলা সাহিত্যও লোকসাহিত্যের উপরে উঠতে পারত না। পরবর্তীকালে উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের যে অভূতপূর্ব বিকাশ হয়েছে, তাও ঘটতে পারত বলে মনে হয় না। সংস্কৃত ভাষাবাহী পৌরাণিক আদর্শ বাঙালির জীবনের আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়েছে, সাহিত্যেও তা দৃঢ়মূল হয়েছে। রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজের নেতারা পৌরাণিকতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, শ্রীরামপুর ও কলকাতার খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়ও তীব্রভাষায় হিন্দুর পৌরাণিক চেতনার বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করলেও এ দৈত্যকে বধ করা গেল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে

এই আদর্শ আবার স্বাতন্ত্র্য অর্জন করল, বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর মানস সন্তানগণ পৌরাণিকতার দিকে শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

রামমোহন ও দয়ানন্দের প্রচার সত্ত্বেও সারা ভারতবাসী আজো পর্যন্ত পৌরাণিক আচার আচরণ ও দেববিশ্বাসে অটল হয়ে আছে। গত শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের প্রকরণ ও বিবর্তনে আধুনিক য়ুরোপের প্রভাব থাকলেও পৌরাণিক ঐতিহ্যও উপেক্ষিত হয় নি। হয়তো কালধর্মের বশে তাতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। মধুসূদন তো হিন্দুধর্ম, বিশেষতঃ পৌরাণিক ধর্মকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন, রাম-রাবণ-লক্ষ্মণ-মেঘনাদ সংক্রান্ত আমাদের বহুকাল পোষিত ধারণাকেও অবহেলা করে তিনি যেন অপশক্তিকেই বরমাল্য দিয়েছেন। তবু তিনি ভারতের পৌরাণিক সংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন নি। হেম-নবীনও আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমাজ-শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হলেও পৌরাণিক সংস্কারের ছায়াতল ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন জীবনজিজ্ঞাসাকে একমাত্র শরণ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্য নিলেও শেষ পর্যন্ত পৌরাণিক সংস্কারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের নাটকেও পুরোপুরি পৌরাণিক সংস্কার স্বীকৃত হয়েছে। য়ুরোপ যেমন নিউ টেস্টামেন্টকে প্রধানতঃ স্বীকার করে ওল্ড টেস্টামেন্টকেও উপেক্ষা করে নি, তেমনি উনিশ শতকে বাঙালি মানস যতই নতুনের দ্বারা প্রবুদ্ধ হোক না কেন, পৌরাণিক ঐতিহ্যকে জাতীয় জীবনের অন্তর্লোকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে নি। আদি ব্রাহ্মসমাজের রবীন্দ্রনাথও কি পৌরাণিক ভাবকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পেরেছেন? বিশ শতকে দেখতে পাচ্ছি, শহরে গ্রামে গঞ্জে পূজা অর্চনার ব্যাপারে প্রবল বিক্রমে পৌরাণিক দেবদেবীরই বাদ্যভাণ্ডসহ উৎসব অনুষ্ঠান চলেছে। যাঁরা ধর্মকর্মকে মানুষের পুরাতন কুসংস্কার মনে করে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে সমূলে বিনাশ করতে চান, তাঁরাও দেখছি এই সমস্ত ব্যাপারে সোৎসাহে যোগ দিচ্ছেন। আসল কথা, পুরাতন পৌরাণিক সংস্কার ভারতবর্ষে এতটা দৃঢ়মূল যে দেশের মনের মাটি থেকে তাকে উৎপাটিত করা প্রায় অসম্ভব। অতিশয় আলোকপ্রাপ্ত ও বৈজ্ঞানিক বিদ্যার ভাণ্ডারী য়ুরোপ এই বিংশ শতাব্দীতেও ধর্মকে স্থানচ্যুত করতে পেরেছে কি? সুতরাং বাংলা দেশ, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির জীবনে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পৌরাণিক ভাবনা এ জাতির সমগ্র সত্তা জুড়ে বর্তমান রয়েছে।

বৈদিক পূজোপাসনা হাজার দেড়েক বৎসর আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। বৈদান্তিক তত্ত্বকথা বাংলা দেশে বড়ো একটা স্থান পায় নি। ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ আধুনিক কালে রামমোহন সূচিত করেন, তার পূর্বে অদ্বৈতবাদী ভাষ্য নয়, দ্বৈতবাদী ভক্তিতত্ত্ব বাঙালির চিত্ত জয় করেছিল। অদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম কর্মকর্তৃত্ব রহিত নির্বিকল্প তত্ত্বমাত্র, দ্বৈতবাদ এবং তার শাখাপ্রশাখায় জীবের স্বতন্ত্র মুক্তি স্বীকৃত হলে সগুণ ব্রহ্মের বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-কৃষ্ণ গোপনন্দন-বল্লবীযুবতীদের প্রাণেশ হতে বাধা ঘটে নি। কার্য ভক্তিতত্ত্বের আর এক পিঠ হচ্ছে শাক্ত ভক্তিবাদ। এখানেও পৌরাণিক শক্তিদেবীর ভক্তের মনে একচ্ছত্র আধিপত্য, সে সম্পর্ক প্রধানতঃ বাৎসল্যভাবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউল সাঁইপন্থীরা আকার-আয়তনহীন যে প্রেমতত্ত্বকে সাধ্যসাধনার অন্তর্গত করেছেন, তাঁরাও পৌরাণিক সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতে পারেন নি। সুতরাং এ জাতির মনের গূঢ় পরিচয় যে পৌরাণিক সংস্কারের মধ্যেই নিহিত আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীমান শিবপ্রসাদ হালদার বহু পরিশ্রম করে, গভীর বিশ্লেষণে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালির এই পৌরাণিক সংস্কারের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। গ্রন্থটি শুধু কল্পনার উপর ভিত্তি করে বিস্তর আহা-উহু সহযোগে প্রস্তুত তরল আবেগে পর্যবসিত হয় নি, লেখকের বক্তব্য, মন্তব্য ও চিন্তা বস্তুগত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ আমাদের কতকগুলি প্রিয় ভাবনা চিন্তা থাকে, যাকে ফ্রান্সিস বেকন বলেছেন *idola specus*, তার হাত থেকে আমাদের মন কিছুতেই মুক্তি পায় না। লেখক এই সমস্ত ব্যক্তিগত প্রিয় ভাবনাচিন্তা থেকে যে ভাবে নিজেকে রক্ষা করে নিঃস্পৃহভাবে ইতিহাসের গতিপথ অনুসরণ করেছেন তাতে তাঁকে বিশেষভাবে সাধুবাদ দিতে হয়। অথচ রচনাটি সব সময়ে তর্কবিতর্কের কচকচিতে পর্যবসিত হয় নি, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ঋজু ভাষাভঙ্গিমায় ধরা পড়েছে, যাঁরা গবেষণাগ্রন্থ বললেই বিরস হয়ে পড়েন তাঁরা নির্ভয়ে এই বইটি পড়তে পারেন। জ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যবোধের, তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের এমন রাজযোটক মিল অনেক বাংলা গবেষণা গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থ সুধীমহলে অভিনন্দিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

১৯৮৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থকারের নিবেদন

রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণাশ্রিত জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গী সামগ্রিকভাবে যাহাকে পৌরাণিক সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা যায়, বাঙালী জাতির মনোধর্মে কখন কিরূপ প্রভাব রাখিয়াছে ও তাহার বিচিত্র সাহিত্যকর্মে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার অন্বেষণে ব্রতী হইয়া কয়েক বৎসর পূর্বে একটি গবেষণা কার্যে আত্মনিয়োগ করি। আলোচনার অনুক্রমে বিষয়টির বিরাটত্ব ও গভীরতা ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে। জাতীয় জীবনের চালচিত্রে যে এত বড একটি ঐতিহ্য বিরাজ করিতেছে, যাহা পদে পদে আমাদের জীবনধারাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। সংস্কৃতির মূলাধাররূপে এই বিরাট বিপুল ভারতসম্পদ বিভিন্নভাবে 'দেশসংস্কৃতি'কে উজ্জীবিত করিয়াছে। ইহাই বাঙালীকে তাহার ক্ষুদ্র মানসিকতা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে বৃহৎ ভারতসভাতলে আসন দান করিয়াছে। আদি পর্বের বাঙালীজীবনে যে মিশ্র সংস্কৃতি কাজ করিতেছিল, লোকচেতনার 'অকুণ্ঠ বলিষ্ঠতা'কে আশ্রয় করিয়াই তাহা পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে। তাহার ধর্ম, আচার-অভিচার দেহধর্মের সহস্রবিধ আধারে রক্ষিত ও লালিত হইয়াছে। এই ধর্ম তাহাকে দূর ও অপ্রাপণীয়ের দিকে ঠেলিয়া দেয় নাই, তাহাকে গৃহধর্মের সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। সেদিনের সাহিত্য তাই কোন-ক্রমেই দূর আকাশের নক্ষত্রলোক স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই মৌতাত বিভোর আত্মতুষ্ট জীবনে বৃহৎ ভারতধর্মের আহ্বান তাহার ভৌম পরিমণ্ডলকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাহার লৌকিক চেতনার সহিত সংগতি রক্ষা করিতে পারে ভারতধর্মের এমন দিকটিই তাহার কাছে গ্রহণীয় হইয়াছে। এইজন্য বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিলেও সে তাহা মানে নাই, একাধিকবার জানাইবার চেষ্টা চলিলেও তাহা কার্যকর হয় নাই। সে ক্ষেত্রে পৌরাণিক সংস্কৃতিই তাহার লোকচিন্তালালিত জীবনধর্মের সঙ্গে খাপ খাইয়াছে বেশী।

মধ্যযুগ হইতে তাহার চিত্তলোকের এই উদ্বোধন, চিন্তাক্ষেত্রের এই প্রসারণ, পরিমণ্ডলের এই ব্যাপ্তি তাহাকে ক্রমশঃই অমৃত পিপাসু করিয়া তুলিয়াছে। কালের যাত্রায় অমৃতকুম্ভের সন্ধানও মিলিয়াছে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও সাহিত্যের সংগ্রহশালায়। কিন্তু সেই সংগ্রহশালায় প্রবেশের ছাড়পত্র সহজে মেলে নাই।

সংস্কার ও প্রজ্ঞার সমুদ্রমন্থনে সেই অমৃত যখন বিস্বাদ হইয়া উঠিল তখন তাহার অস্থির ও সংশয়দীর্ণ চিত্তকে স্থিতধী করিবার জন্য একটি নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইতিহাসের শিক্ষায় পৌরাণিক সংস্কৃতির নির্মোকেই তাহার নূতন জীবনবোধে দীক্ষাগ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। এইভাবে দেখা যায় পৌরাণিক সংস্কৃতি একদা যেমন বাঙালীর জীবনরসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার জীবন ও সাহিত্যের পরিধি বাড়াইয়া দিয়াছিল, তেমনি আধুনিককালে তাহা সেই পরিধিকে আরও প্রসারিত করিয়া তাহাকে বিশ্বচর করিয়া তুলিয়াছে। অস্তিত্বের এই দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালী নিজেকে জানিয়াছে, দেশকে চিনিয়াছে ও বিশ্বকে বুঝিতে চাহিয়াছে। তাহার জীবনচর্যা হইতে সংস্কৃতি পৃথক নহে, তাহার সাহিত্যও এই উভয়কোটিক ধারণার সংযোগ চিহ্ন।

মধ্যযুগ হইতেই এই স্বীকরণ প্রক্রিয়া সুচিহ্নিত বলিয়া এই যুগের সাহিত্য হইতে এই আলোচনা সুরু হইয়াছে। অমৃত হ্রদে মক্ষিকা পতনের মত এই সুধার সে সেদিনের বাঙালী আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছিল। ইহার সর্বসন্তাপহারিণী শক্তি সম্বন্ধে তখনই সে সম্যক্ অবহিত হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর তপ্ত আবহাওয়ায় জাতির যখন অগ্নিপরীক্ষা, তখনই ইহার ত্রিপাদ বিস্তৃত ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে বলিয়া মুখ্যতঃ এই শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে এই সাংস্কৃতিক জীবনবোধের পরিচয় ও তাহার সাহিত্যগত অভিপ্রকাশ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর বিক্ষিপ্ত যুগমানসে সযত্নলালিত বহু সত্যের বিলয়-বিনষ্টিতে এই পুরাতনী প্রজ্ঞা ছিন্ন সতীদেহের ন্যায় নীতি-নিষ্ঠা-কর্তব্য-অনুজ্ঞার সহস্র ভগ্নাংশে আজিও যে সগৌরবে বিরাজমান তাহাতে কোনরূপ সংশয় নাই।

এই গবেষণা কর্মের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে 'ডক্টর অব ফিলজফি' উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছেন। নিবন্ধের দুইজন পরীক্ষকই—প্রয়াত ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ সুকুমার সেন—আমার আচার্য। তাঁহাদেরই সৃষ্ট 'সরস্বতী কুণ্ডে' অবগাহন করিয়া এই নির্মাল্য রচনা করিয়াছি। প্রয়াত আচার্যদেবের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং আচার্য ডঃ সুকুমার সেনের প্রতি বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি।

আলোচনার সমগ্র পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা আমার শিক্ষাগুরু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শানুযায়ী হইয়াছে। সম্মুখ আলোচনায় এবং তাঁহার রচিত

আকর-গ্রন্থগুলি হইতে আমি বহু সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছি। আমার প্রতি একান্ত স্নেহবশতঃ অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি গ্রন্থটির জন্য একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থটি তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

আর্থিক সমস্যার স্পষ্ট কারণে গ্রন্থটি এ তাবৎকাল প্রকাশ করা যায় নাই। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অর্থানুকূল্যে এই প্রকাশনা সম্ভব হইল। প্রয়োজনানুরূপ অবশিষ্ট আর্থিক-দায়িত্ব ফার্মা কেএলএম সানন্দে বহন করিয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছে। মননধর্মী গ্রন্থ-প্রকাশে এই সংস্থার পৃষ্টপোষকতাকে আমি অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে ফার্মা কেএলএম-এর শ্রী শ্রীপতি প্রসাদ ঘোষ ও সুখেন্দুবিকাশ পাল আমাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। অশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও যে দুই চারিটি মুদ্রণ প্রমাদ রহিয়া গেল তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করিয়াছেন শিল্পী শ্রী দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য এবং মুদ্রণ দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পাদন করিয়াছেন নায়ক প্রিন্টার্সের শ্রী কিঙ্কর কুমার নায়ক। ইঁহাদিগকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সংস্কৃতি পরিচর্যার ক্ষেত্রে বর্তমানে নানা দিক হইতে যে বিবিধ প্রকৃতির মননশীল আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে আলোচ্য গ্রন্থ তাহারই একটি দিকে আলোকপাত করিয়াছে। দেশের অন্তর-প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে ও তাহার বহিঃপ্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধিতে এই আলোচনা অনুসন্ধিৎসু মনে কিছুটা আগ্রহ সঞ্চার করিতে পারিলে ইহার প্রকাশ সার্থক হইতে পারে বলিয়া মনে করি।

'সুধৃতি'
ডায়মণ্ড হারবার
জানুয়ারী, ১৯৮৩

শ্রীশিবপ্রসাদ হালদার

সূচীপত্র

—০—

॥ অবতরণিকা ॥

বাংলা দেশের জীবনধারা কিছুটা স্বতন্ত্র উপাদান লইয়া গঠিত হইলেও সর্বভারতীয় জীবন প্রকৃতির সহিত ইহার সাধর্ম্যও ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ধীরে ধীরে ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। প্রত্যন্ত অঞ্চল হইলেও বাংলা দেশ সেই অধ্যাত্ম অনুভূতিকে গ্রহণ না করিয়া পারে নাই। আবার ব্রাহ্মণ্য যুগের কঠোর অনুশাসন ও নীতি নির্দেশ বাংলা দেশের সামাজিক জীবনে সুপ্রাচীন কাল হইতেই অনুসৃত হইয়াছে। জীবনধর্মের স্বতন্ত্র প্রকৃতির জন্য আর্য কল্পনার সমূহ আদর্শ একদিনেই বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।[১] সংঘাত সংঘর্ষের মধ্য দিয়া আর্যদের শিক্ষা সাধনা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে বাংলা দেশও তাহা গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াছে। ভারতবর্ষের অখণ্ড সমগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার ধর্ম ও শাস্ত্রে, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে, সামাজিক বিধান ও অনুশাসনে। বৈদিক সভ্যতার ক্রম বিস্তারে যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে ভারতবর্ষের নিজস্ব জীবনধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। উপনিষদের জিজ্ঞাসা এই বহির্মুখী জীবনচিন্তাকে অন্তর্মুখীন করিয়াছে, আবার ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন ধীরে ধীরে সামাজিক নিয়ম শৃঙখলাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক নীতি নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার মহাকাব্য-পুরাণে। সেই জন্য প্রাচীন জীবনচর্যায় রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণের অপরিসীম গুরুত্ব রহিয়াছে। ভারতবর্ষের জীবনধারা যখন স্বপ্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন তাহার কর্ম, জ্ঞান ও ত্যাগের বিচিত্র মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে মহাকাব্য দুইটিতে। সামাজিক চিন্তার ফল, আধ্যাত্মিক চিন্তার উপলব্ধি ও সাংস্কৃতিক সঞ্চয়ের মহার্ঘ সম্পদ ইহাদের মধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছে। যাহা বেদ-উপনিষদের অন্তর গুহায় আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই বৃহত্তর সামাজিক জীবনের উপযোগী হইয়া মহাকাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতের সুবিপুল পুরাণ সাহিত্যও এইরূপ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। বেদের অর্থ যখন গূঢ় ও দুর্জ্ঞেয়, তখন বেদের চিন্তাকে সহজবোধ্য করিয়া ইহাদের মধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ধর্ম ও জীবনে রামায়ণ ও মহাভারত যেরূপ বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তেমনটি আর কোন গ্রন্থ বা কোন শাস্ত্র করিতে পারে নাই। বৈদিক

ও উত্তর বৈদিক যুগে ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের উচ্চ ও মহত্তম সৃষ্টিগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু অনুশাসন ও বিধি নিষেধের সহস্র বন্ধনে তাহাদের সংক্রমণ লোক মনে ব্যাপক নয়। পরন্তু মহাকাব্য দুইটির মধ্যে যে মহৎ জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা সহজেই জনমানসে আবেদন জানাইয়াছে। এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে ভারতবর্ষের সমগ্র জীবন একটি নিগূঢ় শান্তি ও পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। যুগ যুগান্তের ক্ষয় ক্ষতি হইতে তাহা ভারতবর্ষের জীবন ধারাকে বর্মের মত রক্ষা করিয়াছে।

পুরাণের মোটামুটি লক্ষণ হইল পুরাবৃত্ত রচনা করা। পুরাণ একাধারে ইতিহাস, কিংবদন্তী ও ধর্ম। পুরাণের পঞ্চলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে :

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানু চরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

এই লক্ষণ বিচারে পুরাণের মধ্যে ইতিহাস রচনার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। প্রাচীন পুরাণকার মনে করিতেন কোন দেশের পূর্ণ হিষ্টরি বা পুরাণ লিখিতে হইলে সেই দেশ যখন প্রথম সৃষ্টি হইল তখন হইতেই আরম্ভ করা উচিত। যতদিন পর্যন্ত সেই দেশ প্রলয়ে ধ্বংস না হয় ততদিন তাহার কালানুক্রমিক বিবরণ চলিতে থাকিবে। এই জন্য পুরাণকার স্বীয় গ্রন্থে সর্গ ও প্রতিসর্গের অবতারণা করিয়াছেন। কবে কবে জলপ্লাবন বা ভূকম্পরূপ খণ্ড প্রলয় ঘটিয়াছে পুরাণকার তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বংশ ও বংশানুচরিত প্রসঙ্গে রাজা ও ঋষিগণের উৎপত্তি ও কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে যুদ্ধ বিগ্রহাদির কথা আছে। মন্বন্তর দ্বারা বিশেষ বিশেষ ঘটনার কালনির্দেশ করা হইয়াছে। এই পঞ্চ লক্ষণের সহিত আরও অনেকগুলি লক্ষণ সংযুক্ত হইয়া মহাপুরাণের বৈশিষ্ট্য[২] সূচিত করিয়াছে। এই লক্ষণগুলির মধ্যে যেমন ইতিহাসের উপাদান আছে তেমন ধর্মীয় উপকরণও আছে। পুরাণে কিংবদন্তী ও ধর্মের বিচিত্র সংযোগ ঘটিয়াছে। পুরাণকে শুধু ইতিহাসরূপে জানিলে জনসাধারণ তাহার প্রতি যত্ন লইবে না। ইহাকে যদি ধর্ম গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহা হইলে মানুষ আগ্রহ সহকারে ইহাকে রক্ষা করিবে। কেননা মানুষের মধ্যে একটি চিরন্তন ধর্মবুদ্ধি আছে, তাহা কোন না কোন ধর্মকে আশ্রয় করিবে। প্রাকৃত মনের ধর্মবুদ্ধি বহুলাংশে অলৌকিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ব্যতিরেকে অনেক অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা ও পরিবেশ সহজেই বিশ্বাস্য হয়। লোকরঞ্জনের জন্যই পুরাণকার বোধকরি ইহাতে কিংবদন্তী ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইয়াছেন।[৩]

কিন্তু পুরাণের ইতিহাস ও ধর্মের মধ্যে ধর্মই টিকিয়া গিয়াছে। আখ্যান, উপকথা ও বংশচরিত ধীরে ধীরে ইতিহাস হইতে ধর্মে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেইজন্য পুরাণের ধর্মও বহুলাংশে অলৌকিক এবং সহজেই লোকগ্রাহ্য। বেদের ধর্ম ও দেবতা এইজন্য এখানে লোকায়ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বৈদিক কল্পনা ও জীবনাদর্শের উচ্চতা পৌরাণিক পরিমণ্ডলে সাধারণ্যের উপযোগী হইয়াছে।

এ ক্ষেত্রে উপাসনা পদ্ধতিতে জ্ঞান বা কর্ম গৌণ হইয়া ভক্তি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে এবং ভক্তির বিশেষ আশ্রয় হিসাবে বিষ্ণুকে গ্রহণ করা হইয়াছে। রাম-ভক্তি, কৃষ্ণভক্তি সব কিছুই মূলে বিষ্ণুভক্তি। বিষ্ণুর আরাধনা ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্যকীর্তন সমগ্র পৌরাণিক জীবন চেতনার সাধারণ লক্ষণ। অবশ্য ইহার সমান্তরালে অন্যান্য শক্তিরও পূজা অর্চনা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের প্রাধান্য ততখানি সূচিত হয় নাই।

ভারতে ভক্তিবাদের বিস্তৃতি বাংলা দেশকেও স্পর্শ করিয়াছে। বিশেষতঃ ভাগবতের ভক্তিধর্ম বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। পরবর্তী-কালে তাহা বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া বাংলা দেশের ভক্তিধর্মকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। পুরাণের এই ভক্তিধর্মের সহিত রামভক্তি ও কৃষ্ণ-ভক্তির স্বতন্ত্র প্রবাহ বাংলা দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। মধ্যযুগে রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবত অনুবাদের মধ্যে এই ভক্তির উচ্ছ্বসিত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশের নিজস্ব শক্তি সাধনার মধ্যেও এই ভক্তি চেতনার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়াছে। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা দেশের জীবন ও সাহিত্য ভক্তি চেতনাকে কোন না কোন রূপে গ্রহণ করিয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবন ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি-বাদের আশ্রয় আরও অপরিহার্য হইয়া উঠে। নির্জিত দেশ-জীবন আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে গভীর ভাবে গ্রহণ করিয়া আশ্বস্ত হইতে চাহিয়াছে। সেইজন্য এই যুগের সাহিত্যে দেব নির্ভরতা প্রবল। মঙ্গলকাব্য বা অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যের বিশুদ্ধ প্রকৃতি সম্যক্ প্রকাশিত না হইলেও ইহাদের মধ্যে লোক মানসের চিত্রটি স্পষ্ট। সামাজিক বর্ণভেদ ও রাষ্ট্রীয় বন্ধন শৃঙ্খলের মধ্যে দেশের সাধারণ জীবন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কাহিনী ও চরিত্রে পরম নির্ভরতা অন্বেষণ করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। ইংরাজ আধিপত্য এ দেশে যুগপৎ রাষ্ট্রবিজয় ও ধর্মবিজয়

করিতে চাহিয়াছে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রবল ধর্মৈষণা ও দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে তটস্থ করিয়া তুলিয়াছে। ইংরাজ শাসকদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি সমগ্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে উৎখাত করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক শাসনের পুনর্বিন্যাস ঘটাইয়াছে। এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সভ্যতা এমনভাবে আঘাত পাইয়াছে যাহা তাহার সমগ্র অস্তিত্বকেই বিচলিত করিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার অত্যুজ্জ্বল আলোকে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাব এ দেশের জীবন ও সমাজকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। জাতীয় জীবনের এই বিপর্যয় এবং দেশের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার মহতী বিনষ্টিকে রোধ করিবার জন্য চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ যে সমাজ আন্দোলনের ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাংলা দেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। শিক্ষা সাহিত্য ও ধর্ম-সংস্কৃতির বিবিধ ক্ষেত্রে যে অনুশীলন ও পর্যালোচনা সুরু হইয়াছিল, তাহাই এ দেশে নব জাগরণের সূত্রপাত করিয়াছে। বাংলা দেশের ইতিহাসে এতগুলি যুগন্ধর পুরুষের একত্র সমাবেশ ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। কেহ কেহ প্রগতিশীল চিন্তাধারা বহন করিয়া, কেহ কেহ পুরাতন সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া সমাজ আন্দোলনের পুরোধারূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

ইতিহাসের গতিরেখায় দেখা যাইবে এই আন্দোলন ধারা জাতীয় জীবনকে একটি বিশিষ্ট শিক্ষা দিয়েছে। তাহা হইল দেশের সনাতন ধর্ম ও বিশ্বাসের আনুগত্য। প্রাচীনকালে বিভিন্ন ধর্মের সংঘাতে ভারতীয় জীবনচর্যায় নীতি নিষ্ঠার যেমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, আধুনিক কালেও তেমনি এই বিদেশী সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতের চিরন্তন জীবন নীতিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বহুতর আন্দোলন ও আলোচনা জাতীয় জীবনের এই বিশ্বাসটি ফিরাইয়া আনিয়াছে। স্বমার্গে প্রত্যাবর্তনের পথে যাঁহারা বেদ উপনিষদের চিন্তাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন, তীক্ষ্ণ মনীষা ও বুদ্ধির জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় বিমূঢ় জাতীয় চরিত্রকে সমৃদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের সাধনাও শেষ পর্যন্ত সফল হয় নাই। বিকৃত রুচি প্রকৃতির সংশোধনে, অসুস্থ জীবনবোধের নিরাময়তায় যাঁহারা ভক্তি ও বিশ্বাসের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জাতিকে সত্যকার পথ নির্দেশ দিয়াছেন। ধর্মের গূঢ় কঠিন তত্ত্বালোচনা ও অনুশীলন ব্যক্তি জীবনের আধ্যাত্মিক আকূতির মীমাংসা আনিতে পারে, কিন্তু বৃহৎ লোকসমাজকে প্রবুদ্ধ করিতে তাহা সফল হয় না। সেইজন্য লোকমনের

বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চেতনার স্ফুরণে প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতির লোকায়ত পরিবেশনই সর্বাপেক্ষা উপযোগী বিবেচিত হইয়াছে। মহাকাব্য পুরাণের সুবিশাল ঐতিহ্য স্বাভাবিকভাবেই দেশ জীবনে অনুসৃত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলন ও সংস্কৃতি পরিচর্যার মধ্যে এই চরম সত্যটি উদঘাটিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শতাব্দীর শেষ ভাগে জাতীয় চরিত্রে এই ধ্রুব বিশ্বাসের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ঘটিযাছে। স্বাভাবিকভাবে শেষপাদের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টিতে এই পৌরাণিক চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করিলে জাতীয় চরিত্রের এই ঈপ্সিত লক্ষ্যটি নির্ধারণ করিতে পারিব এবং সাহিত্যক্ষেত্রের বিভিন্ন শাখায় লোকমানসের সনাতন বিশ্বাস বোধের স্বচ্ছ প্রতিফলনটি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইব। দেশের বৃহত্তর জনজীবন উত্তরাধিকার সূত্রে যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও আত্মিক প্রত্যয় লাভ করিয়াছে তাহা যুগ যুগান্তের জাতীয় সম্পদ। দেশকালের নূতন ভাব সংঘাতে সভ্যতা সংস্কৃতির নূতন প্রচ্ছদপটে সমাজ ও জীবনের রূপ অনিবার্য পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়াছে। তথাপি জাতীয় চরিত্র অন্তরের অন্তস্তলে পুরাণ ধর্মের নির্দেশ-উপদেশ ও নৈতিক অনুজ্ঞাকে পরম শ্রদ্ধায় বহন করিয়া চলিয়াছে। পুরাণ মহাকাব্যের যে সমস্ত চরিত্র ত্যাগ ও তপস্যায়, ক্ষমা ও ঔদার্যে, করুণা ও মমতায় চিরকালীন মানবধর্মের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, জাতীয় জীবনের সহস্র উপপ্লবের মধ্যে তাহা অকম্পিত আলোক বর্তিকারূপে গৃহীত হইয়াছে। জাতীয় জীবনে পুরাণ চেতনার এই সর্বাত্মক প্রভাবটিও আমরা প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্য করিতে পারিব।

—পাদটীকা—

১। গুপ্ত সম্রাটগণ এ দেশে রাজ্যস্থাপন করার ফলে যে আর্যপ্রভাব বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে গুপ্ত যুগের অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দের যে কয়খানি তাম্রশাসন ও প্রস্তুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে আর্যগণের ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি এই সময় বাংলায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল—বাংলা দেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ১৪

২। ভাগবত পুরাণে মহাপুরাণের দশলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে :

সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তী রক্ষান্তরাণিচ।
বংশো বংশ্যানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ॥
দশভিলক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥

—ভাগবত, ১১শ স্কন্দ, ৭ম অধ্যায়, শ্লোক ৯-১০

৩। পুরাণ প্রবেশ—গিরীন্দ্রশেখর বসু—পৃঃ ১৭৪

প্রথম অধ্যায়

॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক চেতনা ও বাঙ্গালী মানস ॥

খ্রীষ্টীয় ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত পাল ও সেন বংশের রাজত্বে বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রাধান্য বিস্তার করে। যদিও পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্টপোষকতা করিয়াছেন, তথাপি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংঘাতে বৌদ্ধ ধর্ম শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করিয়াছে। বাংলার এই ধর্ম সংঘাতটি সমগ্র ভারতীয় দ্বন্দ্ব সংঘাতেরই অনুরূপ। এ সম্বন্ধে ডঃ দীনেশ সেন বলিয়াছেন:

"আদিকাল হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও জনমতের মধ্যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কোন সময় গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ বৈদিক আচার ও যাগযজ্ঞ চালাইয়াছেন কখনও বা বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মের আচারে অহিংসামূলক জনমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মের বহু আচার বিচার এবং কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের করতলগত ক্ষমতার লীলা একদিকে, অপর দিকে প্রাচীন যাগযজ্ঞের দুর্গের লৌহ প্রাচীর ভেদ করিয়া মুক্ত আকাশের আলো ও বায়ু আনিবার প্রচেষ্টা—এই দুই প্রবাহ ভারতীয় সভ্যতাকে যুগে যুগে রূপান্তরিত করিয়াছে।"[১]

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই সংঘর্ষের পথে শেষ পর্যন্ত স্মার্ত সংস্কৃতি ও পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়াছে। এইজন্য বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আরতির শিখায় হিন্দু ধর্মের বিলীয়মান জ্যোতি পুরাণ ভাগবতাদির আশ্রয়ে নূতনভাবে প্রজ্বলিত হইয়াছে। তাহাই ক্রমগ্রসরমান ভক্তিবাদের প্রেরণায় আরও সহজভাবে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

বাংলা দেশেও বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমান্তরাল প্রবাহে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছে। ইহার কারণ পালরাজগণের প্রকাশ্য পৃষ্টপোষকতায় যাহার অস্তিত্ব ও প্রভাব ছিল, সেনরাজগণের অন্য ধর্মমতের পোষণে তাহার প্রভাব ক্ষীণতর হওয়া স্বাভাবিক। একদিকে রাজধর্মের প্রবল প্রতাপ, অন্যদিকে হিন্দুধর্মের বিপুল আত্মসাৎ—এই উভয় ক্রিয়ায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রকাশ্য পোষণ সংগুপ্ত হইয়া যায়। হিন্দুধর্ম যদি আপন গোঁড়ামি ও নৈষ্ঠিক আচার আচরণ লইয়াই আত্মনিবিষ্ট থাকিত এবং লোকচেতনার সহিত অভিযোজনের কোন প্রয়াস

না রাখিত, তাহা হইলে হয়ত জনমত প্রকাশ্য বিরোধিতা করিত। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কৌলীন্য যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছায়াতলে আত্মরক্ষা করিতেছিল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই লোকায়ত চেতনা সমাজের অন্তস্তলে প্রবেশ করিবে। বাংলার জাতিভেদ প্রথা বহুকাল ধরিয়া কৌলীন্যকে রক্ষা করিয়াছে। সেইজন্য লোক চেতনা সহসা প্রবল হইতে পারে নাই। বৌদ্ধ ধর্মের উদার ক্ষেত্রে যে হরি-হরছত্র মেলা বসিয়াছিল, তাহা উচ্চবর্ণের স্বীকৃতি পায় নাই। অথচ আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষার তাগিদে হিন্দু ধর্ম এই সমস্ত ধর্মের বহু অংশকে প্রবলভাবে আত্মসাৎ করিয়াছে। এমনভাবে স্বীকরণ করিয়াছে যে তাহার মধ্যে অবৈদিক ধর্মচেতনার চিহ্ন আবিষ্কার করাই দুরূহ। এইভাবেই লোক মানসের সহজ অনুভূতিকে কাজে তুলিয়া সেদিনের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রক্ষা পাইয়াছে, বৌদ্ধ ধর্মকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইয়াছে:

"হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্ম শুধু নষ্ট করিয়া ছাড়েন নাই, তাঁহারা দুহাতে বৌদ্ধ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের উপর নিজ নিজ নামাঙ্কের ছাপ দিয়া উহা সর্বতোভাবে নিজস্ব করিয়াছেন। হিন্দুর পরবর্তী ন্যায়দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই লুণ্ঠনের পরিচয় আছে—কোথাও ঋণ স্বীকার নাই। এইভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের বিলোপ সাধন করিয়াছেন।"[২]

বৌদ্ধ ধর্মের উপর আস্তিক বিজয় সমাপ্ত হইতে না হইতে নূতন বিপদ আসিল। তাহা আরও ভয়াবহ, আরও জটিল। ইহা অভারতীয় ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব—জাতিতে, গোত্রে, আচারে একেবারে ভিন্নমার্গী, ভিন্নধর্মী। বাংলা দেশে মুসলমান আক্রমণ বাংলার সমাজ জীবনকে একেবারে ছারখার করিয়া দেয়। এই রাজনৈতিক উপপ্লব তথা ধর্মনৈতিক বিপর্যয় মধ্যযুগের বাংলার আদি অধ্যায়। এই বিপর্যয় হইতে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য আবার সেই পিতামহ ব্রহ্মের মত পৌরাণিক সংস্কৃতির দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে।

বাংলা দেশে তুর্কী বিজয় আরম্ভ হয় ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী সেইদিন চিরতরে ভাগীরথী গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন। তাহার পর ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমান শাসকদের নানা শাখা বাংলায় রাজত্ব করিয়াছেন। হোসেন শাহী বংশের পূর্ব পর্যন্ত (১৪৯৩ খ্রীঃ) বাংলা দেশের ইতিহাসে এই মুসলমান শাসকগণ তাঁহাদের রক্ত কলঙ্কিত শাসনের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। ইলিয়াস শাহী শাসনকালে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের হাতে (১৩৪২—১৩৫৭) এবং তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহের হাতে (১৩৫৭—৮৯) বাংলা দেশের খানিকটা স্বস্তি

ফিরিলেও হোসেন শাহী আমলের পূর্ব পর্যন্ত (১৫৩২ খ্রীঃ) রাষ্ট্রিক অনিশ্চয়তা কাটে নাই। একদিকে মুসলমান নৃপতিদের অত্যাচার ও হত্যালীলায় যেমন সমাজ প্রকম্পিত হইতেছিল, তেমনি অন্যদিকে হিন্দু সমাজ পীর গাজি ফকিরের ইসলাম ধর্ম প্রচারে আতঙ্কিত হইতেছিল। উভয় প্রকার দলন এবং প্রচার নীতির উদ্দেশ্য এ দেশের লোকের ধর্মান্তরীকরণ। সমাজ জীবনের এক গোপন রন্ধ্র পথে এই প্লাবন বন্যা ভাঙন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব তখন সমাজে প্রচলিত। বৌদ্ধ ধর্ম পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণ তাহা সমূলে উৎপাটিত করিতে বদ্ধ পরিকর। আবার হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরও কোণঠাসা হইয়াছিল। শূন্য পুরাণের 'নিরঞ্জনের রুস্মা' অংশে বৌদ্ধ সমাজের প্রতি ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বিবৃত হইয়াছে। অসহনীয় অত্যাচারে নিরঞ্জন রুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে মুসলমান বেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন, উদ্দেশ্য হিন্দুর দেবায়তন, উপাসনা গৃহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া। 'নিরঞ্জনের রুস্মা' প্রামাণিক কি না সংশয় থাকিলেও ইহা তদানীন্তন সমাজের একটি বাস্তব পরিচয় উদ্ঘাটন করে। হিন্দুদের গোঁড়ামি এবং সঙ্কীর্ণতা কি পরিমাণে সমাজের তলদেশে ছিদ্র করিয়াছিল, তাহারই আভাস ইহাতে লক্ষিত হয়।

সুতরাং এই নির্জিত বৌদ্ধ ও সমাজের নিম্নবর্ণ অধিবাসীদের উপর ধর্মান্তরী-করণ সহজ হইয়াছিল। এই কাজে পীর-ফকিরদের দৌরাত্ম্য, শাসকদের পীড়ন অপেক্ষা কম ছিল না। পাণ্ডুয়ার মখদুম পীর, পীর নেপীর, সেখ আলাউদ্দীন আলাউল হক, সেখ নূরুদ্দিন, নূর কুতব আলম, বাবা আদম, ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজী ও বড়খাঁ গাজী—ইঁহাদিগকে মুসলমান ভক্ত সমাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। ইঁহাদের পীড়ন ও প্রতাপে জমিদার ভূস্বামীদের মত প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও অনেক সময় ধর্ম বা প্রাণ দিতে হইয়াছে।[৩]

এই সংকট ও বিপর্যয়ে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম যে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, তাহার কারণ এই যুগের পৌরাণিক চেতনা ও স্মার্ত সংস্কৃতির আশ্রয়। রাজশক্তি হারাইয়া হিন্দু সমাজ অন্তিম প্রয়াসে আপন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আঁকড়াইয়া ধরে। এই সমাজ-সংরক্ষণ নীতি দুইভাবে দেখা দেয়। একদিকে লৌকিক জনচেতনা শক্তি ভিক্ষা করিয়া আপনাপন দেবদেবীর আশ্রয় অবলম্বন করে ও অন্যদিকে অভিজাত সম্প্রদায় বৃহৎ ভারতীয় সংস্কৃতির ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য এবং অনুবাদগুলির মধ্যে এইভাবে সমাজ সংরক্ষণের চেষ্টা দেখা যায়। মুসলমান ধর্মমতের সহিত লৌকিক ধর্মমতের

সুগভীর ব্যবধান ছিল। বিদেশী শাসকের ধর্মমতের সম্মুখে এ দেশীয় জন সম্প্রদায় অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতেছিল। এই উপক্রুত জাতি সকল প্রকার উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং আত্মত্রাণ করিতে গিয়া সর্বতোভাবে দৈব সহানুভূতির উপর আত্মসমর্পণ করে। সমাজ জীবনের এই অবস্থা হইতেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি।[৪] অপর দিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ব্যাপক অনুশীলন সুরু হয়। টোলে চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ সমাজ শাস্ত্র দর্শন আলোচনা সুরু করেন। বিশেষ করিয়া ন্যায়ের চর্চা তখন বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-দেবের পূর্বেই নবদ্বীপ নব্যন্যায়ের কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলার টোল-গুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও গোপাল পাড়ার টোল। ন্যায় চর্চায় বাংলার সহিত মিথিলার যোগাযোগ ছিল। মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় ন্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থ রচনার কাল ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নহে বলিয়া দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৫] ইনি ন্যায় চর্চায় পথিকৃৎ ছিলেন। নবদ্বীপের ন্যায় চর্চায় গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্ত্ব চিন্তামণি'র উল্লেখযোগ্য দান আছে। চৈতন্যদেবের সময় ও তৎপরবর্তী কালে নবদ্বীপের খ্যাতি শীর্ষে ছিল। ইহা ছাড়া মুসলমান রাজ দরবারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু রাজকর্মচারী ছিলেন। ইঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য পুরাণ ইত্যাদি অনুবাদ করিতে উদ্যোগী হন।

সমাজের এই দুইটি দিক ভিন্ন পথে যাইলেও উভয় শ্রেণীর একটি সাধারণ লক্ষ্য ছিল। তাহা হইল দেব মহিমা ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা। হিন্দুর জাতিভেদ ও আচার ধর্মের বিধি নিষেধের মধ্যে উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের ব্যবধান ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছিল। তুর্কী আক্রমণের সাধারণ অভিঘাতে এই ব্যবধান সংহতির পথে আসিতেছিল। তখন দুই শ্রেণীই সমানভাবে সমাজ সংরক্ষণ করিতে চাহিয়াছে।

॥ মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক উপাদান ॥

জাতীয় জীবনের এই সংকট মুহূর্তে আর্যেতর সংস্কারগুলি শ্রেণী বৈষম্য কাটাইয়া ভদ্র সমাজে আসন পাতিতে সক্ষম হইয়াছিল। যাহা স্বাভাবিক-ভাবে উচ্চ কোটির জীবনাদর্শে গৃহীত হয় নাই, তাহাই বিকল্পরূপে পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য মিশ্রণে সর্বসাধারণে গৃহীত হইতেছিল। কৌলীন্যহীন

বাংলার মাটির দেবতা পুরাণ সম্মত আভিজাত্য লইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল বলিয়াই তাহারা জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিকট পূজা পাইযাছিল। মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায় কৌলীন্যের ছাপ ক্রমশঃ ক্রমশঃ গভীরভাবে দেবদেবীর মধ্যে পড়িতেছিল।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী বিন্যাস, উপস্থাপনা পদ্ধতি ও চরিত্র চিত্রণের মধ্যে এই পৌরাণিক উপাদান লক্ষ্য করা যায। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হইতে মঙ্গলকাব্যের ধারা চলিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে লৌকিক চেতনা ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিই মুখ্য ছিল। তখন সমাজে লৌকিক দেবতাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই। অন্ত্যজ সম্প্রদায় যে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিল তাহাদের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া কাব্যগুলি রচিত হইয়াছে। কিন্তু সমাজের অন্তস্তলে তখন একটি সংহতির গোপন ক্রিয়া সুরু হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য চেতনা অনেকখানি আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করিয়া জনজীবন ধারার সহিত মিলিত হইতে চলিয়াছে। তখন উচ্চবর্ণের জীবনাদর্শ ও ধর্মবোধের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য লৌকিক কাহিনীর উপর পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপের চেষ্টা সুরু হয। আবার সাধারণ জনগণের মনের উপর মঙ্গল কাব্যগুলির বিশেষ প্রভাব থাকায় ব্রাহ্মণগণ এই সাহিত্য বিলোপের চেষ্টা না করিয়া বরং ইহাকে সংস্কৃত মহাকাব্যের ছাঁচে ঢালিযা নূতন রূপ দিযাছিলেন এবং ইহাব ভিতর দিয়া তাঁহাদের বিশেষ ধর্মমত ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য চেষ্টিত হইয়া পডিয়াছিলেন।[৬] বলা বাহুল্য, এই পৌরাণিক চেতনা সর্বদা লৌকিক চেতনাব সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার ফলে মঙ্গলকাব্যের নিজস্ব কাঠামোটি বহুলাংশে শিথিল হইয়া পডিাছে এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ একটি বিশেষ রচনারীতি ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। ষোডশ শতাব্দী হইতে এইরূপ বিশেষ রচনা প্রথার অনুসরণ দেখা যায। এই যুগের কবিগণ সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন এবং মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে বহু পৌরাণিক ও মহাকাব্যিক উপাদান সন্নিবিষ্ট করেন। অবশ্য এই প্রভাব একতরফা হয় নাই। মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যেও মঙ্গলকাব্য দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হইযাছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয অনুমান করেন[৭] বাংলা মহাভারতের দাতা কর্ণ উপাখ্যানটি ধর্মমঙ্গলের হরিশচন্দ্র পালাটির রূপান্তর। লৌকিক রামায়ণে হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবান সংগ্রহের কাহিনী মনসা মঙ্গলের শঙ্কর গারুডীর কাহিনী হইতে গৃহীত। অনুরূপ ভাবে রামায়ণের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট অংশ বাঙ্গালীর

জাতীয় জীবনের সংগে যোগ রক্ষা করিতে পারে, তাহাও কালক্রমে মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্যে সাঙ্গীকৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

মঙ্গল কাব্যের উপস্থাপনা পদ্ধতিতে পৌরাণিক চেতনা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বিশেষ দেবদেবীর প্রশস্তি কাব্য হইলেও ইহাদের মধ্যে পুরাণের পাঁচমিশালী দেববন্দনার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণের অপরিহার্য অঙ্গ হইল সর্গ বা সৃষ্টিতত্ত্ব। মঙ্গলকাব্যে বিশিষ্ট দেবতার কীর্তি রচিত হইবার পূর্বে প্রাক্ কথন হিসাবে সৃষ্টি বিবর্তন আলোচিত হইয়াছে। সৃষ্টির আদিরূপ, মনুর প্রজা সৃষ্টি, প্রজাপতি দক্ষের শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, উমার তপস্যা, মদন ভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর বিবাহ, হরপার্বতীর সংসার জীবন ইত্যাদি পৌরাণিক বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কাহিনীর সহিত ইহাদের যোগ নাও থাকিতে পারে। পৌরাণিক ভাব মণ্ডল সৃষ্টি করিয়া বোধকরি আগে হইতেই দেবতার আসন পাতিয়া দেওয়া হয়। ইহারই অনুক্রমণিকায় আলোচ্য দেবতার আগমন সহজ হইয়া উঠে।

চরিত্র চিত্রণেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বাংলার লৌকিক দেবদেবী যাহা একান্ত-ভাবেই ভূমিজ বা আর্যেতর তাহা পৌরাণিক ভাবযুক্ত হইয়া অনেকখানি উন্নত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙালীর নিজস্ব চেতনা জাত বলিয়াই বোধ করি ইহাদের লৌকিক রূপগুলি বিনষ্ট হয় নাই। তাহার ফলে এই দেবতাকুল পুরাণ এবং লোক মানসের মিশ্ররূপ পাইয়াছে। এই দেবতা পুঞ্জের মধ্যে সর্বপ্রধান হইলেন শিব। পুরাণে যেমন ইনি দেবাদিদেব মহাদেব, মঙ্গলকাব্যেও ইনি দেবতাগ্রগণ্য শিব। শিবচরিত্রের মধ্যে আর্য রুদ্র, পৌরাণিক শিব এবং লোকচেতনার মানবশিবের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ বৈদিক রুদ্র অনেকখানি প্রাগার্য শিবের উপাদান আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই রুদ্র পরে পৌরাণিক শিবে পরিণত হন। পৌরাণিক শিবের মধ্যে পরবর্তীকালের বহু প্রভাব আসিয়া পড়ে। বৌদ্ধ প্রভাবে ইহার রুদ্র মূর্তি বহুলাংশে শান্ত হইয়া যায়। রুদ্র যোগী হইয়া যান। বাংলা দেশে আবার ইহা একটি স্থানীয়রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলার কৃষি সভ্যতার ফলে এই শিব কর্ষণ অধিপতি প্রমথ। ইহার ফলে শিবচরিত্রের একটি অদ্ভুত মিশ্ররূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। উচ্চকোটিক ও লোকায়ত, অলৌকিক ও লৌকিক চেতনার সমাবেশে বাঙ্গালীর ধর্মে ও কাব্যে আর্যশিব বঙ্গশিবে পরিণত হইয়াছেন। আবার তাঁহার চরিত্রের মূলরূপ রুদ্র ও শিব, ঘোর ও অঘোর, উগ্র ও শম্ভু, বামদেব ও প্রসন্ন দক্ষিণ, এই ভাববৈপরীত্যও অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল।[৮] শুধুমাত্র শিবমঙ্গলেই নয়,

বিভিন্ন কাব্যে শিবকে আহবান করা হইয়াছে বোধ করি এইজন্যই যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ ও শান্তি যেমনভাবে শিব চরিত্রে প্রতিফলিত হইযাছে, তেমনটি আর কোথাও হয নাই। শিবহীন যেমন যজ্ঞ হয না, তেমনি শিবহীন কাব্যও হয় না। সকল কাব্যের চরিত্রের সহিত তাঁহার একটি আত্মিক সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। তিনি ধর্মাযণে ধর্মের অধীন, রামাযণে রামের অধীন, মনসামঙ্গলে মনসার, চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীর, মহাভারতে কৃষ্ণের, বৈষ্ণব চরিতে চৈতন্যের, নাথ সাহিত্যে গোরক্ষ-ময়নামতীর। শিব প্রকৃতির সহিত যেখানে মিল সেখানে যেমন তিনি আসিয়াছেন, যেখানে বিরোধ সেখানেও বাদ যান নাই। বিপরীত চিত্র সমন্বযের এই কারুকার্য পুরাণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।* বাঙ্গালী কবি ইহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইযাছেন।

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি এক হিসাবে জাতীয কাব্য। ইহাদের মধ্যে বাংলার প্রাকৃত জীবনধারা একটি নিটোলরূপ পরিগ্রহ করিযাছে। বাঙ্গালীর স্বল্প সুখ ও বিপুল দৈন্যের গৃহ জীবন, দাম্পত্য জীবনের হাসি-অশ্রুর অদ্ভুত সমাবেশ, স্বজন পরিজন পরিবৃত সংসার—এই প্রাকৃত জীবনবোধের ভিতর বোধকরি একটি মাধুর্য আছে। বাংলার কবিকুল এই বেদনা মিশ্রিত মাধুর্যের কাব্যরূপ দিযাছেন। ইহারই **Great Patriarch** হইলেন শিব। সেইজন্য শিবকে দৈন্যে বিভূষিত করিয়া, ভস্মকে বিভূতি জ্ঞান করিয়া বাঙ্গালী তাঁহাকে আরাধ্য দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছে। সাংস্কৃতিক সংঘাতে উচ্চ জীবন ধারার সহিত অভিযোজন আবশ্যিক হইলেও এই অন্তরতম রূপটিকে বাঙ্গালী বিসর্জন দিতে চাহে নাই। সেই জন্য পৌরাণিক চেতনাব আত্যন্তিক আরোপণ হইলেও এই একান্ত বাস্তবরূপটি শিবের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রহিযাছে। মঙ্গলকাব্যে শিব পৌরাণিক চেতনায় অনাসক্ত বৈরাগী আর লৌকিক চেতনায় আসক্তগৃহী। শিবচরিত্রে পৌরাণিক ভাবের এইরূপ স্বীকরণ ঘটিয়াছে।

শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হইবার পূর্বে বাংলা দেশে শিবের গীত প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বলিয়াই বোধকরি ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক অংশের প্রাধান্য ছিল না। আবার শিবমঙ্গল কাব্যের যাহা সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহা সপ্তদশ শতকের পূর্বে নহে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনা অনেকখানি আসিয়া পড়িয়াছে।

শিবমঙ্গল কাব্যের অন্যতম শাখা মৃগলুব্ধের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে পুরাণ আশ্রিত। বিভিন্ন পুরাণের মুচুকুন্দ রাজার কাহিনী হইতে ইহা সংগ্রহ করা হইযাছে। এই

কাব্যে লৌকিক চেতনার অবকাশ কম। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন[১০] লৌকিক শিবের উদ্ভব ভূমি হইতে বহু দূর অঞ্চলে মৃগলুব্ধের কাহিনী প্রচলিত হইযাছিল। সেইজন্য ইহাতে লৌকিক প্রভাব পড়িতে পারে নাই।

বাংলার বহুল প্রচারিত মঙ্গল কাব্য হইল মনসামঙ্গল। এই মনসার উৎপত্তি আর্যেতর সমাজে। অর্বাচীন পুরাণগুলির মধ্যে পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতিতে মনসা দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মনসা দেবী যে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমাজে উঠিতেছিলেন, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। মহাভারতে নাগরাজ বাসুকি ভগিনী জরৎকারুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা মনসা মঙ্গলে কালক্রমে এই জরৎকারু ও মনসা অভিন্ন হইযা গিয়াছেন। মনসামঙ্গলের ধারায়ও প্রথম দিকের কবিদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনার একান্ত অভাব দেখা যায়। পরে যত শেষের দিকের কবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ততই তাঁহাদের কাব্যে পৌরাণিক উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এইজন্য নারায়ণদেব হইতে বিজয় গুপ্তের কাব্যে পুরাণের উপাদান বেশী। আবার জীবন মৈত্রে আরও বেশী। আবার একই কাব্যের অনুলিখন হইয়াছে বিস্তর। ইহার ফলে কাব্যের মধ্যে লেখকদের সময় অনুপাতে পৌরাণিক উপাদানের তারতম্য ঘটিযাছে।

লৌকিক দেবী চণ্ডী একই ভাবে আর্য সমাজে গৃহীত হইয়াছেন। এই চণ্ডীর লৌকিক রূপ দুইটি—প্রথম, তিনি শিকারী ও পশুকুলের দেবী, কালকেতু—ফুল্লরা কাহিনীর মধ্যে যে দেবী রহিয়াছেন , দ্বিতীয়, তিনি হইলেন মঙ্গলচণ্ডী, ভক্তকে যিনি সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করেন, ধনপতি-শ্রীমন্ত উপাখ্যানের চণ্ডী। দুই কালের দুই স্তরের দেবী ও দেবকাহিনী একত্র মিশিয়া গিয়া উচ্চতর শ্রেণীর আরাধ্যা পৌরাণিক দেবী দুর্গা ও চণ্ডীর সংগে একীভূত হইয়া গিয়াছেন। সমাজের স্ত্রী সম্প্রদাযের মধ্যে পৌরাণিক চেতনা অনেক পরে প্রবেশ করিয়াছে। বহুদিন এই স্ত্রী সমাজ রক্ষণশীলতায় আবদ্ধ থাকিযা আপনাদের ধর্ম কর্ম করিয়াছে। পুরুষ সম্প্রদায় এই প্রভাব কাটাইয়া পৌরাণিক দেবতার কল্পনা করিয়াছে। পরে ইতিহাসের অগ্রগতিতে এই দেবতা লৌকিক স্তর হইতে পৌরাণিক স্তরে উন্নীত হইলে পুরুষ সমাজও ইহার পূজা করে। ধনপতি সদাগরের চণ্ডী পূজার বিরোধিতা এই সত্য প্রমাণ করে।[১১]

শিবায়নের শিব পৌরাণিক প্রভাবে যেমন লৌকিক রূপ পরিহার করিতে পারেন নাই, চণ্ডী মঙ্গলের দুই লৌকিক দেবীও তেমনি পৌরাণিক দেবীর সহিত সর্বাংশে এক হইতে পারেন নাই। তবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারায় শেষের দিকে

ক্রমশ: ক্রমশঃ পৌরাণিক চণ্ডীরই প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম পরবর্তী জয়নারায়ণ সেন, মুক্তারাম সেন প্রভৃতির হাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী বা দুর্গারই প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে।

মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্যে দুইটি ধারা স্পষ্ট দেখা যায়। একটি লৌকিক ধারা অপরটি পৌরাণিক ধারা। লৌকিক ধারাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি এবং পৌরাণিক ধারার অন্তর্ভুক্ত করা যায় দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গৌরীমঙ্গল প্রভৃতি। প্রথম শাখার উৎপত্তি অনেক প্রাচীন কালে। সমাজের বহমান লোক চিন্তায় এই লৌকিক দেবমাহাত্ম্যের কাব্য চলিয়া আসিতেছিল। তুর্কী আক্রমণের আভ্যন্তরীণ সংকট এবং সংঘাতে সমাজের সর্বস্তরের মিলন অপরিহার্য হইতেছিল। পৌরাণিক প্রভাব এই অবস্থায় লোকচেতনার কাব্যগুলিকে উচ্চ বর্ণের গ্রহণ-যোগ্য করিতেছিল। যদিও ইহারা সর্বাংশে লোকচেতনাকে পরিহার করিতে পারে নাই, তথাপি পৌরাণিক পরিমণ্ডলে কাব্যগুলির বহুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আবার পৌরাণিক ভাবধারার হুবহু প্রকাশ ঘটিয়াছে অন্য কতকগুলি মঙ্গলকাব্যে। ইহাদের মধ্যে আবার লোকচিন্তার প্রভাব পড়িয়াছে। মঙ্গল কাব্যের কাঠামো ধরিয়াই পৌরাণিক চিন্তার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। এই উভয় চেতনার প্রভাবে মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীকুল একটি মিশ্ররূপ পাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত এই পৌরাণিক চেতনার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে বলা যায় কেননা ষোড়শ শতাব্দী উত্তর মঙ্গল কাব্য-গুলিতে লৌকিক চেতনা ক্ষীণতর হইয়াছে। বাংলা দেশে যে বৃহৎ ভারত ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটিতেছিল সেই ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটুকু ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অনুবাদ কাব্য ঃ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কথা ॥

মধ্য যুগের দ্বিধা বিভক্ত সাহিত্যের মধ্যে অনুবাদ কাব্যগুলি অন্যতম। ইহাদের মধ্য দিয়া ভারতীয় পৌরাণিক চেতনা যেমন লোকমানসে সঞ্চারিত হইয়াছে, তেমনটি অন্য কিছু দ্বারা হয় নাই। ইহাও এক প্রকার মুসলমান রাজত্বের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া। এই বিদেশী শাসনে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ সভ্যতা সংস্কৃতিতে এই শাসককুল ভিন্ন গোত্রীয়, দ্বিতীয়তঃ বাংলা দেশে রাজকার্য পরিচালনায় ইহারা সংস্কৃত অপেক্ষা বাংলাকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে আসন্ন বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য লোকমানসে ইহার প্রচার প্রয়োজন হইয়াছিল।

অনুমান করা যায়, অনুবাদগুলির প্রথম অভিব্যক্তি ঘটে কথকতার মধ্যে। কথক সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে বিবিধ কথা কাহিনী সহজভাবে লোক সমাজে পরিবেশন করিতেন। পরে ইহার প্রয়োজনের গুরুত্ব দেখিয়া সুসংবদ্ধ ভাবে অনুবাদের প্রয়াস দেখা যায়।

বাংলা অনুবাদ কাব্যগুলির মধ্যে প্রথমে রামায়ণকে উল্লেখ করিতে হয়। ইহার পথিকৃৎ হইলেন কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় ও অন্যান্য বিষয়ের অবতারণার উপর নির্ভর করিয়া কৃত্তিবাসের সময়কে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ধরা হইয়াছে।[১২] কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের যে অনুবাদ করেন, তাহাই বাংলা রামায়ণের আদি গ্রন্থ। অবশ্য তাঁহার পূর্বে বাংলা দেশে কিছু কিছু রামকথার প্রচলন ছিল। তুর্কী বিজয়ের পূর্বে অভিনন্দের 'রামচরিত' এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের সন্ধান পাওয়া যায়। চর্যাপদের কোন পদে অধ্যাপক মনীন্দ্র বসু যোগবাশিষ্ট রামায়ণের কোন উপাদান আছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মধ্যেও হনুমানের দৌত্য এবং লঙ্কাকাণ্ডের ইঙ্গিত আছে। বিদ্যাপতি বৈষ্ণবকবিতা এবং হরগৌরী বিষয়ক পদের সংগে কিছু কিছু রাম সীতা বিষয়ক পদও লিখিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত রাম কথার মধ্যে কোন প্রবল ভক্তিবাদের চিহ্ন নাই। কৃত্তিবাসের মধ্যেই সর্বপ্রথম ভক্তিবাদের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ দেখা যায়।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণ হইতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। বাল্মীকির রামচন্দ্র পূর্ণ মানব। রামচন্দ্রের উজ্জ্বল নরমহিমাকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তবে বালকাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ডে দেখা যায় রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বা সাক্ষাৎ নারায়ণ। বাল্মীকি রামায়ণে এই দুই কাণ্ড পরবর্তী যোজনা বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, এই নারায়ণী বিভূতির অন্তরালে রামের নরমহিমাকে বাল্মীকি খর্ব করেন নাই। অনুমান করা যায়, বাল্মীকির রচনায় পরবর্তী হস্তক্ষেপের ফলে তাঁহার মহাকাব্যে বিষ্ণুপ্রভাব পড়িয়াছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণে রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

বাল্মীকি রামায়ণের এই প্রচ্ছন্ন ভক্তিবাদ বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাসের হাতে একেবারে নিরঙ্কুশ ভক্তিবাদে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণব ভক্তি এবং শাক্ত ভক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বাংলা দেশে বৈষ্ণব ভাবধারা ক্রমশঃ ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতেছিল এবং অপর দিকে শাক্ত ভক্তিবাদের ফল্গু স্রোতও বাঙ্গালী জীবনকে সিক্ত করিতেছিল। কৃত্তিবাস স্বাভাবিক ভাবেই এই

ভক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শুধু বাংলাদেশের ভক্তিবাদ নহে, উত্তর ভারতের রামভক্তি শাখাও তখন গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারই কোন তরঙ্গ বাংলা দেশে আসিয়া পড়া বিচিত্র নহে। সুতরাং বহির্বাংলা এবং অন্তর্বাংলার ভক্তিবাদের প্রাবল্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে ভক্তি আশ্রয়ী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার রামভক্তিবাদ উত্তর ভারতের কৃষ্ণভক্তিবাদের আন্তরধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। কৃষ্ণের মহৎ ভাগবতমহিমা রামচরিত্রে আরোপিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের পক্ষে সেইজন্য রামচন্দ্রকে অবতার করিয়া তোলা অসম্ভব হয় নাই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছেন: "বাংলাদেশে দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে ভক্তির স্রোত বহিতেছিল। একদিকে শাক্ত আর একদিকে বৈষ্ণব এই উভয় প্রকার ভক্তিরস বাঙ্গালীর স্বাভাবিক চিত্তধর্মের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র কখনও ব্রহ্ম সনাতন, কোথাও বিষ্ণুর অংশাবতার, কোথাও বা ভক্তের ভগবান। কখনও বা রামচন্দ্র ও দেবী চণ্ডীর মধ্যে বাৎসল্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন যে, পরবর্তী কালের বৈষ্ণবগণ রামকে চৈতন্যের সমপর্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং তাহার জের মিটাইবার জন্য শাক্তগণও শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়া চণ্ডীপুজা করাইয়া লইয়াছেন এবং এইভাবে রামায়ণে বৈষ্ণব ও শাক্তের যুগপৎ হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের সেই মত ও মন্তব্য বিচার প্রসঙ্গে মনে হয় যে, রামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব থাকিলেও তাহার অন্তরালে যে দলবিশেষের সজ্ঞান ও স্পষ্ট প্রয়াস ছিল, এরূপ কল্পনা করিবার যুক্তি সংগত কারণ নাই"[১৩]

এইভাবে কৃত্তিবাসের ভক্তিবাদকে বাঙ্গালী জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিবাদ বলা যায়। বাঙ্গালীর এই অন্তর-চেতনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কৃত্তিবাস বিভিন্ন উৎসের ভক্তির মধ্যে সেতুবন্ধন করিয়াছেন। তাঁহার এই ভক্তিবাদ সহজসাধ্য হইয়াছে নানা পুরাণ কথা এবং রাম কথার আশ্রয় লইবার জন্য। তিনি বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করিলেও ইহার আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। আবশ্যকমত তিনি গ্রহণ-বর্জন করিয়াছেন, অন্যান্য রামকথা ও পুরাণ হইতে কিছু কিছু কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কিছু কিছু মৌলিক সংযোজনও করিয়াছেন। অধ্যাপক মনীন্দ্র বসু অনুমান করেন[১৪] বাল্মীকির পূর্বনামে দস্যুবৃত্তির কথা অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে গৃহীত, দেবী ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে হরিশ্চন্দ্রের উপাদান গৃহীত, দুর্গাপূজার বিবরণ দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ এবং কালিকা

পুরাণ হইতে সংগৃহীত। শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে শিববন্দনা আহৃত হইয়াছে কূর্মপুরাণ, শিবপুরাণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে। ইহা ছাড়া লবকুশের যুদ্ধ বিবরণ পদ্মপুরাণ ও জৈমিনি ভারত হইতে, বনবাসে সীতাকর্তৃক গয়াধামে পিণ্ডদান শিবপুরাণ হইতে, হনুমানের বক্ষবিদারণ ও রামসীতার মূর্তি প্রদর্শন অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। আবার ঔষধ আনিবার সময় হনুমানের সহিত কালনেমির যুদ্ধের বিবরণ অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে। স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ডের জটায়ু উপাখ্যান তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। ইহা ছাড়া ভট্টিকাব্য ইত্যাদি সংস্কৃত কাব্য নাটকাদির প্রভাবও তাহার মধ্যে আছে।

মোটের উপর বলা যায়, বাল্মীকি রামায়ণ যেমন একটি একক রচনা নয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণও তেমনি একক রচনা নয়। সহস্র হস্তের প্রসাধন কলায় এই কাব্য যুগে যুগে বর্ধিত হইয়াছে। সব কিছু মিলিয়া একটি ফলশ্রুতি ঘটাইয়াছে—তাহা হইতেছে উদ্বেল ভক্তিবাদ। 'মরা মরা' উচ্চারণে দস্যু রত্নাকরের মুক্তি আসিয়াছে, তেমনি রাম রাম উচ্চারণে মহাপাতকেরও মুক্তি আসিবে, তাহাই কৃত্তিবাসের আশ্বাসবাণী।

কৃত্তিবাসের পরে ষোড়শ শতাব্দী হইতে রামায়ণ অনুবাদের ধারার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। মধ্য যুগের অনুবাদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্য (১৬ শ) কৈলাস বসু (১৬ শ), চন্দ্রাবতী (১৬ শ), গুণরাজ খাঁ (১৭ শ), ঘনশ্যাম দাস (১৭ শ), ভবানী ঘোষ (১৭ শ), দ্বিজ লক্ষ্মণ (১৭ শ), রামশংকর (১৭ শ), রামানন্দ ঘোষ (১৭ শ), শঙ্কর কবিচন্দ্র (১৮ শ) প্রভৃতি কবিদের রামায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়া অদ্ভুতাচার্য সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, রঘুবংশ, ও অন্যান্য পুরাণ কথা হইতে রামকাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসের রচনায় অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের অনেক অংশ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। কৈলাস বসুর রামায়ণ সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের মূলানুগ অনুবাদ। এই সমস্ত অনুবাদকের সকলেই সম্পূর্ণ রামায়ণ অনুবাদ করেন নাই। কেহ কেহ সমগ্র রামায়ণ, আবার কেহ কেহ এক একটি পালা বা কাণ্ড অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদগুলির মধ্যে লক্ষণীয় এই যে, এইগুলি আদি বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং অদ্ভুত রামায়ণকে অনুসরণ করিয়াছে বেশী। তাহার ফলে ঘটনা বৈচিত্র্য ও নানা উপকাহিনীতে এইগুলি পরিপূর্ণ।

।। মহাভারত ।।

বাংলা সাহিত্যে মহাভারতী কথা রামায়ণ হইতে পরে আসিয়াছে। বোধ হয় মহাভারতের বিরাট কর্মকাণ্ডের সহিত বাঙ্গালীর প্রাণের সায় ছিল না। রামায়ণের সহজ গার্হস্থ্য কথা যেমন সহজেই বাঙ্গালীর মর্মে প্রবেশ করিয়াছে, তেমনি মহাভারতী উত্তেজনা তাহাকে উদ্বেলিত করিতে পারে নাই। এইজন্য মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ হইলে ধীরে ধীরে তাহাতে বাঙ্গালী মনের ভাবারোপ করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় মহাকাব্যগুলির অনুবাদের একাধিক কারণ আছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির লোক প্রচার একটি বিশেষ কারণ সন্দেহ নাই। মুসলমান রাজশাসকগণ এই সংস্কৃতির গূঢ় অর্থ হয়ত বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা এ দেশীয় পুরাণ সাহিত্যের বাহিরের দিক দেখিয়া নিশ্চয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তুর্কী বিজয়ের পর যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই শাসনকার্যে হিন্দুদের সহযোগিতা অপরিহার্য হইয়া উঠিতেছিল। আবার রাজকার্যে তাঁহারা বাংলাভাষাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় বাংলা ভাষায় শাস্ত্র ও মহাকাব্যাদি অনুবাদ করার সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছিল। ডঃ দীনেশ সেন এই মুসলমান আনুকূল্য সম্বন্ধে গভীর উক্তি করিয়াছেন :

> বিদ্যার অর্ণবযান সদৃশ, দেবভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাবান টুলোপণ্ডিতগণের বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার দরুণ আমাদের দেশের ভাষা যে কোন কালে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না। পাঠান প্রাধান্য কালে বাদশাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিযাছিলেন, তাঁহাদের দলিলপত্রও অনেক সময় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত। · তাঁহারা হিন্দুর পুরাণ ও অপরাপর শাস্ত্রের মর্ম জানিবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং বাঙ্গালা তাঁহাদের কথ্য ভাষা ও সুখপাঠ্য ছিল, এজন্য তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জমা করিতে উপযুক্ত পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিযাছিলেন।[১৫]

কিন্তু এই প্রশস্তি কিছু অতিরঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনুবাদ সাহিত্যের ব্যাপকতা মুষ্টিমেয় নরপতির পৃষ্টপোষকতার ফল নহে। তাঁহাদের পৃষ্টপোষকতা অবশ্য ছিল। কিন্তু ইহার অন্তরালে লোকমানসের স্বতন্ত্র প্রেরণা ছিল, আবার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সুপ্রচারের গভীর কামনাও ছিল। বাংলা-

সাহিত্যের এই যুগে এমন দুইটি বিপরীতমুখী চিন্তাধারার অদ্ভুত কাকতালীয় যোগাযোগ ঘটিয়াছে বলা যায়।

মহাভারতের অনুবাদ প্রথম আরম্ভ হয় ষোড়শ শতাব্দীতে হোসেন শাহী আমলে। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁন চট্টগ্রাম জয় করিয়া সেখানকার শাসনকর্তা হন। মুসলমান হইলেও তিনি হিন্দু সংস্কৃতির ভক্ত ছিলেন। তাঁহারই নির্দেশে তাঁহার সভাসদ কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'পাণ্ডববিজয় পঞ্চালিকা' রচনা করেন। যতদূর জানা যায় ইনিই মহাভারতের আদি অনুবাদক। ডঃ দীনেশ সেন সঞ্জয় নামক এক ব্যক্তিকে প্রথম অনুবাদক বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। অবশ্য সাম্প্রতিক গবেষণায় সঞ্জয়ের অস্তিত্বের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যাহা হউক, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রায় সমগ্র মহাভারতের ভাবানুবাদ করেন। তাঁহার মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামেও পরিচিত। তিনি অনুবাদে 'ব্যাসভারত' অপেক্ষা 'জৈমিনি ভারত' হইতে বেশী উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পরাগলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁনও এইরূপ কাব্য রচনার পৃষ্টপোষকতা করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশে সভাকর শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অশ্বমেধ পর্ব সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল। শ্রীকর নন্দী তাহা বিস্তৃত ভাবে অনুবাদ করেন।

এই সমস্ত অনুবাদে জৈমিনি ভারতকেই বিশেষ ভাবে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। বোধকরি গল্পের ভাগ বেশী বলিয়া ব্যাস মহাভারতের তেমন প্রচলন ছিল না। অধ্যাপক বসু অনুমান করেন[১৩] ব্যাস ভারতের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বিজয় পণ্ডিত। সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের রচনা প্রয়োজনমত গ্রহণ ও বর্জন করিয়া বিজয় পণ্ডিত ব্যাস মহাভারতের প্রচলন করিয়াছেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে অসংখ্য মহাভারতের অনুবাদ হইলেও কালজয়ী খ্যাতি কাশীরাম দাসের। এক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের মত কাশীরাম দাসেরও অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। রাজসভার কাব্যকে তিনি জনসভার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি নিজে হয়ত সম্পূর্ণ কাব্য রচনা করিয়া যান নাই, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। কাশীরাম দাস বা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম যিনিই কাব্যটি সম্পূর্ণ করুন, তাহা বাঙ্গালীর কাছে পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছে।

মহাভারতের বীর চরিত্রগুলি কাশীরামের হাতে বাঙ্গালীর রূপ পাইয়াছে।

বাংলাদেশ এই সময় চৈতন্য সংস্কৃতিতে প্লাবিত। জীবনের সর্বত্রই করুণা এবং কোমলতা। ইহার ফলে মহাভারতের শৌর্যের চরিত্র মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। বাংলা দেশের ভক্তিবাদ তখন সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ লাভ করিযাছে। ভক্তি মিশ্রিত সহজ ধর্মবোধের দ্বারা জাতীয় জীবন গড়িযা উঠিযাছে। কাশীদাসী মহাভারত ইহার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিযাছে।

কৃত্তিবাসী রামাযণের মত কাশীদাসী মহাভারতও একক রচনা নয়। অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য বহু কবি ক্রমে ক্রমে কাশীরাম দাসের মধ্যে আপন রচনা সংযোজন করিয়াছেন।

॥ পুরাণ ॥

মধ্যযুগের পুরাণ অনুবাদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাগবত পুরাণের অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যদেবের সময যে ভাগবতধর্ম গভীর মহিমা লাভ করে তাহার সূচনা হয় মাধবেন্দ্র পুরী প্রমুখ ভাগবত প্রচারকদের মধ্যে। মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে (১৪৮০ খ্রীঃ) অনুরূপভাবে বাঙ্গালী সমাজে প্রথম ভাগবত পরিবেশন করেন। ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ লইযা শ্রীকৃষ্ণবিজয কাব্য। ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা, মথুরা লীলা ও দ্বারকা লীলা বর্ণিত হইযাছে। ইহাতে ভক্তিবাদ অপেক্ষা শৌর্যের পরিচয় অধিক তাহা সহজেই অনুমান করা যায। তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙ্গালী সমাজের সম্মুখে একটি 'অমানুষী শক্তির উজ্জ্বল শিখা' প্রজ্জ্বলন করাই হয়ত কবির কামনা ছিল। সেই জন্য মালাধর বসু তাঁহার কাব্যে মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যঘন মূর্তিরই পরিচয দিয়াছেন। মহাপ্রভু অবশ্য ইহাকে ভক্তিরসের অন্যতম উৎসরূপেই গ্রহণ করিযাছিলেন—"নন্দের নন্দনকৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। এই বাক্যে বিকাইনু তাঁহার বংশের হাত॥" তবুও ইহা ঠিক মধুররসের উচ্ছ্বসিত প্রস্রবণ নহে। পরন্তু ইহার ভক্তিবাদ ভাগবত বর্ণিত বৈধীভক্তি, আত্মনিবেদন মূলক গৌড়ীয বৈষ্ণব ভক্তি নহে।[১৭] গৌড়ীয বৈষ্ণব সমাজের রাগানুগা ভক্তি চৈতন্যদেবের সমযে সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। ইহা পরবর্তী ভাগবত অনুবাদগুলিকে মধুর রসে অভিষিক্ত করিযাছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের উপর পরবর্তী কালের যত হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে, ততই ইহার ভাবধর্মের রূপান্তর ঘটিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দী একান্তভাবেই বৈষ্ণবযুগ। ভাগবতের মধ্য দিযা বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের পুষ্টি ঘটিযাছে। অবশ্য শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ভাগবতের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ভাগবতের ঐশ্বর্যলীলা

বহুলাংশে মধুরলীলায় পর্যবসিত হইয়াছে। ষোড়শ শতকের রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী' সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ। মালাধর বসুর অনুবাদ অপেক্ষা ইহা পূর্ণতর। ইহাতে মূল ভাগবতের তাৎপর্য অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। মাধবাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল' মূলতঃ ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ। তবে কবি হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণ কথা হইতেও বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যান্য ভাগবত রচয়িতাদের মধ্যে কৃষ্ণ দাসের 'মাধবচরিত', কবিশেখর দেবকীনন্দন সিংহের 'গোপালবিজয় পাঁচালী', দুঃখী শ্যামাদাসের 'গোবিন্দ মঙ্গল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ভাগবতের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। এই সমস্ত অনুবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে ভাগবতকে লোকপ্রিয় কাব্য হিসাবে প্রচলিত করা। সেইজন্য ভাগবত বহির্ভূত কৃষ্ণলীলার অনেক উপাদানই এইগুলিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণের দানলীলা, নৌকালীলা ইত্যাদি লোকপ্রিয় কৃষ্ণলীলার যেমন প্রবেশ ঘটিয়াছে, তেমনি ভাগবত বহির্ভূত রাধা-চরিত্রও ধীরে ধীরে প্রাধান্য পাইয়াছে। বাংলার ভাগবত কথা পরিণতিতে রাধাকৃষ্ণ প্রেম লীলাকেই উপজীব্য করিয়াছে।

মধ্য যুগের অনুবাদ সাহিত্যে বাঙ্গালী মানসের একটি বিশেষ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মূল রামায়ণ এবং মহাভারতকে অনুবাদ করা হইলেও কেহই প্রায় যথাযথ অনুবাদ করেন নাই। একদিকে বিদেশী শাসক সম্প্রদায় যেমন চিত্তাকর্ষক কাহিনীর ভক্ত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বাঙ্গালী জনসাধারণেরও গল্পরসের প্রতি সহজ আকর্ষণ ছিল। ইহার জন্য অনুবাদগুলির মধ্যে প্রচুর গল্প উপাদান সংযোজন করা হইয়াছে। সংস্কৃত পুরাণ ইত্যাদি হইতে নানাবিধ কাহিনী উপাখ্যান আহরণ করা হইয়াছে। রামায়ণ শাখায় এইজন্য অদ্ভুত রামায়ণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব অধিক পড়িয়াছে এবং মহাভারত শাখায় ব্যাসভারত অপেক্ষা জৈমিনিভারতের ছায়াপাত হইয়াছে বেশী। পৌরাণিক কথাবস্তু উভয় কাব্যের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে এবং অনুবাদগুলি মূল আদর্শ হইতে অনেকখানি সরিয়া আসিয়াছে। মধ্যযুগে গীতি-কবিতার স্বরমূর্ছনার মধ্যে বাঙ্গালী মানসের যে ভাবাতিশয্য দেখা যায়, তাহা এই কথাবস্তুর মধ্যে বাস্তবনিষ্ঠ হইয়াছে। ইহা তাহাদের জীবন প্রীতিরই পরিচয় দিয়াছে। রাজনৈতিক সংঘাতে বাংলার পল্লীপ্রাণ বোধ করি একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। এই শংকা সংকট এড়াইয়া জীবনকে কিভাবে উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা বাঙ্গালী

জানিয়াছে। ইতিহাসের প্রমত্ততা তাহার গৃহজীবনের শান্তিভঙ্গ করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, মহাকাব্যগুলি বাঙ্গালীর জীবনকাব্য হইয়াছে। বাঙ্গালী চিত্তের কোমলতা ও পেলবতা মহাকাব্যের কঠিন আবরণ ছিন্ন করিয়াছে। যে বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ বহির্বাংলায় উৎপন্ন হইয়াছিল, বাংলা দেশের মাটি ও মনের সান্নিধ্যে তাহা যেমন প্রেমধর্মী হইয়া পড়ে, তেমন মহাকাব্যিক জীবনাদর্শও গৃহধর্মী বাঙ্গালীর জীবনাদর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার চরিত্রগুলিতে মহাকাব্যের ভাস্কর্য বলিষ্ঠতা নাই, বাঙ্গালী মনের মৃদুতার স্পর্শে তাহারাও মৃদু ও কোমল হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয়তঃ, ভক্তিবাদের প্রাবল্যে অনুবাদগুলি পৌরাণিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পুরাণে যে উচ্ছ্বসিত ভক্তির অভিব্যক্তি দেখা যায়, বাংলা রামায়ণ-মহাভারতেও সেইরূপ ভক্তির নিঃস্কুশ প্রকাশ ঘটিযাছে। কৃত্তিবাসের সময় রামচন্দ্র বিষ্ণু অবতাররূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। নানাবিধ পৌরাণিক প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস এই ভক্তিবাদকে আরও দৃঢ় করিয়াছেন। আর কাশীরাম চৈতন্যদেবের পরবর্তী বলিয়া সেই ভাবঐতিহ্যকে সহজেই প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছেন। পৌরাণিক ভাবধারার বিরাট স্মারকস্তম্ভ বলিয়া এই রামায়ণ-মহাভারত এতখানি লোকপ্রিয় হইতে পারিয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি যখন সর্বতোভাবে বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যে পৌরাণিক ভাবধারার অনুশীলন করা হইয়াছে তাহাতে একটি ঐতিহাসিক সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে। বাংলার বহির্জীবন নানাভাবে পীড়িত হইলেও অন্তরজীবনের শিখাকে অনির্বাণ রাখিবার জন্য এইরূপ পৌরাণিক বর্মের প্রয়োজন ছিল। সমাজের উচ্চ সম্প্রদায় স্মার্তবিধান ও নৈয়ায়িক চর্চায় টিকিয়া থাকিলেও জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য সংস্কৃতির তরল পরিবেশন অপরিহার্য হইয়াছিল। এই পৌরাণিক চেতনা জাতিকে সেই মহতী বিনষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর নূতন প্রেক্ষাপটে জাতির সম্মুখে অনুরূপ গভীর সংকট সৃষ্টি হয়। বাংলা তথা ভারতের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি—সব কিছুর উপর এই নূতন ভাবধারা গভীর ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করে। জাতির বহিরাচরণই শুধু নহে, অন্তর-চিত্তও ইহাতে গুরুতর ভাবে আলোড়িত হইয়াছে। এই সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী প্রভাবকে কাটাইবার জন্য এই যুগেও উচ্চতর চিন্তা ও দর্শনের আলোচনা

হইয়াছে। কিন্তু সমাজের সাধারণ স্তর যে আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে তাহা এই পৌরাণিক চেতনা। অনেকটা সমান্তরাল পরিবেশের জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার পূর্বে মধ্যযুগের জীবনে ও সাহিত্যে এই পৌরাণিক চেতনার কথা স্মরণ করিতে হয়।

—পাদটীকা—

১। বৃহৎ বঙ্গ—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, পৃঃ ১২২

২। ঐ, পৃঃ ৮

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪৩

৪। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস। ২য় সং।—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫

৫। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান—দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৮

৬। পদ্ম পুরাণ—ডঃ তমোনাশ দাসগুপ্ত সম্পাদিত, ভূমিকা

৭। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস। ২য় সং। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪৪-৪৫

৮। বাংলা কাব্যে শিব—ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৩

৯। ঐ, পৃঃ ৯১

১০। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস। ২য় সং। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০৭

১১। ঐ, পৃঃ ৩২০

১২। কৃত্তিবাসের সময় লইয়া প্রচুর বিতর্ক রহিয়াছে। যে আত্মপরিচয় হইতে তাঁহার কাল অনুমান করা হয়, তাহা সর্বাংশে প্রামাণিক কি না সন্দেহ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত একটি পুঁথিতে আত্মপরিচয়ের সংযোজনটি সকলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করেন না। আবার উক্ত আত্মপরিচয়ে কোন নির্দিষ্ট রাজার নামোল্লেখ নাই। অধিকাংশ গবেষক এই গৌড়েশ্বরকে রাজা গণেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রাজা গণেশের কাল অনুযায়ী কৃত্তিবাসের কালকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ ধরিতে হয়।

১৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৬০

১৪। বাঙ্গালা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়—মনীন্দ্র বসু, পৃঃ ৮৫-৮৭

১৫। বৃহৎ বঙ্গ—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, পৃঃ ৬৫৭

১৬। বাঙ্গলা সাহিত্য—২য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়—মনীন্দ্র বসু, পৃঃ ২৭

১৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৬১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ : অনুবাদ ও অনুশীলনে প্রাচীন রীতি

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলি প্রাচীন রীতিতেই অনূদিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাস তাঁহার শ্রীরামপাঁচালীতে যে ভক্তিবাদের তরঙ্গ ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, যাহা চৈতন্য যুগে শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্য ভাব স্পর্শে আরও বর্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছিল, তাহাই নিরঙ্কুশ ভাবে সমগ্র অনুবাদ সাহিত্যে অনুসৃত হইয়াছে। দেশের বৃহৎ জনজীবন—অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত সমাজ ভক্তিবাদের ছাড়পত্রেই এই অনুবাদগুলিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে মৌলিক সৃষ্টি বিশেষ ছিল না। সুতরাং সাহিত্য সৃষ্টির উদ্যোগ আয়োজন অনুবাদের মধ্যেই বিশেষ ভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল। শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগী ব্যক্তিবৃন্দ এই অনুবাদ ও সংকলনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলির অর্ধ শতাব্দীর অনুশীলন এখানে আলোচিত হইতেছে।

॥ রামায়ণ ॥

রামায়ণ শাখায় যে সমস্ত অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে তাহাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুনর্মুদ্রণ। ইহার মুদ্রণ কাল ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ। পাঁচটি খণ্ডে বাল্মীকিকৃত রামায়ণ মহাকাব্য—যাহা কৃত্তিবাস কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছে—মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে আদি কাণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ডে অযোধ্যা কাণ্ড ও অরণ্য কাণ্ড, তৃতীয় খণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ও সুন্দরা কাণ্ড, চতুর্থ খণ্ডে লঙ্কা কাণ্ড ও পঞ্চম খণ্ডে উত্তর কাণ্ড বিবৃত হইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই রামায়ণ কাব্যে রক্ষিত হইয়াছে। কৃত্তিবাস যে মূল আর্ষ রামায়ণের হুবহু অনুবাদ করেন নাই, তাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণের সকল সংস্করণই সাক্ষ্য দেয়। মিশন প্রেসের রামায়ণে যেমন কৃত্তিবাস গৃহীত আর্ষ রামায়ণের বহু অংশ রক্ষিত হইয়াছে, তেমনি তাঁহার স্বকপোল কল্পনার বহু চিহ্নও প্রকীর্ণ

হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণের মধ্যে নাম মাহাত্ম্য কীর্তনই বোধ হয় কৃত্তিবাসের বিশেষ অবদান। মিশন প্রেসের রামায়ণে এই নাম মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে। বাংলা দেশে রামায়ণ চর্চার উজ্জীবন ক্ষেত্রে মিশন প্রেসের রামায়ণের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাড়া মূল বাল্মীকি রামায়ণ ইংরেজী অনুবাদ সহ কেরী ও মার্শম্যানের সম্পাদনায় চারিটি খণ্ডে ১৮০৬, ১৮০৮ ও ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ পায়। ভারত তত্ত্ব অন্বেষণ তাগিদে সেদিন কোলব্রুক, উইলসন প্রমুখ বিদেশী মনীষিবৃন্দ যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, আমাদের জাতীয় জীবনে তাহার অনেকখানি গুরুত্ব রহিয়াছে। তাঁহাদের এই ঐতিহ্য চর্চার পরোক্ষ ফল হিসাবে আমাদের শিক্ষিত মানসের দৃষ্টি ঐ লুপ্ত ভাণ্ডারের দিকে পড়িয়াছিল। এই দিক দিয়া সংস্কৃত রামায়ণের পুনর্মুদ্রণ ও ইংরেজী অনুবাদের মধ্যে তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙ্গালী আত্মানুসন্ধানের পথ আবিষ্কার করিয়াছিল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের শ্রীরামপুর সংস্করণ কেরী সাহেবের সম্পাদনায় প্রথমে প্রচলিত পুঁথি অনুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছিল (১৮০২-৩ খ্রীঃ)। ইহার কিছু কিছু অংশ পরে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দ্বারা মার্জিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে ১৮৩০-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সমাচার দর্পণের সাক্ষ্য :

> কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বহুকাল পর্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু ঐ রামায়ণ গ্রন্থে লিপিকর প্রমাদে ও শিক্ষক ও গায়কদিগের ভ্রম প্রযুক্ত অনেক অনেক স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ার লুপ্ত ইত্যাদি নানা দোষ হইয়াছে। এইক্ষণে ঐ গ্রন্থ সুপণ্ডিত দ্বারা বর্ণশুদ্ধ্যাদি বিচার পূর্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে।[১]

বাংলাদেশে তর্কালঙ্কারী রামায়ণের বিপুল প্রচার রহিয়াছে। বহু পরিবর্তন ও বিক্ষিপ্ততা বহন করিয়া যে রামায়ণের বার বার পুনর্মুদ্রণ ঘটিয়াছে, তাহার প্রধান কাঠামোটি হইল এই তর্কালঙ্কারী রামায়ণ।

তবে উনবিংশ শতকে রামায়ণ কাব্যের বৃহৎ কীর্তি হইল রঘুনন্দন গোস্বামীকৃত 'রাম রসায়ন'। গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।[২] অর্বাচীন কালের রাম কাহিনীর মধ্যে ইহাই সর্ববৃহৎ। কবি ইহার মধ্যে বাল্মীকি, তুলসীদাস ও অন্যান্য কবি বর্ণিত বহু রাম কাহিনীর সমাবেশ

ঘটাইয়াছেন। গ্রন্থটি মূল সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত হইলেও প্রতি খণ্ডে অসংখ্য পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। তাহাতে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত অসংখ্য উপাখ্যানের সংযোজন ঘটিয়াছে। কবি পুরাণ পারঙ্গম ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার রামায়ণে অসংখ্য পৌরাণিক আখ্যানের উল্লেখ আছে। গ্রন্থটির মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব স্পষ্টই অনুভূত হয়। কবি ইহা তাঁহার আরাধ্য বিগ্রহ 'শ্রীরাধামাধবে'র পবিত্র নামেই উৎসর্গ করিয়াছেন। এই বৈষ্ণব ভাবের জন্য ইহার বিষয় বস্তু ও অন্তর প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই সম্বন্ধে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> সীতা বর্জন, লক্ষ্মণ বর্জন, সীতার পাতাল প্রবেশ রাম রসায়নে স্থান পায় নাই। যে ঘটনা মনকে দুঃখের তরঙ্গে ফেলিয়া যায়, যাহাতে প্রাকৃতিক বিধানের উৎকর্ষের উপর সন্দেহ জন্মে, যেখানে সত্য ও শুভের অসমর্থতা প্রমাণিত হয় তাহাদের শ্মশানের উত্তাপে করুণার অশ্রুবিন্দু শুকাইয়া যায়। বৈষ্ণবগণ সেরূপ ঘটনা বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন না। সেই জন্যই চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবতে গৌরাঙ্গ প্রভুর তিরোধান বর্ণিত হয় নাই।[৩]

ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারে কবির পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধ রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থেরও কয়েকবার পুনর্মুদ্রণ ঘটিয়াছে।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত একখানি রামায়ণ কাব্যের সন্ধান দিয়াছেন। ইহার রচনাকাল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। পিতার আদেশে কবি গৃহে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ভক্ত হনুমানের আদেশে তিনি রামায়ণ রচনা করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবি ইহার মধ্যে কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কৌতুক প্রিয়তা, হাস্যরসও কাব্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন অন্যান্য কয়েকটি রামায়ণ কাব্যের সন্ধান দিয়াছেন।[৪] ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জগৎ মোহনের রামায়ণ কাব্যটির রচনাকাল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। 'রাম ভক্তি রসামৃত' কাব্যের রচয়িতা কমল লোচন দত্ত মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে লেখা এই কাব্যটির কয়েকটি কাণ্ডের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১২৪৯ সালে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় বলিয়া জানা যায়। অদ্ভুত রামায়ণের উপাখ্যানগুলি চিত্তাকর্ষক বলিয়াই বোধ করি ইহার প্রতি কবিগণের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। অদ্ভুত রামায়ণের মূলানুগ অনুবাদ করিয়াছেন হরি মোহন

গুপ্ত (১৮৫২) ও দ্বারকানাথ কুণ্ডু (১৮৫৫)। ইহার গদ্যানুবাদ করিয়াছেন কৃষ্ণকান্ত ন্যায়ভূষণ (১৮৩৫—৩৬)।

লঙ্ সাহেবের তালিকাতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত বা প্রচলিত অনেকগুলি রামায়ণের খণ্ড বা পূর্ণ অংশের অনুবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে রাজা সত্যচরণ ঘোষালের সংস্কৃত ও বাংলা অধ্যাত্ম রামায়ণ, বর্ধমানের রাজার আনুকূল্যে ভাস্কর প্রেসে প্রকাশিত আদি খণ্ড প্রভৃতি রামায়ণ কাব্য উল্লেখযোগ্য। অনেকগুলি রামকাহিনীর লেখক-পরিচিতি নাই। ইহা যে বিক্ষিপ্ত ভাবে নানা স্থানে অনূদিত হইতেছিল ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

॥ মহাভারত ॥

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম উল্লেখযোগ্য মহাভারত রামায়ণের অনুরূপ মিশন প্রেসের কাশীদাসী মহাভারতের অনুবাদ (১৮০২ খৃঃ)। শ্রীরামপুর মিশনে রামায়ণের চেয়ে মহাভারতের ছাপা আগে আরম্ভ হয়। চারিটি খণ্ডে ইহা সম্পূর্ণ। কেরীর বাইবেল চর্চার সমান্তরালে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদও চলিযাছে। বাংলা দেশ এই বাইবেলগুলিকে ভুলিয়া গেলেও তাঁহার রামায়ণ মহাভারতকে ভুলিতে পারে নাই। দেশীয় পণ্ডিতবর্গের সহযোগিতায় কেরী আমাদের ঐতিহ্য চর্চার পথ সুগম করিয়াছেন।

পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার রামায়ণের মত শ্রীরামপুর মিশনের মহাভারতেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। মিশন প্রেস হইতে তাঁহার মহাভারত দুইটি খণ্ডে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে আদি, সভা ও বন পর্ব রহিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বিরাটাদি অবশিষ্ট পর্ব আছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় মিশন প্রেসের কাশীদাসী মহাভারতকে সংশোধন করিয়া তাহার একটি পরিমার্জিত রূপ দান করেন। বাংলা দেশে প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারত আসলে এই তর্কালঙ্কারী মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিযাছে।

মিশন প্রেসের মহাভারতের পর বটতলার মহাভারত বাজারে প্রচলিত ছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের 'সম্বাদ ভাস্করের' বিজ্ঞাপন হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। "কাশীদাসী মহাভারত।—কলিকাতা নগরীর শোভাবাজার বটতলা স্থানীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়কারি শ্রীযুত বাবু মধুসূদন শীল কাশীদাসী মহাভারত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, শ্রীরামপুরীয় পাদরি শ্রীযুত মার্স্যমেন সাহেবের মহাভারত ছাপার পরে এই ছাপা হইল।"[৫] বস্তুতঃ বাংলা দেশে বটতলার সাহিত্যের একটি বিশেষ মূল্য আছে। সাহিত্যকে লোকসাধারণের দরবারে পৌঁছাইয়া দিতে বটতলার

ভূমিকা গৌণ নহে। পুরাতন ধর্ম পুস্তক ও শাস্ত্র গ্রন্থ একাধিকবার বটতলা হইতে প্রকাশিত হইযা বাংলা দেশের ঘরে ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। আজিও পর্যন্ত বাংলা দেশে প্রচলিত মহাভারতের বিরাট অংশ এই বটতলা সংস্করণ।

সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদের সমান্তরালে মহাভারত অন্তর্গত ভগবদ্গীতারও বহুল অনুবাদ হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রাচ্য বিদ্যা অনুশীলনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল। ইহার পণ্ডিতমণ্ডলী সংস্কৃত হইতে বিবিধ বিষয় বাংলায় অনুবাদে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। কেরী সাহেব স্বয়ং যে সমস্ত রচনায় হস্তক্ষেপ করিতেন, এই পণ্ডিতবর্গ সেগুলিকে যথা সম্ভব পরিমার্জিত ও সংশোধিত করিয়া দিতেন। আবার স্বতন্ত্র ভাবে ইঁহারা কিছু কিছু অনুবাদও করিয়াছেন। চণ্ডীচরণ মুন্সী ভগবদ্গীতাকে পয়ার ছন্দে অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং ইহার পাণ্ডুলিপি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলেজ কাউন্সিলে উপস্থাপিত করা হয়। ইহার জন্য কলেজ কাউন্সিলের নিকট হইতে তিনি ৮০্ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।[৬] কিন্তু চণ্ডীচরণের এই গীতা মুদ্রিত হয় নাই। গীতার আভ্যন্তরীণ মর্মোদ্ঘাটনে কলেজ কর্তৃপক্ষের আদৌ আগ্রহ ছিল না, তাঁহারা যে শুধু বাংলা ভাষা চর্চাকে উৎসাহ দান করিবার জন্যই এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গীতার পদ্যানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে ১৮১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে। লেখক ভাগীরথী তীরে বেলগড্যা গ্রামের অধিবাসী।[৭] রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র সমালোচনায় রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক গীতার পদ্যানুবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠনাথের গীতার অনুবাদই রামমোহনের পদ্যানুবাদ কিনা, সে বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। কারণ বৈকুণ্ঠনাথ, রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার 'নির্বাহক' ছিলেন এবং তিনি কোন পণ্ডিতের সহায়তা অবলম্বনে ভগবদ্গীতা অনুবাদ করেন। সুতরাং ইহাতে রামমোহনের হস্তক্ষেপ থাকা বিচিত্র নহে।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কৃত গীতার অনুবাদ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মুদ্রিত হয। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের মূল গীতাকে লেখক 'গদ্য রচিত ভাষা অর্থ সহ' প্রকাশ করিয়াছেন। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের গীতা অনুবাদও এইখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি যেমন মহাভারত অনুবাদ করিয়াছেন, তেমনি পৃথকভাবে ভগবদ্গীতাও অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানান্বেষণ মুদ্রাযন্ত্রালয় হইতে তাঁহার গীতার নবম

অধ্যায় পর্যন্ত সটীক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে অপরার্ধ অনুবাদ করিয়া তিনি দুইটি ভাগ একত্রে প্রকাশ করেন।

॥ পুরাণ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে বহু সংখ্যক পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। অষ্টাদশ পুরাণ এবং উপপুরাণের কিছু কিছু অংশের যেমন অনুবাদ হইয়াছে, তেমনি পুরাণোক্ত বিভিন্ন কাহিনীরও পৃথক পৃথক অনুবাদ হইযাছে। পুরাণের নানা তীর্থ মাহাত্ম্য, বিশেষ ভাবে কাশী মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিয়া কয়েকটি অনুবাদাত্মক কাব্য সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাণের মধ্যে আবার ভাগবত পুরাণের একটি স্বতন্ত্র ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের যে প্লাবন বহিয়া যায়, তাহাতেই ভাগবত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। সেই জন্য ভাগবত অনুবাদের প্রতি কবি ও লেখকদের একটি স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়।

উনবিংশ শতকের প্রথম হইতে যে সমস্ত পুরাণ আশ্রিত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ডঃ সুকুমার সেন তাহাদের বিবরণ দিয়াছেন।[৮] তাহা অনুসরণ করিয়া এ পর্যায়ের পৌরাণিক অনুবাদগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণকিশোর রায়ের 'দুর্গালীলা তরঙ্গিনী'র রচনাকাল ১৮২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দ। দেবী মাহাত্ম্যকীর্তন প্রসঙ্গে কবি গ্রন্থের শেষের দিকে কৃষ্ণলীলার বিবরণ দিয়াছেন। দীন দয়াল গুপ্তের 'দুর্গাভক্তি চিন্তামণি' ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পর্যায়ের সর্ববৃহৎ দেবীমঙ্গল কাব্য হইল রামচন্দ্র মুখুটির 'দুর্গামঙ্গল'। কবি গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করিয়াছেন ১৮১৯—২০ খ্রীষ্টাব্দে। কাব্যটির মধ্যে কয়েকটি পালা স্বতন্ত্রভাবে গ্রথিত আছে, যথা 'গৌরী বিলাস', 'কঙ্কালীর অভিশাপ', 'হর পার্বতী মঙ্গল' এবং 'নল দময়ন্তী উপাখ্যান'। ইঁহার অন্যান্য পৌরাণিক কাব্য হইল শ্রীকৃষ্ণলীলা জ্ঞাপক 'অক্রূর সংবাদ' এবং যযাতি শর্মিষ্ঠা সম্পর্কিত 'চন্দ্রবংশ'। রামায়ণ কাহিনী ও দেবী মাহাত্ম্য লইয়া নন্দকুমার কবিরত্নের 'কালী কৈবল্য দায়িনী' মুদ্রিত হয় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। 'নিত্য ধর্মানুরঞ্জিকা' পত্রিকায় নন্দকুমারের বহু পৌরাণিক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অন্তর্গত 'রাধাহৃদয়' স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। নন্দকুমার সে যুগে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। হিন্দুধর্মের আচার নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

দেবী মাহাত্ম্য জ্ঞাপক অন্যান্য অনুবাদের মধ্যে রামরত্ন ন্যায়পঞ্চাননের দেবী

ভাগবত পুরাণের অন্তর্গত 'ভগবতী গীতা' (১৮২১), রাধা চরণ রক্ষিতের মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে 'চণ্ডিকা মঙ্গল', রামলোচন তর্কালঙ্কারকৃত কালী পুরাণের পদ্যানুবাদ (১৮৫৪) উল্লেখযোগ্য। দেবানন্দ বর্ধনের 'শিব মাহাত্ম্য' কাব্যের রচনাকাল হইতেছে ১২৫১ সাল।

কোচবিহারের মহারাজাগণও পৌরাণিক কাব্য কাহিনী রচনার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অনেকগুলি পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের আনুকূল্যে রচিত কাশীশ্বর কৃত 'ব্রহ্মোত্তর খণ্ড' (১৮৩৭—৩৮) এবং রাম নন্দন কৃত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' (১২৪২) উল্লেখযোগ্য। মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিজ বৈদ্যনাথ শিব পুরাণের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মূল ভাগবতের পুনর্মুদ্রণ বা অনুবাদ তথা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পুরাণাশ্রিত কাব্য রচনায় এযুগের অনেকেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রক্ষণশীল সমাজের মুখপাত্র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শ্রীধর স্বামীর টীকা সমেত মূল ভাগবত তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রিকা যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ জোড়াসাঁকো রাজবাটীর রাজা শিবচন্দ্র রায়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়।[৯] এ বিষয়ে ভবানীচরণ এক অদ্ভুত রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। তুলট কাগজের প্রাচীন ধারা মত পুস্তকের পাত করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ দ্বারা এগুলি মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। ভাগবত ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থও তিনি কিছু কিছু মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মনুসংহিতা, উনবিংশ সংহিতা, ভগবদ্গীতা ও রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নব্য স্মৃতি পুনর্মুদ্রণ করিয়া ভবানী চরণ স্বধর্ম পালনের নিষ্ঠা ও আনুগত্য দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভাগবত অনুবাদে দ্বিজ রামকুমারের ভাগবতের পদ্যানুবাদ (১৮৩১), সনাতন চক্রবর্তী কৃত ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ, উপেন্দ্রনাথ মিত্রের ভাগবত অনুবাদ প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রচনা। এই সময়ের লেখা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য ও নিবন্ধের যে তালিকা ডঃ সুকুমার সেন দিয়াছেন, তাহাতে বিশ সংখ্যকেরও অধিক রচনার সন্ধান পাওয়া যায়।[১০] কৃষ্ণলীলা বিষয়ক রচনা যে কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল, ইহাতে তাহারই প্রমাণ হয়। ভাগবতের প্রভাব জনমানসে বিপুলতর ছিল বলিয়াই কবিবৃন্দ তাঁহাদের অধিকাংশ অনুবাদ ভাগবতকেন্দ্রিক করিয়াছেন।

কৃষ্ণ লীলা ব্যতীত অন্যান্য পুরাণের অনুবাদ উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগ

পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে রচনা এবং উনবিংশ শতকের শেষ দিকে মুদ্রিত গঙ্গারাম দাস বটব্যালের ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ১২৫৫ সালে মুদ্রিত রামলোচন দাসের ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ উল্লেখযোগ্য অনুবাদ। রামলোচন কল্কি পুরাণেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। কেদার নাথ ঘোষাল পদ্ম পুরাণের অন্তর্গত ব্রহ্ম খণ্ডের অনুবাদ করিয়াছিলেন ১২৫৩ সালে। স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত কাশী খণ্ডের অন্যান্য অনুবাদক হইলেন জয়নারায়ণ ঘোষাল, কেবল-কৃষ্ণ বসু ও সীতানাথ বসু মল্লিক। রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের কাশী খণ্ডের অনুবাদ একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই সুবৃহৎ অনুবাদ সংকলন করিতে তিনি অনেকের সাহায্য পাইযাছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নৃসিংহদেব নামে এক কবির নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ মধ্যে কাশীর যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন :

> তৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরের যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্তিটি আমাদের চক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে, কালে এই চিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইবে, তখন ম্যাণ্ডিভাইলের জেরুজেলাম, ব্যাসের ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউ-এন সাঙের কুশীনগর এবং নরহরি চক্রবর্তীর বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের চিত্রপটের সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্রখানি এক স্থানে রক্ষিত হইবার উপযুক্ত হইবে।[১১]

জয়নারায়ণের কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক বৃহৎ কাব্য হইল 'শ্রী করুণা নিধান বিলাস।' ইহা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। কবি কাশীতে শ্রীকরুণা নিধান নামক কৃষ্ণ মূর্তি স্থাপন করেন। স্বীয় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নাম হইতেই যে তাঁহার কাব্যের নাম 'করুণা নিধান বিলাস' হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্য মধ্যে কৃষ্ণ লীলার বহুবিধ দিক আলোচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণা-বতারের সূচনা হইতে তাঁহার মথুরা ও দ্বারকা লীলা পর্যন্ত সময়ের বিচিত্র ঘটনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আবার কৃষ্ণ লীলার প্রসঙ্গে কবি বাংলার সমাজ জীবনের নানা দিক—তাহার পূজা অর্চনা, পার্বণ লীলা ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

পৌরাণিক কাহিনী ও বৈষ্ণব জীবনী বিষয়ক উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের সর্ববৃহৎ সংকলন হইতেছে রাধামাধব ঘোষের 'বৃহৎ সারাবলি।' গ্রন্থ রচনার সমাপ্তি কাল ৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থের চারিটি খণ্ডে যথাক্রমে কৃষ্ণ লীলা, রাম লীলা, গৌরাঙ্গ লীলা ও জগন্নাথ লীলা বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ লীলার মধ্যে ব্রহ্ম বৈবর্ত

পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, দণ্ডী পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতির উল্লেখ আছে এবং জগন্নাথ লীলার মধ্যে স্কন্দ পুরাণের কথা আছে।

লঙ্ সাহেবের তালিকাতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে লিখিত অনেকগুলি পৌরাণিক রচনার উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে 'ভুবন প্রকাশ', 'ব্রাহ্মণ্য চন্দ্রিকা' 'ব্রহ্ম খণ্ড', 'জ্ঞানার্জন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি হইতে উপাদান লইয়া এইগুলি রচিত হইয়াছে। ইহাদের কোন কোনটির রচনা-কালের উল্লেখ থাকিলেও প্রায় ক্ষেত্রেই ইহাদের রচয়িতাদের উল্লেখ নাই।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলির এই পুনর্মুদ্রণ ও অনুবাদের মূলে মুদ্রাযন্ত্রের দান অনস্বীকার্য। বাংলা টাইপের প্রবর্তক কোম্পানীর কর্মচারী চার্লস উইলকিন্স। শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার তাঁহার নিকট হইতে এই অক্ষর প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়া লন। শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস ও কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্রে ব্যবহৃত অক্ষরগুলি তিনিই সরবরাহ করিতেন। মুদ্রণের কল্যাণে গ্রন্থ-গুলির বহুল প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে এবং দেশের বৃহৎ জনসমাজ এগুলি সহজে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার, শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগ ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য সূচী এক দিক দিয়া আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলি প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। একথা সত্য যে মিশনারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বধর্ম প্রচার কিন্তু তাঁহাদের বিপুল উদ্যম আশানুরূপ সাফল্য আনয়ন করিতে পারে নাই। তাঁহাদের বাইবেল অনুবাদ যেমন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল, দেশীয় শাস্ত্র সাহিত্যের প্রচারও তেমনি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির বৃহত্তর উপায় রূপেই গৃহীত হইয়াছিল। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহারা এ দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির কিছু কিছু অনুশীলন করিতেছিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কিছুমাত্র অনুরাগ বা নিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায় না, পরন্তু এ দেশীয় শাস্ত্র ধর্মের নিষ্ফলত্ব প্রদর্শন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সাধারণ জনসমাজের উপর রামায়ণ মহাভারতের বিপুল প্রভাব আছে জানিয়াই তাঁহারা এগুলির পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি ছদ্ম ভূমিকা না থাকিলে তাঁহাদের প্রচারধর্মী কার্যধারা ব্যাপকতা লাভ করিত না। অপর দিকে তাঁহাদের এই প্রচেষ্টাসমূহ পরোক্ষ ভাবে বাঙ্গালী জীবনের মহদুপকার করিয়াছে। বাঙ্গালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির আশু সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রথম দিকে এইরূপ সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নাই। ধর্ম যখন নির্জিত, সংস্কার যখন প্রবল, তখন এই বিদেশী পাত্রীদের উগ্র ধর্মৈষণাই বাঙ্গালীর

চিত্তকে আপন মার্গে প্রত্যাবর্তন ঘটাইয়াছিল। শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের মূর্তি পূজার বিচার, হিন্দুর ষড়্দর্শন ও পুরাণ তন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে খ্রীষ্টানী সংস্কার স্পৃহা দেখা দিয়াছিল, তাহাই ঘাত পরিবর্তন করিয়া এ দেশীয় জনসাধারণের চিত্তকে আপন ধর্ম-সংস্কৃতির শোধন ও সংস্কারের পথে আগাইয়া দিয়াছিল।

ফোর্টউইলিয়ম কলেজের বাংলা গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু ছিল প্রধানতঃ গল্প ও উপকথা, ইতিহাস ও ন্যায়দর্শন। সংস্কৃত উপকথা, বিদেশী ঈশপস ফেব্‌লস এবং আদি রসাত্মক গল্পের ভূরি প্রমাণ আয়োজনে কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই পরিবেশে তাঁহাদের বিশুদ্ধ ধর্মনীতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হয় নাই। তবু ইহারই মধ্যে পণ্ডিতমণ্ডলীর কেহ কেহ পৌরাণিক কাহিনী, ভাগবত কথা বা গীতার অনুবাদ করিয়াছিলেন। কেরী সাহেবের নির্দেশনায় রচনাগুলি লিখিত হইলেও সর্বত্রই তিনি পাদ্রী মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থ, কাব্য গ্রন্থ ও রামায়ণাদি পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় পূর্বরশ্মি সরল না হইলেও তির্যক ভাবে ফোর্টউইলিয়ম কলেজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। তবে ইহার মধ্যে কর্তৃপক্ষ এ দেশের ধর্ম-বিষয়ে কিছু উদারতা দেখান নাই। কেননা, বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্য রচনা 'বাসুদেব চরিত' তাঁহারা মুদ্রিত করিতে চাহেন নাই। গ্রন্থটি ভাগবতের দশম স্কন্ধের কিছু কিছু ভাবানুবাদ এবং কিছু কিছু ভাবানুবাদ। বিদ্যাসাগরের অনুবাদাত্মক রচনা ধারার সূচনা এইখানেই হয়।

ফোর্টউইলিয়ম কলেজের রামরাম বসুর 'লিপি মালা'র মধ্যে অনেকগুলি পুরাণ কাহিনী সম্পর্কীয় পত্র আছে। রামরাম বসু অদ্ভুত ভাবে খ্রীষ্টধর্মের তরঙ্গ এড়াইয়া গিয়াছেন। কেরী গোষ্ঠীর নিকট তিনি খ্রীষ্ট ধর্মানুরাগী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন কিন্তু নিজে কোনদিন খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অনেকগুলি রচনায় খ্রীষ্ট ধর্মের প্রশস্তি রহিয়াছে। লিপিমালার মধ্যে 'বাইবেলের অনুবাদ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারকদের কথা' থাকিলেও ইহার মধ্যে এ দেশীয় পুরাণ কাহিনীর অনেকগুলি বিবরণও রহিয়াছে। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ কাহিনী, বারাণসীর বর্ণনা, শিব সতী কাহিনী, বৈদ্যনাথ তীর্থের প্রতিষ্ঠা কাহিনী, সগর ভগীরথ কাহিনী প্রভৃতি লইয়া লিখিত কতকগুলি পত্র ইহাতে স্থান পাইয়াছে। রামরাম বসুর জীবনচর্যায় এদেশীয় শাস্ত্র ধর্মের কোনরূপ প্রতিষ্ঠা না থাকিলেও তিনি যে এগুলি সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

পণ্ডিত গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য়

পৌরাণিক প্রতিমা পূজা ও উপাসনা পদ্ধতির সমর্থন আছে। গ্রন্থটির লেখক-পরিচয় অনুক্ত থাকিলেও ইহা যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা রামমোহনের বিশুদ্ধ বেদান্ত তত্ত্বের প্রতিবাদ। ইহার কর্মকাণ্ডে প্রতিমা পূজার যৌক্তিকতা, উপাসনা কাণ্ডে নিগুর্ণ ব্রহ্মের ধ্যান ধারণার অযোগ্যতা ও সগুণ ব্রহ্মের অর্থাৎ দেব দেবীর উপাসনার যোগ্যতা, এবং জ্ঞানকাণ্ডে অদ্বৈত জ্ঞানের দুরূহত্ব ও তাহাতে সংসারী ব্যক্তির অনধিকারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।[১২] রামমোহন যে নিগুর্ণ ব্রহ্মোপাসনার কথা বলিতে চাহিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয় তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি পূজোপাসনায় লোকাশ্রিত রূপটিই গ্রহণীয় বলিযা সিদ্ধান্ত করিযাছেন। ইহা অবশ্য কলেজের পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অনুরূপভাবে সমসাময়িককালের কলেজ-পাঠ্য বহির্ভূত রচনা কাশীনাথ তর্ক পঞ্চাননের 'পাষণ্ড পীড়ন' ও 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' রামমোহনের একেশ্বর বাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপক রচনা। ভক্তি-তত্ত্বজ্ঞানীর দার্শনিক প্রত্যযকে তিনি কটূক্তি করিয়াছেন। স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন বলিযাই বোধ করি তিনি হিন্দু সংস্কৃতির সনাতন রূপের উপর বিশেষ আস্থাবান ছিলেন।

সমকালীন দেশ ও সমাজে পৌরাণিক চিন্তা চেতনার ধারণা সম্বন্ধে এইখানে আলোচনা করা যায। আলোচ্য পর্বে রাজা রামমোহন রায় বাংলাদেশের এক মহান চিন্তানাযক। তাঁহার চিন্তাধারায় বেদান্ত, তন্ত্র ও পুরাণ সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। তিনি শংকরপন্থী বৈদান্তিক, মায়াবাদকে পূর্ণভাবে স্বীকার না করিলেও পারমার্থিক সত্যের দৃষ্টিকোণ হইতে জগতকে 'অসৎ' দেখিয়াছেন। আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে তিনি বেদান্তের পরব্রহ্মকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তন্ত্র ও পুরাণ, উপনিষদের চিন্তাধারা হইতে স্বতন্ত্র কিন্তু তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে এই পৌরাণিক চিন্তাধারা একটি অনিবার্য সংযোজন। বেদ ও বেদান্তের কর্ম ও জ্ঞান এখানে ভক্তির মধ্যে আসিযা গিয়াছে। মনস্বী লেখক ইহার লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "পৌরাণিক যুগের এক অতি সুস্পষ্ট বিকাশ ভক্তিবাদ। সৃষ্টি তত্ত্বের দিক দিযা এই ভক্তিবাদের সহিত লীলাবাদ জড়িত রহিয়াছে। ইহাতে বাহ্যতঃ মায়াবাদের প্রতিবাদ আছে। আবার পৌরাণিক যুগের আর এক অংশ তন্ত্রে মায়াবাদের ও নিগুর্ণ ব্রহ্মের যথেষ্ট অবসর আছে।"[১৩] রামমোহন এই পুরাণ ও তন্ত্রকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

পৌরাণিক ভক্তিবাদের সহিত তিনি এক প্রকার বিরোধিতাই করিয়াছেন আর তন্ত্র সম্বন্ধে বহু ক্ষেত্রে তাঁহার সমর্থন থাকিলেও ইহার ব্যবহারিক দিককে তিনি উপেক্ষাই করিয়াছেন। তবে তাঁহার চিন্তাধারায় বহু ধর্মমতের প্রভাব পড়িয়াছে। অনেক কিছু গ্রহণ-বর্জন করিয়া তিনি নিজস্ব ধর্মবোধকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই জন্য তন্ত্রের প্রতি তাঁহার একটি আকর্ষণ ছিল। তন্ত্রের মধ্যে বেদান্তের অদ্বয়ত্ব রক্ষিত হইয়াছে। শিব ও শক্তির অদ্বয় মিলন একেশ্বরবাদ অনুভূতিরই নূতন একটি দিক। ইহা তত্ত্ব সাপেক্ষ বটে, কিন্তু ক্রিয়াপ্রধান। তন্ত্রের বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতি আছে। রামমোহন তত্ত্বগত উপলব্ধিতে তান্ত্রিক ভাব সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি প্রচ্ছন্ন তান্ত্রিক কি না তাহা লইয়া বিতর্কও হয়। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তাঁহার তান্ত্রিক গুরু ছিলেন। বেদান্ত আলোচনার পূর্বে রংপুরে বা কলিকাতায় তিনি ইহার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে ছিলেন। আবার রামমোহন 'মদ্য পান সমর্থন এবং শিবের আজ্ঞাবলে যে কোন বয়সের এবং যে কোন জাতির স্ত্রীলোককে চক্রের সাধনায় শৈব বিবাহে শক্তিরূপে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।'[১৪] তিনি এইরূপ তন্ত্রোক্ত বামাচারের সমর্থন করিয়াছেন কিন্তু ইহার বহু ক্রিয়া এবং আচার পদ্ধতিকে অস্বীকার করিয়াছেন। মুখ্যতঃ তন্ত্রের অদ্বয় মিলন তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সেই জন্য ইহার বহুদেববাদকে তিনি সমর্থন করেন নাই। ইহাকে তিনি মায়াবাদ দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। দেবতার শরীরকে মানিলে তাহার নশ্বরতাকেও মানিতে হয়।[১৫] সেক্ষেত্রে মানুষের শরীর বা দেবতাদের রূপ মিথ্যা। ব্রহ্মই পরম সত্য, দেবতা বা মনুষ্য তুল্যরূপে মিথ্যা। বস্তুতঃ এই বৈদান্তিক বিচারে তিনি তন্ত্রকে নিরাবিত করিয়াছেন। আবার ইহার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপেও তাঁহার সমর্থন ছিল না। যদিও তাঁহার তান্ত্রিক গুরু ছিল, তথাপি তন্ত্রের গুরুবাদকে তিনি গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। "গুরুর মধ্যে ঈশ্বরবাদ ও অভ্রান্তবাদ আসিয়া মিশ্রিত হওয়াতে এবং তজ্জন্য সাধারণ অজ্ঞ লোকদের মধ্যে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যে ভয়, দুর্বলতা ও দুর্নীতির প্রশ্রয় পাওয়াতে রামমোহন গুরুবাদকে অস্বীকার করিয়াছেন।"[১৬] অনুরূপ ভাবে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র বিদ্যার প্রতিও তাঁহার জুগুপ্সা ছিল। তাঁহার যুক্তিবাদী চিন্তায় মন্ত্রের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই।

অন্যতর পৌরাণিক চেতনায় তন্ত্রের ক্রিয়াযোগের পরিবর্তে বিশুদ্ধ ভক্তি-যোগের সন্ধান পাওয়া যায়। রামমোহনের প্রবল যুক্তিবাদী চিন্তাকে ভক্তির

উচ্ছ্বসিত প্রস্রবণ আদৌ দ্রবীভূত করিতে পারে নাই। বেদান্তের কষ্টিপাথরে বিচার করিয়া তিনি ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ রূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মচিন্তার মধ্যে বহুচারিতার স্থান নাই। কিন্তু ভারতীয় ধর্মের ধারা বেদ উপনিষদের যুগ হইতে নানা পথ অতিক্রম করিয়া পুরাণ তন্ত্রমন্ত্র, আচার অভিচারের মাধ্যম ধরিয়া জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির বিচিত্র বিকাশ ঘটাইয়াছে। রামমোহন এই সমগ্র স্রোতধারার মধ্যেই অবগাহন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে একটি দৃঢ় অবলম্বন স্বরূপ বেদান্ত চিন্তাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। পরিপার্শ্বস্থ ধর্ম প্রবাহ বিরাট জলস্রোতের ন্যায় তাঁহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। রামমোহন এই ধর্ম প্রবাহে আগত ও বাহিত পুঞ্জীভূত আবর্জনা দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছেন। ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি তাহাতে পঙ্কলিপ্ত হইয়াছে মনে করিয়া তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুরাণের বহু দেব দেবী, আরাধ্য বিগ্রহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে অহেতুক ধর্ম কোলাহল একেশ্বর উপাসনার ওঙ্কারধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছেন। পুরাণের মূর্তি পূজার মধ্যে অব্যক্ত অসীমের বন্ধনকে তিনি চিত্তের মূঢ়তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন—ইহাতে সত্য বিকৃত হইয়াছে, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান পরমের উপলব্ধিকে অবরোধ করিয়াছে, লোক ব্যবহার ও সাধন পদ্ধতি বহুলাংশে ঈশ্বরচেতনাকে বিলুপ্ত করিয়াছে আর ইহারই রন্ধ্রপথে আসিয়াছে যত ঐহিক আবিলতা, সামাজিক দুর্নীতি, নৈতিক ব্যভিচার। চিন্তাশীল লেখক এই প্রসঙ্গে রামমোহন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "রাজা রামমোহন এই পৌরাণিক যুগের স্কন্ধেই অল্পাধিক আমাদের জাতীয় দুর্গতির সমস্ত হেতুকে আরোপ করিয়া এই পৌরাণিক যুগকে ইউরোপের মধ্য যুগের ন্যায় দূর করিয়া দিবার মানসে এক ভীষণ সংগ্রামে বদ্ধমুষ্টি হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।"[১৭]

এইজন্যই পৌরাণিক ভক্তিবাদের স্মারকগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি রামমোহন সুবিচার করিতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতকে তিনি পুরাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু ইহা বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ পুরাণ নহে। সেই জন্যই ইহাকে প্রামাণ্য শাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। যাহা কিছু অবৈদান্তিক, তাহাই রামমোহনের সমালোচনার বস্তু। ভাগবতপন্থীদের প্রতি তাঁহার অভিযোগ—ইহারা "অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্বব্যাপী যে পরব্রহ্ম তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্তনা দিয়া থাকেন।"[১৮] শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণে সাকার বিগ্রহ

কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক অন্য দেবতাগণও স্ব স্ব উপাসক সম্প্রদায় কর্তৃক ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। শিবপুরাণগুলিতে মহাদেবকে, কালীপুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকে, শাম্বপুরাণ প্রভৃতিতে সূর্যকে বিশেষরূপে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। আবার মহাভারতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব তিনকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সেক্ষেত্রে বিষ্ণুমাহাত্ম্য জ্ঞাপক পুরাণগুলিতে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলা হইলে অন্যান্য পুরাণের দেবতাদিগকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। একের বাহুল্যে অন্যের মহিমা খর্ব হয়, এরূপ সহজ সিদ্ধান্তও করা যায় না। বেদে বা মহাভারতে শুধু মাত্র বিষ্ণু মাহাত্ম্যই কীর্তিত হয় নাই, সূর্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাও বেদে ব্রহ্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। আবার মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণে শিব ও ভগবতীর মাহাত্ম্যও কম নাই। ইহাদের প্রত্যেকেই ব্রহ্ম হইলে বেদান্ত নির্দিষ্ট ব্রহ্মের একমদ্বিতীয় রূপ অর্থহীন হইয়া যায়।[১৯] রামমোহন শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে শ্রীভাগবত বেদান্ত বিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিভিন্ন পুরাণের প্রমাণগুলি অর্বাচীন কালের রচিত এবং তাহারা স্ববিরোধী বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন দেবতা ও ঋষি ব্রহ্ম দৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞান করেন, তাহার মীমাংসা বেদান্ত সূত্রেই আছে। পরন্তু ভাগবত কহিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সর্ব্বভূত ব্যাপী আমি যে আত্মা স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমার পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে।"[২০] কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণব্রহ্ম এরূপ সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। এইজন্য ভাগবতের ব্রহ্মচিন্তা প্রামাণ্য নহে, ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে হইলে বেদান্তই গ্রাহ্য। অপর দিকে নব্যবঙ্গের প্রতিভূ ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিপ্লবাত্মক। শুদ্ধ আস্তিক্যবাদে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল না, আবার পুরোপুরি নাস্তিকও তাঁহারা ছিলেন না। দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর মত ধর্ম ও অন্যান্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁহারা সংশয়বাদী ছিলেন। আবার ইউরোপীয় রীতি নীতি কিংবা খ্রীষ্ট ধর্মের আকর্ষণ অনেক ক্ষেত্রে প্রবল থাকায় তাঁহারা এদেশের ধর্ম ও সংস্কারকে খোলা চোখে দেখিতে পারেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যায়। হিন্দুধর্মের উপর তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ষড় দর্শন গ্রন্থে। তাঁহার মতে বেদ অপৌরুষেয় নয় এবং তিন উপাধি বিশিষ্ট এক ঈশ্বরের পরিচয় হিন্দুশাস্ত্রে বিকৃত হইয়াছে, ইহার শুদ্ধতাৎপর্য কেবল বাইবেল শাস্ত্রেই আছে।[২১] কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যায় তিনি হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষা বাইবেলকেই প্রামাণিক বলিয়া মনে

করিয়াছেন। এইরূপ হইবার কারণ তাঁহাদের শিক্ষিত মানসে এ দেশের সংস্কার ও আচারের অতিরেক অত্যন্ত গর্হিত বিবেচিত হইয়াছিল। হিন্দু সমাজের এক ক্ষয়িষ্ণু অধ্যায়ের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের সংশয়ী মন অবিশ্বাসের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। চিত্তের প্রদাহে হিন্দু ধর্মের গূঢ় অন্তর রহস্যকে তাঁহারা বুঝিতে চাহেন নাই, লোকাচার ও লোকরীতি-আশ্রিত কোনরূপ সংস্কার বা পৌরাণিক চেতনাকে তাঁহারা আমল দিতে চাহেন নাই।

রক্ষণশীলগোষ্ঠীর অধিনায়ক রূপে বঙ্গ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা স্মরণ করা যাইতে পারে। রামমোহনের সহযোগী ও প্রতিযোগী, হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষক ও পরিপোষক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতকের বাংলা দেশের একজন বিদগ্ধ মনীষী। রামমোহনের সহিত চিন্তার সাধর্ম্য অনুভব করিয়া তাঁহার সহিত যুক্তভাবে তিনি 'সংবাদ কৌমুদী' সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্দু বিদ্বেষের প্রতিরোধে রামমোহন যখন সচেষ্ট হইলেন, তখন ভবানীচরণ তাঁহার সহিত একমত হইতে দ্বিধা করেন নাই। পরে সংবাদ কৌমুদীর সহিত তিনি সংস্রব বর্জন করেন। ইহার মূলে তাঁহার স্বতন্ত্র মনোভঙ্গীই দায়ী। সংবাদ কৌমুদীর অন্যতম সহকারী হরিহর দত্ত সহগমন প্রথার প্রতি বিরূপ সমালোচনা করিলে তিনি ধর্মহানির আশংকা দেখিলেন।[২২] রামমোহন ও রামমোহনপন্থীদের এই সংস্কার রীতিকে তিনি সমর্থন করেন নাই। সেইজন্য ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বতন্ত্রভাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করিলেন। নব্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় যখন হিন্দু কলেজের শিক্ষা দ্বারা বা মিশনারীদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া স্বধর্ম সম্বন্ধে বীতরাগ হইয়া পড়িতেছিল, তখন সমাচার চন্দ্রিকাই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া তাহাদের নিকট হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য তুলিয়া ধরিয়াছিল। একদিকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও অন্যদিকে দেশ ধর্মে অনাস্থা—এই উভয়বিধ সংঘাত হইতে স্বধর্ম রক্ষার জন্য ভবানীচরণ আরও সক্রিয়তা ও সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। ইহারই ফল হইল 'ধর্মসভা'র প্রতিষ্ঠা। এই সভার ছত্রতলে সেদিন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ ইহার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বধর্ম প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন।

'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদনা বা 'ধর্মসভা'র প্রতিষ্ঠার মত প্রতিষেধক ব্যবস্থা করিয়াই ভবানীচরণ ক্ষান্ত হন নাই। সমাজের নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করিবার জন্য

তিনি শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজিরও প্রকাশ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন, "প্রবল জলোচ্ছ্বাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে যেমন পদতলে শক্ত মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হয়, তিনিও সেইরূপ প্রতীচ্য ভাব সংঘাতের সর্বনাশা প্রভাব হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সনাতন সামাজিক আদর্শকেই একমাত্র অবলম্বন রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।"[২৩] ইহার জন্য তাঁহার অনেক প্রয়াস হাস্যকর বলিয়াও মনে হয়। তুলট কাগজে গ্রন্থ মুদ্রণ এবং ব্রাহ্মণ কর্মচারী দ্বারা মুদ্রণ কার্য সম্পাদন ভবানী চরণের গোঁড়া হিন্দুয়ানির পরিচয় দিয়াছে।

পুরাণোক্ত তীর্থ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবহিত ভবানীচরণ বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। এইরূপ তীর্থ মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্যে তিনি 'শ্রীশ্রী গয়াতীর্থ বিস্তার' রচনা করিয়াছেন। সমাচার চন্দ্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়, এই তীর্থ মাহাত্ম্যে বায়ু পুরাণের সহিত ঐক্য রক্ষা করা হইয়াছে এবং ইহা উক্ত তীর্থবাসীদের মহদুপকার সাধন করিবে।[২৪] অনুরূপভাবে তিনি শ্রীক্ষেত্র ধামের বিবরণ লিখিয়াছেন 'পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা'। প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থের মুদ্রণে তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত, মনুসংহিতা, ঊনবিংশ সংহিতা, শ্রীভগবদ্গীতা, রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি ইত্যাদি মুদ্রিত করিয়া তিনি হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও পোষক বলিয়া নিঃসংশয়ে গৃহীত হইয়াছেন। পৌরাণিক সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে যে আচাররাজি সংহিতা ও স্মৃতি গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে, তাহা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ জীবনে পুনঃ সঞ্চারিত করা যায় কি না তাহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এক্ষেত্রে তিনি রামমোহনেরই অনুবর্তী। তবে উভয়ের মত ও পথে পার্থক্য ছিল। রামমোহন যুক্তি চিন্তার আলোকে উজ্জ্বল করিয়া শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি তাহা করেন নাই, তিনি তদ্রূপেই সেগুলিকে দেখিয়াছেন, তাহাদের পুরাতন টীকাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। শতাব্দীর জীবন ধারায় পঙ্কলিপ্ত হইলেও তাহাদের পরিমার্জনা তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই।

অতঃপর ব্রাহ্ম সমাজের কথা। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রগতিশীল চিন্তাধারায় পুরাণকে প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। পুরাণের ধর্ম ও দর্শনকে সাম্প্রদায়িক বিবেচনা করিয়া তাঁহারা এক প্রকার উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে মহাভারত বা গীতাকে তাঁহারা অমর্যাদা করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মহাভারত, গীতা ও ভাগবতকে অসীম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষি সর্বতোভাবে বেদান্তের জ্ঞানমার্গীয় মায়াবাদী চিন্তাকে গ্রহণ করেন নাই।

বেদান্ত উপনিষদের উপর ভক্তিবাদী দৃষ্টিতে অদ্বৈতের মধ্যে এক প্রকার দ্বৈত সাধনাকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন :

> ব্রাহ্ম ধর্মের মুক্তি ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকা, তাঁহাদের মুক্তি ঈশ্বর হইয়া যাওয়া। বস্তুতঃ তাহাতে জীবের ঈশ্বরত্ব হয় না, তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলা হয়। সংসারের অধীন না হইয়া ঈশ্বরের যে অধীনতা, তাহাতেই যথার্থ মুক্তি।[২৫]

এই ভক্তিবাদই দেবেন্দ্র নাথের সাধনধর্মের শেষ কথা। এ ক্ষেত্রে তিনি রামমোহনের মত শাস্ত্র ও যুক্তিকে বড করিয়া দেখেন নাই। ভক্তির কষ্টি পাথরে বিচার করিয়া বেদকে তিনি অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই,—উপনিষদকেও তদ্রূপে স্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। এই সহজাত ভক্তিভাবের জন্যই দেবেন্দ্রনাথ ভক্তি শাস্ত্রগুলির দিকে স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহাভারতের সহিত প্রথম পরিচয়ের উৎসাহ ও আনন্দের কথা তিনি আত্মজীবনীতে ব্যক্ত করিয়াছেন।[২৬] আরও দেখা যায় উত্তর জীবনে পারিবারিক সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে আত্মিক প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থের সহিত মহাভারতকেও নিত্য সঙ্গী করিয়া লইয়াছিলেন।[২৭]

দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার ফল তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ। বেদ ও উপনিষদ হইতে যেটুকু সত্য আহরণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাহাই তিনি বিবৃত করিয়াছেন।

"বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য, তাহা লইয়াই ব্রাহ্ম ধর্ম সংগঠিত হইল এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল। বেদরূপ কল্পতরুর অগ্র শাখার ফল এই ব্রাহ্ম ধর্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ এবং উপনিষদের শিরোভাগ ব্রাহ্মী উপনিষদ।"[২৮] ইহার দুইটি অংশ উপনিষদ ও অনুশাসন। অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসুর সহযোগিতায় ইহার উপনিষদ অংশ রচিত হয় এবং অনুশাসন অংশ লিখিত হইয়াছে ইহার পরে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর সহযোগিতায়। দুই খণ্ড গ্রন্থ অনুবাদ সহ ১৮৫১-৫২ সালে প্রকাশিত হয়। অনুশাসন অংশের সংকলন প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "মহাভারত, গীতা, মনুস্মৃতি প্রভৃতি পড়িতে লাগিলাম, এবং তাহা হইতে শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়া অনুশাসনের অঙ্গ পুষ্ট করিতে লাগিলাম।"[২৯] সুতরাং মহাভারতের প্রতি মহর্ষির যে অবিচল নিষ্ঠা ছিল তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথও স্বীয় পিতৃদেবের ভগবদ্গীতায় অনুরাগ সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ

করিয়াছেন। মহর্ষির হিমালয় যাত্রার এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গী হইলে উভয়ে কিছুদিন বোলপুরে অবস্থান করেন। এই সময়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন :

"ভগবদ্গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়ীতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার পরে এই সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।"[৩০] মহর্ষির মানস বৈরাগ্য সংসার সম্বন্ধে তাঁহাকে নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত করিয়াছিল। পারিবারিক অশান্তি, আর্থিক বিপর্যয় যখনই তাঁহার সংসার জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, তখনই তিনি বিমর্ষ না হইয়া ভগবৎ সান্ত্বনাকে গভীর করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সংসারকে অতিক্রম করিবার এই আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দেবেন্দ্রনাথের শুদ্ধ চিত্তেই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথ যখন আরও ঋণের বোঝা বাড়াইয়া চলিয়াছেন তখন আত্মিক প্রদাহে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া বরাহনগরে গোপাললাল ঠাকুরের বাগানে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীমদ্ভাগবতের বৈরাগ্য জ্ঞাপক শ্লোকগুলি তাঁহার অধ্যাত্মচেতনাকে গভীর ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।[৩১]

ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তত্ত্ববোধিনী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত অথবা সভার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন হইতেও আমরা ভাগবত বা মহাভারত সম্বন্ধে সমাজের অনুকূল ধারণার বিষয় জানিতে পারি। কয়েকটি নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ সহিত শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধ তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে । বিজ্ঞাপন, আষাঢ় ১৭৭২ শক। ১১৯ সংখ্যা।

আনন্দগিরি কৃত টীকা সহিত, শঙ্করাচার্য কৃত ভাষ্য সম্বলিত, শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা ও তদনুযায়ী ভাষ্য সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ক্রমশঃ মুদ্রিত হইতেছে এবং এইক্ষণে তাহার প্রথম অধ্যায় তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে...। বিজ্ঞাপন, ফাল্গুন ১৭৭৫ শক। ১২৭ সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক গদ্যে অনুবাদিত বাঙ্গালা মহাভারত। মহাভারতের আদি পর্ব তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়াছে, অতি ত্বরায় মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে...। বিজ্ঞাপন, ফাল্গুন ১৭৮০ শক। ১৮৭ সংখ্যা।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক অবিকল অনুবাদিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে এবং তাহাতে দুষ্মন্ত রাজা ও শকুন্তলা প্রভৃতির চারিখানি চিত্রিত প্রতিমূর্তি নিবেশিত হইয়াছে। —বিজ্ঞাপন, আশ্বিন ১৭৮১ শক। ১৯৪ সংখ্যা।

—পাদটীকা—

১। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, সা সা. চ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৩
২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৮৯৮
৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন পৃঃ ২৮৯
৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৮৯৮-৯৯
৫। সম্বাদ ভাস্কর, ১৮৫৪, ৭ই জানুয়ারি
৬। চণ্ডীচরণ মুন্সী, সা সা চ., ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২৬
৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং., ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৯০০
৮। ঐ পৃঃ ৮৮৮-৯৭
৯। ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সা সা চ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩৫
১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৯০১
১১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন পৃঃ ২৭৭
১২। বাংলা সাহিত্যে গদ্য, ২য় সং, ড সুকুমার সেন পৃঃ ৪৬
১৩। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী পৃঃ ৪৭
১৪। ঐ পৃঃ ৬৫
১৫। ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, রামমোহন গ্রন্থাবলী, পরিষৎ সং পৃ ১৬৯
১৬। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী পৃঃ ৭৫
১৭। ঐ পৃঃ ৪১
১৮। গোস্বামীর সহিত বিচার, রামমোহন গ্রন্থাবলী, পরিষৎ সং। পৃঃ ৪০
১৯। ঐ পৃঃ ৫৯
২০। ঐ পৃঃ ৬২
২১। ষড়দর্শন সংবাদ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৫২২
২২। সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৮৫
২৩। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৪০
২৪। ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সা সা চ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩১
২৫। ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ ৯২

২৬। আত্মজীবনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, পৃঃ ১২
২৭। ঐ পৃঃ ১০৮
২৮। ঐ পৃঃ ১৩৬
২৯। ঐ পৃঃ ১৩৭
৩০। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৪৮
৩১। আত্মজীবনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পৃঃ ১৭২

তৃতীয় অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ : পৌরাণিক সংস্কৃতির নব পর্যালোচনা।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সকল দিক দিয়াই জাতীয় জীবনের উদ্যোগপর্ব। নূতন প্রতীচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিব পরিচয় এই সময় স্পষ্টতর হইলেও জাতীয় জীবন সর্বতোভাবে ইহাকে মানিয়া লইতে পারে নাই। সেইজন্য সমাজ ও সাহিত্যেব সকল ক্ষেত্রেই পূর্বানুবৃত্তিব একটি লক্ষণ দেখা যায়। সমাজের প্রচলিত আচাব ও সংস্কার এখনও পর্যন্ত সক্রিয় ও শক্তিশালী। যে সব ক্ষেত্রে নূতন প্রগতিশীলতাব চিহ্ন দেখা দিযাছে, সেগুলির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি আসে নাই। সুতরাং অনিবার্য ভাবে বাংলা দেশের সমাজে একটি ভাবদ্বন্দ্বের সূচনা হইযাছে। সাহিত্যক্ষেত্রেও একই লক্ষণ অনুভব করা যায। নূতন ইংরাজী সভ্যতা, তাহার সাহিত্য ঐশ্বর্য, কিংবা আধুনিক সাহিত্যের প্রবর্তনা শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশেষ কার্যকরী হয নাই। গদ্যের রূপ নির্মাণ করিতেই কেবল অর্ধ শতাব্দী কাটিয়া গেল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষার অনুশীলন কাল (১৮০১) হইতে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব (বেতাল পঞ্চবিংশতি—১৮৪৭) পর্যন্ত সময় বাংলা গদ্যের কাযাগঠনে নিয়োজিত হইযাছে। কাব্য ও এই সমযে প্রাচীন রীতির—কবিগান, পাঁচালী ও যাত্রাগান বাংলার জনসমাজে আসর জুড়িযা রহিয়াছে। আলোচ্য পর্বে বামাযণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলি বাঙ্গালী মনের বৃহত্তর ক্ষুধার নিরসন কবিয়াছে। ইহাই ছিল তাহাদেব বিশ্ব সাহিত্য। যাহা মহাভারতে নাই, তাহা ভূ-ভারতে নাই—এইরূপ এক প্রকার গভীর বিশ্বাস জনমনে দৃঢ হইয়াছিল। ব্যবহারিক নীতি, সামাজিক কর্তব্য, আধ্যাত্মিক পবিতৃপ্তি—ইহাই ছিল জন-চিত্তের পরম কামনা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাস কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীতে কাশীরাম এই পবম তৃপ্তির পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কালে সেই ধারারই অনুবর্তন ঘটিযাছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এইজন্য যে সমস্ত অনুবাদ অনুশীলন হইযাছে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ অভিনবত্ব দেখা যায় না। কোন্‌ক্ষেত্রে অনুবাদ কতখানি মূলানুগ হইল এবং সেই অনুপাতে রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটিল কিনা, এইরূপ কোন জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় নাই।

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এই ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অনুবাদের মধ্যেও এখন সতর্কতার প্রশ্ন আসিল, পাঠান্তর, প্রক্ষিপ্ততা ইত্যাদির দিকে পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি পড়িল। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ গ্রন্থগুলির এইবার সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে পুনর্বিচার সুরু হইল। জাতীয় সংস্কৃতির সহিত ইহাদের সংযোগ, জাতীয় সাহিত্যে ইহাদের প্রেরণা, জাতীয় জীবনের গৌরব ও মহিমা প্রতিষ্ঠায় ইহাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলে সচেতন হইল। ইতিপূর্বে উইলিয়ম জোন্‌স, কোলব্রুক, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ্‌গণ এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির লুপ্ত গৌরবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জাগ্রত কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা এই সময় আরও কিছুটা বর্ধিত হইল। মহাকাব্য ও পুরাণগুলিতে এদেশের ইতিহাস ও পরিচয় সংগুপ্ত আছে। ইহাদের কাহিনী অংশে যেমন অবিমিশ্র ভক্তির প্রাবল্য, ইহাদের তথ্যাংশে তেমনি ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিচয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইতিবৃত্ত ও ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির এই যে নূতন পর্যালোচনা, ইহাই আমাদের পুরাণ চর্চার নবতর ইঙ্গিত। শুধু জন সমাজে ব্যাপক প্রচলন ও লোকরুচির চাহিদায় ইহাদের তরল পরিবেশনার মধ্যেই অতঃপর পণ্ডিতবর্গের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রহিল না। ইহাদের সত্যকার তাৎপর্য উদ্ঘাটন, নবযুগের মননধর্মিতায় ইহাদের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহারা মনোনিবেশ করিলেন। এইজন্য স্বাভাবিক উপলব্ধি আসিল যে কেবল মাত্র অনুবাদ কর্মের মধ্যে অনুশীলন সীমাবদ্ধ থাকিলে ইহাদের সর্বাত্মক প্রভাব অনুভূত হয় না। সাহিত্যের সৃষ্টিক্ষেত্রেও ইহাদের প্রয়োগ প্রয়োজন। নব প্রতীতির এই আলোকে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন মৌলিক সৃষ্টি কর্মে ইহাদের গ্রহণ ও ব্যবহার করা হইয়াছে। সর্বত্র যে এগুলিকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, এমনও নহে, সৃষ্টি কর্মে ইহাদিগকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়া নবকালের গূঢ় ব্যঞ্জনাও ইহাদের উপর আরোপ করা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সম্পর্কিত রচনারাজি হইতে আমরা এই নব পর্যালোচনার রূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

॥ অনুবাদ ॥ দ্বিতীয়ার্ধের অনুবাদ গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ। পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তায় সিংহ মহাশয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মহাভারতের গদ্য অনুবাদ সুরু

করেন। ইহার প্রথমখণ্ড ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রঘুনন্দনের রামরসায়ন যেমন অর্বাচীনকালের বৃহত্তম রামায়ণ কাহিনী, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতও তেমনি অর্বাচীনকালের মহত্তম ভারত কাহিনী। একেবারে আধুনিক কালের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অক্ষয় কীর্তি মহাভারত অনুবাদ ব্যতীত কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের সমকক্ষ আর কোন রচনা নাই। এই সুবৃহৎ অনুবাদ কার্যে তিনি তদানীন্তন বাংলা দেশের বিদগ্ধ মনীষিবৃন্দের সাহায্য পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহার সম্পাদনা কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই অনুবাদ কার্যে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং সময় সময় সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে মুদ্রাযন্ত্রের ও অনুবাদ কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু কালী-প্রসন্ন সিংহের মহাভারত রচনার পরিকল্পনা দেখিয়া তিনি সে কার্য হইতে বিরত হন।

গ্রন্থের উপসংহারে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁহার ভারত কাহিনী অনুবাদের বিবরণ দিয়াছেন। তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল।

> ১৭৮০ শকে সৎকীর্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এ৫ আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপিতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চির সঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপন স্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম। অনুবাদ সময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই অথচ বাংলা ভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেগুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।[১]

কালীপ্রসন্ন সিংহের এই সম্পাদনা সম্পূর্ণ আধুনিক রীতির। আধুনিক কালে বিভিন্ন গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপির পাঠ মিলাইয়া একটি নির্দিষ্ট পাঠ স্থির করা হয় এবং তদনুযায়ী সম্পাদনা কার্য সংসাধিত হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ এইরূপ রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই জানাইয়াছেন যে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থ, শোভাবাজারের রাজবাটির গ্রন্থ, আশুতোষ দেব ও যতীন্দ্রমোহন

ঠাকুরের গ্রন্থাগারের গ্রন্থ, তাঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ কর্তৃক কাশীধাম হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত গ্রন্থগুলি একত্রিত করিয়া তিনি বিতর্কবহুল পাঠ বা সংশয়গুলি নিরসন করিয়াছেন।[২]

বস্তুতঃ এইরূপ রীতি গ্রহণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ আধুনিক মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। মূল ব্যাস-মহাভারতকে শিক্ষিত জনের উপযোগী করিয়া পরিবেশন করিতে তাঁহার এই প্রচেষ্টা অতুলনীয়। কাশীদাসী মহাভারত দেশের সাধারণ সমাজে যে আবেদন রাখিয়াছে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত দেশের শিক্ষিত সমাজে আজও পর্যন্ত সেই আবেদন রাখিযাছে। আবার তিনি শুধু অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহার প্রচারের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। মহাভারতের দুইটি খণ্ড তিন হাজার করিয়া মুদ্রিত হয় এবং এগুলি তিনি বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে বিতরণ করিয়াছিলেন।[৩]

পরবর্তী কালে তিনি শ্রীমদ্ভগবদগীতারও অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর অনেক পরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিকার মধ্যে তিনি ভীষ্ম পর্ব পাঠে "অভূত-পূর্ব আনন্দ লাভ এবং অনেক সত্য উপার্জনের" কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ মহাভারত ও গীতার মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহতী কীর্তি বাংলার সারস্বত সমাজে চির অম্লান থাকিবে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সংশোধিত মহাভারত দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৫৫ খ্রীঃ) একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ। এই খণ্ডে উদ্যোগ পর্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত লিখিত হইয়াছে। কাশীদাসী মহাভারত নানাজন কর্তৃক মুদ্রাঙ্কিত হইবার ফলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং ইহার একটি যথেচ্ছরূপ গড়িয়া যায়। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টা ছিল কাশীদাসী মহাভারতের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা, সেইজন্য নানা স্থান হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইযাছিল কারণ শেষ পর্ব সমূহের আদর্শগুলি আগে সংগৃহীত হইযাছিল। আদি পর্ব হইতে বিরাট পর্ব পর্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রথম খণ্ড প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইযাছিল। তবে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের অনুবাদগুলিও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য সম্পাদিত 'সর্বার্থ পূর্ণ চন্দ্রে' (১৮৫৫) তিনি কল্কি পুরাণের গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। তবে তাঁহার বিখ্যাত কীর্তি হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ।

তিনি ভাগবতের দশম স্কন্ধের কিয়দংশ পর্যন্ত অনুবাদ করিয়া পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক অদ্বৈত চন্দ্রের সমগ্র ভাগবত অনুবাদ কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম খণ্ডের প্রকাশ কাল ১৭৭৭ শকাব্দ। শ্রীধর স্বামীর ভাগবত দীপিকাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এই অনুবাদ কার্যে অগ্রসর হন। নব পর্যায়ের শাস্ত্রানুশীলনে যে যৌথ উদ্যোগ দেখা গিয়াছিল মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ তাহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া যুগোপযোগী চিন্তাধারারই পরিচয় দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদের (১৮২০—৭৯) পৃষ্ঠপোষকতার কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁহার উদ্যোগে রামায়ণের পদ্যানুবাদ এবং রামায়ণ ও মহাভারতের গদ্যানুবাদ হয়। আবার মূল রামায়ণ এবং হরিবংশ সমেত মহাভারত প্রকাশ করিয়াও তিনি অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হন। বর্ধমানের রাজবাড়ীর এই পৃষ্ঠপোষকতা মধ্যযুগের অনুবাদ কর্মে রাজপৃষ্ঠ-পোষকতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্যক্তি আগ্রহে সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচর্যা করিয়া মহারাজা মহাতাবচাঁদ অসামান্য বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

॥ সাহিত্য সৃষ্টি ॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ যেমন জাতীয় জীবনের উদ্যোগ পর্ব, ইহার দ্বিতীয়ার্থ তেমনি জাতীয় জীবনের গঠন পর্ব। যে সমস্ত চিন্তা ও ভাবনা প্রথমার্ধে জাতীয় মানসকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল, সেগুলি প্রশমিত হইয়া এখন সৃষ্টি ক্রিয়ার বিবিধ উপকরণ হিসাবে গৃহীত হইল। এ সম্পর্কে ডঃ সুশীল কুমার দে সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছেন:

> প্রথম আলোড়ন বিলোড়ন শান্ত হইবার পর বাহিরের সহিত সন্ধি করিয়া অন্তরে যে আদর্শ গৃহীত হইল, তাহার ফলে এখন বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর ভাবজীবন এক অপূর্ব রসরূপ লাভ করিল। ইতিমধ্যে বিজাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির যুগোপযোগী সমন্বয়ে আমরা সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে পাইয়াছিলাম দৃঢ় ভিত্তির আশ্বাস। তাই সংস্কার বাসনার সঙ্গে আসিল সাহিত্য সৃষ্টির আনন্দ, যুক্তিতর্ক বিচার বুদ্ধির যে প্রয়োজন তাহার বাহিরে, সকল প্রয়োজনের অতীত ভাবকল্পনার উল্লাস নব্য বঙ্গের প্রাণমন অধিকার করিল।[৫]

বাংলা দেশ ও সাহিত্যে ইহাই নবযুগের উদ্বোধন। নবযুগের সাহিত্যের চারণক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত। ইহার মধ্যে যেমন পাশ্চাত্যের নব্য মানবিকতা, ঐহিক চেতনা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে তেমনি দেশ জীবনের

আচার চর্যা ও সংস্কার ধর্মের অনিষ্ট আদর্শটিও গৃহীত হইয়াছে। স্বধর্মের সনাতন আদর্শ যাহা আকস্মিক যুগ সংঘাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই এখন পরিশীলিত পরিচর্যায় সাদর স্বীকৃতি লাভ করিল। এইজন্য classical theme লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি এই যুগের একটি বিশিষ্ট লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল, সাহিত্য সৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী ও আদর্শ উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। একদিকে সনাতন বিশ্বাস ও সংস্কার রক্ষাকল্পে যেমন ইহাদের অবিকৃত অনুসরণ চলিযাছে, তেমনি অন্যদিকে নবকালের প্রয়োজনায় ইহাদিগকে নূতন ভঙ্গীতেও ব্যবহার করা হইযাছে। সে সব ক্ষেত্রে পৌরাণিক কথাবস্তু ও ভাবাদর্শ আন্তর প্রেরণারূপে গৃহীত হইলেও তৎ সম্পর্কিত রচনা ও সৃষ্টিগুলি একেবারে নূতন হইয়া গিযাছে। বস্তুতঃ মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিতে ঐতিহ্যাশ্রিত উপকরণসমূহের এইরূপ গ্রহণ ও রূপান্তরের সার্থকতা উহাদের শিল্পগত উৎকর্ষ ও সাহিত্যগত আবেদনের উপর নির্ভর করে। আমরা শতাব্দীর শেষার্ধের সাহিত্যকে দুইটি পর্যায়ে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিভিন্ন শাখায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সমূহের এই অভিযোজনের রূপ নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করিব।

— পাদটীকা —

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, হিতবাদী সং, অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহার পৃঃ ১
২। ঐ পৃঃ ১
৩। কালীপ্রসন্ন সিংহ, সা সা, চ,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪২
৪। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, সা সা. চ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২৯-৩০
৫। দীনবন্ধু মিত্র—ড সুশীল কুমার দে পৃঃ ১১-১২

চতুর্থ অধ্যায়

সাহিত্য সৃষ্টি ঃ দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভ

॥ পরোক্ষ প্রভাব—রামায়ণ, মহভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ॥

প্রাক্ বঙ্কিম যুগের বাংলা কাব্য পুরাতন জীবনরীতি ও নূতন জীবন বোধের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। জীবন ও সমাজের সমূহ ধ্যানধারণা আমাদের সাহিত্যে এতদিন মূলতঃ কাব্যের মাধ্যমেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই যুগে গদ্যের উন্মেষে মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটিতেছিল। তথাপি কাব্য, জীবন বিশ্বাসের নির্যাসকেই প্রকাশ করে বলিয়া কাব্যের গতিরেখায় দেশমানসের মর্মবাণী অনুভব করা যায়। নব যুগের অস্ফুট পদধ্বনি তখন বাংলা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আসিতেছিল। তাহার ফলে চিন্তা জগতের এক একটি রূপ পরিবর্তিত হইতেছিল। সমাজ ও সাহিত্যের উভয় ক্ষেত্রেই এই রূপান্তর চলে এবং একের প্রভাব অপর ক্ষেত্রে বিপুল ভাবে বিস্তৃত হয়। কখনও সমাজের বাহিরের রূপ, কখনও ইহার অন্তরের উত্তাপ সাহিত্যকে নূতন করিয়া গড়িতেছিল। নাটক, কথাসাহিত্য ও গদ্য সাহিত্যে মূলতঃ সমাজের বহিঃচেতনা প্রকাশ পাইয়াছে এবং কাব্য শাখায় বিশেষভাবে ইহার অন্তর চেতনা রূপায়িত হইয়াছে।

নব যুগের চেতনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাববস্তু অবলম্বন করিতেছিলেন। মানুষের নব মূল্যায়ন, দেশের ধর্ম সংস্কৃতির পুনর্বিচার, স্বাধীনতা চেতনা প্রভৃতি কতকগুলি মৌল উপাদানের উপর এ যুগের কাব্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। পশ্চিমী বাতাসে যে বাতায়ন খুলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে পশ্চিমের জীবন কেন্দ্রিক ভৌম জিজ্ঞাসা সুস্পষ্ট হইতেছিল। অধিকাংশ কবি এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সজাগ দৃষ্টিভঙ্গী আবার তাঁহারা এ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরও আরোপ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এগুলির পুনর্মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে। সেই জন্যই দেখা যায় মানবায়নের মূল মন্ত্রে পৌরাণিক কথাবস্তুর রূপান্তর ঘটিয়াছে। অবশ্য সকলের ক্ষেত্রে ইহা ঘটে নাই। যাঁহারা পাশ্চাত্য জীবন জিজ্ঞাসাকে প্রবলতর রূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রেই এই রূপান্তর ঘটিয়াছে। আর যাঁহারা

দেশ জাতির সীমা লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণা অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই।

নব যুগের উন্মেষ পর্বে ঈশ্বর গুপ্ত বা তদ্‌শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরাণিক ঐতিহ্য অনুসরণ করেন নাই। ঈশ্বর গুপ্তের ভিতরে একটি অধ্যাত্ম চেতনা প্রসুপ্ত ছিল, তথাপি তাঁহার কাব্য একান্তভাবে পার্থিব চেতনা লইয়া। একদিকে যেমন গ্রাম্য জীবন ও গ্রাম্য অনুভূতিকে তিনি কৌতুকে কৌতূহলে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে বিদেশী প্রভাবপুষ্ট যুবসমাজ সমাজের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে মনে করিয়া তাহাদের উপর ব্যঙ্গ শ্লেষের কশাঘাত হানিয়াছেন। ভবানীচরণের মত কোন আচারনিষ্ঠা বা ধর্মবোধের দ্বারা ঈশ্বরগুপ্তের এই বিরাগ সূচিত হয় নাই। ধর্মবিশ্বাসে তিনি পৌরাণিক সংস্কৃতির পক্ষপাতী ছিলেন, এমত জানা যায় না। বরং সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মনীতির দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 'নির্গুণ ঈশ্বর' কবিতায় তিনি পিতৃভাবে ভগবানকে ডাকিয়াছেন, কাতর কিঙ্কর হইয়া তিনি নিখিল বিশ্বের জনকরূপী ভগবানকে আরাধনা করিয়াছেন। তবে এই কবিতার মধ্যে তিনি যে গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ কোন ধর্মমার্গ প্রসূত বলিয়া মনে না করাই সঙ্গত। 'শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন,' 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকা' প্রভৃতি কবিতায় তিনি পদাবলী ঐতিহ্য অপেক্ষা কবি গানের ঐতিহ্যই অনুসরণ করিয়াছেন।[১]

ঈশ্বরগুপ্ত-শিষ্য রঙ্গলালের মধ্যে ইতিহাস চেতনা ও স্বদেশ চেতনার সংমিশ্রণ দেখা যায়। নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি কাব্য রচনা করিয়াছেন। স্বদেশের সংস্কৃতি অপেক্ষা ইতিহাসই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

এই যুগের কবি-প্রতিভূ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বস্তুতঃ তিনি বাংলার কাব্য ক্ষেত্রে স্বরাজ্যে সম্রাট। এত বড় স্বতন্ত্র ও একক কবি বাংলা সাহিত্যে আর নাই। এক বিপুল কাব্য প্রেরণা, এক জলন্ত সামাজিক পরিবেশ, এক উদার প্রশস্ত বিশ্বগচারণ ভূমি তাঁহার সাহিত্য সাধনার পশ্চাদপট। বামনাবতারের মতই তিনি স্বর্গ মর্ত্য পাতালে ত্রিপাদ বিস্তার করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তাঁহার কাব্যের ব্যাপ্তি এত বিরাট। ইহা অবিসংবাদিত পাশ্চাত্য প্রেরণার ফল নহে, ইহা তাঁহার অন্তর প্রেরণার রসোৎসার। দেশ জাতির ধর্ম সংস্কৃতি, বিদেশ বিশ্বের সাহিত্য ও সৃষ্টি তাঁহার সাহিত্য সঙ্গমে সত্তা লোপ করিয়াছে। সুতরাং মাইকেলের কাব্যের প্রভাব উৎসে কোন চেতনাই স্বরূপে অবস্থান করে নাই।

একটি বিরাট ব্যক্তিসত্তা সব কিছু আহরণ করিয়া একটি মহৎ কবিসত্তাকে অনন্য ও অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে।

মাইকেলের সাহিত্য সৃষ্টির বিজয় বৈজয়ন্তী 'মেঘনাদ বধ কাব্য'। এই একটি কাব্য লিখিলেই তিনি অমর হইতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরও কোন সংশয় ছিল না। বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাডিশন-মুক্ত সৃষ্টি হইল 'মেঘনাদ বধ কাব্য'। কাব্য প্রকৃতিতে ইহা মহাকাব্য বলিয়া নির্ধারিত। তবে রামায়ণ মহাভারত যে অর্থে মহাকাব্য, ইহা নিশ্চয় সে অর্থে নহে। আসল মহাকাব্যের দিন চলিয়া গেলেও পুরাণ ইতিহাসের বিষয় বস্তু হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া পরবর্তীকালে যে অনুকৃত মহাকাব্য গড়িয়াছে, 'মেঘনাদ বধ' তাহারই নিদর্শন। মধুসূদন ইহাতে প্রাচ্য মহাকাব্যের নিয়মরীতি বিশেষ অনুসরণ করেন নাই, পাশ্চাত্য কবিকুল হইতেই আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে ইহাতে প্রাচ্য নির্দেশমত কল্পনার বিশালতা, ভাব গম্ভীর পরিবেশ, বস্তুধর্মের প্রাচুর্য প্রভৃতি আন্তরধর্ম যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি বহিরঙ্গের নানা কারুকার্যে—সর্গ পরিকল্পনা, গ্রন্থারম্ভে নমস্ক্রিয়া ও বর্ণনার সূক্ষ্মতায় এদেশীয় মহাকাব্যের লক্ষণ ফুটিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্যের ধর্মকে গ্রহণ করিয়া মাইকেল 'মেঘনাদ বধ' রচনা করিয়াছেন। গঠন রীতিতে এই শ্রেণীর মহাকাব্যের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যাস-বাল্মীকি যেমন একটি ইহলোক পরলোক বিধৃত সমগ্র জীবনের ধারণায় মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে তেমন কোন অখণ্ড ধারণার পরিচয় মেলে না। মেঘনাদ বধ স্বল্প কালের স্বল্প ঘটনা—বীরবাহুর পতন হইতে মেঘনাদ বধ ও প্রমীলার চিতারোহণ পর্যন্ত মোট তিনদিন দুই রাত্রির ঘটনা। সেইজন্য এই খণ্ড আখ্যানের মধ্যে পরিস্ফুট জীবনদর্শনও বহুলাংশে কবির আরোপিত, আদি মহাকাব্যগুলির মত অন্তর-উদ্ভূত নহে।

'মেঘনাদ বধ কাব্য' নামকরণ হইতেই দেখা যায় মাইকেল তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু রামায়ণী কথা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন[২] এই নামকরণের মধ্যে প্রাচ্য অনুকরণ আছে। 'কুমারসম্ভব' হইতে 'তিলোত্তমাসম্ভব' এবং 'শিশুপাল বধ' হইতে 'মেঘনাদ বধ' নামকরণ হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। যাহা হউক, মেঘনাদ বধের মধ্যে রামায়ণী কথা কি পরিমাণে গৃহীত ও পরিবর্তিত হইয়াছে এবং এই পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

মধুসূদন নিজেই বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বের বরেণ্য কবিদের কাব্য ছাড়া অন্য

কবিদের লেখা পাঠ করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন এই কবিকুলগুরুদের কাব্য ও বাণী যে কোন একজন মানুষকে প্রথম শ্রেণীর কবি করিয়া তুলিতে পারে, যদি তাহার মধ্যে কিছু মাত্র কাব্য প্রতিভা থাকে।[৩] মধুসূদন আপন কাব্য-প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং ইহাদের কাব্য পাঠে তিনি যে মহৎ কিছু সৃষ্টি করিতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। বিভিন্ন প্রেরণার স্বীকরণে একটি সৃষ্টিধর্মী কাব্য চেতনা গড়িয়া তোলাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ শেষ হইলে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,

"It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own ; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki."[৪] বাল্মীকি হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা যে কেন, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। তবে সামান্য হইলেও তিনি যে বাল্মীকিকে গ্রহণ করিবেন, তাহা ইহাতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

বস্তুতঃ বাল্মীকির প্রতি মধুসূদনের আবাল্য একটি আকর্ষণ ছিল। কবিগুরুর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা তাঁহার কাব্যের বহুস্থানে ব্যক্ত হইযাছে। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার আগ্রহ বিশেষ না থাকিলেও হিন্দুধর্মের এই মহাকাব্যকে তিনি অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণকে তিনি পত্রে লিখিতেছেন, "Though as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hindui:m, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it."[৫] মহাকল্পনা ও মহাসৌন্দর্যের এই উৎসের প্রতি মধুসূদন গভীর মনোযোগী ছিলেন। মেঘনাদ বধের চতুর্থ সর্গে তিনি কবিগুরু বাল্মীকির উদ্দেশ্যে বিনম্র প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন। শুধু বাল্মীকিই নহে, বঙ্গের অলঙ্কার কৃত্তিবাসও কবির বন্দনীয়। কবিপিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করিয়া কবি কৃত্তিবাস সুমধুর রামনামে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছেন। মহাকাব্যের কাব্যসৌন্দর্য এবং মহাকবিদ্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ কবিকে রামায়ণী বিষয়বস্তু নির্বাচন করিতে সহায়তা করিয়াছে।

রামায়ণের মেঘনাদ-লক্ষ্মণ যুদ্ধ ও লক্ষ্মণ হস্তে মেঘনাদের মৃত্যু বিবরণ লইয়া মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণে আছে খরের

পুত্র মকরাক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে রামের হস্তে নিহত হইলে রাবণ উত্তেজিত হইয়া ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎ রামের মনোবল ভাঙিয়া দিবার জন্য মায়াসীতার সৃষ্টি করেন। হনুমান ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করিতে আসিলে তিনি মায়াসীতাকে সর্বসমক্ষে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং তীক্ষ্ণধার খড়্গের আঘাতে তাঁহাকে বিনষ্ট করিলেন। এই সংবাদে রাম শোকাতুর হইয়া পড়িলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রবোধ দান করিতে থাকেন। বিভীষণ এই মায়াসীতার কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং জানাইলেন ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হোম করিবেন। অতঃপর বিভীষণ সসৈন্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যাইবার প্রস্তাব করিলেন এবং যজ্ঞ পণ্ড করিয়া মেঘনাদকে বধ করিবেন জানাইলেন। তিনি আরও জানাইলেন ইন্দ্রজিৎ মহাবনে বটবৃক্ষতলে ভূতগণকে উপহার দিয়া যুদ্ধ করিতে যান এবং অদৃশ্য ভাবে শত্রু নিধন করেন। অতঃপর লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের সম্মুখ যুদ্ধ হয় ও তাহাতে ইন্দ্রজিৎ নিহত হন।

কৃত্তিবাসে মূল রামায়ণ কাহিনী মোটামুটি রক্ষিত হইয়াছে। তবে সেখানে খরের পুত্র মকরাক্ষের স্থলে আপন পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণ মেঘনাদকে যুদ্ধে যাইতে বলিয়াছেন। অন্যান্য কথা অর্থাৎ মেঘনাদ কর্তৃক মায়াসীতা নির্মাণ ও তাঁহাকে হত্যা, লক্ষ্মণের সান্ত্বনা দান ও বিভীষণ কর্তৃক মায়াসীতার ভ্রান্তি অপনোদন এবং ইন্দ্রজিৎ নিধনের কলা কৌশল সবই বাল্মীকির অনুরূপ হইয়াছে।

বলাবাহুল্য, বীরবাহু পতন কাহিনী মাইকেল কৃত্তিবাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনা বিন্যাসে ও উপস্থাপনায় তিনি মৌলিকতা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মেঘনাদের পূর্ব দুইবার যুদ্ধ যাত্রার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু মেঘনাদ কর্তৃক মায়াসীতা নির্মাণ ও হত্যার কাহিনী একেবারে অনুক্ত রাখিয়াছেন। মেঘনাদের উচ্চ আদর্শ ও বীর্যবত্তায় ইহা বোধ করি নিতান্ত কলঙ্ককর। সেইজন্য বীরচরিত্রের, মর্যাদায় এই হীন রণকৌশল একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আবার মেঘনাদ যে ভূতদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া মায়ার দ্বারা অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাও কবি অস্বীকার করিয়া লক্ষ্মণের উপর তাহা চাপাইয়া দিয়াছেন। মাইকেল মূল রামায়ণের মেঘনাদ বিভীষণ কথোপকথন আংশিক বিবৃত করিয়াছেন, তবে এস্থলে মেঘনাদের উক্তির মধ্যে আরও ওজস্বিতা ও প্রবল যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিভীষণের ধর্মভীরুভাব এবং রাবণ চরিত্রের মহাপরাধ উল্লেখ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রকৃতিও রামায়ণের

অনুরূপ। কিন্তু মাইকেল রামায়ণের সম্মুখ যুদ্ধকে আদৌ গ্রহণ করেন নাই। লক্ষ্মণই তস্করের মত গোপনে মায়ার প্রভাবে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা করিয়াছেন, এই দুর্ধর্ষ মৌলিকতা মাইকেল দেখাইয়াছেন। আবার ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে ভীম পরাক্রম রাবণ যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাল্মীকি রাবণকে দারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণ করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন। পুত্র শোকজনিত মর্মবেদনাকে তিনি শত্রু নিপাতে ভুলিতে চাহিয়াছেন।[৬] পুত্র মেঘনাদ যেমন মায়াসীতাকে বিনষ্ট করিয়াছিল, রাবণ তদ্রূপ সত্যকার সীতাকে বধ করিতে মনস্থ করিলেন। সুপার্শ্ব নামে মেধাবী সৎ আমাত্যের পরামর্শে তিনি সে কাজ হইতে নিরস্ত হন। এই মন্ত্রী তাঁহাকে রামের মৃত্যু কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং মৈথিলী লাভ অবশ্যম্ভাবী জ্ঞাপন করায় রাবণ সে প্রচেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইলেন। মধুসূদন রাবণ চরিত্রের এই গ্লানিকর দিকের উন্মোচন করেন নাই। সেখানে পুত্র শোকাতুর পিতা অন্যায় যুদ্ধে হত পুত্রের স্মৃতি সম্বল করিয়া যুদ্ধে নামিয়াছেন। শক্তি নির্ভেদের মধ্যে দুঃখাভিহত রাবণের বীরত্ব ও পৌরুষ প্রকাশ পাইয়াছে।

মেঘনাদ বধের কেন্দ্রীয় কথাবস্তুতে এই ভাবে রামায়ণের গ্রহণ ও পরিবর্জন হইয়াছে। অন্যান্য অপ্রধান অংশে রামায়ণী কথার প্রয়োগ বা পরিত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম সর্গের বীরবাহুর পতন অংশটি কবি কৃত্তিবাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। রাবণের উত্তেজনা ও মেঘনাদকে যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রবুদ্ধ করা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুরূপ। তবে বারুণী মুরলা ও লক্ষ্মী প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য সাহিত্য অনুসরণ জাত। দ্বিতীয় সর্গের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে রামায়ণের বহির্ভূত। দেবদেবীদের ষড়যন্ত্রে হোমারের প্রভাব পড়িয়াছে। তৃতীয় সর্গের ঘটনাও রামায়ণের সহিত সম্পর্কশূন্য। তৃতীয় সর্গের ঘটনা প্রমোদোদ্যান হইতে বিরহিনী প্রমীলার লঙ্কাপুরে মেঘনাদ সমীপে আগমন। প্রমীলা চরিত্র বা তাঁহার এইরূপ পদক্ষেপের কোন উল্লেখ রামায়ণে নাই। চতুর্থ সর্গের কথাবস্তু প্রায় সর্বাংশে রামায়ণ হইতে গৃহীত। তবে রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধে ভূমে পতিতা সীতার স্বপ্নদর্শন-এর বৃত্তান্ত রামায়ণে নাই। সমালোচকগণ এইখানে ভার্জিলের 'ঈনীড' কাব্যের প্রভাব আছে বলিয়া মনে করেন।[৭] পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ কর্তৃক চণ্ডীদেবীর আরাধনা ও বরপ্রাপ্তির মধ্যে রামায়ণোক্ত রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা ও বরলাভের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তবে মূল ঘটনা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনার কোন উল্লেখ বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসে

নাই। অষ্টম সর্গে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের কাহিনীতে মাইকেল মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণে হনুমান কর্তৃক বিশল্যকরণী ও অন্যান্য ঔষধ আনিবার কথা ভেষজতত্ত্বজ্ঞ সুষেণের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। মাইকেল দেখাইয়াছেন রামচন্দ্র এই নির্দেশ প্রেতপুরীতে দশরথের নিকট পাইয়াছিলেন। মৃত দশরথের সহিত সাক্ষাৎকারের কথা অবশ্য রামায়ণে আছে, কিন্তু তাহা ঘটিয়াছে অনেক পরে রাবণ বধ ও সীতার অগ্নিপরীক্ষার শেষে। মাইকেল ইহা আগেই দেখাইয়া দিয়াছেন। এই প্রেতপুরীর বর্ণনা মূলতঃ ভার্জিল এবং দান্তের কাব্য হইতে গৃহীত, রামায়ণের সহিত ইহার প্রায় কোন যোগ নাই। শেষ সর্গের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া রামায়ণে নাই। ইহা হোমারের 'ইলিয়াড' কাব্যের অনুসৃত বলিয়া মনে করা যায়।

সুতরাং দেখা যায়, মূল কাহিনী রচনায় রামায়ণী কথার একটি প্রধান অংশের পরিচয় থাকিলেও তাহার মধ্যে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনায় মাইকেল বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসকে হুবহু গ্রহণ করেন নাই। তিনি যে বলিয়াছিলেন বাল্মীকিকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিবেন, তাহা প্রায় যথার্থ হইয়াছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। মেঘনাদ বধের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শে তিনি বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস হইতে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। চরিত্রের রূপায়ণে এবং সামগ্রিক আবেদনে মেঘনাদ বধ বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের আদর্শকে লুপ্ত করিয়া স্বতন্ত্র ভাবব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

রামায়ণে বাল্মীকির আদর্শ যুগ যুগান্তের প্রণম্য চরিত্র রামচন্দ্রকে ঘিরিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। এই রামচরিত্রের তুলনা নাই। "বাল্মীকির বক্তব্য ছিল রাম অয়ন। মহাপুরুষের মাহাত্ম্য গান—মানুষের মনুষ্যত্বধর্ম এবং উহার বিজয়িনী শক্তির মহাসঙ্গীত গান করাই ত কবিগুরুর লক্ষ্য ছিল।"[৮] কে এই আদর্শ পুরুষ? ভুবনমণ্ডলে দুর্লভ গুণরাজির অধিকারী একটি মাত্র পুরুষই আছেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্র। এই রামচন্দ্র জীবনের নানা অসংগতি অতিক্রম করিয়া একটি মহৎ মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মহৎ মনুষ্যত্ব দাঁড়াইয়া আছে একটি জাগ্রত নীতিবোধের উপর। এই নীতির কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, কোন মমতা করুণা নাই, অশ্রুর জলপ্রপাত বহিয়া যাইলেও সে নীতি অবলুণ্ঠিত হইবার নহে। রামায়ণ ও মহাভারতের উভয় ক্ষেত্রেই এই উদাত্ত নীতিবোধের জয়গান ঘোষিত হইয়াছে। ঋষিকবি বাল্মীকি রামচরিত্রকে পূর্ণ মানবরূপে চিত্রিত করিয়া তাঁহাকে এতখানি নৈতিক বলের আধার করিয়াছেন। ভক্তি চন্দনে

চর্চিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র পরবর্তী কালে অবতারে পর্যবসিত হইয়াছেন। রামভক্তিবাদের বিভিন্ন ধারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইলে সর্বত্রই শ্রীরামচন্দ্রের লোকোত্তর মহিমা নারায়ণী বিভূতি বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে। বাংলার কৃত্তিবাস তাহারই তরঙ্গে উল্লসিত হইয়াছেন।

রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের মানবিক কার্য ও নৈতিক বিশ্বাস পরিস্ফুট করিবার জন্য লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও অন্যান্য ধর্মপ্রবণ চরিত্রের কার্যকলাপ নির্ধারিত হইয়াছে। লোকধর্মকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা শাশ্বত ধর্মকে বড় করিয়াছেন। লক্ষ্মণের রামানুগত্য ভ্রাতৃপ্রীতি অপেক্ষা অনেক বড়। সুখে-দুঃখে শ্রীরামচন্দ্রকে ছায়ার মত অনুসরণ করিয়া, সংসার স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া, গুরুভার কর্তব্যে অটল থাকিয়া লক্ষ্মণ সর্বাংশে শ্রীরামচন্দ্রের জীবন সাধনার উত্তর সাধক হইয়াছেন। এই মহৎ ধর্মজীবনের শান্তি ছায়াতলে কবি বিভীষণকে বিপরীত কক্ষ হইতে আনিয়া দিয়াছেন। লোকধর্মে অপরাধ হইলেও শাশ্বতধর্মে তাহা নিন্দিত নহে। আর বেদনায় উজ্জ্বল, কর্তব্যে অটল ও ন্যায়ের রক্ষক চরিত্রগুলিকে অমেয় গৌরব ও প্রতিষ্ঠা দান করিবার জন্য রাবণের মত দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের প্রয়োজন ছিল। ঋষিকবি রাবণকে সর্বাংশে হীন করেন নাই, পরন্তু তাঁহার বংশ মর্যাদা, আভিজাত্য, ঐশ্বর্য ও ধর্মবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। "তিনি মাতৃ আদেশ পালনের জন্য দশ সহস্র বৎসর নিশ্ছিদ্র তপস্যা করিয়াছেন। শরবনে বিপত্তি সৃষ্টি করার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শঙ্করের নিকট সহস্র বৎসর অনুতাপ করিয়াছেন, নর্মদাতীরে পুণ্য স্নান ও শিবার্চনা করিয়াছেন। রাবণের রাজত্বে লঙ্কায় ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হোম যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানরূপে নানা যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাবণের দেবদ্বিজে ভক্তি বিশ্বাস ছিল। তিনি স্বয়ং যাগ, যজ্ঞ, পূজা, উপাসনা ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিতেন। শত বিপদ সত্ত্বেও তিনি কখনও ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন নাই।"[*]

তবুও এই রাবণের প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। তিনি গভীরতম পাপ করিয়াছেন। ঋষি কবি তাঁহার ব্যভিচারিতার চিত্র আঁকিয়াছেন। অপ্সরা রম্ভা ও পুঞ্জিকাস্থলা এবং ঋষি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতীর তিনি সতীত্ব নষ্ট করিয়াছেন। ইহার জন্য রাবণকে অভিশাপগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। সর্বোপরি, রাবণের সীতাহরণের কোন ক্ষমা নাই। ইহা শুধু রাজনৈতিক কৌশলই নহে, ইহা মনুষ্যধর্মবিরোধী ও চরম-নৈতিক অপরাধ। কৃত্তিবাস ঋষিকবি বাল্মীকির মানবচরিত্র ও রাক্ষস চরিত্রের যাথার্থ্য রক্ষা করেন নাই। তাঁহার কাছে শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণ মানব নহে, তিনি বিষ্ণুর

অবতার এবং রাক্ষসরাজ রাবণ নীতিবিগর্হিত দাম্ভিক পরদারলোলুপ পুরুষ। কিন্তু কৃত্তিবাসের প্রধান সুর রামায়ণে ভক্তিবাদের জয়গান। এই ভক্তিবাদের তরঙ্গে পড়িয়া রাবণও শ্রীরামচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন ভক্ত হইয়া গিয়াছেন। রাম রাবণের যুদ্ধকালে কৃত্তিবাসের রাবণ বলিয়াছেন:

> না জানি ভকতি স্তুতি, জাতি নিশাচর।
> শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদাধর ॥
> তুমি হে অনাদ্য আদ্য অসাধ্য সাধন।
> কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড নবখণ্ড বিনাশন ॥
> আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
> কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যানন্দন ॥[১০]

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের এই আদর্শ সম্মুখে দেখিয়া মাইকেল রক্ষঃরাজ রাবণকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বাল্মীকির চরিত্র চিত্রণ তাঁহাকে কিছুটা উদ্দীপিত করিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিণতিতে তিনি কবিগুরুর 'রাম অয়ন'কে গ্রহণ করেন নাই। রক্ষঃ কুলের প্রতিই তিনি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি লিখিতেছেন—

"People here grumble and say that the heart of the poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination, he was a grand fellow."[১১] অন্য একটি পত্রে তিনি অনুরূপ উক্তিই করিয়াছেন—**"I have thrown down the gauntlet and proudly denounced those, whom our country men have worshipped for years, as imposters, and unworthy of the honours heaped upon them ,"**[১২]

বস্তুতঃ রাবণের মধ্যে তিনি একটি বিরাট শক্তি ও তাহার অপচয় লক্ষ্য করিয়াছেন। কবিগুরু 'রাম অয়নে'-এর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তিনি রামচরিত্রে মহৎ নীতি প্রতিফলিত দেখিয়াছেন। মাইকেল রাবণের মধ্যেও অনুরূপ একটি সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তি লক্ষ্য করিলেন। "রাবণ বিলাপ করিতেছে অসহ্য পীড়া ধর্মে—দেহি ধর্মে, ভুলেও তো রামের নিকট পরাভব স্বীকারের কথাটুকুন ভাবিতেছে না। মধুসূদন তাহাকে কাঁদাইয়াছেন, তাহার আত্মার ঐ বিজয়শ্রী উজ্জ্বল করিবার উদ্দেশ্যে। এই অনম্যমেরুদণ্ডী রাবণ!

সংসারে মেরুদণ্ডী মহাপুরুষগণ কি এইরূপে অবস্থার অসহনীয় নিষ্পেষণেও চিরকাল সত্যের জন্য, ভাবের জন্য, আত্মমর্যাদার জন্য সংগ্রাম করিয়া চলিয়া যান না—মরিয়া যান না? এই স্থানেই মেঘনাদবধ কাব্যের নৈতিক ভিত্তি—রাবণ চরিত্রের নৈতিক ভিত্তি।"[১৩]

এহেন রাবণ, তাঁহারই পুত্র মেঘনাদ, কবির একান্ত প্রিয়জন—বিরাট বনস্পতির একটি ঊর্ধ্বমুখী সতেজ শাখা। শৌর্যে বীর্যে, কর্তব্যে, স্নেহে, প্রেমে, আনুগত্যে এ চরিত্র মহতো মহীযান। রামচন্দ্রের বানরচমূর সাহায্যে এই বীরপতন একটি অস্বাভাবিক অসংগতি। কবিগুরু আর্য বিজয় কাহিনী যদি রামায়ণে বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সামান্য অনুচরবৃন্দের সাহায্যে সম্ভব কি? মাইকেল যদি আর্যপক্ষে বিরাট অনুচর ও সঙ্গীসাথী দেখিতেন, তাহা হইলে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, কিন্তু এই সামান্য অবস্থায় ও নগণ্য সাহচর্যে নহে।[১৪]

রক্ষঃকুলের প্রতি মাইকেলের সহানুভূতি যে স্পষ্ট, তাহাতে সংশয়ের কিছু নাই। সুধী সমালোচক কেহ কেহ বলিয়াছেন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ছোট হইয়া যান নাই। তাঁহারা যে একটি বিরাট নীতিধর্মের প্রবক্তা ছিলেন, তাহার কাছে রাবণ তথা মেঘনাদের পরাজয় ঘটিয়াছে। অর্থাৎ মেঘনাদ বধই যখন হইয়াছে, তখন লক্ষ্মণের রণকৌশল, বিভীষণের দেশদ্রোহিতা, রামের ধর্মভীরুতা সব কিছুই মহৎ নীতি আশ্রিত। চিত্রাঙ্গদার মধ্যে এই শাশ্বত নীতির ঘোষণাও তাহার লংঘন জনিত মহাবিনষ্টির কথা ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং মধুসূদন ইহাতে যে রামায়ণী সত্য হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন এমত মনে হয় না।

কিন্তু এইরূপ নীতিবোধের প্রশস্তি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নহে। যাহা রামায়ণে দেখান হইয়াছে, তাহা একটি খণ্ড অংশে বিবৃত হয় নাই। মাইকেল এমন একটি অংশ নির্বাচন করিয়াছেন যেখানে তাঁহার উপজীব্য রামায়ণের সত্য নহে—মেঘনাদ তথা রাবণের জীবন নির্গত একটি মানবিক মহাসত্য, যাহা শুধুমাত্র এদেশীয় পুরাণ শাস্ত্রের কর্মফলই নহে, তাহা অদৃশ্য মহাজাগতিক এক পরাশক্তি। মানুষের কর্ম ও আচরণের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহার অমোঘ নির্দেশ মানুষকে নিঃশেষ করিয়া দেয়। মধুসূদন রাবণের পাপাচারকে কোথাও প্রকট করেন নাই। "রাজনীতি—অধিকারের শত্রুতা এবং রণনীতি অধিকারের অরিতা-কার্যরূপেই যে মধুসূদনের রাবন সীতাহরণ করেন, ইহা মেঘনাদের পাঠককে সর্বাগ্রে, কাব্য পাঠের প্রবেশ মুখেই বুঝিয়া লইতে হইবে।"[১৫] নিছক সীতা-

-হরণের অনিবার্য পরিণতি ধ্বংস হইলে তাহা পৌরাণিক কর্মফল প্রসূত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু রাবণ চরিত্রের মূল ক্রিয়াটি এমন প্রতাপশ্রী ও রাজশ্রীর অবমাননা প্রসূত হইয়াছে, যেখানে এই মর্মন্তুদ পরিণতি কর্মফলজনিত নহে। মধুসূদন কর্মফলের পরিধি কাটাইয়া মানব জীবনের উপর ক্রুর নিয়তিবাদের খেলা দেখাইয়াছেন। এই নিয়তির কাছে মানব তুচ্ছ, অমিত শক্তির অহেতুক অপচয়ই তাহার লীলা। মধুসূদন যেখান হইতেই ইহা গ্রহণ করুন।[১৬] ইহা তাঁহার কাব্যকে পৌরাণিক পরিমণ্ডল হইতে চিরন্তন মানব জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পৌরাণিক দেব-দেবীর প্রতি মধুসূদনের দৃষ্টিভঙ্গী এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। সব দেশেই দেববাদ উৎপত্তির একটি সাধারণ সূত্র রহিয়াছে। দেবতারা সাধারণতঃ মানুষের মানসিক শক্তির একটি অত্যুজ্জল প্রকাশ। প্রকাশের বিরাটত্ব অনুসারে তাহা মানুষের নিকটে বা দূরে থাকে। ভারতীয় আর্য মনীষীদের দেবচরিত্র অত্যুজ্জ্বল ভাগবতী মহিমায় ঠিক সীমাবদ্ধ মানুষের নিকটে থাকে নাই। তাঁহারা বহুলাংশে মানবিক কলঙ্ক মুক্ত। কিন্তু এই অতিমানবীয় চরিত্র পৌরাণিক যুগে ভক্তি বাদের উচ্ছ্বসিত ভাবতরঙ্গে বহুলাংশে মানবিক হইয়া পড়িয়াছে। এইখানে ইহারা গ্রীক দেব চরিত্রের অনুরূপ হইয়া গিয়াছে। মধুসূদনের কাব্যে গ্রীক দেব-চরিত্রের অনুকৃতি থাকিলেও তাহা যে ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্রের এই রূপান্তরিত স্তর, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। পৌরাণিক যুগে দেবতার আরাধনা ও প্রসাদ ভিক্ষা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। এসম্বন্ধে শশাঙ্কমোহন সেনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "পুরাণে দেবানুগ্রহের আদর্শ প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু ঐ অনুগ্রহের মূলে ছিল তপস্যা। অসুর এবং রাক্ষসগণও প্রথম প্রথম তপস্যাবলে শিব এবং শিবানীর বরযোগ্য হইয়াই সৃষ্টি মধ্যে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব লাভ করে, পরে পরে প্রকৃতিগত দুর্জয় তামসিকতার বশে এবং শক্তি প্রাবল্যে অন্ধ হইয়াই শক্তির কুব্যবহার করিতে থাকে, উহাতেই ক্রমে বিশ্বনীতির বিদ্রোহী এবং ভুবনের উপপ্লবকারী শক্তি রূপে পরিণত হইয়া আপনার ধ্বংস আপনিই ডাকিয়া আনে। ইহ'ই হইল পৌরাণিক 'দেবানুগ্রহ' বাদের এবং অনুগ্রহদর্পিত দৈত্যতা বা রাক্ষস তত্ত্বের মূল।"[১৭] মেঘনাদবধ কাব্যে দেবতার নিকট এই প্রসাদ ভিক্ষা আছে এবং সেই আশীর্বাদ পুষ্ট চরিত্র 'রাবণ বা মেঘনাদ দুর্জয় হইয়াছে। কিন্তু অন্ধ তামসিকতার বশে রাবণ যখন শাশ্বত বিশ্বনীতিকে লংঘন করিয়াছে তখন এই দেবতা বিমুখ হইয়াছেন। বিরূপাক্ষ রুদ্রতেজদানে রক্ষঃ কুলরাজকে

তেজস্বী করিলেও শেষ পর্যন্ত অমোঘ নীতি বিধানের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছেন এবং পরমভক্ত রাবণের শত্রু শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে ক্ষমা করিয়াছেন। ইহা ভক্তজনের উপর বিরূপতা নহে, বিশ্বনীতি লংঘনকারী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান। মেঘনাদ বধের সমূহ দেবচরিত্র মানুষের মতই যেন অদৃষ্ট তাড়িত। দেবতাকে মানবীকরণ করিয়া মাইকেল তাঁহার কাব্যে দেব ও মনুষ্যকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যায়, মেঘনাদ বধ কাব্যে মধুসূদন রামায়ণী কথাকে ঢালিয়া সাজিয়াছেন। ঘটনার রদবদল, চরিত্রের রূপান্তর ও অন্তর্নিহিত ধ্বনির পরিবর্তনে মধুসূদন রামায়ণের স্থলে এক মানবায়ন রচনা করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক রূপান্তর। মধু মানসের কোন প্রকৃতি ও মধু জীবনের কোন প্রেরণা তাঁহাকে কাব্য ক্ষেত্রে গতানুগতিক পথচারী না করিয়া বিপ্লবের ভৈরবমন্ত্র দান করিয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে।

মধুসূদনের কবিমন অত্যন্ত সংবেদনশীল, কিন্তু চেতনাটি সংস্কার মুক্ত। এই নির্মুক্ত দৃষ্টি তাঁহার হিন্দু কলেজের অবদান; ডিরোজিওর প্রভাবিত উত্তরকালীন স্বাধীন চিন্তা ও রিচার্ডসন সাহেবের প্রত্যক্ষ সাহচর্য তাঁহার আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং সংস্কারের নিগড় কাটাইতে সাহায্য করিয়াছে। ইয়ং বেঙ্গলের দুর্ধর্ষ পথিকৃৎবৃন্দ প্রথাবদ্ধ সমাজকে যে আঘাত দিয়াছিলেন, মধুসূদন যেন তাহারই অনুক্রমণিকা। খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়া তিনি আচার সংস্কারের শেষ বন্ধনটি কাটাইয়া ফেলিলেন। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয়, মধুসূদনের সংস্কার মুক্তি ও ইয়ং বেঙ্গলের সংস্কারমুক্তি এক জিনিস নয়। মধুসূদনের অনুরূপ তাঁহারাও পশ্চিমী প্রেরণা পাইয়াছিলেন, পশ্চিমী স্বাধীন চিন্তা উভয়েরই মধ্যে কার্যকরী হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের সব কিছু প্রচেষ্টা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকেই পড়িয়াছে। মধুসূদনের দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা অনেক সূক্ষ্মতর। রক্ষণশীল সমাজের সহিত কালাপাহাড়ী বিরোধিতা তিনি করিতে চাহেন নাই। সেই শক্তিটুকু তিনি সাহিত্য সাধনায় নিয়োগ করিতে চাহিয়াছেন। কবি মনের স্পর্শকাতরতা একটি স্বচ্ছ মানস প্রকৃতির আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাকে সংস্কারের ক্ষেত্র হইতে সৃষ্টিলোকে লইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ মধুসূদনকে বলা যায় রেনেসাঁসের মানস সন্তান। রেনেসাঁস কথাটির ব্যাপকত্ব অনেকখানি। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের তরঙ্গাভিঘাত ঊনবিংশ শতকের প্রথম হইতেই বাংলাদেশের তটভূমিতে আসিতে থাকে।

বাংলাদেশে ইহাই নব জাগরণের সূত্রপাত করে। রামমোহন রায় ইহার পথিকৃৎ। জাতীয় জাগরণের যে বীজ মন্ত্র তিনি দিয়া গিয়াছিলেন তাহাই ইষ্ট মন্ত্র করিয়া পরবর্তীকালের বাংলার মনীষিবৃন্দ দেশের চিন্তাজগতে ও ভাবজগতে আলোড়ন আনিয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই ইহার গূঢ় অর্থ অনুধাবন করিতে পারেন নাই। পরন্তু দেশ সংস্কৃতির কঠিন শিলাতলের উপর দিয়া এই জলতরঙ্গ প্রবল বেগে বহিয়া গিয়াছে। তাহাতে কঠিন শিলা কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও উৎপাটিত হইতে পারে নাই। অধ্যাত্মচেতনার গভীর স্পর্শ, সংস্কার নিষ্ঠার দৃঢ় আনুগত্য, নিরুত্তাপ নিস্তরঙ্গ জীবনের মেদুর প্রশান্তি আমাদের বিমুক্ত করে নাই। প্রবৃত্তি প্রকৃতির সর্বগ্রাসী দাহ হইতে ইহা রক্ষাকবচের মত আমাদের আগলাইয়া রাখিয়াছে। জীবনের প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল রূপের অন্তরালে দারিদ্র্য-নির্বেদ বৈরাগ্যের কথায় উত্তরীয় আমাদের খিন্ন তাপসের আত্মপ্রসাদ দিয়াছে। ইহা আর যাহাই হউক, মুক্ত জীবন পিপাসা নহে। মধুসূদন রেনেসাঁসের উজ্জ্বল আলোকে জীবনের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দুঃখ দারিদ্র্য অভিহত কোন তপশ্চর্যার জীবন নহে, ভোগে ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ বস্তুজীবন। রত্নসৌধ কিরীটিনী লঙ্কার মধ্যে তিনি রাবণের অমিত ঐশ্বর্য দেখিয়াছেন। অমিত শক্তি ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী রাবণ সেই বস্তু ভোগী জীবনেরই একটি পূর্ণ রূপ। ইহার সহিত জটাচীরবল্কলধারী শ্রীরাম লক্ষ্মণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন কি করিয়া। সমুন্নত বীরত্ব ও নীতি ধর্মের প্রশস্ত ক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকিলেও তিনি দাশরথি পক্ষে জয় দিতে পারিলেন না।

"The subject is truly heroic; only the monkeys spoil the joke."[১৮] নগণ্য বানরচমূ লইয়া কিরূপে তিনি এতবড় রাজশ্রীকে হতশ্রী করিবেন? তাই ত্রিভুবনজয়ী দশাননের নিকট শ্রীরামচন্দ্র 'ভিখারী রাঘব' থাকিয়া গিয়াছেন।

আবার এই জীবন শুধু বস্তুর মধ্যেই নহে, নানাদিকে প্রসারিত হইয়া আপন সার্থকতা উপলব্ধি করিতে চায়; প্রতিটি সম্ভাবনাকে রূপে রসে মূর্ত করিয়া নিজের পরিপূর্ণতা আনিতে চেষ্টা করে। যে বাধা জগদ্দল পাথরের মত এই জীবন বিকাশকে ব্যাহত করে, তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া জীবনের রথচক্র আগাইয়া চলে। সংস্কার বন্ধন, ঐতিহ্যানুরাগ যদি ইহার বাধা সৃষ্টি করে, সেক্ষেত্রে লোকমনের এই বিপুল বিশ্বাসকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া ব্যক্তিত্বের জয়গান উচ্চারিত

হয়। মানব তন্ত্রের এই উচ্চকিত ঘোষণাই রেনেসাঁসের মূল মন্ত্র। মানবতন্ত্রী নীতির আদর্শ সম্বন্ধে সমালোচক বলেন,

> ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশই হোল মানবতন্ত্রী নীতির মূল আদর্শ। এই বিকাশে যা সাহায্য করে, তা ভালো, এ বিকাশকে যা ব্যাহত করে তা মন্দ। যে ব্যবহার, যে ক্রিয়াকলাপ, যে ভাবনা, যে সম্বন্ধ ব্যক্তির অস্তিত্বকে সমৃদ্ধিতর করে তোলে, তাই যথার্থ কল্যাণকর। অপর পক্ষে যার ফলে অস্তিত্ব সঙ্কীর্ণতর, রুক্ষতর, ক্ষীণতর হয়, তাই অশিব, তাই অন্যায়। মানবতন্ত্রীর অন্বেষণ সেই আদর্শ সমন্বয়ের জন্য যাতে কোন মানুষের বিকাশকেই ব্যাহত না করে প্রতি মানুষের বিকাশকেই সুগম করে তোলা যায়। এই অন্বেষণেরই প্রকাশ মানবতন্ত্রীর বিবেক। সে বিবেক তাই কোতোয়াল নয়, বরং তাকে বলা যায় কবি।[১৯]

মধুসূদন এই কবি। রাবণের অপচিত সম্ভাবনাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। ব্যক্তি মানুষ হিসাবে, স্বকীয়তার মূল্যে তাঁহার যে পরিচয়, তাহার উদ্‌ঘাটন না করিলে মানবতন্ত্রে দীক্ষিত কবির কবিকর্মে অপূর্ণতা থাকিয়া যাইবে। রেনেসাঁসের অমূল্য অবদান ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আর মানব মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া সবচেয়ে অপচিত জীবনকে তিনি ধুলা হইতে তুলিয়া ধরিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের যে মহিমা, তাহা লোকোত্তর মহিমা, জীবন মহিমার অনেক ঊর্ধ্বে তাহার আসন। দেবানুগৃহীত, দৈবপুষ্ট সে মহিমার গরিমা কোথায়? বিরাট বৃক্ষকুলের বরবনস্পতি যখন দাবানলে পুড়িয়া যায়, কবি তখন তাহারই জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, বনস্পতির সতেজ শাখা যখন আকস্মিক বজ্রপাতে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখনই কাঁদিয়া উঠেন—"**It costs me many a tear to kill him.**"[২০] অপরদিকে মধুসূদনের চিত্ততলে স্বাদেশিকতার একটি চেতনা যে প্রসুপ্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমসাময়িক কালের দেশ সমাজে স্বদেশ চেতনা একটি জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। লেখক বা কবি সকলেই ইহাতে কিছু না কিছু সাড়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে রঙ্গলাল স্বদেশ প্রেমকে মুখ্য করিয়া কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। সহপাঠী ভূদেব এবং রাজনারায়ণের মধ্যেও স্বদেশ প্রেমের প্রগাঢ় পরিচয় পাওয়া যায়। অব্যবহিত পূর্বে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলার রায়ত জীবনের উপর নীলকরদের অত্যাচার কাহিনী পরাধীন দেশবাসীকে গভীরভাবে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। মধুসূদন ইহাকে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার প্রতি তাঁহার

একটি আন্তরিক অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক। ধর্মে খ্রীষ্টান, দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বচ্ছ ও মুক্ত হইলেও দেশ ও জাতির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রীতি পোষণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। তিনি আর যাহাই হোন, সাহেব যে ছিলেন না, তাহা নিজেই ব্যক্ত করিযাছেন :

আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য আপনাদিগকে দুঃখিত হইতে হইবে না, আমার কোট বুট যদি কোনদিন সাহেব হইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তবে একখানি দর্পণের দিকে চাহিলেই আমার সে ভ্রম দূর হইবে, আমার বর্ণই আমার জাতি স্মরণ করাইয়া দিবে।[২১]

এইরূপ অন্তর প্রকৃতিতে সচেতন হইয়া নীলদর্পণের মত উদ্দেশ্যমূলক কোন কিছু রচনা না করিলেও তাঁহার কাব্য সৃষ্টি ও কবি কল্পনার মধ্যে ইহার প্রভাব আসিয়া পড়া বিচিত্র নহে। জাতীয়তাবাদের পরিস্ফুটন ক্ষেত্রে লঙ্কাপুরীকে সেই মাতৃভূমি বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে যেখানে মেঘনাদ জীবনাহুতি দিয়া দেশের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাহিয়াছে, শ্রীরামলক্ষ্মণ পরভূমিতে অবতরণ করিয়া সেই স্বাধীনতা খর্ব করিতে উদ্যত, তাঁহার বিভীষণ স্বদেশদ্রোহী, যে বিদেশীর পায়ে স্বদেশকে তুলিয়া দিয়াছে। মেঘনাদ-বিভীষণ কথোপকথনে মেঘনাদমুখে কবি জলন্ত ও তির্যক ভাষণ দিয়া স্বদেশদ্রোহিতার অপরাধ দেখাইয়া দিয়াছেন।

কবিমনের এইরূপ প্রসারতা ও স্বীকরণ ছাড়া তাঁহার ব্যক্তি মনের প্রকৃতিকেও তাঁহার কবিকর্মের জন্য অল্পবিস্তর দায়ী করা চলে। মধুসূদন জীবনক্ষেত্রে নিয়তই আবর্তিত হইয়াছেন, কোথাও স্থিতিলাভ করেন নাই। এক প্রচণ্ড আগ্নেয় দুর্দান্ততার অধিকারী ছিলেন বলিয়া জীবন পরিক্রমায় তিনি নিত্য নূতন পদক্ষেপ রচনা করিযাছেন। যাহা জন্মসূত্রে পাইয়াছিলেন—'পৈতৃকী অর্থ বিলাসিতা এবং ঐশ্বর্য লিপ্সা', যাহা শিক্ষাসূত্রে অর্জন করিয়াছিলেন—স্বাধীনচিন্তা ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি, যাহা ভাবসূত্রে স্বীকরণ করিযাছিলেন—বিশ্বের কবি মনীষীদের আত্মিক সহিতত্বলাভ—সব কিছু লইয়াই তিনি জীবনপথে পাড়ি দিয়াছেন। ইহাদের সব কয়টিই তাঁহার চিত্তকে দোলায়িত করিয়াছে, কখনও সুস্থির ও প্রশান্ত করিতে পারে নাই। এক মুহূর্তে তিনি যাহা পাইযাছেন, অন্য মুহূর্তে তাহাকে অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া নূতন কিছু চাহিতেছেন। এই অতৃপ্তির প্রদাহ মধুজীবনের ট্র্যাজেডী ছিল। তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে চাহিলেন, হয়ত আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। তিনি

ইংরেজীতে লিখিতে চাহিলেন হয়ত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ঘটিবে, কিন্তু তাহাতে হয় নাই। তিনি বিলাত যাইতে চাহিলেন হয়ত আর্থিক ক্ষেত্রের অনটন ঘুচিবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। তিনি যে এই সমস্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্যেও সাহিত্য কর্মে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, ইহার মূলে তাঁহার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং অহংধর্মিতা। এই শক্তিটুকু তাঁহাকে স্বক্ষেত্রে সম্রাট করিয়াছে। কিন্তু গতি ও সৃষ্টির প্রবল প্রচণ্ডতায় তিনি কোন সুনির্দিষ্ট জীবন প্রত্যয় লাভ করিতে পারেন নাই। দৃঢ় ভিত্তিভূমে পদরক্ষা করিয়া দৃষ্টিকে নভোচারী করিলে ক্ষতি নাই, ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বের অনেক সূর্য, অনেক নক্ষত্রকে তখন দেখা যাইবে। কিন্তু ভিত্তিভূমি অশক্ত হইলে দৃষ্টির অপূর্ণতা ঘটিবে। অশান্ত গতিরেখায়, দারুণ চিত্তবিক্ষিপ্ততায় কবি অযুত যুগ তপস্যার ভারতবাণীকে পাঠ করিতে পারেন নাই, লক্ষকোটি মানুষের ধ্যান ধারণার আশ্রয়ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। দূরযানী কবিদৃষ্টি শ্যামল মর্ত্যকোণ ছাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডলোকের কক্ষে কক্ষে আলোক অন্বেষণ করিয়াছে।

তবে একথা ঠিক মধুসূদনের কবি মানস বা ব্যক্তি মানসের এই প্রভাবগুলি সর্বত্রই যে স্পষ্টভাবে তাঁহার কবিকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহা নহে। মধুসূদন সাহিত্যকর্মে স্বয়ম্ভূ সৃষ্টি কল্পনাকেই প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছেন— "I mean to give free scope to my inventing powers." —এক একটি প্রেরণা মাত্রাতিরিক্ত হইলে তাহাদের অতিচারী দৌরাত্ম্যে কবিধর্ম পিষ্ট হইত। এইজন্য মধুসূদনের শিল্পচেতনা, তাঁহার আবৃত অন্যান্য চেতনা হইতে অনেক বড়।

মহাকাব্য বা পুরাণ সম্পর্কিত মধুসূদনের অন্যান্য কবিকর্মকে এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। মেঘনাদ বধ কাব্য শুধু এই প্রসঙ্গের শ্রেষ্ঠ রচনা নহে, মধুসূদনের সমগ্র কাব্যক্ষেত্রের সোনার ফসল। ইহা ছাড়া তাঁহার প্রথম ও পরবর্তী কাব্য কবিতার ক্ষেত্রেও পৌরাণিক বিষয়বস্তু ও ভাবচেতনার বহুল ব্যবহার দেখা যাইবে।

মধুসূদনের প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' মহাভারতের আদি পর্বস্থিত রাজ্যলাভ পর্বাধ্যায়ের সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী লইয়া রচিত। মধুসূদন শুধুমাত্র কাহিনীর মূল কথাটি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার পটভূমিকাকে গ্রহণ করেন নাই। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণ যখন দ্রৌপদীকে লইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠির সমীপে একনারী বহুপতি সম্পর্কিত বিপদ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়া সুন্দ উপসুন্দের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, উদ্দেশ্য পাণ্ডবগণ তাহাতে

যথোচিত সাবধান হইযা কোনরূপ আত্মভেদকে যেন প্রশ্রয় না দেন। মধুসূদন এই কাহিনীটুকুই গ্রহণ করিযাছেন, তবে তাহাতে এইরূপ শিক্ষা নির্দেশক কোন পশ্চাদপট নাই। প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ কাহিনী অবতারণা করিযা, তাহাকেই বিশাল পটভূমি ও বিপুল ব্যাপ্তি দিয়া তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যকে মধুসূদন মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য দান করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে যে মহাকাব্যের সমগ্রতা নাই, সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁহার মতে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য 'is a story, a tale, rather heroically told.'[২২] ইহাতে পৌরাণিক পরিমণ্ডলটি সুন্দর ভাবে রক্ষিত হইযাছে। দিকপাল পরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্র, সুরলোক ব্রহ্মলোকের দৃশ্যাবলী, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার শিল্পরচনা, নারদের দৌত্যকার্য, দৈববাণীতে কার্যক্রম নির্দেশের মধ্যে অতিমানবিক পরিবেশটি স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিযাছে। মহাভারতে দেবর্ষি যুধিষ্ঠির সমক্ষে উপনীত হইয়া তাঁহাকে দানবদ্বয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। মধুসূদনের দেবর্ষি কাম্যবনে ইন্দ্র সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী বিবৃত করিযাছেন।

ইহার কাহিনীগত তাৎপর্যে পৌরাণিক ইঙ্গিতটুকু পরিস্ফুট হইয়াছে। পুরাণে ও মহাকাব্যে দৈবী ও আসুরী জীবনদর্শনের কথা ব্যক্ত হইযাছে। আসুরী জীবন-প্রকৃতিতে মানুষ নিজেকে ভোগী, সিদ্ধ, বলবান ও ঈশ্বর সদৃশ মনে করে। ধনসম্পদে অধিকারী ও শত্রুনাশে সফলকাম হইয়া এই পুরুষ নিজেকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে।[২৩] এই অসুরধর্ম তমোগুণের আধার। ইহার কবলিত হইলে আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুন্দ-উপসুন্দ এই অসুরধর্মে দীক্ষিত ছিল, সেইজন্য তাহারা ভোগসম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়া আত্মবিনষ্টির পথ প্রস্তুত করিযাছে। তিলোত্তমা তাহাদের এই অসুরধর্মকে উত্তেজিত করিয়া পরস্পরের বিচ্ছেদ ও মৃত্যু আনিযাছে।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য মূলত দেবচরিত্রের কাব্য। মর্ত্যজীবন ও মানবরস ইহাতে প্রায নাই বলিলেই হয়। বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"The want of what is called 'human interest' will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women."[২৪] তবে তথাকথিত মানবরসের ন্যূনতা ঘটিলেও ইহার দেবচরিত্রগুলি দেব আবরণে মানবই। মধুসূদন দেবচরিত্রের ঐশ্বর্য রক্ষা করিযাছেন, কিন্তু মানবিক চিত্তদৈন্য হইতে তাঁহাদের মুক্ত করিতে পারেন নাই।

একমাত্র দেবরাজ-চরিত্রই ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু সমুন্নত। বৈদিক ইন্দ্র পুরাণের দেবরাজ হইলে তাঁহার মধ্যে চরিত্র দৈন্য সূচিত হয়। শৌর্যে বীর্যে তিনি বারংবার পরাভূত, তিনি স্বার্থান্ধ, ভোগবিলাসী ও পরদার লোলুপ, তিনি বারবার তপস্যারত ধ্যানীদের তপোভঙ্গ করিবার জন্য অপ্সরাদের প্ররোচিত করেন। তিলোত্তমাসম্ভবে এই ইন্দ্রচরিত্র অনেকখানি কলঙ্কমুক্ত। দৈত্য পীড়নে স্বর্গচ্যুত ও শ্রীভ্রষ্ট হইলেও তিনি আশ্রিতবৎসল ও ধর্মভীরু। তিনি দেবমহিমা সম্বন্ধে সচেতন। দিতিপুত্রগণ যদি অধর্মে রত হয়, অমর অদিতি নন্দনগণ তাঁহাদের মত অধর্মচারী হইতে পারে না। তাঁহার কাছে যথা ধর্ম, তথা জয়। ইন্দ্র ব্যতীত স্কন্দ বরুণ প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঔদার্য ও চিত্তপ্রসারতা থাকিলেও কৃতান্ত, পবন প্রভৃতি দেবতার তীব্র জিঘাংসা বোধ কবি মানবেতর ভঙ্গীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। মানবজগৎ দৃষ্টান্তে যে সুরলোকের দেবকুল অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে অখণ্ডনীয় বিধি-নির্বন্ধের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। সুরবৃন্দের যে স্বর্গচ্যুতি, তাহার মূলে তাঁহাদের কোন দুষ্কৃতি নাই। সুতরাং ইহা কর্মফল নহে। ভারতীয় কর্মফল বাদের উপর আস্থা রাখা মধুসূদনের জীবন-প্রত্যয় নহে, তিনি এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অদৃষ্টবাদের প্রতিই মনোযোগী। তবে তিলোত্তমাসম্ভবে এই অদৃষ্টকে বিধাতা বিধানের সহিত যোগ করিয়া অনেকটা ভারতীয় রূপ দেওয়া হইয়াছে। ইহা পাশ্চাত্যের দুর্নিরীক্ষ্য নিয়তিবাদ নহে, পরন্তু প্রাচ্যের স্বচ্ছ ও সহজ ধর্ম-বিশ্বাস।

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র চরিত্র ও ঘটনাবলী পৌরাণিক। বিস্মৃত পুরাণ পর্যায়ের কতকগুলি অবিস্মরণীয় মুহূর্তকে তিনি নির্বাচিত করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ নারী চরিত্র এই মুহূর্তগুলিতে তাহাদের চিন্তাবেগের দ্বারা আন্দোলিত হইয়াছে। ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করিয়া তাহারা নায়িকা পদবাচ্য এবং এই অর্থেই বীরাঙ্গনা। মধুসূদন তাঁহাদের ব্যক্তি হৃদয়ের নিগূঢ়তম অনুভূতিকে আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিধ পুরাণ কিংবদন্তী হইতে মধুসূদন তাঁহার নায়িকা নির্বাচন করিয়াছেন। "ভারতীয় আর্য সমাজের যে অবস্থায় রমণীগণ 'স্বয়ংবরা' হইতে জানিতেন, সমাজের যে গৌরবময় অবস্থায় রমণীগণ 'স্বয়ংতন্ত্র' পরিচালন করার উপযোগী শিক্ষা ও বিশুদ্ধতা উপার্জন করিতেন, মধুসূদন তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এখন সমাজ হইতে রমণীর স্বয়ংশক্তি এবং বীরাঙ্গনা তত্ত্ব

লাভ করিবার যোগ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত হইয়া গিয়াছে। ....বীরাচারী রমণীগণের লুপ্ত স্মৃতি সচেতন করিয়া তৎসঙ্গে সহানুভূতির পথে সমাজের বিলুপ্ত গৌরবের স্মৃতিবুদ্ধি পরিস্ফুট করাই হয়ত একদিকে মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল।"[২৫] এই নারী সমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে, তাহাদের অন্তর বাহিরের বন্ধনমুক্তির প্রয়াসে মধুসূদন স্বকীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জয়োদ্ধত পৌরুষের তিলক দিয়া রাবণ-মেঘনাদকে যেমন তিনি শতাব্দীর সংস্কার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তেমনি বলিষ্ঠ প্রেমের অভিব্যক্তিতে, দুর্জয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশে এই সংস্কারশাসনবদ্ধ নারী চরিত্রগুলিকে তিনি প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

রামায়ণী কথা হইতে কেকয়ী ও শূর্পণখার পত্র রচিত হইয়াছে। রামায়ণ কাহিনীর প্রায় নেপথ্যে থাকিয়াও একটি সময়ে গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দশরথ-মহিষী কেকয়ী রামায়ণের সমগ্র ঘটনাস্রোতেরই মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে। উৎকেন্দ্রিক বাৎসল্যে, স্বার্থান্ধ দৃষ্টিতে কেকয়ীর কোন মর্যাদা সেখানে নাই। মধুসূদন কেকয়ীকে স্বাধিকার প্রশ্নে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা নির্মম হইলেও সত্য। এ সত্যের সহিত স্নেহমমতার আপোষ নাই। রাজা দশরথ সত্য পালন না করিলে রঘুকুলে 'পরম অধর্মচারী থাকিয়া যাইবেন। মধুসূদন কেকয়ীকে আত্মপ্রত্যয়ে সুদৃঢ়, ব্যক্তিত্বে বিরাট ও অভিমানে জয়ী করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কেকয়ীর এই চরিত্রধর্ম তাহার উদ্ধত প্রকাশে যখন নারীধর্মকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, মধুসূদন সেদিকে সজাগ থাকেন নাই।

শূর্পণখা চরিত্র রামায়ণ হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মধুসূদন এই শূর্পণখাকে বুঝিবার জন্য 'বাল্মীকি বর্ণিতা বিকটা শূর্পণখাকে স্মরণ পথ হইতে দূরীকৃতা' করিতে বলিয়াছেন। রামায়ণে শূর্পণখা সাক্ষাৎ কামরূপিণী। রাম ও লক্ষ্মণের নিকট সে তাহার উলঙ্গ দেহপিপাসা ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু মধুসূদন শূর্পণখাকে মানবিক জীবন পিপাসায় উজ্জ্বল করিয়াছেন। রামের প্রতি তাহার অনুরক্তির কোন কথাই এখানে নাই। লক্ষ্মণই তাহার আরাধ্য। এই ভস্মাচ্ছাদিত বৈশ্বানরের নিকট সে তাহার জীবন যৌবন সমর্পণ করিতে উদ্যত। অলংকারে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্য রচনার শত আয়োজনে শূর্পণখা লক্ষ্মণের মনোরঞ্জন করিতে প্রস্তুত ; আবার প্রয়োজন হইলে সে ঐ পাদপদ্মের জন্য অম্লানবদনে উদাসীনবেশে সব কিছু ত্যাগ করিতেও পারে। শূর্পণখা লক্ষ্মণকে সামাজিক বিবাহের কথা বলিয়াছে।[২৬]

চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণলঙ্কাধামে
সমপাত্র মানি তোম, পরম আদরে,
অর্পিবেন শুভক্ষণে রক্ষঃ কুলপতি
দাসীরে কমল পদে।

সম্ভোগ সচেতন শূর্পণখা প্রেমে বরনারী হইয়া উঠিয়াছে।

মহাভারতের দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া শকুন্তলার পত্রটি রচিত। অবশ্য কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক শকুন্তলাকেন্দ্রিক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অমর কবি কালিদাস বিরহখিন্না শকুন্তলাকে শ্রেষ্ঠ বাণীমূর্তি দিয়াছেন। তাঁহার নাটকে শকুন্তলার পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। দুষ্মন্তকে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে শকুন্তলা তাঁহার মনোবেদনা ব্যক্ত করিযাছেন। মধুসূদন শকুন্তলার বিরহকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার পত্রকে একটি স্মরণার্থ পত্রিকা রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। কণ্বের অনুপস্থিতিতে তিনি যে হৃদয় নিবেদন করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি ব্যাকুল হইযা উঠিযাছেন। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার নিন্দাভাষণকে প্রতিহত করিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। প্রেম ও উৎকণ্ঠার মধ্যে ঋষি তনয়া শকুন্তলার অসহায় ভাবকে মধুসূদন সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহার এ প্রেমে ঔদ্ধত্য নাই, তপোবনের স্নিগ্ধতার মতই তাহা স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত। মহাভারত হইতে গৃহীত অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনা দ্রৌপদী, ভানুমতী, দুঃশলা, জাহ্নবী ও জনার পত্রে ব্যক্ত হইযাছে। মহাভারতের বনপর্বে ইন্দ্র লোকাভিগমন পর্বাধ্যায়ে দেখা যায় বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত অর্জুন সুরলোকে গমন করিয়াছিলেন। বনবাসকালীন এই বিরহ বেদনায় দ্রৌপদীর মানসিক উদ্বেগ ও প্রোষিতভর্তৃকাসুলভ প্রেমানুরাগ লইয়া মধুসূদন দ্রৌপদীর পত্র রচনা করিয়াছেন। ইন্দ্রলোকে উর্বশীর অভিসার ও প্রেম নিবেদনে অর্জুন অপূর্ব চারিত্র্য সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য পত্রে কবি তাহার কোন চিত্র আঁকেন নাই। পরন্তু অপ্সরা পরিবৃত হইয়া অর্জুন আনন্দে দিনাতিপাত করিতেছেন, দ্রৌপদীর এই অভিমানকে মধুসূদন কাব্যরূপ দিযাছেন। পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্মিণী হইলেও পার্থের প্রতি দ্রৌপদীর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এইজন্য মহাপ্রস্থানকালে তাঁহার পতন হয়। মধুসূদন দ্রৌপদীর এই পার্থপ্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া পত্রটি রচনা করিয়াছেন। মধুর স্মৃতির পর্যালোচনা করিয়া দ্রৌপদী আজকের বিরহ বেদনাকে আরও গভীর ভাবে অনুভব করিতেছেন। জতুগৃহ দাহে পঞ্চপাণ্ডব হয়তো ভস্মীভূত হইলেন, এই আশংকায় তিনি ব্যথিত হইয়াছেন। স্বয়ংবর সভায় অর্জুনের

স্তুতিতে তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হইয়াছেন। তিনি তখন অর্জুনকেই বরমাল্য দিতে চাহিয়াছেন, শুধু তিনি নিষেধ করায় তাহা হয় নাই, তাই তাঁহার এক পতি না হইয়া পঞ্চ পতি হইয়াছে। সমগ্র পত্রে দ্রৌপদীর এই বিশেষ অনুরক্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহার অন্তর সত্যাকে মধুসূদন ব্যক্ত করিয়াছেন। দ্রৌপদী নিঃসঙ্গ একাকিত্বের বেদনা বহন করিয়া স্মৃতি চারণা করিয়া চলিয়াছেন, বহমান অর্জুনের বহুধা বীরকীর্তির পর্যালোচনা করিয়া অনুপস্থিত অর্জুনের মানসসান্নিধ্য অনুভব করিতেছেন এবং আগামী কালে কৌরব সমরে শূরজয়ী অর্জুন পাণ্ডুকুলরাজে রাজাসনে বসাইবেন, এই সুচিরসঞ্চিত-আশা পোষণ করিতেছেন। প্রোষিত-ভর্তৃকার নিরুদ্ধ প্রেমপিপাসা পত্রের ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পটভূমিকায় ভানুমতীর পত্রিকা রচিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে সমস্ত বীর নায়ক সমবেত হইয়াছে। অন্তঃপুরচারিণী নারী-সমাজের অন্যতমা দুর্যোধনপত্নী ভানুমতী নিত্যদিন যুদ্ধের সংবাদ শুনিতে পাইতেছেন। কুরুকুলরাজ দুর্যোধন এই মহাসমরের অন্যতম প্রধান নায়ক। পাণ্ডবকুলের সহিত যুদ্ধে স্বামীর আসন্ন অমঙ্গল চিন্তা করিয়া তিনি শঙ্কিতা। প্রলয়ংকর মহাসমর হইতে হয়ত স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবেন, এই আশায় ভানুমতী পত্র লিখিতেছেন।

আলোচ্য পত্রে মধুসূদন ভানুমতী চরিত্রকে মহত্ত্বে, ধর্মানুরক্তিতে ও স্বামী-প্রীতিতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু স্বামীর মঙ্গল কামনা। কিন্তু ধর্মশীল কর্মক্ষেত্রে অধর্মের প্রতিষ্ঠা নাই। পাণ্ডবকুলের সকলেই কর্মে ও আচরণে এই ধর্মকেই অবলম্বন করিয়া আছেন। শকুনির পরামর্শ ও কর্ণের বীর্যবত্তা ভরসা করিয়া দুর্যোধন এই যুদ্ধে নামিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নৈতিক বল কোথা? ভানুমতীর পাণ্ডবানুরক্তি স্বামী-ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া, তাঁহার ধর্মানুরক্তি সমগ্র কুরুকুলের মঙ্গল কামনায়। সতী নারী কালযুদ্ধে নিয়তির অদৃশ্য লিপি পাঠ করিতে পারিয়াছেন—"হ্রদের তীরে রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি ভগ্ন উরু।" স্বামীর অমঙ্গল আশংকায় সাধ্বী স্ত্রীর গভীর উৎকণ্ঠা পত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

অনুরূপ কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পটভূমিকায় দুঃশলার পত্রখানিও রচিত। কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য সিন্ধুপতি জয়দ্রথ পত্নী দুঃশলাসহ হস্তিনাপুরে আসিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দুঃশলা পিতৃগৃহে থাকিয়া যুদ্ধ বৃত্তান্ত শুনিতে ছিলেন। অভিমন্যু নিধনে জয়দ্রথের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকায় পার্থ যে তাঁহার

নিধনে ভীমপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া দুঃশলা দারুণ শঙ্কিতা হইয়াছেন। একটি অবধারিত নিয়তি বিধানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুঃশলা স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছেন। ভানুমতীর মত সর্বব্যাপ্ত উদার মহত্ব হয়ত তাঁহার নাই, তিনি কৌরবকুলের জন্য ততটা চিন্তিত নহেন, স্বামী জয়দ্রথই তাঁহার চিত্ত-মনের সবটুকু অধিকার করিয়া আছে। ভ্রাতা দুর্যোধন পাপী, অন্য ভ্রাতৃবৃন্দও তাঁহার সমর্থক, দোষ গুণের বিচারে কৌরব ভ্রাতাদের অপরাধের সীমা নাই। জয়দ্রথ ত উভয়ের আত্মীয়, সুতরাং হিমাদ্রিতে জন্ম নদবয়ে ভেদজ্ঞান করিয়া তাঁহার সার্থকতা নাই। পরিশেষে অসম বীর প্রতিযোদ্ধা পার্থের সহিত সম্মুখ সমর না করিয়া গোপনে পলায়ন করিলেও তাঁহার অগৌরব কিছু নাই। দুঃশলা আপন নারীধর্মে স্বামীর ক্ষাত্রধর্মকেও তুচ্ছ করিতে পারেন। পুত্র কলত্রের সহিত সিন্ধুরাজ কৌরবের পাপরাজ্য পরিত্যাগ করুন, কুরু পাণ্ডুদলের নিয়তি নির্দেশে তাঁহার হাত দিবার প্রয়োজন নাই।

জাহ্নবীর পত্র রচিত হইয়াছে মহাভারতের আদি পর্বস্থিত শান্তনু-গঙ্গা উপাখ্যান হইতে। অভিশাপগ্রস্ত বসুগণের মুক্তি দিবার জন্য গঙ্গা শান্তনুকে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু সর্তানুযায়ী তিনি পুত্রগণকে বিসর্জন করিলেও শান্তনু কিছু বলিতে পারিতেন না। দ্যু-বসু দেবব্রত রূপে জন্মলাভ করিলে শান্তনু তাহাকে বিসর্জন না দিবার জন্য অনুরোধ করেন, সুতরাং গঙ্গা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান। পত্নী বিরহিত রাজাকে পূর্বস্মৃতি ভুলিয়া যাইবার জন্য তিনি অনুরোধ পত্র দিতেছেন। মহাভারতের নিরুরুণ ঔদাসীন্য মধুসূদনের হাতে মমতা করুণ বিচ্ছেদরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। আখ্যানগত মৌলিকতা এই যে, এখানে দেবব্রতকে বড় করিয়া জাহ্নবীই তাহাকে শান্তনু সমক্ষে পাঠাইতেছেন, রাজা তাহাকে আগে কাছে রাখেন নাই। মর্ত্য মানবীর বৈশিষ্ট্য দিয়াও কবি শেষ পর্যন্ত জাহ্নবীর দেবীরূপকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব হইতে জনা পত্রিকা রচিত। মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব ধরিলে পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। সেই পার্থকে রাজা নীলধ্বজ বন্ধুরূপে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলে রাজ্ঞী জনা ক্ষুব্ধ হইয়া স্বামীর নিকট এই পত্রখানি লিখিতেছেন। কেকয়ী পত্রিকার মত জনা পত্রিকাটিতে মধুসূদন একটি ব্যক্তিত্ব সচেতন বীর নারীকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আসমুদ্র হিমাচল যখন যুধিষ্ঠিরকে আভূমি প্রণাম জানাইতেছে, তখন সেই সম্রাট সার্বভৌমের প্রতিনিধি অর্জুনের উদ্দেশ্যে জনার তীব্র বিরূপতা প্রকাশ পাইয়াছে।

পুত্র প্রবীরের মৃত্যুতে স্বামী শত্রুকে মিত্রজ্ঞানে গ্রহণ করিলে তাঁহার মাতৃধর্ম আহত হইল। আহত ফণিনীর মতই তিনি গর্জন করিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার তীব্র সমালোচনায় কেহই রেহাই পায় নাই। তাঁহার কাছে অর্জুন জারজ সন্তান, কুন্তী ভ্রষ্টা, দ্বৈপায়ন ঋষির জন্ম ও চরিত্র কলঙ্ককর, দ্রৌপদী অসতী। স্বামীর ক্লীবতায় তিনি লজ্জিত। সর্বশক্তি প্রয়োগে হতচেতন স্বামীকে তিনি সম্বিতে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামীর প্রতি চরম শ্লেষও ব্যর্থ হইলে তিনি জাহ্নবী জলে জীবন বিসর্জন দিতে চাহিয়াছেন। শোকে ও দুঃখে, অপমানে ও প্রতিহিংসায় জনা চরিত্র ভারতীয় ক্ষাত্র নারীর ওজস্বিনীরূপকে উন্মোচিত করিয়াছে। গভীর মর্মপীড়ায় ও দারুণ চিত্ত প্রদাহে সীতা ও দ্রৌপদীর মত চরিত্রও নারীধর্ম বিরোধী কটূভাষণ উচ্চারণ করিয়াছে। মধুসূদনের জনা চরিত্র অবস্থা বিপর্যয়ে তাঁহাদের মতই তীক্ষ্ণ ও তির্যক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে।

ভাগবতের রুক্মিণী আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করিলে পূর্বরাগদীপ্তা রুক্মিণী কৃষ্ণকে আপন প্রেম নিবেদন করিয়া একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। মধুসূদন এই পত্রে ভাগবতোক্ত রুক্মিণীর এই প্রেম নিবেদনকে আরও গভীর এবং বাস্তব করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য পত্র অপেক্ষা এই পত্রটিতে মধুসূদনের পুরাণ অনুরক্তি অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠার সহিত প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বরাগের বিচিত্র ভাবতরঙ্গ যাহা তাঁহার কুমারী হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়াছে পত্রটির মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তারা ও উর্বশীর পত্র, দুইটি প্রসিদ্ধ পুরাণ কিংবদন্তী হইতে আহৃত। গুরু-পত্নী স্বামী বৃহস্পতির শিষ্য সোমকে তাঁহার হৃদয় নিবেদন করিয়াছেন। মধুসূদন এক্ষেত্রে পৌরাণিক কাহিনীকে উল্টাইয়া লইয়াছেন এবং মাতৃস্থানীয়া গুরুপত্নীকে প্রগল্‌ভা করিয়া শিষ্যের প্রতি অনুরক্তা করিয়াছেন। পুরাণ কাহিনীর এইরূপ স্থিতি বিপর্যয় ঘটাইয়া মধুসূদন একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছেন। হৃদয়ধর্ম আর সমাজধর্মের দ্বন্দ্বে তিনি হৃদয়ধর্মকেই জয়ী করাইয়াছেন। মনের গহনে প্রবেশ করিয়া মধুসূদন তারা চরিত্রের একটি সম্ভাব্য স্বভাব সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন। নীরস কঠোর শাস্ত্র চর্চায় সমাহিত স্বামী যখন রূপবতী ভার্যার দেহদেহলীতে পূজা জানায় না, তখনই তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, ইন্দ্রিয়জ দেহলালসা নয়, আত্মাবমাননার মধ্যেই থাকে এই বিদ্রোহের সুর। কিন্তু এই সুর এতখানি তীব্র যে, তাহা যেন কারণকেও ছাপাইয়া যায়।

মধুসূদনের রাবণ চরিত্র যদি বিরাট ঐতিহ্য প্রাসাদকে কম্পিত করিয়া তোলে, তাঁহার তারা চরিত্র তবে সেই কম্পিত প্রাসাদকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে।

পৌরাণিক পুরুরবা উর্বশীর কাহিনী উর্বশী পত্রের ভিত্তি। কুবের ভবন প্রত্যাগতা উর্বশী হিরণ্য পুরবাসী কেশী দৈত্যের দ্বারা অপহৃতা হইলে রাজা পুরুরবা তাঁহাকে উদ্ধার করেন। উর্বশীর গভীর কৃতজ্ঞতা প্রেমানুরাগে পর্যবসিত হইল। পরে স্বর্গের নৃত্যানুষ্ঠান কালে পুরুরবার নামোচ্চারণ করিলে উর্বশী স্বর্গভ্রষ্টা হইলেন। মধুসূদন এই সুযোগে উর্বশীকে দিয়া পত্র লিখাইয়াছেন। পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কালিদাস বিক্রমোর্বশী নাটক লিখিয়াছেন। মধুসূদন সম্ভবতঃ ইহা হইতেই উর্বশী পত্রিকার সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সুরকন্যাদের প্রেম ও ভালবাসার বহু ক্ষেত্র-পাত্র দেখা যায়, তাঁহারা বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি আসক্ত হন না। মধুসূদন এই দেবসঙ্গিনীকে মর্ত্যাঙ্গণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে চিরকালীন মানব পিপাসা সঞ্চারিত করিয়াছেন।

বীরাঙ্গনা কাব্যে পৌরাণিক কাহিনী বিধৃত কয়েকটি অসমাপ্ত পত্রিকা আছে, যথা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা, যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী ও নলের প্রতি দময়ন্তী। মধুসূদন এইগুলির সূচনা মাত্র করিয়াছেন, সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। গান্ধারীর পত্রটিই ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড। মহাভারতের অগণ্য নরনারীর মধ্যে গান্ধারীর চরিত্র আপন মাহাত্ম্যে ভাস্বর। আলোচ্য ক্ষেত্রে মধুসূদন গান্ধারীর অনুপম পতিভক্তি এবং তজ্জনিত স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। নদনদী গিরি কান্তারকে গান্ধারী চাক্ষুষ দৃষ্টিতে দেখিতে না পারিলেও স্মরণের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন।

বীরাঙ্গনা কাব্যের বিষয়বস্তু পৌরাণিক হইলেও কবির দৃষ্টিভঙ্গী অবিমিশ্র পৌরাণিক নহে, পরন্তু বহুলাংশে আধুনিক। যে সংস্কার ও বন্ধনমুক্তি মধু-মানসের বৈশিষ্ট্য, তাহাই এইখানে প্রকাশিত হইয়াছে। একমাত্র রুক্মিণীর চরিত্র ভিন্ন অন্যগুলিতে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এইজন্য তাঁহার চরিত্রসমূহের সাধর্ম্য দেখিয়াছেন যেখানে, সেখান হইতেও কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার নায়িকা চরিত্রে ইতালীয় কবি ওভিদের নায়িকা ক্যানাস বা ফ্রিডার সমাজ বন্ধন ও নীতি বিগর্হিত প্রেমের উত্তাপ লাগাও বিচিত্র নহে। অবশ্য ওভিদের কাব্যে এই অসামাজিক প্রণয়লীলার যেমন নিরঙ্কুশ প্রকাশ আছে, বীরাঙ্গনায় ততটা নাই। তবুও মধুসূদন ঠিক প্রাচ্য রক্ষণশীলতাকে

রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভারতীয় নারী সমাজ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে নারীত্বকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারে নাই। মধুসূদন এইখানে প্রাচ্য জীবনরীতির উপর পূর্ণ শ্রদ্ধা জানাইতে পারেন নাই। তার্কিক বুদ্ধি চেতনায় কেকয়ীকে সমর্থন করিলেও তাঁহার অনুযোগ বহ্নিকণার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, নিরুপদ্রব শান্ত পারিবারিক জীবনকে তাহা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারে। এই কল্যাণহীন সত্যকে অনন্যোপায় হইয় মানিয়া লইলেও স্বামী শিশু সমক্ষে তাহার মানিনী-ভামিনী রূপকে মানিয়া লওয়া শক্ত। যুগ যুগান্তের উল্টা হাওয়া বহিলেও ভারতবর্ষে এই ধারণার স্বীকৃতি ঘটিবে না, ভারতের কোন উল্টা পুরাণে এই আচরণের সমর্থন থাকিবে না। সে ক্ষেত্রে মধুসূদন চিরদিনই জীবনের মত কাব্যেও হয়ত বিধর্মী থাকিয়া যাইবেন।

মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যেও পৌরাণিক উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এই কবিতাগুলি তাঁহার স্মৃতি চারণ ও আত্মভাব রোমন্থনের বাণীরূপ। বিদেশ-মাটিতে বসিয়া নিঃশব্দ একাকীত্বের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তি মানস দেশ মাটির দুর্লভ সান্নিধ্য খুঁজিতেছিল। নিছক বস্তু রূপে যাহা ছিল, ভাবরূপে তাহাকে তিনি রস মূর্তি দিয়াছেন। ইহাদেব মধ্যে স্বদেশ চিন্তার উগ্র আতিশয্য লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই, তবে ইহাদের মধ্যে যে তাঁহার নিভৃত ব্যক্তি মানস ধরা পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। মহাকাব্যের বীর জগতের মধ্যে মধুসূদনের ব্যক্তি স্বরূপটি ঢাকা পড়িয়াছিল। মহাকাব্যের বস্তুগত উপাদানের প্রাচুর্যে ও কাব্যগত প্রয়োজনে কবিমনের সংগোপন ইচ্ছাটি সম্যক্ ভাবে প্রকাশ পায় নাই। মধুভাণ্ডারে অনেক কিছুই জমা ছিল, চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে সেই সুপ্ত বাসনালোকের চিন্তা ও অনুভূতিগুলির সহজতম প্রকাশ লক্ষ্যকরা যায়।

রামায়ণ-মহাভারতের জাহ্নবী ধারায় মধুসূদন যে অবগাহন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবিগুরুদ্বয়ের বিরাট কাব্য জগৎ পরিক্রমণ করিয়া তিনি একটি বীরজগৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রাবণের অপরাজেয় পৌরুষ, পার্থের অনুপম শৌর্য বীর্যের আলোকে প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তাঁহাদের ললাটদেশে জয়ের তিলক আঁকিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শৌর্য-বীর্যের অন্তরালে যে অশ্রুর উষ্ণ প্রস্রবণ প্রবাহিত ছিল, তাহাও তাঁহাকে কম উদ্বেলিত করে নাই। বেদনা বারিধির উপর শুভ্র শতদলরূপে ফুটিয়া আছে সীতাদেবী, দ্রৌপদী চরিত্র। মহাকাব্যের বীর পূজাতে যে অশ্রুর ফল্গু স্রোত ছিল, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তাহাই শতমুখী বন্যায় উৎসারিত হইয়াছে।

রামায়ণ মহাভারত দুই মহাকাব্য মহাকাব্যের কবি এবং মহাকাব্যের অবিস্মরণীয় কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবির শ্রদ্ধার্ঘ্য রচিত হইয়াছে। 'রামায়ণ' কবিতাতে কবি দিব্যচক্ষে শ্রীরামের বিজয়কাহিনী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 'মহাভারত' কবিতার মধ্যে কৌরবেশ্বর, ভীম, কর্ণ ও পার্থের দুর্দম জিগীষার চিত্র দেখিয়া কবি আতঙ্কিত হইয়াছেন। 'বাল্মীকি' কবিতাতে তিনি আদি কবি বাল্মীকির দস্যুরূপ-জন্মান্তর কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশভাষায় দুই মহাকাব্যের কবি কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের প্রতি মধুসূদন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। বঙ্গের অলঙ্কার 'কীর্ত্তিবাস' কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করিয়া সুমধুর রামনামে বঙ্গমণ্ডল মুখরিত করিবেন, ইহাই কবির কামনা। কাশীরাম দাস সুধন্য তাপস ভগীরথের ন্যায় ভারতরসের ধারাকে ভাষাপথে প্রবাহিত করিয়া গৌড়ের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছেন, ইহাতেই ত তিনি কবীশদলে পুণ্যবান কবি। রামায়ণ মহাভারতের কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনাকে কবি কাব্যরূপ দিয়াছেন। 'সীতাবনবাসে'র মধ্যে বন্দিনী সীতার করুণ ক্রন্দন, 'কিরাতার্জুনীয়মের' মধ্যে অর্জুন ও কিরাতবেশী পশুপতির সংগ্রাম, 'গদাযুদ্ধ' কবিতায় দুর্যোধন ও ভীমসেনের রণমত্ততা, 'গোগৃহ-রণে' মৃত্যুঞ্জয় ধনঞ্জয়ের অপূর্ব রণকৌশল, 'কুরুক্ষেত্র' কবিতায় অভিমন্যুর অকাল মৃত্যু, 'হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু' কবিতায় মহাপ্রস্থান পথে দ্রৌপদীর পতন প্রভৃতি ঘটনাবলী চতুর্দশপদীতে কাব্যরূপ পাইয়াছে। এই স্মরণীয় ঘটনাগুলি মধুমানসে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার মনে যে ভাবের উদ্রেক করিয়াছে মধুসূদন ইহাদের মধ্যে তাহারই স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। বীরত্বকে তিনি শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, আবার তাহা যখন অপাপবিদ্ধ জীবন জগতকে ছারখার করিয়া দেয়, তখন তিনি আতঙ্কিত হইয়াছেন।

চতুর্দশপদীতে যে বীরচরিত্র মধুসূদনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা হইল মহাভারতের পার্থ চরিত্র। ভারতীয় মহাকাব্যে পার্থ ও রাবণ চরিত্রে বীরত্বের দুই রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। পার্থের মধ্যে যদি দৈবী শক্তির প্রকাশ ঘটে, রাবণের মধ্যে তবে আসুরী শৌর্যের প্রকাশ ঘটিয়াছে। অজেয় প্রাণশক্তির অধিকারী করিয়া কবি রাবণকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, চতুর্দশপদীর মধ্যে এই রাবণ চরিত্রের প্রতি কোন শ্রদ্ধা প্রদর্শন ত দূরের কথা, কবিচিত্তের এতটুকু আসক্তিও দেখা যায় না। রক্ষঃরাজের প্রশস্তি গান নেহাতই ঘটনাগত বীর পূজা না কবির অন্তরমনের গোপন কামনা, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হয়। আমাদের ধারণা, রাবণ-চরিত্র অঙ্কন সময়ে কবির দৃপ্ত অহং-

শৈলশিখরের মত উত্তুঙ্গ ছিল। সেই অভ্রংলিহ অহমিকা জীবন পরিক্রমার সংঘাত আবর্তনে বহুলাংশে স্তিমিত হইয়া পড়িলে একখানি বিরোধকে প্রতিষ্ঠিত করিতে অপারগ হইয়া যায়। অর্থ, যশঃ ও প্রতিপত্তির লালসা ও ব্যর্থতা, নির্জন বিদেশ বাস, আত্মীয় বন্ধুর কৃতঘ্নতা সব মিলিয়া মধুসূদনের ঊর্ধ্বরেখ গতিশক্তিকে নিম্নাভিমুখী করিয়া দেয়। অন্তর জীবনের এই শূন্যতা ও নৈরাশ্যের মধ্যে কল্যাণবিহীন বীর্যবত্তাকে মধুসূদন হয়ত ভরসা করিতে পারেন নাই। তাই একদিন যাহাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আজ তাহাকেই অস্বীকার করিতে দ্বিধা হইল না। আবার এই কারণেই বোধ করি সীতা চরিত্রকে কবি অন্তরমনের সমুহ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। মেঘনাদবধের মত প্রতিকূল ক্ষেত্রে রক্ষঃকুলপ্রীতির আবেষ্টনীতে থাকিয়াও মধুসূদন সীতার কারুণ্য ও মাধুর্যকে যথোচিত মূল্য দিতে ভুলেন নাই। চতুর্দশপদীর অনুকূল ক্ষেত্রে বৈদেহী প্রশস্তির সেই মন্দ্রস্বর উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছে। অশোক কাননে বন্দিনী সীতাকে কবি অনুক্ষণ স্মরণ করিতেছেন। এই সতীনারীর অপহরণ রাবণের একান্ত মূঢ়তা। কবির স্পষ্ট ভাষণ, ভূমিকম্পে দ্বীপ যেমন অতল সাগরে ডুবিয়া যায়, সীতাহরণে রক্ষোবংশ তেমনি বিলুপ্ত হইবে।

করুণরসের মূর্তি রচনায় একটি রূপকল্প সৃষ্টিতে মধুসূদন মহাভারতের আদি পর্বস্থিত দ্রৌপদী বিবাহ পর্বাধ্যায়ের অশ্রু সঞ্জাত স্বর্ণপদ্মের ভাবটি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় অনুমান করেন।[৩১] নানাভাব ও রূপের সঞ্চয়ন মধুসূদনের একটি স্বভাব বৈশিষ্ট্য ছিল। সুতরাং মহাভারতের এই অপূর্ব সুন্দর রূপকল্পটি আহরণ করিয়া ও তাহাকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া মধুসূদন কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন।

মধুসূদনের আরও কয়েকটি পৌরাণিক কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এগুলি তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। এগুলি হইল 'পাণ্ডব বিজয়' 'সিংহল বিজয়' ভারত বৃত্তান্তের অন্তর্গত 'মৎস্য গন্ধা কাব্য' ও 'দ্রৌপদী স্বয়ম্বর কাব্য' ও 'সুভদ্রাহরণ কাব্য'। পাণ্ডববিজয়ের মধ্যে কুরুরাজ দুর্যোধনের অন্তিমদশা বর্ণিত হইয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রী মহারথী দুর্যোধনকে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা সান্ত্বনা দিতেছেন। সিংহল বিজয়ের স্বল্প কয়েকটি পংক্তিতে বিজয়সিংহের লঙ্কা অভিযানের কথা বিবৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক বিজয়সিংহকে কবি পৌরাণিক প্রতিবেশে সংস্থাপিত করিয়াছেন। কুবেরপত্নী মুরজা বিজয়সিংহের অভিযান রোধ করিবার জন্য বায়ুরাজের শরণাপন্ন হইতে চাহিয়াছেন। মৎস্য গন্ধ' কাব্যে

মৎস্যকন্যা সত্যবতী জীবনযৌবনের ব্যর্থতায় যমুনার নিকট খেদোক্তি করিতেছেন। দ্রৌপদী স্বয়ম্বর কাব্যে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদীর স্বামী লাভের কাহিনী কবি পয়ার ছন্দে বিবৃত করিয়াছেন। কাব্যটিকে অমিত্রচ্ছন্দে পুনর্লিখিত করিবার সময়ে কবি ইহাকে পরিবর্তিত করিয়া সুভদ্রা হরণে রূপান্তরিত করেন।[২৮] প্রারম্ভে সুভদ্রা বিজয়ের কাহিনী বিবৃত করিবার জন্য কবি বাগ্‌দেবীর কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। অর্জুনের প্রতি ঈর্ষাপ্রণোদিত শচীর উষ্মা, দেবরাজের প্রতি তাঁহার অভিমান ও ধর্মের নিকট দেবেন্দ্রের আচার আচরণের বিচার প্রার্থনা দ্বারা কাব্যটি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু মানসিক অতৃপ্তি ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়িয়া কবি অবশেষে সুভদ্রা দেবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য কাব্যকয়টি অসমাপ্ত বলিয়াই বোধ করি ইহাদের মধ্যে মধুসূদনের কবিত্বশক্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না।

এইরূপে দেখা যায়, প্রারম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত সকল সময়ে মধুসূদনের কবিকীর্তি একটি পৌরাণিক জগতকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে জগৎ হয়ত ভক্তি বিশ্বাস আর সংস্কারের কোন ধূসর মায়ালোকে অবস্থিত নহে, হয়ত তাহার অধিষ্ঠান প্রশ্ন-প্রত্যয় অধ্যুষিত মধুসূদনের মনোলোকে। কবির অপূর্বনির্মাণ-ক্ষমা কাব্য প্রতিভা সেই জগৎকেই ঘিরিয়া নানা বর্ণালী সৃষ্টি করিয়াছে।

মধুসূদনের কাব্যে পুরাতন কথাবস্তুর উপর যেমন নূতন ভাব চেতনার আরোপ হইয়াছে, এই যুগের অন্যান্য পৌরাণিক কাব্যে সেইরূপ নূতন জীবন জিজ্ঞাসার প্রতিফলন হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিকুল পুরাতন কথা কাহিনী লইয়াই পরিতৃপ্ত ছিলেন। এই যুগের বহু আখ্যায়িকা কাব্যে পৌরাণিক উপাদানের প্রাচুর্য থাকিলেও কবিকুল মহাকাব্য পুরাণের সনাতন ঐতিহ্যকে যথাসম্ভব রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। আমরা এই পর্বের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কাহিনীর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

নির্বাসিতা সীতা (১২৭১)॥ রামায়ণ কাহিনী হইতে ঢাকার হরিশ্চন্দ্র মিত্র 'নির্বাসিতা সীতা' নামে একটি খণ্ড কাব্য রচনা করিয়াছেন। কয়েকটি পৌরাণিক নাটক এবং রামায়ণের বালকাণ্ডের অনুবাদের দ্বারাও তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বনবাসান্তর সীতার করুন হৃদয় বিলাপ নির্বাসিতা সীতা কাব্যের উপজীব্য। লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া সীতার বিলাপ সুরু হইয়াছে। বনবাসে থাকিয়া তিনি প্রেমব্রত উদ্‌যাপন করিবেন, কিন্তু ত্রিভুবনে রাঘবের কোন অযশ কীর্তিত যেন না হয়। এই অবস্থায় সচেতন থাকিলেই যন্ত্রণা সর্বাধিক। সেইজন্য সীতা

আপন সংজ্ঞার বিলুপ্তি এবং স্মৃতির বিস্মরণ চাহিতেছেন। বন প্রদেশে শুক দম্পতির কাছে, অদৃশ্য বিধাতা পুরুষের কাছে সীতা আপন হৃদয় বেদনা প্রকাশ করিতেছেন। রামচন্দ্রের উদ্দেশে তাঁহার নিরুদ্ধ অভিমান ব্যক্ত হইয়াছে। সীতা হরণ হইলে রামচন্দ্র জনপ্রাণী, গিরি, তরু, নদী প্রত্যেককে মিনতি করিয়া সীতার সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন। আজ সেই ক্রন্দনের প্রতিশোধেই কি তাঁহার সীতা নির্বাসন? সীতার গভীর দুঃখ গর্ভস্থ সন্তানকে লইয়া। রাজরাণীর পুত্র হইলে আনন্দ উৎসবের কত আয়োজন হইত, মঙ্গল বাদ্য ধ্বনিত হইত, দীন দুঃখীরা রত্নরাজি লাভ করিয়া অদীন হইত। কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় 'নবনীত নিন্দিত শয়ন বিনিময়ে ভূমিতলে হইবে শয়ন।' লক্ষ্মণের প্রতিও তাঁহার অনুযোগ রহিয়াছে। যে লক্ষ্মণ সীতা উদ্ধারে শক্তিশেল গ্রহণ করিয়াছিল, সেই লক্ষ্মণ কিরূপে সীতাকে নীরবে দারুণ বাণ হানিতে পারে। এই বর্জনের দায়ে লক্ষ্মণকে অবশ্যই ভার্গবের মত দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। পরিশেষে সীতা জাহ্নবীজলে জীবন বিসর্জন দিতে চাহিয়াছেন। অন্তিম সময়ে সমীরণের কাছে তাঁহার অনুরোধ সে যেন শ্রীরামের নিকট জানায় সেই অনুতাপিনী মৃত্যুকালে আর কিছু প্রার্থনা করে নাই, শুধু চাহিয়াছে জন্ম জন্ম রামই যেন তাঁহার স্বামী হন। আর যদি এই বাসনা চরিতার্থ না হয়, তবে বিধাতার নিকট তাঁহার অনুরোধ যেন দাসীভাবেও তিনি শ্রীরামের পদসেবা করিতে পারেন। জাহ্নবী জলে সীতার জীবন বিসর্জনান্তর কাব্যটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

কাব্যটিতে আদ্যন্ত করুণ রসের প্রস্রবণ বহিয়াছে। একটানা করুণ রসের পরিবেশনে একটি ক্লান্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। রামায়ণে সীতা চরিত্রের যে পরিণতি আছে, কবি তাহা রক্ষা করেন নাই। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি ভাগীরথী গর্ভে তাঁহার দেহাবসান ঘটাইয়াছেন। লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার অনুযোগও রামায়ণানুগ নহে। রামায়ণে সীতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কোন অভিযোগ করেন নাই।

কবিকর্মের দিক হইতে ইহা কোনরূপ উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি নহে, কবি নির্বাসিতা সীতার বেদনার চিত্রকেই শুধু অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন এবং সেখানে সীতার জীবনাবসানের মৌলিকত্ব দেখানও সর্বথা সমর্থনীয় নহে।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান (১৮৬২)। মহাভারতের হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লইয়া দ্বারিকানাথ চন্দ্র 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান' কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যের বক্তা মহামুনি বৈশম্পায়ন এবং শ্রোতা রাজা জন্মেজয়। কবি হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তি হইতে তাঁহার স্বর্গারোহণ পর্যন্ত সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে

বিবৃত করিয়াছেন। মহাভারতের অসংখ্য উপাখ্যানের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আপন মহিমায় সমুজ্জল। কবি সরল ভঙ্গীতে পয়ার, ত্রিপদী ও মালঝাঁপ ছন্দের সাহায্যে উপাখ্যানটিকে সহজবোধ্য করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্রের ত্যাগ, বিশ্বামিত্রের পৌরুষ, শৈব্যার কারুণ্য আপনাপন বৈশিষ্ট্যানুযায়ী প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যের মধ্যে সর্বত্র একটি কৃষ্ণময়তার পরিচয় রহিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের কৃষ্ণচেতনাকে কবি সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন :-

"এমন দুর্লভ ধন কৃষ্ণের চরণ।
ধনমদে মত্ত হয়ে হৈনু বিস্মরণ॥
ওহে প্রভু নারায়ণ লহ মায়াপাশ
বঞ্চনা করো না মোরে আমি তব দাস"॥

মহাভারতী কথার সর্বত্র যে নীতিবোধের পরিচয় আছে, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীতেও তাহার অভাব নাই। দান ধর্ম অতি পুণ্যের কাজ। কিন্তু আত্মকীর্তনে সেই দানের মাহাত্ম্য নষ্ট হইয়া যায়। কবি মহাভারতী কাহিনীর এই সত্যটিকে আলোচ্য কাব্যে সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। একটি অতি প্রিয় ও পরিচিত ভারত কাহিনীর উপভোগ্য পরিবেশনে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান কাব্যটি নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক।

দময়ন্তী বিলাপ কাব্য (১৮৬৮)॥ প্রদ্যুম্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দময়ন্তী বিলাপ কাব্য' মহাভারতের নলদময়ন্তী উপাখ্যান হইতে গৃহীত। নলোপাখ্যানের সব কথাই আলোচ্য কাব্যে বিধৃত হইয়াছে। তবে ইহাতে কোন ঘটনার সংঘটন নাই, ইহা একান্ত ভাবে লিরিকভঙ্গীতে দময়ন্তী কর্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে। গহন বনমধ্যে নল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দময়ন্তী যে অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহাই কাব্যের অঙ্গীরস গড়িয়া দিয়াছে। দময়ন্তীর একটানা বিলাপে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়াছে। নিষাদ চরিত্রকে আনিয়া কবি দময়ন্তীর নিঃসীম শূন্যতাকে সহানুভূতির আলোকে আরও মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছেন।

তবে কাব্যটির অভিনবত্ব কিছু নাই। পূর্বস্মৃতি রোমন্থন এবং বর্তমান দুরবস্থা-জনিত বিলাপ কাব্যের বিষয়বস্তু হওয়ায় ইহার কিঞ্চিৎ আবেদন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটানা বিলাপের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন করুণরসের পরিবেশন বিশেষ সফল হয় নাই। আঙ্গিক বিন্যাসে ইহা মাইকেলের মেঘনাদবধের স্পষ্ট অনুসরণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দ, কাব্যারম্ভ, বাণী বন্দনা এমনকি

পরিস্থিতি (Situation) সৃষ্টিতে কবি মাইকেলকে অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন। এই অনুকরণ যে সার্থক হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

সাবিত্রী চরিত কাব্য (১৮৬৮) ॥ মহাভারতের সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান লইয়া ভোলানাথ চক্রবর্তী 'সাবিত্রী চরিত কাব্য' রচনা করিয়াছেন। সাতটি সর্গে বিন্যস্ত কাব্যটি মহাকাব্য লক্ষণাত্মক রচনা। ইহার সাতটি সর্গ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—বনভ্রমণ, পূর্বানুরাগ, দূতপ্রেরণ, সাবিত্রীব্রত, সত্যবানের মৃত্যু ও সতীত্বের পুরস্কার। কাব্যটি আদ্যন্ত পয়ার ছন্দে লিখিত।

স্পষ্টতঃ সাবিত্রী চরিত্রের পাতিব্রত্যের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করাই কবির লক্ষ্য। সেই জন্য কবি কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে সাবিত্রীর দিকেই লক্ষ্য দিয়েছেন বেশী। পিতা অশ্বপতি 'আপনি অন্বেষোপতি' বলিয়া অনুমতি দান করিলে সখী প্রভাবতী সমভিব্যাহারে সাবিত্রী বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিতে সুরু করেন। বনপ্রদেশে নবীন তাপস সত্যবানের সন্দর্শন ও তাঁহার সহিত সাবিত্রীর বিবাহ কবি যথোচিত বর্ণনা করিয়াছেন। বৎসরান্তের সাবিত্রীর বৈধব্যের চিত্রটি কবি করুণরসাত্মক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর যমের সহিত সাবিত্রীর বিজ্ঞজনোচিত আলাপ আলাপন, নিজ প্রতিজ্ঞায় স্থিতপ্রজ্ঞ থাকা এবং পরিশেষে মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করার মধ্যে সাবিত্রীর সতীধর্মের জয় ঘোষিত হইয়াছে। কবি নাটকীয় কৌশলে সত্যবানের স্বপ্নদর্শনের মধ্যে সাবিত্রীর অঘটনঘটনপটীয়সী সাধনার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। অতঃপর অন্ধত্ব তিরোহিত রাজা দ্যুমৎসেন স্বরাজ্যে গমন করিয়া সত্যবানকে রাজ পদে অভিষিক্ত করিলে সাবিত্রী সত্যবানের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। করুণরস কাব্যটির অঙ্গীরস বলিয়া সর্বত্রই ইহার প্রাধান্য ঘটিয়াছে। সাবিত্রী চরিত্রের দুইটি দিক জনমনের হৃদয়ে আবেদন জানায়—তাঁহার অকাল বৈধব্য এবং সতীধর্মের পরাকাষ্ঠায় স্বামীর পুনর্জীবন লাভ। মৃত্যুর অলংঘ্য বিধানকে কোনদিন মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না। সত্য ও ধর্মের অধিরাজ্যে, ধূসর পরিম্লান পৌরাণিক জগতে যদি কখনও মানুষের সাধনা সফল হয়, তবে তাহার আবেদন চিরকালের। সাবিত্রী চরিত্রের মাহাত্ম্য গাহিয়া কবি আমাদের সেই সংগোপন কামনাটিই ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইহার পৌরাণিক প্রতিবেশটি উল্লেখযোগ্য। তপোবনপ্রকৃতি, ঋষিকুলের পবিত্রজীবন ধারা, দেবর্ষি নারদের সংবাদ পরিবেশন, সর্বোপরি মৃত্যুরাজ যমের আলেখ্য দর্শনে একটি বাত্যাহত সংসার জীবনের ঊর্ধ্বস্থিত অলোকলোকের

সন্ধান পাওয়া যায়। যমের বর্ণনার মধ্যে কবি শংকা শ্রদ্ধার একটি মিশ্র অনুভূতির উদ্রেক করিয়াছেন।

> "বিকট শরীর জ্যোতিঃ ধূমল বরণ,
> রক্তবাস পরিধান, লোহিত লোচন,
> বঙ্গশির, দীর্ঘ দন্ত, মুখে অট্টহাস,
> অপসব্যে ঘোর দণ্ড, বাম করে পাশ।"[৩০]

অন্ধরাজা দ্যুমৎসেনের অকস্মাৎ দৃষ্টিশক্তিলাভ ও স্বরাজ্য প্রাপ্তি কাব্যের অলৌকিক পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে।

নিবাতকবচবধ (১৮৬৭)॥ মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত নিবাতকবচ যুদ্ধ পর্বাধ্যায় অবলম্বন করিয়া মহেশচন্দ্র শর্মা এই কাব্যটি রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে কবি বলিয়াছেন "সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণানুসারে আমি এই কাব্যখানি প্রণয়ন করিলাম, যদিও ইহার ভাষা সংস্কৃত নহে বটে, তথাপি এই লক্ষণের লক্ষ্য অন্যান্য পদার্থ প্রায়ই ইহাতে লক্ষিত হইতে পারে। মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত নিবাতকবচবধ পর্ব ইহার মূল, কিন্তু উক্ত পর্বে বর্ণিত উর্বশীর শাপাংশ ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ উহা এই কাব্যের অঙ্গী বীররসের বিরোধী।"[৩১] কবি ইহাকে মহাকাব্যের রূপ দিতে চাহিয়াছেন। সেই জন্য মহাকাব্যের আলংকারিক রীতি অনুসারে সর্গ পরিকল্পন, সর্গের নামকরণ, সর্গ শেষে নূতন ছন্দ প্রয়োগ ইত্যাদি আঙ্গিক পরিকল্পনা ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। তবে ইহার ভাব পরিকল্পনায় মহাকাব্যের বিশালতা নাই। মহাভারতে অর্জুনের বিজয়াভিযানের অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি নিবাত কবচ দৈত্যকুল বিনাশ ও প্রত্যাগমনপথে হিরণ্যপুর বিজয়ের কাহিনী ইহার বিষয়বস্তু। ইহা একান্তই স্থানকালের সীমায় আবদ্ধ, মহাকাব্যের পরিধি বিশালতা এখানে অনুপস্থিত। ইহার মধ্যে কবি কোন সার্বজনীন জিজ্ঞাসারও অবতারণা করিতে পারেন নাই।

কাব্যটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে: পাণ্ডবদের নির্বাসনকালে মন্দর গিরিতটে অর্জুনের নিকট ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের আগমন হইলে অর্জুন তাঁহার স্বর্গলোক গমন বিষয়ে জ্ঞাত হন। অতঃপর লোকপালগণ তাঁহাকে নানাবিধ দিব্যাস্ত্র দান করিলেন। ইন্দ্র সারথি মাতলির দিব্যরথে অর্জুন সুরলোকে উপস্থিত হন। সুরপুরের অতুল ঐশ্বর্য দেখিয়া অর্জুন অভিভূত হইলেন। বিশ্বাবসু পুত্র চিত্রসেনকে সখারূপে পাইয়া অর্জুন নানাবিধ রম্যস্থান পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ইন্দ্র, পুত্র অর্জুনকে নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা দান করিতে সুরু করেন।

শিক্ষা শেষে তিনি অর্জুনকে গুরুদক্ষিণারূপে নিবাত কবচকুল বিনাশ করিতে বলিলেন। অর্জুন জানাইলেন 'প্রাণান্তে যদি হয়, এ ভৃত্য কাতর নয়।' ইন্দ্র জানাইলেন সমুদ্র গর্ভে সেই দানবপুরী। নিবাত কবচগণ ব্রহ্মার বরে দৃপ্ততেজ হইয়া দেবতাদের অবজ্ঞা করিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মার বরে ইন্দ্রের বংশজাত পুরুষ অর্থাৎ কেবলমাত্র অর্জুনই তাহাদের বিনাশ করিতে পারিবে। অতঃপর অর্জুনের সহিত নিবাতকবচগণের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দৈত্যগণ নানাপ্রকার মায়া সৃষ্টির দ্বারা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করিল। অর্জুন নিপুণ বৈদ্যের ন্যায় দৈত্যদের সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাদের বিনাশ করিলেন। অতঃপর প্রত্যাগমন পথে অর্জুন ব্যোমদেশে হিরণ্যপুর আক্রমণ করিয়া সেখানকার দৈত্যদেরও সবংশে নিধন করিলেন। দৈত্যনারীদের বিলাপে ও দৈত্য মাতা পুলোমা ও কালকার আর্তক্রন্দনে অর্জুন বিচলিত হইলেন। তখন মাতলির সান্ত্বনায় তিনি স্থির হন। ইন্দ্র সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিলে নানাবিধ উৎসব আয়োজনের দ্বারা তিনি সংবর্ধিত হইলেন। অতঃপর সুরপুরের উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিয়া ইন্দ্রের আশীর্বাদ লইয়া অর্জুন পুনরায় মন্দর গিরিতটে ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইলেন।

কাব্যটির অঙ্গীরস বীর রস। কাহিনীর প্রথম হইতেই যুদ্ধ বিগ্রহের আয়োজনের দ্বারা এই বীররসের সঞ্চার হইয়াছে। সেইজন্য কবি ইহার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর অবতারণা করেন নাই। লোকপালদের দিব্য অস্ত্রদান, অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা, দৈত্যদের অস্ত্রসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে কাব্যের বীররসকে টানিয়া রাখা হইয়াছে। অসি, চর্ম, ভূষণ্ডী, তোমর, পরিঘ, নালীক প্রভৃতি দৈত্যকুলের অস্ত্র অর্জুনের দিব্যাস্ত্রগুলির সমকক্ষতার দাবী রাখে।

মহাভারতের কেন্দ্রভূমি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বাহিরে অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছে। বীর নায়ক অর্জুন বহুবার আপন বীর্যের প্রকাশ করিয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অমিত পরাক্রমের পূর্বাভাস দিয়াছেন। নিবাতকবচ দৈত্যকুলের বিনাশে অর্জুন চরিত্রের সেই বীর্যবত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য বা বিশালতা না থাকিলেও ইহা মহাভারতের বীর চরিত্রকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে।

নিবাত কবচবধে প্রাচীন রীতিই শুধু অনুসৃত হয় নাই, ইহাতে দুরূহ সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগও হইয়াছে। বৃন্দারক, নিকার, মরুত্বান, গীর্বান, বৈদুর্য্য, উর্জস্বি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া কাব্যটির প্রাচীন রীতি পরিগ্রহণে সাহায্য

করিয়াছে। তবে তদ্ভব শব্দের সহিত ইহাদের যদৃচ্ছ প্রয়োগে সর্বদা প্রাঞ্জলতা রক্ষিত হয় নাই।

দ্বারিকাবিলাস কাব্য (১৮৫৫)॥ কাব্যটি ভাগবত পুরাণ ভিত্তিক রচনা। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলাকে কেন্দ্র করিয়া জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা রচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণটি সূচনা মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে—

আপনি জন্মিব আমি এ মহিমণ্ডলে।
হরিব ক্ষিতির ভার ভেব না সকলে॥[৩২]

মথুরায় কংসকে বিনাশ করিবার পর দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণজীবনের যে বিচিত্র লীলা ঘটিয়াছে, কাব্য মধ্যে তাহাই সংকলিত হইয়াছে। বিশ্বকর্মার দ্বারা দ্বারকা-পুরী নির্মাণ, রুক্মিণী হরণ, স্যামন্তক মণির জন্য মণিচোরা অপবাদ ও তাহার খণ্ডন প্রচেষ্টা, পাতাল পুরীতে জাম্বুবতীকে বিবাহ, সত্রাজিত কন্যা সত্যভামার পাণিগ্রহণ ও নরক রাজার বন্দিনী ষোড়শ সহস্র কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার ঘটনাগুলি ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণবংশধরদের কাহিনী বিশেষভাবে মদন ও রতির বিচ্ছেদ ও মিলন, অনিরুদ্ধ ও উষার প্রণয় ও পরিণয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যদুবংশ ধ্বংস এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ দেখাইয়া গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ হইতেই প্রধানতঃ দ্বারকাবিলাস কাব্যের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। মহাভারতী পটভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের যে ব্যাপক ভূমিকা রহিয়াছে, শুধু দ্বারকা লীলার মধ্যে তাহা প্রকাশিত হইবার নহে। তবুও শ্রীকৃষ্ণের রাজসিক শক্তি ভাগবতেই সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে এবং আলোচ্য দ্বারকালীলায় সেই অলৌকিক কৃষ্ণমহিমাই বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 'মহতী বিনষ্টির' যিনি হোতা তিনিই যদুবংশ ধ্বংসেরও কারণ। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই ধর্ম পীড়িত। ভূভার হরণই যখন শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলার কারণ, তখন উচ্ছৃংখল যদুবংশের বিনষ্টি পরিকল্পনাও তাঁহার—

'অত্যন্ত দুরন্ত হইল পুত্র পৌত্রগণ।
আরম্ভিল বিবিধ অধর্ম আচরণ॥
আমার তেজেতে সবে ধরে মহাবল।
চকিতে জিনিতে পারে স্বর্গ মহীতল॥
পৃথ্বীভার নিবারণে হয়ে অবতার।
নিজ পরিবারে পূর্ণ হইল সংসার॥

তাহাতে সকল শিশু হইল দুর্জ্জয়।
ব্রহ্ম কোপানল বিনা না হবে সংক্ষয়॥"৩৩

ইহার ফলে মৌষল পর্বের অবতারণা এবং যদু বংশের বিনষ্টি। কৃষ্ণলীলার বিস্তৃত প্রতিফলনে দ্বারকাবিলাস কাব্য পৌরাণিক রচনা হিসাবে সার্থক হইয়াছে বলা যায়। গ্রন্থটি প্রধানতঃ পয়ার ছন্দে রচিত হইলেও স্থানে স্থানে গদ্যরচনারও নিদর্শন আছে।

কংসবিনাশ কাব্য (১৮৬১)॥ দীননাথ ধর ভাগবতের কৃষ্ণ-কংস কাহিনী অবলম্বন করিয়া আলোচ্য কাব্যটি রচনা করিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে কংসের বিনাশ পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হয় নাই। চারিটি সর্গে কৃষ্ণের জন্ম হইতে শকটাসুরের গোকুলে গমন এবং তাহার অত্যাচার নিরসনে শিবদূতের ধরাগমন পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। কংসের সহিত কৃষ্ণ বলরামের যে মূল দ্বন্দ্ব তাহা কাব্যে দেখান হয় নাই। প্রথম সর্গে যাদব জন্ম উদ্যোগের মধ্যে কংস বিনাশী দুই ঐশ্বরিক শক্তির মর্ত্যরূপ পরিগ্রহণের আয়োজন দেখা যায়। বিষ্ণু এবং মহামায়া যথাক্রমে দেবকী এবং যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গে কংসের কারাগারে যাদব জন্ম হইয়াছে। উদ্বেগসংকুল বসুদেব নবজাতককে লইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। হৈমবতী বায়ুর সাহায্যে বসুদেবকে পুত্র লইয়া পলাইয়া যাইতে বলিলেন। ভিশিঙ্গীর সাহায্যে বসুদেব যমুনা অতিক্রম করিয়া নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং নন্দ সুতার সহিত আপন সন্তান পরিবর্তন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেবকী এইরূপ সন্তান বিনিময়ের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলে বসুদেব তাহা সত্য বলিয়া জানাইলেন। তৃতীয় সর্গে পূতনার মোহিনী বেশ ধারণ। কারাগারে শিশু কন্যাকে দেখিয়া কংস দৈববাণী ব্যর্থ হইয়াছে মনে করিল। হত্যার সময়ে শিশুকন্যা অষ্ট ভূজা মূর্তিতে উর্ধ্বদেশে উঠিয়া ঘোষণা করিল—

'আমারে কে নষ্ট করে ওরে দুষ্ট মতি।
অচিরে ভূঞ্জিবি মূঢ়, দুষ্কর্ম দুর্গতি॥
আজি হইতে জন্মিয়াছে অরাতি তোমার
ইচ্ছা করি যার করে হইবি সংহার॥"৩৪

অতঃপর কংসের নারকীয় শিশু হত্যা আরম্ভ হইল। কংসের নির্দেশে পূতনা প্রচ্ছন্ন ভাবে মথুরায় ধ্বংস লীলা আরম্ভ করিল। মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া মথুরার পর গোকুলে তাহার শিশু সংহার চলিতে লাগিল। চতুর্থ এবং শেষ সর্গে পূতনার বিনাশ ঘোষিত হইয়াছে। তবে কৃষ্ণ কর্তৃক পূতনার পতন

হইয়াছে এ কথাটি কবি অনুক্ত রাখিয়াছেন। কংস ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যকুলের সকলকে তাহার বৃন্দাবনে নবজাত শত্রুর সংহারের কথা জানাইল। তাহার আদেশে শকটাসুর বৃন্দাবনে অত্যাচার আরম্ভ করিলে শিবানী শিবের দূতকে মর্ত্যধামে পাঠাইয়া দিলেন। কংস সেই অজ্ঞাত আবির্ভাবে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

ভাগবতে কংসারি কৃষ্ণের যে ভূমিকা আছে, আলোচ্য কাব্যে তাহা নাই। ইহা কংস বধের সূচনা মাত্র। কৃষ্ণ এখানে নিষ্ক্রিয়। তাঁহার বাল্য বিক্রমের কথা পূতনা নিধনে আভাসিত হইয়াছে মাত্র। কেন্দ্রীয় ঘটনা কংস নিধন বহু দূরবর্তী বলিয়া কাব্য মধ্যে কৃষ্ণের লোকোত্তর মহিমা প্রকাশিত হইবার অবকাশ রচিত হয় নাই। চরিত্র চিত্রণে কংসের নারকীয়তা এবং বসুদেবের কাতরতা বৈপরীত্য গুণে সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। নবজাতক রক্ষায় বসুদেবের সন্ত্রস্ত যাত্রাটি কবি মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন—

"নৃশংস কংসের ত্রাস ভাবি মনে মন।
তবু বসুদেব পাছে চায় ঘন ঘন॥
হায়রে কুরঙ্গ যথা কিরাতেরি ভয়ে।
পৃষ্ঠ দেশে দেখে যবে দৌড়ে শিশু লয়ে॥"[৩৫]

ভাগবতের ঐশ্বর্য না থাকিলেও চরিত্র পরিস্ফুটনে এবং পরিবেশ রচনায় কাব্যটি একেবারে অকিঞ্চিৎকর নহে।

পৌরাণিক উপাদান লইয়া এই যুগে আরো অনেকগুলি কাব্য রচিত হইয়াছে। রামায়ণ কাহিনী হইতে দ্বারিকানাথ রায়ের 'সীতাহরণ কাব্য' (১৮৫৭), রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'সীতার বনবাস' (১৮৬৮), যাদবানন্দ রায়ের 'সীতা নির্বাসন' (১৮৭০), উপেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরীর 'রাম বনবাস কাব্য' (১৮৭২), মহাভারতী কাহিনী হইতে ভুবন মোহন ঘোষের 'গান্ধারী বিলাপ' (১৮৭০), অঘোর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিমন্যু বধ' (১৮৬৮), হরিচরণ চক্রবর্তীর 'ভদ্রোবাহ কাব্য' (১৮৭১), নরনারায়ণ রায়ের 'শ্রীবৎস চরিত' (১৮৭০), কিশোরী লাল রায়ের 'নলদময়ন্তী কাব্য' (১৮৭২) এবং পুরাণ-কাহিনী হইতে বিহারী লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহিষাসুর বধ সম্পর্কীয় 'শক্তি সম্ভব কাব্য' (১৮৭০) প্রভৃতি কাব্য এই পর্বে রচিত হইয়াছে। মহাকাব্য পুরাণের কাহিনীগত আকর্ষণ, ইহাদের অন্তর্নিহিত বীররস এবং জাতীয় মানসের স্বাভাবিক ধর্মচেতনাকে কেন্দ্র করিয়াই এই ভূরি প্রমাণ বাংলা কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

বাংলা কাব্যের এই সময় ঋতুবদল হইতেছিল। নবযুগের চেতনা জীবনের সকল ক্ষেত্রের মত সাহিত্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। এই নবযুগ প্রেরণায় ইতিহাস পুরাণ ও অতীত কথা কাব্যের উপাদানরূপে পরিগৃহীত হইলে তাহাদের উপর কবিমনের নূতন প্রত্যয়বোধের আরোপণ হইয়াছে। এই প্রত্যয় ও বোধের অধিকারী যাঁহারা ছিলেন না, তাঁহারা কাহিনী উপাখ্যানের সীমিত কক্ষেই আবদ্ধ ছিলেন। পুরাণ তাঁহাদের কাছে পুরাতন রহিয়া গিয়াছে, নূতন অর্থ বহন করে নাই। সেইজন্য মাইকেলের পুরাণ দৃষ্টি একরূপ এবং অন্য কবিদের পুরাণ দৃষ্টি অন্যরূপ। পুরাতন পন্থীগণ চলমান জীবন চেতনার একান্তে থাকিয়া তাঁহাদের চিরস্থায়ী সম্পদের সাহায্যে কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহারা ভাবের ঘরে বিশেষ কোন মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই। রূপের দিকে ইহাদের অনেকেই মাইকেলের অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন, তবে অধিকাংশই ব্যর্থ হইয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতি কাব্যের কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়। এই যুগে মহাকাব্য ও আখ্যান কাব্যের ধারায় আধুনিক গীতিকবিতার সূত্রপাত হইতেছিল। জাতীয় জীবনের উচ্চতর চিন্তা, দেশপ্রেম ও ঐতিহ্য সংস্কৃতির বিবিধ উপাদানে কাহিনীমূলক কাব্যগুলি রচিত হইয়াছে। অপর পক্ষে ব্যক্তি চিত্তের অনুভূতি কামনা, স্নেহ প্রেম ভালবাসার বুভুক্ষা-বেদনা, প্রকৃতির অন্তরে শান্তি ও সৌন্দর্য অন্বেষণ, অধ্যাত্মবোধ ও উপলব্ধির নিগূঢ় প্রশান্তি গীতিকাব্যের ধারাকে পুষ্ট করিতেছিল। বাঙ্গালীর গৃহ ধর্ম ও মনোধর্মের কথা স্বভাবরূপ লইয়া ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে হৃদয় সম্পর্কের প্রশ্নটি সর্বাপেক্ষা বড়। ব্যক্তি হৃদয় মানব হৃদয়ের প্রকৃতি লোকে বা অধ্যাত্ম জগতে কিরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহে, এই কাব্য তাহার নিভৃত স্বগতোক্তি। মানব হৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতির আবেদন লইয়া এই যুগের কয়েকজন কবি কিছু কিছু গীতি কবিতা রচনা করিয়াছেন। বস্তুগত উপাদানকে প্রাধান্য দেন নাই বলিয়া ইহারা পুরাতন কাব্য পুরাণের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন নাই, তবে দেশমাটির সংস্কারে পুষ্ট কাব্য চেতনা বহু ক্ষেত্রে ইহাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'ঈশ্বর প্রেম' বা 'ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য' কবিতায় ঈশ্বরের প্রতি জীবের অচ্ছেদ্য হৃদয় সম্পর্কের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। তথাপি এ শ্রেণীর কবিতা গীতি কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয় নাই; হৃদয় নিঃসৃত গভীর আকূতি এইরূপ কবিতায় প্রকাশ পায় নাই।

গীতি কাব্যের ক্ষেত্রে যাঁহারা সার্থক হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বর চেতনা ও হৃদয় চেতনা এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।[৩৬] কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবি। ইঁহারা নির্বিশেষে অধ্যাত্ম আকুতিকে কাব্যরূপ দিয়াছেন, কোনরূপ তত্ত্ব বা কাব্য পুরাণের সংস্কারকে সচেতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই।

—পাদটীকা—

১। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য। ১ম সং।—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন পৃঃ ৪৮
২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সং। ২য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ১০৩
৩। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র—মধুস্মৃতি। ২য় সং।—নগেন্দ্রনাথ সোম পৃঃ ৬০৩
৪। ঐ পৃঃ ৬০৫
৫। ঐ পৃঃ ৬০০
৬। বাল্মীকি রামায়ণ—যুদ্ধ কাণ্ড, ত্রিনবতিতম সর্গ
৭। মেঘনাদবধ কাব্য—ড সুবোধ সেনগুপ্ত ও কালীপদ সেন পৃঃ ১৮৯
৮। মধুসূদন। ২য় সং। শশাঙ্ক মোহন সেন পৃঃ ৮২
৯। রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা—ডঃ মাখন লাল রায়চৌধুরী পৃঃ ১৪৯
১০। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃঃ ৪১৫
১১। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র—মধুস্মৃতি, নগেন্দ্র নাথ সোম পৃঃ ৬১৯
১২। ঐ পৃঃ ৬০৩
১৩। মধুসূদন। ২য় সং। শশাঙ্ক মোহন সেন পৃঃ ১১০-১১
১৪। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র—মধুস্মৃতি পৃঃ ৬০৫
১৫। মধুসূদন—শশাঙ্ক মোহন সেন পৃঃ ১০৫
১৬। "অনির্বচনীয় এবং 'অচিন্ত্যহেতুক' 'দেবতার ইচ্ছা' বা 'দৈব' বলিতে যাহা বুঝায় মধুসূদন হোমার হইতে সেই অদৃষ্টবাদই লাভ করিয়াছিলেন এবং মেঘনাদবধের রস নিষ্পত্তি বিষয়ে তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন"—মধুসূদন—শশাঙ্ক মোহন সেন পৃঃ ১০৪
১৭। ঐ পৃঃ ১০১
১৮। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র—মধুস্মৃতি পৃঃ ৬১১
১৯। রেনেসাঁসের সাধনা, সাহিত্য চিন্তা—শিবনারায়ণ রায় পৃঃ ৩৬
২০। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র—মধুস্মৃতি পৃঃ ৬১২

২১। ঢাকবাসীদের অভ্যর্থনার উত্তর—মধুস্মৃতি পৃঃ ৩৯৭
২২। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র—ঐ পৃঃ ৩০৫
২৩। ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—ষোড়শ অধ্যায়, শ্লোক ১৩।১৪
২৪। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র—মধুস্মৃতি পৃঃ ৩০১
২৫। মধুসূদন—শশাঙ্ক মোহন সেন পৃঃ ১১৪-২৫
২৬। লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা—বীরাঙ্গনা কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
২৭। সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ—জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য পৃঃ ১১২
২৮। মধুস্মৃতি— পৃঃ ২৫৬
২৯। রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান—দ্বারিকা নাথ চন্দ্র পৃঃ ৪৮-৪৬
৩০। সাবিত্রী চরিত কাব্য—ভোলানাথ চক্রবর্তী পৃঃ ১২৭
৩১। বিজ্ঞাপন—নিবাত কবচবধ—মহেশচন্দ্র শর্মা
৩২। দ্বারকাবিলাস কাব্য—জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১
৩৩। ঐ পৃঃ ৯১
৩৪। কংস বিনাশ কাব্য—দীননাথ ধর পৃঃ ৫৮
৩৫। ঐ পৃঃ ৪৮
৩৬। উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়—ভূমিকা ১।৵০

পঞ্চম অধ্যায়

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও প্রাথমিক বিকাশ যে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ভাবাদর্শের ফল এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা নাটক রচনার তাগিদ আসিয়াছে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হইতে। ইহার পূর্বে এদেশে নাটকের বিকল্পে কবিগান, পাঁচালী, যাত্রাগান ইত্যাদির প্রচলন ছিল। এগুলি একশ্রেণীর জনসাহিত্য। কারণ ইহাদের অধিকাংশ উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে পুরাণাদি সাধারণ ভাণ্ডার হইতে এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে জনসাধারণ ইহাদের রসাস্বাদন করিয়াছে।[১] লোকরঞ্জন এবং লোক-শিক্ষা এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যে এইগুলি সমাজ ক্ষেত্রে পরিবেশিত হইত। সাধারণ লোকে যাহাতে ইহাদের মর্মে প্রবেশ করিতে পারে সেইজন্য প্রচলিত পৌরাণিক প্রসঙ্গ ইহাদের প্রধান আশ্রয় ছিল। পরবর্তীকালে দেশের শিক্ষিত মানুষের রুচি পরিবর্তনে এই লোকরঞ্জক সাহিত্যের পরিবর্তে শিল্পগুণমণ্ডিত নাট্যকলার অনুশীলন সুরু হইলে ইহাদের অন্তর্নিহিত ধর্মীয় সুর নাট্য সাহিত্যেও অনুস্যূত হইয়া আসিয়াছে। সেইজন্য নাট্য সাহিত্যে পৌরাণিক চেতনা আলোচনার প্রাক্ সূত্রে কবিগান পাঁচালী যাত্রাগান ইত্যাদির মধ্যে পৌরাণিক ভাবধারার অভিক্ষেপ অন্বেষণ করা সমীচীন।

কবিগান ।। কবিগানের কাল পরিধি প্রায় শতবর্ষ (১৭৬০—১৮৬০)। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত কবিগানের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। বিখ্যাত কবিওয়ালা হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই লোকান্তরিত হন। কবিগানের ধারা পরবর্তীকালে কিছুটা চলিলেও নূতন ভাব সংঘাতে তাহা ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া আসে।

ধর্ম নিরপেক্ষ লৌকিক প্রেমের পরিচয় কবিগানের মধ্যে থাকিলেও ধর্ম সাপেক্ষ চিন্তাধারার পরিচয় ইহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট। ধর্মীয় চেতনার দিক হইতে কবিওয়ালাগণ প্রধানতঃ শক্তি ও বৈষ্ণব কবিতার জের টানিয়াছেন। বৈষ্ণব কাব্যের গতি ইতিমধ্যেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। শাক্ত গীতি কবিতা রামপ্রসাদের প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত জাগিয়াছিল। কতকটা রাজনৈতিক

অনিশ্চয়তায় এবং কতকটা সামাজিক দুরবস্থায় শক্তি সাধনা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। সেইজন্ত বৈষ্ণব কাব্য প্রবাহে ভাটা পড়িলেও তখন শাক্তপদ সাহিত্যের প্রচলন ও প্রভাব অনেকটা অক্ষুণ্ণ ছিল। এ দেশের অনেক ভূস্বামী ও তাঁহাদের অনুচরবর্গ কোম্পানীর রাজস্বনীতির ফলে জমিদারী হারাইয়া ফেলিলে তাঁহারা দিশাহারা হইয়া শক্তিপাদপদ্মতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বহু শাক্ত-পদ রচনা করিয়াছেন। লোকসাধারণও ভয়ে এবং ভাবনায় বাঁচিবার জন্য মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে। লোকমনের এই স্তিমিত সংচেতনা কবিগানের অন্যতম আশ্রয় হইয়া উঠে। বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেম ও বাৎসল্যের বিবিধ অনুভূতি লইয়া কবিরা এক প্রকার বিকল্প বৈষ্ণব ও শাক্তভাবধারা প্রবর্তন করেন। যে নীতিবোধ ও সুস্থ জীবনদৃষ্টি ভারতচন্দ্রের যুগে অন্তর্হিত হইয়াছিল, এই কবিকুল যেন তাহারই কিছুটা রক্ষা করিতে চাহিয়াছে। "বিদ্যাসুন্দরের রতিবিলাস-কথনের উল্লাসময়তা অবলম্বন করিয়া প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা কাব্যের যে ধারা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবহমান ছিল, তাহার পাশাপাশি যদি কবিগানের কলস্বন না জাগিয়া উঠিত তাহা হইলে ইংরেজ প্রভাবান্বিত বাংলা সাহিত্যের বিকাশক্ষণ পর্যন্ত এই রতিবিলাস বা মদনমঞ্জরীর উল্লাসময়তা সহ্য না করিয়া উপায় ছিল না।"[২]

কবিগানের মধ্যে প্রধানতঃ বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর ধারা অনুসৃত হইলেও কবি সম্প্রদায় সাধারণ ভাবে পৌরাণিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। পুরাণে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি না থাকিলে প্রতিপক্ষের নিকট তাঁহাদের পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। আবার গাহনার সময় শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনে ইহারা রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ কাহিনীর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিতেন। বিশেষতঃ—রামায়ণের রাম মাহাত্ম্য, মহাভারতের কৃষ্ণ মাহাত্ম্য, বিষ্ণু পুরাণ বা ভাগবতের কৃষ্ণ মাহাত্ম্য লইয়া তাঁহারা কৃষ্ণলীলার পদগুলির আবেদন বৃদ্ধি করিতেন। এই শ্রেণীর পদ রচনায় নিতাই বৈরাগীর একপ্রকার সহজাত দক্ষতা ছিল। পদগুলি যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, ইহাদের আন্তরিকতাও তেমনি স্বচ্ছ। সীতার অপরিসীম দুঃখকে কবি রুক্মিণীর মুখ দিয়া নারায়ণকে নিবেদন করিতেছেন :

মহড়া

ওহে নারায়ণো, আমারে কখনো,
বলো না জানকী হোতে।
সে জনমের বহু দুখো আছে মনেতে ॥

দুর্জয় রাবণো, করিয়ে হরণো
রাখিলো অশোকো বনেতে।

চিতেন

কহিছে রুক্মিণী, ওহে চক্রপাণি
আসিছে পবন সুতে,
রামরূপে শ্যাম দেহ দরশনো,
আমি তো হবনা সীতে ॥

অনুরূপভাবে মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণ মহিমাকে কবি ব্যক্ত করিতেছেন ঃ

চিতেন

দ্রৌপদীরে যখন বিবস্ত্রা করে,
দুষ্টমতি দুঃশাসন।
বস্ত্রধারী হোয়ে, বস্ত্র দান দিয়ে
কোরে'ছিলে লজ্জা নিবারণ ॥

অন্তরা

হায়, শুনেছি তুমি পাণ্ডব সখা,
বনমালী কালিয়ে।
রহিলে বলীর দ্বারেতে দ্বারী—
প্রেমে বশো হইয়ে ॥

চিতেন

হিরণ্যকশিপু করিলে বধ
নৃসিংহরূপ মোহন
প্রহ্লাদ ভক্তেরো কারণে দিলে
স্ফটিকেরি স্তম্ভে দরশন ॥

পুরাণ কাহিনীর এই সহজ ও আন্তরিক পরিবেশনের জন্য কবিগান সেদিন এতখানি লোকপ্রিয় হইয়াছিল।

পাঁচালী ॥ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহুল প্রচলিত পাঁচালী ও যাত্রাগানে পৌরাণিক উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। ডঃ সুকুমার সেন পাঁচালীর দুই প্রধান রীতির উল্লেখ করিয়াছেন—প্রাচীন পদ্ধতি ও নবীন পদ্ধতি। প্রাচীন পদ্ধতিতে গায়কের পায়ে নূপুর ও হাতে চামর মন্দিরা থাকিত এবং নবীন

পদ্ধতি কীর্তন গান হইতে উদ্ভূত। নবীন পাঁচালী একদিকে যেমন কীর্তনের ধারায় উদ্ভূত, তেমনি অন্যদিকে ইহা যাত্রারও পূর্বসূত্র।[৩] সাজসজ্জা, পাত্র-পাত্রী ও অঙ্গ-ভঙ্গির তারতম্যে পাঁচালী, কীর্তন বা যাত্রা হইতে পৃথক। তবে পাঁচালী ও যাত্রা দুই-এরই ব্যাপক প্রসার ছিল উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। ইংরাজী প্রভাবপুষ্ট আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের আবেদন শিথিল হইয়া যায়। তবে শতাব্দীর ৭ম-৮ম দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নাটকের পাশাপাশি যাত্রাগানের ধারাও চলিয়া আসিয়াছে।

পাঁচালীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি হইলেন দাশরথি রায়। প্রকৃত পক্ষে তিনিই নবরীতির পাঁচালীর প্রবর্তক এবং এক্ষেত্রে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বও তর্কাতীতভাবে স্বীকৃত। দাশরথির সাফল্যের কারণ তাঁহার পাঁচালীর অন্তর্নিহিত ভাব সম্পদ। "পাঁচালীতে প্রচার প্রাধান্য সুস্পষ্ট, তদানীন্তন রক্ষণশীল সমাজের চৌহদ্দির মধ্যে ভক্তিবারি সিঞ্চন করিয়া মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্মের বীজ বপন করা এবং সুনীতি সদাচার ঈশ্বরভক্তিরূপ সুগন্ধ সুবর্ণ কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত করাই ছিল পাঁচালীর মুখ্য কাজ। দাশরথির পাঁচালীতে এই লক্ষণ সুপ্রকট।"[৪] যুগের মুখ চাহিয়া প্রত্যাসন্ন কালের নবনির্দেশনাকে তিনি আহ্বান করিতে পারেন নাই, সেইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলনও তাঁহার বিদ্রূপের বিষয় হইয়াছিল। দেব দ্বিজে ভক্তি, অযুত যুগের পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাস, সনাতন বিধি ব্যবস্থার আনুগত্য এক কথায় যুগার্জিত রক্ষণশীলতার কুণ্ঠহীন স্বীকৃতি ও তাহার সোচ্চার ঘোষণা তাঁহাকে খ্যাতির শীর্ষচূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

দশখণ্ডে প্রকাশিত দাশরথির পাঁচালী পালায় পৌরাণিক উপাদানই মুখ্য। পৌরাণিক সংস্কৃতির সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার রত্নরাজিকে তিনি পালার আকারে গাঁথিয়া দিয়াছেন। রামায়ণী কথাতে দাশরথি রায় শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ হইতে লব কুশের যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনার বিবৃতি দিয়াছেন। পালাগানের আকারে রচিত বলিয়া এই কাহিনীগুলির এক প্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে, ধারাবাহিকতা রক্ষা না করিলেও ইহাদের রসাস্বাদনে কোনরূপ কষ্ট হয় না। রামায়ণের সহিত লোক মানসের পরিচয় অত্যন্ত স্বাভাবিক জানিয়া তিনি ঘটনা বিবৃতি অপেক্ষা রসানুভূতি সঞ্চারের দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন। এইজন্য শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন ও সীতাহরণ, তরণীসেন বধ, মায়া সীতা বধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, রাবণ বধ প্রভৃতি করুণ রসোদ্দীপক ঘটনাবলীকে তিনি বেদনাসিক্ত ও গভীর করিয়া দর্শক সমীপে নিবেদন করিয়াছেন। রামায়ণী কথায় দাশরথি কৃত্তিবাসকেই প্রধান ভাবে আশ্রয়

করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের মত তাঁহার রাবণও একজন প্রচ্ছন্ন ভক্ত—নিখিল চরাচরে পাপী-তাপী সকলেই যখন শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাধন্য, তখন রাবণকে উদ্ধার করিলে তাঁহার পতিতপাবন নাম অবশ্যই সার্থক হইবে। কৃত্তিবাস ও দাশরথির রাম কথার ফলশ্রুতি স্বতন্ত্র নহে।

কৃষ্ণায়ন পালাগুলিতে দাশরথি রায় মহাভারতী কথা অপেক্ষা বৈষ্ণবীয় রাধা-কৃষ্ণ লীলাকে অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। মথুরা-বৃন্দাবনের স্মৃতি ও কীর্তি বিজড়িত যে কৃষ্ণলীলা, যাহাতে ভক্তি ও সমর্পণের সহজ ইঙ্গিত আছে প্রধানতঃ তাহাকেই দাশরথি বিভিন্ন পালার আকারে গ্রন্থনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন, শ্রীরাধার মানভঞ্জন, মাথুর, নন্দবিদায় প্রভৃতি পালা এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতী অংশের পালা বেশী নাই। মহাভারতের সভাপর্ব হইতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং বনপর্ব হইতে দুর্বাসার পারণ—দুইটি তাঁহার মহাভারতী রচনা। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলা প্রসঙ্গে রুক্মিণী হরণ পালা গানটি রচিত। প্রহ্লাদ চরিত্র, বামন ভিক্ষা প্রভৃতি তাঁহার অপরাপর পৌরাণিক পালাগান। পৌরাণিক শিব উপাখ্যান হইতে দক্ষযজ্ঞ, শিব বিবাহ, কাশীখণ্ড প্রভৃতি এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে মহিষাসুর-এর যুদ্ধ, শুম্ভ নিশুম্ভ বধ প্রভৃতি পালাগানগুলিও তাঁহার বিখ্যাত রচনা। 'ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন' পালাগানে গঙ্গার মর্ত্যাবতরণ বিষয়টি গৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত রচনায় দাশরথি রায় যে সর্বত্র পৌরাণিক আনুগত্য মানিয়া চলিয়াছেন, এমন নহে। যুগ যুগান্তরে দেশ জীবনে পুরাণ কিংবদন্তীর যে পল্লবিত বিকাশ ঘটিয়াছে, লোকরঞ্জনের উপায়রূপে দাশরথি রায় সেইগুলিই ব্যবহার করিয়াছেন।

যাত্রা ॥ যাত্রায় পালাগানে পাঁচালীর প্রভাব সুস্পষ্ট। যাত্রা ও পাঁচালীর মধ্যে পার্থক্য হইল পাঁচালীতে একটিমাত্র গায়ন থাকে আর যাত্রায় গায়ন্ একাধিক।[৫] যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানতঃ ধর্ম সম্বন্ধীয়। দেশের বৃহত্তর জনজীবনে ধর্মভাবের প্রতি যে স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল, তাহাই যাত্রার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল। যাত্রার মূল অর্থ দেবলীলার অংশভাগী হইবার জন্য উৎসবে যোগদান বা যাত্রা করা। পরে দেবলীলায় গমন ব্যাপারটি একস্থানে বসিয়া দেবলীলার অভিনয় দেখায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং যাত্রার মধ্যে ধর্মভাব থাকা একান্ত অপরিহার্য। আবার এই ধর্মভাব ছিল প্রধানতঃ বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কিত এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। এই ভাবের প্রাধান্য হেতু কৃষ্ণলীলার অবতারণা করা

এক সময়ে যাত্রার একমাত্র বিষয়বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইত। কৃষ্ণলীলার মধ্যে আবার কালীয় দমন কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এইজন্য তৎকালে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সমস্ত পালাই 'কালীয় দমন' এই সাধারণ নামে অভিহিত হইত। তৎপরে আসিল রাম যাত্রা, চণ্ডী যাত্রা, ভাসান যাত্রা ইত্যাদি। রাম যাত্রায় আনন্দ অধিকারী এবং জয়চাঁদ অধিকারী, চণ্ডী যাত্রায় ফরাস ডাঙ্গায় গুরুপ্রসাদ বল্লভ এবং ভাসান যাত্রায় বর্ধমানের লাউসেন বড়াল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। লৌকিক উপাদান লইয়া শেষ দিকে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার উৎপত্তি লৌকিক প্রণয় কাহিনী হইতে রুচি বিচার ঘটিলে যাত্রার প্রকৃত অর্থ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণকমল গোস্বামী 'রাইউন্মাদিনী' ও অপরাপর রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক রচনাগুলির মধ্য দিয়া প্রাচীন যাত্রার আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে রঙ্গ মঞ্চের প্রভাব এবং জন মনের রুচিপরিবর্তন এমন স্পষ্ট হইয়া উঠে যে যাত্রার মধ্যে রূপান্তর অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়। যাত্রার সহিত থিয়েটারের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া 'সখের দলের অভিনয়' শতাব্দীর সপ্তম দশকে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। যাত্রা ও থিয়েটারের ঘনিষ্ট সংযোগ হেতু নাট্যাভিনয় ও গীতাভিনয় কাছাকাছি আসিয়া গেল এবং সাধারণ ভাবে গীতাভিনয়ের লোকপ্রিয়তা অনেক বাড়িয়া গেল। এই গীতাভিনয়ের জন্য পালা লিখিয়া অনেকেই যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন বিখ্যাত পালাকার ব্রজমোহন রায় ও মতি রায়। ব্রজমোহন রায়ের দুইটি প্রসিদ্ধ যাত্রা পালা হইল 'অভিমন্যু বধ' ও 'রামাভিষেক' (১৮৭৮)। ইহা ছাড়া তিনি 'সাবিত্রী সত্যবান', 'শতস্কন্ধ রাবণ বধ', 'দানব বিজয়' ও 'কংস বধ' নামে আরও কতকগুলি পৌরাণিক যাত্রা পালা লিখিয়াছিলেন।

মতি রায়ের খ্যাতি ব্রজমোহন অপেক্ষা বেশী। পুরাণ শাস্ত্রে পারঙ্গম এবং নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত মতি রায় গীতাভিনয়ের ক্ষেত্রে নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে দোগাছিয়া নিবাসী হরিনারায়ণ চৌধুরীর অনুরোধে তিনি প্রথমে রামায়ণী কথা অবলম্বনে 'তরণী সেন বধ' ও পরে 'রাম বনবাস' নামে দুইটি পালাগান রচনা করেন। হরিনারায়ণের সহিত একযোগে তিনি যাত্রার দল পরিচালনা করিয়াছিলেন।* তাঁহার রচনাগুলি বিশেষ উচ্চাঙ্গের না হইলেও তাঁহার সুকণ্ঠের পরিবেশন পালাগানগুলিকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। এমন কি তাঁহার 'নিমাই সন্ন্যাস' গীতাভিনয় দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস পর্যন্ত মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। মতিরায় রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিধ পুরাণ কাহিনী

হইতে বহু সংখ্যক পালাগান রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে সীতাহরণ, ভরতাগমন, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, পাণ্ডব নির্বাসন, ভীষ্মের শরশয্যা, কর্ণবধ, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক গয়াস্বরের হরিপাদ পদ্মলাভ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মতিরায় 'নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায়' স্থাপন করেন (১৮৮০)। সেখানকার অভিনয়ে নবদ্বীপের সারস্বতসমাজ তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধি ও স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছিলেন।

মতি রায়ের গীতাভিনয়ের ধারায় অহিভূষণ ভট্টাচার্যের পৌরাণিক পালা "সুরথ উদ্ধার"-এর নাম উল্লেখযোগ্য। দাশরথি রায়ের পাঁচালীর ধারা কৃষ্ণযাত্রায় বহন করিয়াছিলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

শতাব্দীর অষ্টম দশকে যাত্রাপালার রীতিতে অনেকগুলি পৌরাণিক নাটকের কথা ডঃ সুকুমার সেন উল্লেখ করিয়াছেন।[৭] এই যাত্রাপালাগুলির প্রধান বিষয় ছিল অভিমন্যু বধ কাহিনী, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ ও রাম বনবাস। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকড়ি বিশ্বাস প্রভৃতি নাট্যকারবৃন্দ প্রধানতঃ এই শ্রেণীর পৌরাণিক পালাগান রচনা করিয়া যাত্রাগানের শেষ ধারাটি টানিয়া রাখিয়াছিলেন। পালাগানের পরিবর্তে নাটকীয় আঙ্গিকে গীতাভিনয়ের সূত্রপাত করিয়াছেন মনোমোহন বসু। পৌরাণিক নাটকের ধারায় তাঁহার প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র আলোচিত হইবে।

বাংলা নাটকের প্রথম পর্ব ॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত হয়। এ যুগের অধিকাংশ নাটকই সংস্কৃত অথবা ইংরাজী নাটকের অনুবাদ। সংস্কৃত অনুবাদগুলি ছিল মূল নাটকসমূহের ছায়া মাত্র। তাহাতে বাঙ্গালী মনের নাট্যরস-পিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। সেইজন্য মৌলিক নাটক রচনার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারগণ সহজ উপাদানের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এইজন্য পৌরাণিক নাটক রচনার দিকে স্বভাবতঃই লক্ষ্য পড়িয়াছে। সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাইয়া এ যুগে যেমন সামাজিক নাটক ও প্রহসন সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি লোকমনের সাধারণ বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী লইয়া নাটক রচনার প্রয়াস দেখা দিয়াছে। বাংলা নাটক রচনার প্রথম পর্ব চলিয়াছে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর স্যান্যাল বাড়ীতে সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠা হইলে নাটক রচনার স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয়। আবার এই সময় হইতেই হিন্দু ধর্মের

নব জাগৃতি ঘটে। ইহার ফলে স্বাভাবিক ভাবে পৌরাণিক নাটক রচনার উদ্দীপনা দেখা যায়। বাঙ্গালী মনের চিরন্তন ধর্মভাব, যাহা পাঁচালী কথকতা প্রভাবিত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী নাটকগুলিকে জনপ্রিয় করিয়াছে। আমরা এই পর্বের পৌরাণিক নাটকগুলি একে একে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ভদ্রার্জুন ।। যোগেন্দ্রগুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' নাটকটিকে বাংলার প্রথম মৌলিক নাটক বলিয়া অভিহিত করা হয়। তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকটি ইহার ঈষৎ পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় (১৮৫২ খ্রীঃ)। তবে আঙ্গিক বিন্যাসে অপেক্ষাকৃত ত্রুটি শূন্য বলিয়া কীর্তিবিলাস অপেক্ষা ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অধিক। বাংলা নাটকের উন্মেষ পর্বে এই মৌলিক নাটকটি পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত। বাংলা নাটকগুলি যখন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদমাত্র ছিল, সেই সময়ে ইউরোপীয় আঙ্গিকে ভদ্রার্জুন নাটক রচনা করিয়া তারাচরণ সিকদার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তবে ইহার মধ্যে গদ্য পদ্য রচনাকে নাট্যকার পরিহার করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব না মনে করিয়া তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রভাব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।[৮] লেখক তদানীন্তন নাটকের প্রভাব যেমন অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন, তেমনি করিয়া তদানীন্তন কাব্য প্রভাবকে নস্যাৎ করিতে পারেন নাই। আঙ্গিক বিন্যাসে অভিনবত্ব ছাড়াও সংগীত বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সংগীত দ্বারা ব্যক্ত করিলে নাটকীয় গতি ব্যাহত হয় বলিয়া তারাচরণ সংলাপের প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সংলাপ মূলতঃ পয়ার ছন্দে বিবৃত হওয়ায় নাটকের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ভারতচন্দ্রের প্রভাব তখনও পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ভারতী রীতিতে অনেক ক্ষেত্রে অলংকৃত পয়ারের ব্যবহার আছে, কিন্তু নাটকীয় গতি তাহাতে ক্ষুণ্ন হইয়াছে। পয়ারের যাহা প্রধান অসুবিধা, চরণের শেষে যতিপাত, তাহাতে বক্তব্যকে টানিয়া যাইতে অসুবিধা হয়। সাধারণ কথাবার্তায় যে সমস্ত অসংলগ্ন আলাপ আলাপন থাকে, তাহা এই ছন্দ ভঙ্গীতে ব্যক্ত করা দুরূহ। তারাচরণ এই অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সেইজন্য বহুক্ষেত্রেই তাঁহার সংলাপ আড়ষ্ট হইয়াছে।

তবুও প্রকাশভঙ্গী রচনায় 'ভদ্রার্জুনে'র যে নূতনত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার মূল্য শুধু প্রথম ছাপা বাঙ্গালা নাটকদ্বয়ের অন্যতম বলিয়া[৯] একথা সর্বথা স্বীকার্য নহে। প্রথম সৃষ্টি বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ত

আছেই, তাহা ছাড়া তদানীন্তন কালের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার সাহিত্যমূল্যও একেবারে অকিঞ্চিৎকর নহে। চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা-বিন্যাস ও সংলাপ রচনায় ইহার নাটকীয় উৎকর্ষকে একেবারে অপলাপ করা যায় না।

নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদিপর্বস্থিত সুভদ্রাহরণ পর্বাধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। মূল মহাভারতী কাহিনী হইতে ইহা অনেকটা ভিন্ন। লেখক কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন বেশী। ব্যাস ভারতের সহিত যেটুকু সঙ্গতি তাহা হইল এই—ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণের সহিত নারদের সাক্ষাৎ, দ্রৌপদী সম্বন্ধে পাণ্ডবদের প্রতি নারদের উপদেশ, স্বীয় মত প্রতিষ্ঠায় নারদ কর্তৃক সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী বিবৃতি, পরিশেষে পাণ্ডবগণ কর্তৃক নারদের নির্দেশ গ্রহণ। অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষায় অর্জুনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও তজ্জন্য স্বেচ্ছায় দ্বাদশ বৎসরের নির্বাসন গ্রহণ। নির্বাসনকালে তীর্থ পর্যটনের সময় অর্জুন প্রভাসে উপস্থিত হন এবং তথায় কৃষ্ণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন সুভদ্রা হরণ করেন। বলরাম কৃষ্ণের উপর অভিযোগ আরোপ করিলেও কৃষ্ণের যুক্তিতে তিনি ও অন্যান্য যাদব অর্জুনের উপর বৈরীভাব ত্যাগ করেন।

ভদ্রার্জুন নাটকের ঘটনাংশে সুভদ্রা হরণের মূল কাহিনী প্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিন্তু কাশীরাম দাস তাঁহার বর্ণনায় যে বাহুল্য ও বৈচিত্র্য আনিয়াছেন, তারাচরণ প্রায় তাহার সবটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন। রৈবতক পর্বতে কৃষ্ণ ও অর্জুনের আগমন ঘটিলে লোকে তাঁহাদিগকে পৃথক করিতে পারে নাই। কাশীরাম দাসের বর্ণনায় ইহার উল্লেখ আছে। তারাচরণ পথিক ও মণ্ডপের কথোপকথনের মধ্যে এই প্রহেলিকা বিবৃত করিয়াছেন। প্রথম দর্শনে অর্জুনের প্রতি সুভদ্রার অনুরাগ কাশীরাম দাস অনুগ, তবে ভদ্রার্জুনে তাহার যেমন অসংকোচ অভিব্যক্তি আছে, কাশীরামে তাহা নাই। সেখানে অনেকটা ইঙ্গিতে ও পরোক্ষে সুভদ্রা সত্যভামার কাছে অন্তরের কথা ব্যক্ত করিয়াছে। কাশীরাম আরও কলাও করিয়া সুভদ্রাকে রতির নিকট লইয়া গিয়াছেন। এককালের কাব্যরীতিই এইরূপ ছিল। স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিলে তাহার বর্ধন ও সার্থকতার জন্য এইরূপ বাহিরের উপাদানের সাহায্য লওয়া হইত। তারাচরণ এইটুকু পরিহার করিয়াছেন। সত্যভামা নিজেই সুভদ্রার বাসনা চরিতার্থ করিবার ভার লইয়াছেন।

চতুর্থ অঙ্কে বরসজ্জা সম্পর্কে দুর্যোধনের প্রতি ভীমের কটাক্ষ ও অপ্রিয় ভাষণ কাশীরাম দাস হইতে গৃহীত। সেখানে ভীম দুর্যোধনকে বরবেশে যাইতে

নিষেধ করিয়াছেন। 'কোন কন্যা বিবাহেতে যাহ বরবেশে' ইহাই ছিল ভীমের প্রশ্ন। তারাচরণ ইহাকে প্রায় হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন। সুভদ্রা হরণ ঘটনাটি কাশীরাম অনুগ, মূলানুগ নহে। মূলে বিবৃত আছে পূজা শেষ করিয়া সুভদ্রা রৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণান্তর দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, অর্জুন তখন তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া রথে তুলিয়া লইলেন। সভাপালের নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইলে সভাপাল যাদবগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে নির্দেশ দিলেন। নাটকের মূল ঘটনা এইরূপ সরল রেখায় বিবৃত হইলে তাহার নাটকীয়ত্ব ফোটে না। সেই জন্য তারাচরণ ইহাতে কাশীরামের পথই গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্যোধনের সহিত আসন্ন বিবাহ ব্যবস্থা, কন্যার গাত্রহরিদ্রালেপন, বিবাহ প্রাক্কালে কন্যার স্ত্রী আচারাদি করার মধ্যে আচম্বিতে অর্জুনের আগমন ঘটিয়াছে। ইহা কৃষ্ণের সজ্ঞাত হইলেও সমগ্র ঘটনা প্রবাহের উপর আকস্মিকতা-যুক্ত, স্থান-কাল অনুসারে এই হরণের গুরুত্ব অনেক বর্ধিত হইয়াছে। নাট্যিক ক্রিয়া এইখানে চরমোৎকর্ষে পৌঁছিয়াছে।

ভদ্রার্জুন ঘটনাপ্রধান নাটক, চরিত্রপ্রধান নহে। সুভদ্রাহরণ হইবে, এই পূর্বসূত্রটি ধরিয়া নাটক অগ্রসর হইয়াছে। পৌরাণিক নাটকের উপস্থাপনা যেরূপ এখানে তাহাই হইয়াছে। এইজন্য চরিত্রগুলি বিশেষ সচল চঞ্চল হয় নাই। অর্জুন পরুষ কঠিন শক্তির জন্য মহাভারতী বীরপুঙ্গব নহে, বীরত্বের সঙ্গে শালীনতা ও শিষ্টাচারের যে মণিকাঞ্চন যোগ, তাহাই অর্জুন চরিত্রকে মহাভারতে মহৎকরিয়াছে। এখানেও অবশ্য অর্জুনের চারিত্রিক ঔদার্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও স্বেচ্ছানির্বাসনের মধ্যে কিছুটা ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু সত্যভামা সন্নিধানে নিশীথ রাত্রিতে সুভদ্রাকে দেখিয়া তিনি অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়িলেন। আবার পরক্ষণেই সুভদ্রাকে কৃষ্ণভগিনী জানিয়া কৃষ্ণভয়ে একেবারে সুভদ্রার প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করিলেন। এখানে অর্জুন চরিত্রের বীরত্ব ও মহত্ত্ব বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বস্তুতঃ ভদ্রার্জুন নামকরণ হইলেও নাটকটিতে অর্জুনের ভূমিকা গৌণ। বীরত্বের দ্বারাই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার কথা। কিন্তু সেই বীরত্বকে তিনি সবলে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছেন না। দারুকের কাছেও আত্মসমর্থনে কৃষ্ণ বলদেবের মতানৈক্যের কথা ব্যক্ত করিতে হইয়াছে এবং কৃষ্ণের ইঙ্গিতেই সুভদ্রাহরণ করিয়া দারুকের রথে পলায়ন করিতে হইবে, তাহাই জানাইয়াছেন। সুভদ্রাহরণের দুঃসাহস অপেক্ষা হরণোত্তর সংগ্রামেই অর্জুনের বীরত্ব মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভদ্রার্জুনের মধ্যে এই সংগ্রামের কোন আয়োজন নাই। দূতমুখে কৌরবগণ ইহা জানিতে

পারিয়াছেন এবং অন্যতম প্রধান চরিত্র বলদেবও দূতমুখে ইহা জ্ঞাত হইয়াছেন। নাট্যিক গতির মধ্যদিয়া ইহা ফুটিলে সার্থক হইত।

ভদ্রার চরিত্রও বহুলাংশে নিষ্প্রভ। মহাভারতী উপাখ্যানে প্রেমের যে ভূরি প্রমাণ নিদর্শন পাওয়া যায়, ভদ্রার মধ্যে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রেম বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে নাটকীয় সংঘাতটি ফুটিয়া উঠিত। ভদ্রার্জুনে এই প্রেমের সরলরৈখিক গতি আছে। সুভদ্রার প্রেম, সত্যভামার সমর্থন, কৃষ্ণের সম্মতি ও ব্যবস্থাপনা এবং অর্জুনের হস্তক্ষেপে সহজ পরিণতি পাইয়াছে, বিপরীত পক্ষকে প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করিতে হয় নাই। বলদেবের প্রতিকূলে প্রস্তাব, দুর্যোধনাদির সক্রিয় উদ্যোগ এবং কৌরব রথীদের সাড়ম্বর উপস্থিত ও নাটকীয় চরম মুহূর্তকে প্রাণবন্ত করিতে পারে নাই। একমাত্র পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে সুভদ্রার অন্তর্দ্বন্দ্বটি আংশিক অভিব্যক্ত হইয়াছে। অর্জুনের প্রতি আকর্ষণ এবং বলদেবের বিরোধিতায় সুভদ্রার উদ্বেগ আকুল চিত্তকে নাট্যকার পরিস্ফুট করিয়াছেন। নায়িকা হিসাবে সুভদ্রা প্রথম দর্শনে প্রেমের প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুর পরিচয় দিতে পারেন নাই। অর্জুন সমভিব্যহারে রথের সারথ্য যাহা ভদ্রার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা, তাহাও এখানে দূতমুখে বিবৃত হইয়াছে মাত্র।

ভদ্রার্জুন নাটকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্র সত্যভামা, কৃষ্ণ ও বলদেব। সুভদ্রা হরণে কৃষ্ণের যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে, নাট্যকার এখানে তাহা বিবৃত করিয়াছেন, সত্যভামার প্ররোচনায় তিনি অর্জুনকে সুভদ্রাহরণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণের মহানায়করূপ এখানে অপরিস্ফুট। তিনি যে কূটচক্রী সে পরিচয় তাঁহার স্বল্প ভূমিকায় ব্যক্ত হয় নাই। এ দিক দিয়া সত্যভামার চরিত্র কিছুটা প্রাণবন্ত। সত্যভামা অনেকটা প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। সুভদ্রার অনুরাগে তিনিই কৃষ্ণ সমীপে অর্জুন-সুভদ্রার মিলনের কথা বলিয়াছেন এবং এ বিষয়ে কৃষ্ণকে তৎপর হইতে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, কৃষ্ণের নির্দেশে তিনিই নিশীথ রাত্রিতে সুভদ্রাকে সংগে করিয়া অর্জুনের শয়নাগারে উপস্থিত হইয়াছেন। সত্যভামার মধ্যে যে কোনরূপ মানবিক অনুভূতি নাই[১০] এরূপ যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু সুভদ্রার দুঃখবেদনার প্রত্যক্ষ সাক্ষীরূপেই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই।

নাটকে প্রাণবন্ত চরিত্র যদি কেহ থাকে, তিনি হইলেন বলদেব। রোহিণী পুত্র বলদেব দুর্যোধনকে বরাবরই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন—ইহা মহাভারত-

সম্মত। সেই বলদেব যে অর্জুন অপেক্ষা দুর্যোধনকেই উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাতে সংশয় কি? বলদেবের বাসনা ও উদ্যোগ যখন কৃষ্ণ ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হইয়া গেল, সমগ্র যাদবকুল যখন কৃষ্ণকে সমর্থন করিল, মাতৃদ্বয় এবং পিতা বসুদেবও যখন কৃষ্ণের আচরণ সমর্থন করিলেন, তখন বলদেবের দুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না। পঞ্চম অংকের শেষ দৃশ্যে বলরামের অভিমানাহত সুরটী আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। পিতা-মাতা সমক্ষে বলদেব এইকথা বলিয়াছেন, "পিতা মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্যবাসই উত্তম কাজ, অতএব সকলে আমার আশা ত্যাগ কর।" তঁহার অভিমান ও হৃদয় বেদনা লিরিক-ভঙ্গীতে শেষ উক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে। মহাভারতে বলদেব সুভদ্রা হরণকে কেন্দ্র করিয়া যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখানে তাহা অনুপস্থিত। সুভদ্রা-অর্জুনের বিবাহ-পূর্বে এখানে বলদেবের যে দৃঢ়তা ও পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যায়, বিবাহের পরে তাহা বেদনা ও অভিমানে রূপান্তরিত হইয়াছে।

পৌরাণিক নাটক হিসাবে ভদ্রার্জুনকে গ্রহণ করা চলে ঠিকই, তবে নাটকীয়তার দিক দিয়া ইহা যে ত্রুটি বিমুক্ত এমত বলা যায় না। একটি মনোরম মহাভারতী উপাখ্যান নাটকের বিষয় বস্তু বলিয়া ইহাতে পৌরাণিক উপাদানগুলির অভাব নাই। দর্শকমন নাটকের ফলশ্রুতিতে তৃপ্তি পাইয়াছে, দুর্যোধনের লাঞ্ছনায় আনন্দ পাইয়াছে, বলদেবের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াছে আর নবদম্পতিকে হয়ত বা সম্বর্ধনাই করিয়াছে। বাংলা নাটকের আদি পর্বে পৌরাণিক উপাদান সম্বলিত এই নাটকটি একেবারে ব্যর্থ হয় নাই।

কৌরব বিয়োগ।। হরচন্দ্র ঘোষের কৌরব বিয়োগ (১৮৫৮) একটি পৌরাণিক নাটক। ইহার ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের অনবগতি নহে যে মহাভারত গ্রন্থ নীতিগর্ভ ও সম্পর্কশুদ্ধির আশ্রম, এবং সাংসারিক ও পারলৌকিক বিষয়ের ও উপদেশ নিকরের নিকেতন। একারণ আমি ঐ মহাগ্রন্থের কিয়দংশ এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপূর্ব বৃত্তান্ত সুমার্জিত সাধু ভাষায় করিয়া 'কৌরব বিয়োগ নাটক' এই আখ্যাদানে প্রকাশ করিলাম।" ভূমিকাতে নাট্যকার আরও ব্যক্ত করিয়াছেন যে ইংলণ্ডীয় এবং এতদ্দেশীয় বহুতর বিজ্ঞবরের অভিপ্রায় মতে তিনি কাশীরাম দাসের রচনার কিছু রদবদল করিয়া নাটকটি রচনা করিয়াছেন। মহাভারত সর্ববিধ নীতি শাস্ত্রের আকরস্থল। সমুন্নত বিষয়বস্তু এবং জাগ্রত

নীতিবোধ লইয়া নাটক রচনা করিলে সহজেই তাহা লোকপ্রিয় হইবে, এইরূপ ধারণা নাট্যকারের ছিল। সেইজন্য কৌরব বিয়োগে নাট্যিক লক্ষণ অপেক্ষা নৈতিক আদর্শই বড় হইয়াছে।

বিষয়বস্তু মহাভারতী উপাখ্যান। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের উত্তর পর্ব লইয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। নাট্যকার মহাভারতের শরণাপন্ন হন নাই, কাশীরাম দাস হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাও আবশ্যকমত গ্রহণ ও বর্জন করা হইয়াছে। কাশীরাম দাসের গদাপর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্রমিক পর্ব পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে যেমন আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ আছে, ইহাতে ঠিক তেমনটি নাই, মধ্যবর্তী বহু ঘটনা লুপ্ত করিয়া নাট্য প্রয়োজনে কয়েকটি প্রধান ঘটনা গ্রহণ করা হইয়াছে। অশ্বত্থামার পাণ্ডব বধার্থে প্রতিজ্ঞা, তাঁহাকে সেনাপতিত্বে অভিষেক, শিবির দ্বারে অশ্বত্থামার শিবদর্শন, স্তবের দ্বারা তাঁহার তুষ্টি, শিবিরে প্রবেশ করিয়া অশ্বত্থামা কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নাদির নিধন, হর্ষ-বিষাদে দুর্যোধনের মৃত্যু—সমস্তই কাশীরাম অনুগ। পুত্র নিধনে পাঞ্চালীর ক্রোধ, তাঁহার সন্তুষ্টি বিধানে ভীমের যুদ্ধ যাত্রা, ভীমের প্রতি অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশে অর্জুন কর্তৃক বাণ ক্ষেপণ, আসন্ন সৃষ্টি বিপর্যয়ে ব্যাসের আগমন ও উভয়কে বিরত হওয়ার জন্য অনুরোধ, অশ্বত্থামার অস্ত্রে উত্তরার অকাল প্রসব, পরিশেষে আপন শিরোমণি ত্যাগ—ঘটনাগুলি কাশীরাম হইতে গৃহীত। কাশীরাম অবশ্য আরও পল্লবিত বিস্তার করিয়াছেন। শিরোমণি ত্যাগে অশ্বত্থামার যে কষ্ট হইবে, তাহা কাশীরাম ভুলেন নাই। তিনি বিশ্বের যাবৎ মানুষকে তেল মাখিবার সময় তিন ফোঁটা তেল অগ্রে ফেলিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন। পুত্র-পরিজনদের নিধনে সমগ্র কৌরব এবং পাণ্ডবকুলের শোক কাশীরাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাভারতের এক দিকে দুঃখ শোক ও বেদনার করুণ কান্না, অন্যদিকে ত্যাগ, মুক্তি, মোক্ষ ইত্যাদি মহাব্রত। কাশীরাম বাঙ্গালীর দুঃখ বেদনাকে একান্ত করিয়া দেখিয়াছেন। সেইজন্য দুঃখ শোক ও খেদোক্তির বিবরণ তাঁহার মধ্যে একটু বেশী। আর্যভারতে এত কান্নার অবকাশ নাই। কিন্তু কাশীরাম সুযোগ পাইলেই একবার কাঁদাইয়া লইয়াছেন। চরিত্রের এই কোমলত্ব কাশীরামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাশীরামকে অনুসরণ করিয়া হরচন্দ্রও যুধিষ্ঠির হইতে আরম্ভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী ও অন্যান্য কুরুকুলবধূদের অশ্রু বিসর্জন করাইয়াছেন এবং তাঁহাদের সান্ত্বনা দিবার জন্য বিদুর, সঞ্জয়, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেব নিত্য যাতায়াত করিয়াছেন।

এইরূপে নাট্যকার কাশীরাম দাসকে বহুলাংশে নিখুঁত ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন।

কাশীরামকে নাট্যকার যেটুকু রদবদল করিয়াছেন, তাহা নাটকের প্রয়োজনে। অন্তর্বর্তী পর্ব অশ্বমেধ পর্বকে আদৌ গ্রহণ করা হয় নাই, কেন না তাহা পাণ্ডব বিজয়ের স্মারক চিহ্ন, কৌরব বিয়োগের শোকোৎসার নহে। নাট্যকার যে Hisitorcal tragedy out of the Mahabharat' লিখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহতী বিনষ্টির দিকেই লক্ষ্য দিয়াছেন। এই বিনাশের রূপ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি নিকরূণ মাধুর্য ও সমুন্নত মহিমা আছে। ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে ধর্মের অনুকূলে বা প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া বীর নায়কগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। মহাভারতে মৃত্যু যেমন অগণিত, তাহার মহিমাও সেইরূপ অনুপম। ভীষ্মের মৃত্যু সেইরূপ অতুলনীয় মহিমায় ভাস্বর। ভীষ্মের মহিমা মহাভারতের সংগে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বলিয়াই বোধ করি নাটকের প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহার উপদেশ ও ভাবণকে লেখক নাটকে স্থান দিয়াছেন। কাশীরামের শান্তি পর্বের কিছু অংশ লইয়া নাট্যকার ভীষ্ম মহিমা দেখাইয়াছেন, বাহুল্য বোধে অন্যগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভীষ্ম কর্তৃক মৃত্যু ও ব্যাধির জন্ম বৃত্তান্ত, প্রেতপুরী বর্ণনা, কর্মফল ও জন্মান্তর তত্ত্ব এবং দানধর্ম বিষয়ে তাঁহার উপদেশ নাটকে বিবৃত হইয়াছে। কাশীরাম ভীষ্মের দ্বারা আরও নানা তীর্থ মহাত্ম্য, ব্রতমাহাত্ম্য কীর্তন করাইয়াছেন। হরচন্দ্র সেগুলি অনাবশ্যক বিধায় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নাটক হিসাবে 'কৌরব বিয়োগ' যে অসার্থক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নাটকের প্রাণবস্তুটি যে Action তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহা যে শ্রেণীর নাটকই হউক। নাটকের প্রকৃতি অনুসারে Action-এর প্রকৃতি বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু নাটকের উপজীব্যটুকু ফুটাইয়া তুলিতে হইলে চরিত্র ও ঘটনার সচল ক্রিয়াশীলতা অত্যাবশ্যক। কিন্তু কৌরব বিয়োগে বিভিন্ন ঘটনার বিবৃত রহিয়াছে। যে ঘটনা ঘটিতেছে বা ঘটিয়াছে তাহা নাটকীয় চরিত্রগুলি বিবৃতির মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়াছে। সুতরাং দর্শক বা পাঠককেও সেই বিবৃতি শুনিয়া শান্ত হইতে হয়। ইহাতে দৃশ্যকাব্যোচিত উপস্থাপনা কিছু নাই। মহাভারতের অনুরূপ এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধনের পতনের পর বিবিধ সংবাদ পরিবেশন করিতেছেন। মহাভারতে বিদুর, সঞ্জয়, শ্রীকৃষ্ণ বা ব্যাসদেব গুরুতর অবস্থা পরিবেশে অনেক শান্তি নির্দেশ ও সান্ত্বনা বাক্য জানাইয়াছেন। এগুলি কাব্যোপযোগী। দীর্ঘ হইলেও তাহাতে মাধুর্য নষ্ট হয় নাই। কিন্তু নাটকের মধ্যে

যদি সেই দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার করা যায়, তাহাতে নাট্যরস ক্ষুন্ন হইয়া পড়ে। 'কৌরব বিয়োগে' এইরূপ দীর্ঘ সংলাপ বা বিবরণ অনেক আছে। কর্ণের শৌর্য-বীর্যে দুর্য্যোধনের আস্থার অভাব ছিল না, কিন্তু পরিশেষে কর্ণের পরাভবই ঘটে। ইহাতে দৈবেই বলবান দেখা যায়। দুর্য্যোধনের কথায় কৃপাচার্য প্রাসঙ্গিক গল্পটির বিস্তৃত বিবরণ দিলেন। অশ্বত্থামার বীরত্ব প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করিলেন। নিহত পুত্রদের জন্য ধৃতরাষ্ট্র শোকাতুর হইলে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে কৌরব বংশধরদের পূর্বনির্দিষ্ট ভাগ্য সম্পর্কে সুদীর্ঘ কাহিনী ব্যক্ত করিলেন। তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ অঙ্গেই বোধ করি দীর্ঘ সংলাপের বাহুল্য ঘটিয়াছে। গান্ধারীর বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের মধ্যে মহাভারতের কাহিনী ও মর্মবাণী ব্যক্ত হইযাছে, কোন বিশেষ নাটকোপযোগী সংলাপ ব্যবহৃত হয় নাই। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় অঙ্গে ভীষ্ম কর্তৃক উপদেশ দানের মধ্যে দানধর্মের মাহাত্ম্য জ্ঞাপক বিবৃতিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। দান ধর্মের মহিমা ও উতঙ্ক মুনির উপাখ্যান ব্যক্ত করিয়া নাট্যকার কাহিনীকে প্রধান করিয়াছেন, ঘটনা সংঘটনকে বড় করেন নাই। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলিযাছেন, 'কৌরব বিয়োগ' কাশীরাম দাস রচিত মহাভারতেরই অংশ বিশেষের একটি গদ্যরূপ মাত্র, নাটক নহে; ইহাতে ঘটনার বর্ণনাকারী আছে, কিন্তু সংঘটনকারী নাই।[১২]

তবে নাটকের দিক দিয়া চরিত্র পরিস্ফুটন যথার্থ না হইলেও চরিত্রগুলির পৌরাণিক মহিমা প্রায় অক্ষুন্ন রহিয়াছে। মহাভারতের মহানায়কবৃন্দ, এখানে প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। আপনাপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য লইয়া তাঁহারা সমগ্র মহাভারতে যে ভূমিকা রচনা করিয়াছেন, আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রায় সেগুলি রক্ষিত হইয়াছে। দুর্যোধন চরিত্রের ক্রূরতা নাটকের বিষয়বস্তু বহির্ভূত বলিয়া তাঁহার চরিত্র প্রায় অব্যক্ত। তবে স্বল্পকালের মধ্যে নাট্যকার তাঁহার জিগীষা ও পাণ্ডব বৈরিতার আভাস দিয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র ভীম ও তাঁহার খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিযাছেন। নাটকে অর্জুনের ভূমিকা গৌণ। নাটকটি নীতি ও আদর্শ দিয়া রচিত বলিয়া ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসদেব, বিদুর, ভীষ্ম প্রমুখ নীতি ধর্মের প্রবক্তাবৃন্দই প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন। ঠিক একটি নায়কের পতন বলিয়া যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে ধৃতরাষ্ট্রই এই নাটকের নায়ক। সমগ্র কৌরব কুলের বিনষ্টি এই বৃদ্ধ রাজার অন্তিম পর্বকে দুঃখ-করুণ করিয়া দিযাছে। ব্যাসদেবের আপ্তবাক্য, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মৃত্যু অতিক্রান্ত জীবন-দর্শন বা ভীষ্মের অভিজ্ঞতা লব্ধ নীতি উপদেশ কুরু-পাণ্ডুকুলের মৃত্যু মিছিলের উপর শান্তি-বারি সিঞ্চন করিতে পারে নাই।

এইজন্য বার বার একই রূপ দর্শন উপদেশের পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। অগণিত মৃত্যু মহোৎসবের মধ্য দিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী জীবনের যবনিকাপাত হওয়ায় নাটকটিতে দুঃখবেদনার করুণ স্পর্শ লাগিয়াছে।

তবুও ইহা নাটকের ফলশ্রুতি নহে, মহাভারতী কাহিনীরই রস সঞ্জাত আবেদন মাত্র। সে দিক দিয়া নাট্যকার ব্যর্থ হইয়াছেন বলিতে হইবে। নাট্যকৌশলের দিক হইতে তিনি যে ঘটনাগুলি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য স্থানে স্থানে পৌরাণিক পরিমণ্ডলটি সৃষ্টি হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম অঙ্গে রঙ্গভূমি বদরিকাশ্রমে অশ্বত্থামা ও পাণ্ডবদের যুদ্ধে নানারূপ বিচিত্র ঘটনায় একটি পৌরাণিক অথচ নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। ভীমের প্রতি অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশে সেই বাণ প্রতিহত করিতে অর্জুনের বাণ নিক্ষেপ, ব্যাসদেবের আকস্মিক আগমন, অশ্বত্থামার শিরোমনি ছিন্ন, উত্তরার অকাল প্রসব ইত্যাদি আকস্মিক ঘটনামালা একের পর এক ঘটিয়া পরিবেশটিকে অলৌকিক করিয়া তুলিয়াছে। আবার শেষ অঙ্কে ব্যাসদেবের কৃপায় জীবিত কুরু পাণ্ডব নরনারীদের মৃত আত্মীয় স্বজন দর্শনের মধ্যেও অনুরূপ ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছে।

সব দিক দিয়া বিচার করিলে 'কৌরববিয়োগ'কে নিশ্চয় সার্থক পৌরাণিক নাটক বলা যাইবে না। ইহার মধ্যে নাটকীয়তার একান্ত অভাব। অত্যন্ত বৃহৎ অথচ অপেক্ষাকৃত নীরস অধ্যায়টি অবলম্বন করিয়া হরচন্দ্র ঘোষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেন নাই। মহাভারতের প্রধান লক্ষ্য তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। অনুক্রমণিকা অংশে শুধু খেদ, বিলাপ আর পুঞ্জীভূত উপদেশের মধ্যে নাটকীয়ত্ব ফুটাইয়া তোলা শক্ত। আখ্যানবস্তুর প্রাচুর্য, দীর্ঘ সংলাপ, উৎকট ভাষা বিন্যাস, প্রবল নৈতিক আদর্শ প্রভৃতির দ্বারা 'কৌরববিয়োগ'-এর নাটকত্ব যেমন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তেমনি গতিশীলতার অভাব, চরিত্রসমূহের প্রাণহীনতা ও যান্ত্রিকতা, নাটকীয় ঘটনাবিন্যাসে শৈথিল্য সর্বোপরি মহাভারতের প্রতিটি বিষয়ের ছায়ানুসরণে ইহার নাট্যিক উৎকর্ষ প্রকাশ পায় নাই। পূর্ববর্তী নাট্যকার তারাচরণ সিকদার এ দিক দিয়া অধিকতর কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন।

শর্মিষ্ঠা নাটক॥ ইহা মাইকেল মধুসূদনের প্রথম বাংলা রচনা। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের জন্য সংস্কৃত রত্নাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি সর্বপ্রথম মৌলিক নাটক রচনার প্রেরণা অনুভব করেন। ইহার ফলস্বরূপ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা করেন এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়া

রঙ্গমঞ্চে ইহা অভিনীত হয়। বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। দর্শকসাধারণ তখন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা সংস্কৃতগন্ধী বাংলা নাটক দেখিতে অভ্যস্ত। ইহা যে বাংলা নাটকের পক্ষে অনুপযোগী মধুসূদন তাহা বুঝিয়াছিলেন অথচ দর্শকজনের রুচি-প্রকৃতি তখনও আধুনিক হয় নাই। এইরূপ সন্ধিক্ষণেই তাঁহার শর্মিষ্ঠা রচনা। মধুকবি বাংলা সাহিত্যে বন্ধন মুক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাঁহার প্রথম রচনা নাটকের ক্ষেত্রে তিনি যে ঐতিহ্য মুক্তির হাওয়া তুলিলেন, কাব্য ক্ষেত্রে তাহাই ঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে। বন্ধু গৌরদাস বসাককে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার নাটকে বৈদেশিক ভাব কিছু থাকিবে। সংস্কৃত যাহা কিছু তৎসমস্তের প্রতিই আমাদের দাসসুলভ মনোভাবের ফলে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য যে শৃঙ্খল সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা হইতে মুক্ত হওয়াই আমার উদ্দেশ্য'।[১৩] তবুও শর্মিষ্ঠা নাটক এইরূপ ঐতিহ্য মুক্ত কোন রচনা নহে। ইহাতে সংস্কৃত রচনারীতি হুবহু গৃহীত হয় নাই সত্য। তথাপি ইহা ঠিক পাশ্চাত্য প্রভাবিত নাটকও নহে। নাটকের রীতি প্রকৃতিতে এখানে তিনি পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্য ধারারই অধিক অনুসরণ করিয়াছেন। পঞ্চাঙ্ক কলেবরে গর্ভাঙ্কের উপস্থাপনা, নান্দী, নটী ও সূত্রধার বর্জন, ঘটনাবাহুল্য পরিবর্জনে নাটকের সংহতি ও ঐক্য রক্ষা প্রভৃতি নাটকের বহিরঙ্গ-বিন্যাসের কতকগুলি ক্ষেত্রে মধুসূদন পাশ্চাত্য রীতিকে অনুসরণ করিয়াছেন। তথাপি ইহার অঙ্গ সজ্জার অন্যান্য দিকে প্রাচ্যরীতির কম নিদর্শন নাই। ইহার প্রাচ্যরীতি প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করিয়াছেন—"সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ীই 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কাহিনী মিলনাত্মক ও শৃঙ্গার রসাত্মক হইয়াছে। যদিও ইতিপূর্বেই এদেশে ইউরোপীয় ধরণের মঞ্চসজ্জা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তথাপি মঞ্চোপকরণের অভাব পূরণার্থে সংস্কৃত নাট্য শাস্ত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ রহিয়াছে, ইহাতেও তাহাদের প্রায় কোনটিরই ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে যোদ্ধৃবেশী দৈত্যের দীর্ঘ স্বগতোক্তির এইজন্যই অবতারণা করা হইয়াছে। ভারতের নাট্য শাস্ত্রে অভিনয়কালে দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ প্রমুখ যে সব ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেও তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইংরেজী আদর্শে উৎকৃষ্ট নাট্যিক উপাদান থাকা সত্বেও সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী অপ্রিয় দণ্ডাদেশ বা কোন অভিশাপ ইহার অভিনয়কালে উচ্চারিত হয় নাই। সংস্কৃত নাটকের নিপুণিকা চতুরিকাই এখানে পূর্ণিকা-দেবিকার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এখানেও রাজ বয়স্য চড্ডক

প্রিয় মাধব্য নামক বিদূষক।"[১১৪] মধুসূদন যে কেন শর্মিষ্ঠার মধ্যে আপন মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই, জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু তাহা অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'নিজের উদ্ভাবনী শক্তির উপর মধুসূদন তখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। সুতরাং নিজের গ্রন্থের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে 'রত্নাবলী'কেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইয়াছিল। উভয় গ্রন্থে সেইজন্য ভাবগত এবং কোন কোন স্থলে ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষিত হইবে।"[১১৫] একজনের উপর অন্য জনের প্রভাব সম্বন্ধে হঠাৎ করিয়া কিছু বলা যুক্তি সংগত নহে, তবে ইহা যে মধুসূদনকে বাংলা সাহিত্যে মহামহীরুহ করিয়া তুলিয়াছিল, সাধনার সেই বীজমন্ত্রটি তখনও অনায়ত্ত ছিল বলিয়াই শর্মিষ্ঠা নাটকে তাঁহার ভীরু পদক্ষেপ দেখিতে পাই।

শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদি পর্বান্তর্গত সম্ভব পর্বাধ্যায়ের দেবযানী শর্মিষ্ঠা যযাতি উপাখ্যান হইতে গৃহীত। মহাভারতী কাহিনীকে মধুসূদন আবশ্যকমত পরিবর্তন ও সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কতকটা নাটকের সংহতি রক্ষা, কতকটা বা চরিত্র চিত্রণের আবশ্যকতায় তিনি এইরূপ করিয়াছেন। বিস্তৃত পরিসরে, স্থানকালের অনেক ব্যবধানে মহাভারতে শর্মিষ্ঠা যযাতির কাহিনী আবৃত্ত হইয়াছে। নাটকের ঐক্য সংস্থাপনে এই দূরান্তরী ঘটনাবলীর নৈকট্য দেখান হইয়াছে। এইজন্যই ইহার মধ্যে এত বিলম্বিতলয়ের অবকাশ নাই। শর্মিষ্ঠা যযাতির কলহ এখানে আদৌ বর্ণিত হয় নাই, বকাসুরের সংলাপের মধ্যে এই বিবাদের কারণ ও পরিণতির কথা বিবৃত হইয়াছে। এইভাবে নাটকের প্রস্তাবনা সূচিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে মহাভারত বর্ণিত শর্মিষ্ঠা চরিত্রের কোন আভাসই নাই। এই বিবাদের কেন্দ্রে শর্মিষ্ঠার যে দৃপ্ত অহংকার ও দাম্ভিকতা মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, মধুসূদন তাহার ইঙ্গিতও করেন নাই। আপন মানস কন্যা শর্মিষ্ঠার ধৈর্য ও মহত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার চরিত্রের অপহ্নবকারী সমস্ত কলঙ্করেখাকে তিনি মুছিয়া দিতে চাহিয়াছেন। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব'র কোন উল্লেখ নাটকে নাই। কন্যা শর্মিষ্ঠার প্রতি তাঁহার নির্মম আদেশ দান নাটকে সংবাদের মত পরিবেশন করা হইয়াছে। মূল কাহিনীতে দেখা যায় প্রথম সাক্ষাতের দীর্ঘকাল পরে সখী পরিবৃত দেবযানী চৈত্ররথে বনে বিহার করিতে যাইলে যযাতি মৃগয়া ব্যপদেশে সেইখানে আসেন। সেখানে দেবযানী যযাতিকে তাঁহার অনুরাগের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন ও পিতাকে যযাতির হস্তে সম্প্রদান করিতে বলিয়াছেন। শর্মিষ্ঠা নাটকে দেবযানী তাঁহার

যযাতি অনুরক্তিকে সখী পূর্ণিকা সমীপে ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্ণিকাই এখানে তাহা শুক্রাচার্যকে জানাইয়াছে যদিও তিনি পূর্বাহ্নেই ইহা অনুমান করিয়াছিলেন।' কচের অভিশাপের কথা অপ্রাসঙ্গিকবোধে মধুসূদন আদৌ তোলেন নাই পরন্তু যযাতি, 'ক্ষত্রকুলজাত তথাচ বেদবিদ্যাবলে' দেবযানীর উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছেন। মহাভারতে শুক্রাচার্য যযাতিকে শর্মিষ্ঠা সম্বন্ধে সাবধানে থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন, শর্মিষ্ঠাকে যেন তিনি সসম্মানে রাখেন, কিন্তু তাঁহাকে যেন শয্যাসঙ্গিনী না করা হয়। মধুসূদন ইহার পরিবর্তন করিয়াছেন। যযাতি শর্মিষ্ঠার পরিণয়ের কাহিনী দেবযানী পিতাকে জানাইলে শুক্রাচার্য বলিলেন, 'বৎসে' গান্ধর্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয় কুলের রীতি, তা কি তুমি জান না?' মহাভারতের শুক্রাচার্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যযাতিকে অভিশাপ দিয়াছেন এবং যযাতির অনুরোধে শাপমুক্তির উপায় বলিয়া দিয়াছেন। এখানে দেবযানীই শুক্রাচার্যকে অভিশাপ দিতে প্রবৃদ্ধ করিয়াছেন, "আপনি সে দুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন, যেন সে আর কামিনীর মানোহরণ করতে না পারে। "শুক্রাচার্যকে মধুসূদন মহাভারত অনুগ তেজস্বী মহামুনি করিয়া আঁকেন নাই। তাঁহার মানবতার দিকটির উপর বেশী লক্ষ্য দিয়াছেন। অপত্য স্নেহের বশে তিনি অভিসম্পাত করিলেও তাহা যে দেবযানীর অবমাননার জন্যই তিনি করিয়াছেন, একথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই। তাঁহার কাছে ইহা অনেকটা প্রাক্তনের ইঙ্গিত—"বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কর্ত্তে পারে? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিৎ পাপ সঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে?" আবার অভিশাপের পর দেবযানীই অগ্রণী হইয়া পিতাকে শাপমোচনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মহাভারতের মত যযাতি নিজেই ইহার জন্য প্রার্থনা জানান নাই। মধুসূদন দেবযানী চরিত্রকে পরিস্ফুট করিবার জন্য এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। যযাতির জরা প্রাপ্তির পর হইতে শাপমুক্তি পর্যন্ত সময়ে মহাভারতের বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ আছে। মধুসূদন মন্ত্রীমুখে সেই সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়া নাটকের যবনিকা টানিয়াছেন।

চরিত্র চিত্রণ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য শর্মিষ্ঠা চরিত্র। নাটক রচনায় মধুসূদন সর্বত্র আত্মলোপ করিতে পারেন নাই। কাব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ দিকে যেমন তাঁহার প্রত্যক্ষ সহানুভূতি ছিল, নাটকের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। মেঘনাদ যেমন মধুসূদনের মানসপুত্র হইয়াছেন, শর্মিষ্ঠাও তেমনি তাঁহার মানস কন্যা হইয়াছেন। বস্তুতঃ শর্মিষ্ঠার ত্যাগ, ধৈর্য, সহনশীলতা মধুসূদনকে গভীরভাবে

প্রভাবিত করিয়াছিল। এইজন্যই বোধ করি তিনি আপন কন্যার নামও এই শর্মিষ্ঠাই রাখিয়াছিলেন। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মধুসূদন শর্মিষ্ঠা চরিত্রকে উচ্চগ্রামে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। শর্মিষ্ঠার কলহকে অনুক্ত রাখিয়া দেবযানী সম্পর্কিত বিড়ম্বিত জীবনের কথাই তিনি নাটকে ব্যক্ত করিয়াছেন। শর্মিষ্ঠা দৈত্যরাজের নির্দেশে দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছেন, দেবযানীকে তিনি দোষারোপ করেন না—"আমি আপন দোষেই এ দুর্দশায় পতিত হয়েছি—আমি আপনি মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশ্রিত করে ভক্ষণ করেছি। অন্যের দোষ কি?" বকাসুর শর্মিষ্ঠার শাপ মোচনের প্রস্তাব লইয়া প্রতিষ্ঠান পুরীতে সমাগত হইলে শর্মিষ্ঠা দৈত্য পুরীতে প্রত্যাবর্তনের অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ধৈর্যশীল চরিত্রে জীবন তৃষ্ণার উন্মেষে মধুসূদনের অপূর্ব কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। মহাভারতী শর্মিষ্ঠার মত ইনি প্রগল্‌ভা নহেন। সেখানে তিনি রাজাকে প্ররোচিত করিয়াছেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য। রাজা সত্যভঙ্গের আশংকা করিলে শর্মিষ্ঠা তাঁহাকে শাস্ত্রানুমোদিত পঞ্চবিধ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া জানাইয়াছেন। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা অনুরাগ দীপ্ত হইয়া যযাতিকে পূর্বেই আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন, যযাতির নিকট ব্রীড়ানম্র হইয়া সেই নিবেদনকে স্নিগ্ধ ও শান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। যযাতি অগ্রবর্তী হইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়াছেন "শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্য কুসুমে কখনও স্পৃহা করেন?" তাঁহাদের পরিণয় কথা দেবযানীর কর্ণ গোচর হইলে বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হইয়া তিনি যে আচরণ করিয়াছেন, শর্মিষ্ঠা তাহাতে তাঁহাকে দোষারোপ করেন নাই, সহচরী দেবিকার নিকট তিনি বলিয়াছেন: 'তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি? যদ্যপি আমি কোন মহামূল্য বস্তুকে যত্ন করি, আর যদি সে বস্তুকে কেহ অপহরণ করে, অপহর্তাকে আমি তিরস্কার করি না?' দেবযানী প্রাসাদে নাই জানিয়া পতিপরায়ণা শর্মিষ্ঠা সন্ত্রস্তা হইয়া পড়িয়াছেন এবং যে কোন মুহূর্তে মহারাজের বিপদ ঘটিতে পারে এই আশংকা করিয়াছেন। মধুসূদন নাটকীয় কৌশলে এইখানে যযাতির জরা আনিয়া দিয়া শর্মিষ্ঠার আকুলতাকে গগনস্পর্শী করিয়া দিয়াছেন। দুঃখের অমারাত্রি শেষে যখন মিলনান্তক পরিণতি আসিল, তখন শর্মিষ্ঠা পূর্ববৈরিতার কোন চিহ্নই রাখেন নাই। দেবযানীকে তিনি বলিলেন, 'প্রিয় সখী, তোমার দোষ কি? এসকল বিধাতার লীলা বই-ত নয়।'

তবে শর্মিষ্ঠা নাটকে দেবযানীর চরিত্র শর্মিষ্ঠা অপেক্ষা অনেক বেশী সক্রিয়।

বলিতে গেলে, দেবযানীই নাটকটিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। মহৎ আদর্শের প্রতিমূর্তি হিসাবে শর্মিষ্ঠাকে অঙ্কিত করা হইয়াছে, কিন্তু স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতার দিক হইতে দেবযানীর সার্থকতা। তাঁহার অপমানে পিতা শুক্রাচার্য দৈত্যরাজের উপর ক্রোধ প্রকাশ করেন ও তাহারই ফলস্বরূপ শর্মিষ্ঠাকে দাসী থাকিতে হয়। এইভাবে তাঁহার দ্বারা নাটকের গতিটি আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যবর্তী অধ্যায়ে দেবযানী যযাতির প্রণয় কাহিনীতে নাটকের বিস্তার ঘটিয়াছে। এই প্রণয়ের সহিত যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রণয়ের সংঘাত সুরু হইলে নাটকীয় দ্বন্দ্বটি পরিস্ফুট হয়। অতঃপর দেবযানীরই সক্রিয়তায় শুক্রাচার্যের অভিশাপ ও অনুতপ্ত দেবযানী কর্তৃক যযাতির নিরাময়তা প্রার্থনায় প্রেমের দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। নাটকের গতি এইভাবে ফলশ্রুতিতে পৌঁছাইয়া যায়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, এইরূপ গুরুতর ভূমিকা ফুটাইতে হইলে যেরূপ সচেতন ও স্পর্শকাতর হইতে হয়, চরিত্রের যে দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের যে বলিষ্ঠতা প্রয়োজন, দেবযানী চরিত্রে তাহা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে। এইখানেই চরিত্রটির অভাবনীয় সাফল্য।

তবু নাটক হিসাবে শর্মিষ্ঠা যে সফল হইয়াছে, এমত বলা যায় না। দেবযানী শর্মিষ্ঠা ছাড়া নাটকের অন্যান্য চরিত্র তেমন প্রাণবন্ত নহে। যযাতিকে বেদ পারঙ্গম শৌর্য বীর্যশালী রাজা বলিয়া আদৌ মনে হয় না। প্রণয় ব্যপদেশে যে কয়েকবার তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিয়াছে, তাহা একান্তই গতানুগতিক এবং বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। শুক্রাচার্য চরিত্রটিতে মধুসূদন কিছুটা মৌলিকতা দেখাইয়াছেন, উগ্রচেতা মুনির মধ্যে মানবিকতার ফল্গুধারা আনিয়া শুক্রাচার্যকে অনেকখানি স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রের অসম্পূর্ণতা ও নাটকীয় উপস্থাপনার ত্রুটিতে সমগ্রভাবে শর্মিষ্ঠা উচ্চাঙ্গের নাটক হইতে পারে নাই। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের নাটকগুলির দীর্ঘ সংলাপ ও স্বগতোক্তি মধুসূদন পরিহার করিতে পারেন নাই। দীর্ঘ ভাষণের মধ্যে নিসর্গবর্ণনা বা মনের ভাব প্রকাশ যাহা আছে, তাহার সহিত নাটকের সংযোগ ক্ষীণ। আবার একটি সুপরিচিত কাহিনীর রূপায়ণ বলিয়া দৃশ্যগুলির মধ্যে পারম্পর্যও রক্ষিত হয় নাই। মধুসূদন নাটকীয় দৃশ্যগুলির বহুল অপচয় ঘটাইয়াছেন। তবে ইহার সর্বপ্রধান ত্রুটি হইল নাটকের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে, নাট্যিক ক্রিয়াশীলতার মধ্য দিয়া সেগুলি সংঘটিত হয় নাই। ইহাও আমাদের প্রথম পর্বের নাটকগুলির মত বিশেষ ত্রুটি। যে সব ঘটনা দূতমুখে বা মন্ত্রী মুখে বিবৃত হইয়াছে, সেগুলি ঘটিয়া গেলে নাটকীয় আকস্মিকতা বা উৎকণ্ঠা বজায় থাকিত এবং দৃশ্যগুলি প্রত্যক্ষ

হইয়া উঠিত। বকাসুর প্রথমেই বিবৃতি দিয়া শর্মিষ্ঠার দাসীত্ব গ্রহণের কথা ব্যক্ত করিয়াছে। ইহাকে না হয় প্রস্তাবনা হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তৎপরে দেবযানী যযাতির প্রণয়োন্মেষ পরোক্ষভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা পূর্ণিকা দেবযানীর ব্যাপার নহে, যযাতি দেবযানীর ব্যাপার। ইহার অনেক পরে একেবারে উভয়কে পাওয়া যাইতেছে। ইহা অপেক্ষা শর্মিষ্ঠা যযাতির প্রণয় নিবেদন অনেক প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আবা। চতুর্থাঙ্কে বিদূষকের নিকট যযাতি কর্তৃক দেবযানীর ক্রোধোৎপত্তির কথা ব্যক্ত করা নাট্যোপযোগী হয় নাই। শর্মিষ্ঠাও তাহার পুত্রদের দেখিয়া দেবযানী যযাতির গোপন প্রণয়ের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ইহার কি গুরুতর প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পারে, রাজা তাহা বিদূষকের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। অনুরূপ ভাবে ক্রোধান্বিতা দেবযানীর কথা আবার তিনি শর্মিষ্ঠা সকাশে ব্যক্ত করিয়াছেন। দেবযানী যযাতির মধ্যে বাদানুবাদ ও তাহার ফলে দেবযানীর স্বামীগৃহ ত্যাগ—এই চরম ঘটনাটি ঘটিয়া গেলে নাটকের দিক হইতে তাহা অনেকখানি উৎকৃষ্ট হইত। শুধু বিবৃতির মাধ্যমে এই গুরুতর অধ্যায়টি বর্ণনা করায় নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। পরন্তু চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কটি নাটকীয় হইয়াছে। শুক্রাচার্য ও দেবযানীর আকস্মিক সাক্ষাৎ ও পিতার কাছে সমূহ ঘটনা বিবৃতি এমন আকস্মিকতা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে, যাহাতে ইহার নাটকীয়ত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এই আবশ্যিক রীতিটুকু অবলম্বিত হয় নাই। যযাতির শাপ মোচনের কথা একেবারে পরোক্ষভাবে মন্ত্রীমুখে বিবৃত হইয়াছে। এইভাবে নাটকটির মধ্যে ঘটনাগুলি যথাযথ ঘটিতে পারে নাই। ডঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন, "শর্মিষ্ঠা নাটক পড়িতে পড়িতে বারংবার মনে হয় যে মধুসূদন নাটকের বিশিষ্ট সমস্যাগুলি এড়াইয়া বর্ণনার সাহায্যে কাহিনীটি উপস্থাপিত করিতেছেন।"[১৬]

সাবিত্রী সত্যবান॥ কালীপ্রসন্ন সিংহের একমাত্র মৌলিক রচনা 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮খ্রীঃ) নাটকটির আখ্যানভাগ মহাভারতের বনপর্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য। ডঃ সুশীলকুমার দে নাটকটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইংরেজী নাটকের অনুসরণে কাণ্ড ও অঙ্ক বিভাগ হইলেও আঙ্গিক গঠনে সংস্কৃত নাটকের রীতি ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার মঞ্চ নির্দেশনায় ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের উভয় রীতির মিশ্রণ দেখা যায়। ডঃ দে নাটকটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "গ্রন্থকার পুস্তকগত নায়ক-নায়িকার আদর্শের

আশ্রয় লইয়াছেন, জীবন্ত চিত্র আঁকিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টা খুব সফল হয় নাই। এই নাটকের বিদূষক সংস্কৃত নাটকের মামুলী প্রথাগত, উদর পরায়ণ, ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত বিদূষকের ছায়ামাত্র। ভবভূতির অনুকরণে প্রথম কাণ্ড তৃতীয় অঙ্কে যে দুই শিষ্যের প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে হাস্যোদ্দীপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব গ্রন্থকার বর্জন করিতে পারেন নাই। সেইজন্য বর্ণনা বা ভাব প্রবণতার আতিশয্য নাট্যবস্তুর অবাধ গতিতে অনেকস্থলে ব্যাহত করিয়াছে।[১৭] প্রকাশ ভংগীতে গুরুগম্ভীর ভাষা ও লঘু চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়া ইহার গাম্ভীর্যকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। লেখক সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন বলিয়া এই ত্রুটি তাঁহার প্রায় সব নাটকেই আসিয়া পড়িয়াছে।

স্বর্ণ শৃঙ্খল নাটক ॥ ডাঃ দুর্গাদাস করের 'স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক' বাংলা সাহিত্যের একখানি বিস্মৃত নাটক। ইহার একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইহা প্রথম সামাজিক নাটক কুলীন 'কুল সর্বস্বের' রচনাকালের পরবর্তী বৎসরে (১৮৫৫) রচিত হয়। নাট্যকারের সহৃদয় বন্ধুগণের অনুরোধে অভিনয় করিবার নিমিত্ত বরিশালে এই নাটক লিখিত হয়। কিন্তু বহুদিন ইহা প্রকাশিত হয় নাই। 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশের দুই বৎসর পরে (১৮৬৩) ইহা প্রকাশিত হয়।[১৮]

দ্রৌপদী প্রেমের স্বর্ণশৃঙ্খলে পঞ্চপাণ্ডবকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ভাবটি হইতে গ্রন্থকার গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন।[১৯] ইহার কথাবস্তু মহাভারতের সভাপর্ব হইতে গৃহীত। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞ করিলে দুর্যোধন তাঁহার ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হন। পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাণ্ডব বিনাশের অভিপ্রায় জানাইলে ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে বিচলিত হন। কৌরব অধিনায়কবৃন্দ তাহা অনুমোদন করিলেন না। তখন দুর্যোধন পিতাকে মত করাইয়া মাতুল শকুনির সাহায্যে যুধিষ্ঠিরের সহিত অক্ষ ক্রীড়ার আয়োজন করিলেন। আমন্ত্রিত যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজসভার অক্ষ ক্রীড়ায় পণে বার বার হারিয়া গেলেন এবং ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থের সমূহ ঐশ্বর্য, রত্ন, বহুমূল্য বস্ত্র ও ভ্রাতৃমণ্ডলীকে পণ রাখিয়া সকলকে হারাইয়া ফেলিলেন। শকুনি সেই সময় ইঙ্গিত করিল রাণী দ্রৌপদীকে পণ রাখা হউক। রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমে অস্বীকার করিয়া পরে রাজী হইলেন এবং ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া দ্রৌপদীকেও হারাইলেন। অতঃপর দুর্যোধনের আজ্ঞায় দুঃশাসন ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া হস্তিনাপুরের রাজসভায় উপস্থিত করিল। অতঃপর বস্ত্রহরণ প্রাক্কালে স্তূপীকৃত

বস্ত্র সভামধ্যে জন্মিয়া দ্রৌপদীকে নারীত্বের অপমান হইতে রক্ষা করিল। পুনরায় অক্ষ ক্রীড়া করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসরের অজ্ঞাত বাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া পাণ্ডবগণ সত্য রক্ষার জন্য বন গমন করিলেন। বনগমন প্রাক্কালে ভীম ও দ্রৌপদীর ভীম প্রতিজ্ঞা পাঠকমনে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণের এক বীভৎস করুণ অধ্যায়ের আভাস আনিয়া দেয়।

মহাভারত অনুগ আখ্যানবস্তুই নাটকে উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কটি নাটকের অগ্রগতিতে বিশেষ সাহায্য করে নাই। ভীমের বীর্যবত্তা ও দ্রৌপদীর প্রেমের আভাস দিয়া নাটকের কাহিনীবৃত্ত শুরু হইয়াছে। মহাভারতী দুর্যোধনের ক্রূরতা ও শকুনির চাতুর্য ও শঠতা নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। তাঁহার পাণ্ডব প্রিয়তার সহিত দুর্যোধনের আচরণ সমর্থনের তেমন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। অর্জুন চরিত্রের ভূমিকা প্রায় নাই। ভীম চরিত্র সে তুলনায় অনেক প্রাণবন্ত। ভীমের আস্ফালন ও রণপ্রকৃতি তাঁহার উক্তিগুলির মধ্যে স্পষ্ট হইয়াছে।

পাশ্চাত্য নাটকের মত প্রাচ্য নাটকেও ক্রূর ও বীভৎস ঘটনাগুলি প্রকাশ্যে সংঘটিত হয় না। নাট্যকার এই রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের বীভৎস দৃশ্যটি সংঘটিত হয় নাই। ইহা বিদুর কর্তৃক বিকর্ণকে তথা দর্শকমণ্ডলীকে জ্ঞাত করান হইয়াছে। ইহাতে নাটকীয়তা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এইরূপ ঘটনার পশ্চাদসংঘটন ক্ল্যাসিক নাটকেরই রীতি। সমকালীন বিখ্যাত নাটক নীলদর্পণে ক্ষেত্রমণি উডসাহেবের দৃশ্যটি বীভৎসতা লইয়াই দৃশ্যমান হইয়াছে। স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক এ দিক দিয়া ক্ল্যাসিক নাট্যরীতিকেই অনুসরণ করিয়াছে।

আদিযুগের অধিকাংশ বাংলা নাটকের মত এই নাটকটির সংলাপও অযথা দীর্ঘ এবং গুরুগম্ভীর। ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন কথোপকথনের মত গুরুতর ক্ষেত্রে ভাষার যে গাম্ভীর্য, দ্রৌপদী-সরলার আলাপ আলোচনায়ও সেইরূপ গাম্ভীর্য আসিয়াছে। সহচরী সরলাকে দ্রৌপদী বলিতেছেন : "আমি যেন এক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছি, অকস্মাৎ দেখি যে, এক বৃক্ষস্কন্ধে এক সিংহ স্বর্ণ শৃংখলে বদ্ধ রহিয়াছে, তাহারি অনতিদূরে একটা শৃগাল দ্বারা একটা সিংহী অপমানিত হইয়া শৃংখলে আবদ্ধ ঐ সিংহের প্রতি বার বার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আর্তনাদ করিতেছে। সিংহ এতাবদ্দৃষ্টে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল রহিয়া এক একবার শৃংখলের প্রতি দৃষ্টি করিতেছে।" ইহা যে বিদ্যাসাগরী ভাষারীতির অনুসরণ, তাহা

অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। বলা বাহুল্য, নাটকীয় সংলাপে এইরূপ বাক্যবিন্যাস যথোপযুক্ত হয় নাই।

উষানিরুদ্ধ নাটক ।। মণিমোহন সরকারের 'উষানিরুদ্ধ নাটক'টি (১৮৮৩) কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়কে উৎসর্গীত। 'সাবিত্রী সত্যবান' ও 'মালতী মাধবে'র রচনা দ্বারা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় নারী সমাজকে যে মহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার জন্য গ্রন্থকার শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আলোচ্য নাটকখানি তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন। বাণরাজার কন্যা উষার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রণয়লীলাই নাটকের বিষয়বস্তু। কাহিনী রচনায় বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব আছে। উষার গান্ধর্ব বিবাহ, তাহার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা, অনিরুদ্ধের বন্ধন, কালীর প্রবেশ ও অভয়দান, বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়লীলার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। নাটকটির মধ্যে পৌরাণিক পরিবেশ বিশেষ কিছু নাই। উষা ও অনিরুদ্ধের গোপন প্রণয় নিবেদন নাটকটিকে উর্ধ্বচারী করিতে পারে নাই। নারদের মধ্যে পৌরাণিক রূপ কিঞ্চিৎ রক্ষিত হইয়াছে। তিনিই উষা সহচরী চিত্রলেখাকে অনিরুদ্ধকে আনিবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, উদ্দেশ্য ইহার ফলে সংকট অবস্থা আসিলে দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম আসিয়া বাণরাজার দর্প চূর্ণ করিবেন। পরিণতিতে তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে এবং উষা ও অনিরুদ্ধের মিলনের মধ্য দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

নাটকটি সংস্কৃত প্রভাবিত। নটনটী, বিদূষক, কঞ্চুকী প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের পাত্রপাত্রী ইহাতে আছে। নট ও তাহার প্রেয়সী সূচনায় কাহিনীর আভাস দিয়া প্রস্থান করিলে নাটকটি আরম্ভ হইয়াছে। নাটকটির আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার গীতিবহুলতা। মনের ভাব অভিব্যক্তির জন্য সংলাপের সংগে নায়ক নায়িকা এমন কি অপ্রধান চরিত্র চিত্রলেখা, মদলেখা, বিদূষক পর্যন্ত—সকলেই গানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। আঙ্গিক বিন্যাসে ইহা পূর্ববর্তী বাংলা নাটকগুলির মত নহে। এক একটি দৃশ্যই ইহার এক একটি অঙ্ক হইয়াছে। নাটকটিতে এইরূপ আটটি অঙ্কের সমাবেশ আছে।

জানকী নাটক ॥ হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'জানকী নাটক'টি (১৮৬৩) রামায়ণের সীতার বনবাস অংশ অবলম্বন করিয়া রচিত। কিন্তু সীতার বনবাস ইহার মর্মকথা হইলেও নাটকটি মিলনান্তক। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির যজ্ঞে কৌশল্যাদি রাজমাতাগণ গমন করিলে পূর্ণগর্ভা সীতা স্বামী ও দেবরের তত্ত্বাবধানে অযোধ্যাপুরীতে রহিলেন। লক্ষ্মণ জানকীর ইচ্ছানুসারে পুরাতন দিনের স্মৃতি

রিঞ্জভিত চিত্রপট তাঁহাকে দেখাইতেছেন। রামচন্দ্র সর্ববিধ উপায়ে প্রজানুরঞ্জনের দায়িত্ব পালন করিতে প্রতিজ্ঞ। এ হেন সময়ে দুর্মুখ আসিয়া সীতাদেবী সম্বন্ধে অপবাদের কথা রামচন্দ্রকে জানাইল। মানসিক বেদনা ও গ্লানিতে রামচন্দ্র ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পরিশেষে রাজধর্মের জয় হইল। লক্ষ্মণ সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে দেবীকে ভাগীরথী তীরে বাল্মীকির তপোবনে বিসর্জন দিয়া আসিলেন। ইহার পর রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি। যজ্ঞকালে এক ব্রাহ্মণের মৃত সন্তান দেখিয়া রামচন্দ্র নিজের পাপের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দৈববাণীতে শোনা গেল শূদ্র শম্বুকের তপস্যাই বিপর্যয়ের হেতু। দণ্ডকারণ্যে শম্বুকের শিরচ্ছেদ করিয়া রামচন্দ্র ধর্মের বিধান অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। শম্বুক অন্বেষণে আসিয়া জনস্থান অঞ্চলে রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর মিলন ঘটিয়াছে। এইরূপ কোন মিলন রামায়ণে নাই, ইহা গ্রন্থাকারের নিজস্ব কল্পনা। অতঃপর বাল্মীকির তপোবনে জনক, কৌশল্যা প্রভৃতি বিলাপ করিতে সুরু করিলে বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী তাঁহাদের সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—এই অংশও নাট্যকারের মৌলিক রচনা। ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব ধরিয়া লব রামচন্দ্রের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। লক্ষ্মণপুত্র চন্দ্রকেতু ও লবের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর শ্রীরামচন্দ্র নির্দেশে পরস্পরের বন্ধুত্ব হইল। লবকুশের অবয়ব আকৃতি দেখিয়া, তাহাদের বাসস্থান জানিয়া এবং জম্ভৃকাস্ত্র তাহাদের আজন্ম সিদ্ধ জানিয়া রামচন্দ্র তাহাদিগকে আপন সন্তান বলিয়া সংশয় পোষণ করিলেন। লবকুশ তাঁহার নিকট রামায়ণ গান আরম্ভ করিল। ইহার পর গ্রন্থকার একটি অন্তবর্তী নাটক রচনার দ্বারা সীতার শেষ জীবনের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। জননী বসুমতী সীতার ভাগ্য বিপর্যয়ে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত। তিনি তাঁহাকে পাতালপুরীতে আহ্বান করিতেছেন। আবার রামচন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে জম্ভৃকাস্ত্র দেবীর সন্তানদ্বয়ের আশ্রিত হইল। ইহা হইতেই রাম লক্ষ্মণ লবকুশ সম্বন্ধে যথার্থ পরিচয় পাইলেন। অতঃপর নাটকের ভ্রান্তি কাটাইয়া দেবী জানকী শ্রীরাম সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। মাতা বসুমতী এবং কুলদেবী গঙ্গা সীতার পবিত্রতা সম্বন্ধে উচ্চ স্তুতি গাহিলেন। দৈববাণীতেও ঘোষিত হইল সীতার তুল্য সতী নাই। গুরুপত্নী অরুন্ধতী আসিয়া রামচন্দ্রকে জানাইলেন, সকলেই সীতার পবিত্রতা অনুমোদন করিয়াছেন, রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করুন। রাম-সীতার মিলন হইল। বাল্মীকি লবকুশকে জনক জননীর ক্রোড়ে বসিতে বলিলেন। অন্যান্য গুরুজনদের উপস্থিতিতে এই মিলন মধুময় হইল।

নাট্যকার নাটকটিকে বিয়োগান্ত করেন নাই। সমাপ্তিতে করুণ রস সৃষ্টি করা ঠিক প্রাচ্য রীতি অনুমোদিত নহে। এইজন্যই হয়ত নাট্যকার অন্তর্বর্তী অধ্যায়ে করুণ রসের সঞ্চার করিয়া পরিণতিকে আনন্দদায়ক করিয়াছেন। রাম সীতার কথোপকথনের মধ্যে, বসুমতী ও গঙ্গার-সংলাপের মধ্যে, সুমন্ত্র, লক্ষ্মণ ও সীতার উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে নাটকের করুণ সুরটি টানিয়া রাখা হইয়াছে। কৌশল্যা প্রমুখ রাজমাতাগণকে অযোধ্যা ত্যাগ করাইয়া সীতার মর্মবেদনাকে লোকমনে সহজেই সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন। সীতার মন্দভাগ্যকে তীব্রতর করিয়া দেখাইবার জন্য নাট্যকার মৌলিক বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন—"জানকী গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে রঘুকুলদেবী মন্দাকিনী নিজ কুলবধূকে আদরে গ্রহণ করেন এবং সেইখানেই সীতা দুটি সন্তান প্রসব করেন। তখন বসুমতী সেই সন্তান দুটি আর আপনার মেয়ে সীতাকে নিয়ে পাতালপুরে গেলেন। তারপর সন্তান দুটি স্তন ত্যাগ করলে পর ভগবতী বসুমতী আর ভাগীরথী মন্ত্রণা করে শাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্তে মহর্ষি বাল্মীকির কাছে তাদিকে সমর্পণ করেছেন।" মূল রামায়ণের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই।

নাটকের আঙ্গিক বিন্যাসে সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের মিশ্র রূপ দেখা যায়। অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক রচনায় ইহাতে পাশ্চাত্য রীতি অনুসৃত হইয়াছে, আবার সংস্কৃতের অনুরূপ প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে সীতার সহচরীবৃন্দের কথোপকথনে নাটকের বিষয়বস্তু আভাসিত হইয়াছে। নাটকটি গীতিবহুল। সংলাপের মধ্যেও বহু ক্ষেত্রে গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

উর্ব্বশী নাটক ।। কামিনীসুন্দরী দেবী 'দ্বিজতনয়া' নামে 'উর্বশী' নাটক (১৮৬৮) রচনা করিয়াছেন। ডঃ সুকুমার সেন ইহাকে বাংলায় মহিলা রচিত প্রথম নাটক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[২০] দণ্ডী পুরাণের দণ্ডী রাজার বৃত্তান্ত হইতে লেখিকা ইহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে লেখিকা বলিয়াছেন: "আমার নাটক পুরাণ অবলম্বন করিয়া লেখা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু সে কেবল প্রসঙ্গত মাত্র · দণ্ডী পুরাণের বৃত্তান্তে উর্ব্বশী ও দণ্ডী রাজাই প্রধান। আমি নাটকে তাঁহাদিগেরই প্রাধান্য দিয়াছি।"[২১] দুর্বাসার অভিশাপে উর্বশী ঘোটকী হইয়া মর্ত্যধামে দণ্ডী রাজার আশ্রয় লাভ করেন। 'দিনের বেলায় ঘোটকী মূর্তি রাত্রিতে পরিবর্তিত হইয়া উর্বশীরূপ পরিগ্রহ করিত। রাজা দণ্ডী তাহার প্রতি গভীর প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ ঐ ঘোটকী চাহিলে দণ্ডীর সহিত তাঁহার

বিবাদ আসন্ন হয়। দণ্ডী উপায়ান্তর না দেখিয়া জলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগের উদ্যোগ করেন। ভীম দয়া পরবশ হইয়া দণ্ডীকে নিজের কাছে রাখিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদের বিবাদ আসন্ন হয়। এই যুদ্ধে স্বর্গের দেবকুলও কৃষ্ণপক্ষে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু সুভক্ত পাণ্ডব পক্ষের গৌরব বাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ অমর পক্ষের পরাজয় ঘটাইয়া দেন। দুর্বাসার শাপমোচনের নির্দেশ অনুসারে বিষ্ণুর চক্র, ব্রহ্মার অক্ষ, শিবের শূল, ইন্দ্রের বজ্র, কার্তিকের শক্তি, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড ও পার্বতীর খড়্গা—এই অষ্ট বজ্রের সমন্বয় হইলে উর্বশীর শাপ মোচন হয় এবং আবার তিনি স্বর্গপুরীতে ইন্দ্র সমীপে সমাগত হন।

লেখিকা ইহাতে প্রচুর চরিত্রের সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। তবে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য উর্বশী এবং দণ্ডী চরিত্র। দণ্ডীর প্রেমের মোহ এবং উর্বশীর অপ্সরা সুলভ নির্মোহ ও ক্রীড়াপরায়ণতাকে লেখিকা নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকটিতে পৌরাণিক পরিবেশ নাই বলিলেই হয়। নারদের বিশিষ্ট ভূমিকা, দেবগণের মর্ত্যধামের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ, দুর্বাসার শাপ ও উর্বশীর শাপ মুক্তি—এইরূপ কয়েকটি ক্ষেত্রে অলৌকিকতা ফুটিয়া উঠিলেও প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে নাটকীয় চরিত্রগুলি একেবারে লৌকিক হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণ চরিত্রের সমালোচনায় কৃষ্ণজায়াগণ তাঁহাদের গাম্ভীর্য ও মর্যাদা আদৌ রাখিতে পারেন নাই। নাট্যকার লেখিকা বলিয়াই বোধ করি ইহাতে রমণী সুলভ ভাবানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়াছে। রাজার প্রণয় ভাষণের মধ্যে ক্ষুদ্র সংলাপগুলি রসসৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে, কিন্তু মাঝে মাঝে দীর্ঘ কাব্যোক্তিতে ইহার সংহতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তবে নাটকীয়তার বিচারে ইহাকে একেবারে অসার্থক বলা যায় না।

ঊষা নাটক ।। ঊষা অনিরুদ্ধের প্রণয়কাহিনী লইয়া কামিনীসুন্দরী দেবীর আর একটি পৌরাণিক নাটক 'ঊষা' (১৮৭১)। ইতিপূর্বে এই কাহিনী লইয়া মণিমোহন সরকারের 'ঊষানিরুদ্ধ নাটক' (১৮৬০) রচিত হইয়াছে। কিন্তু বিষয়-বস্তুর অভিনব উপস্থাপনায় আলোচ্য নাটকখানি পূর্ববর্তী নাটকটি হইতে অনেক উচ্চস্তরের। আগের নাটকটিতে বিদ্যাসুন্দরের খুব বেশী প্রভাব আছে। কিন্তু দ্বিজতনয়ার এই নাটকটি এইরূপ প্রভাব বর্জিত। ইহার মধ্যে রিরংসাতপ্ত গোপন প্রণয়ের কোন চিত্রই নাই। নাট্যকার মহিলা বলিয়া বোধ করি প্রেমও পরিণযকে যথোচিত পরিমিতিবোধের মধ্যে রাখিয়াছেন। কাহিনীর লৌকিকতা হইল এই যে, বাণ রাজা মহাদেবের নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন অচিরকালে তাঁহার

কাছে সমযোদ্ধা আসিবে। সেই সময় দেবমন্দিরের ধ্বজা ভাঙিয়া পড়িবে। আর সেইদিন রাজকন্যার বিবাহ। এইরূপ শুনিয়াই রাজা ঘোষণা করিলেন উষাকে বিবাহ করিবার জন্য যে আসিবে, তাহারই যেন শিরশ্ছেদন করা হয়। উষার সহিত গোপন প্রণয়ে অনিরুদ্ধ জড়াইয়া পড়িলে দ্বারকা হইতে তাঁহার অন্তর্ধান ঘটে। শ্রীকৃষ্ণজায়া রুক্মিনী তাহাতে বিচলিত হইলে দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সমস্ত কিছু জানাইলেন এবং তাঁহাকে অনিরুদ্ধের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বাস দিলেন। অনিরুদ্ধ বাণ রাজের বন্দী হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাহিনীর সহিত দৈত্য রাজের যুদ্ধ শুরু হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন প্রথমে বাণ রাজা এবং পরে মহাদেব স্বয়ং। অতঃপর রুদ্রসেনা ও দৈত্যসেনা উভয়কে পরাভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাণ রাজার দর্পচূর্ণ করেন। দেবর্ষি নারদ ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের উপদেশ পরামর্শে বাণরাজ অনিরুদ্ধের সহিত উষার পরিণয় ব্যবস্থা করেন।

উষা-অনিরুদ্ধের মূল কাহিনীকে সমুন্নত করিবার জন্য লেখিকা মহাদেবের সক্রিয় ভূমিকা আনিয়াছেন। ইহার মধ্যে ভৈরবীরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উষা অনিরুদ্ধের প্রেম ও পরিণয়ের অগ্রগতিকে ভৈরবী অনেকখানি সাহায্য করিয়াছেন। রাণী প্রভাবতী ও কন্যা উষা উভয়ে তাঁহার নিকট সান্ত্বনা ও আশ্বাস পাইয়াছেন। পৌরাণিক নাটকে এইরূপ দৈবী মহিমা সম্পন্ন চরিত্রের আনাগোনা স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা যায়। প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা কিংবা কঞ্চুকী বিদূষকের ভূমিকার মধ্যে নাটকটিতে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব পড়িয়াছে। তবে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার মধ্যে তেমন গীতিবাহুল্য নাই।

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান নাটক ॥ মহাভারতের বনখণ্ডের অন্তর্গত শ্রীবৎস চিন্তার কাহিনী লইয়া পূর্ণচন্দ্র শর্মা এই নাটকটি লিখিয়াছেন (১৮৬৬) গ্রন্থারম্ভে ত্রিপদী ছন্দে শ্রীবৎস রাজের মূল আখ্যায়িকাটি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তাহাই ক্রমশঃ নাটকের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। শনি-লক্ষ্মীর বিবাদ, শ্রীবৎসের সিদ্ধান্ত, শনি কোপে শ্রীবৎস ও চিন্তার বিপুল দুর্ভোগ এই আখ্যায়িকাকে অতি মাত্রায় পরিচিত ও প্রিয় করিয়াছে। নাট্যকার তাহার সবটুকুই সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তবে ইহা ঠিক নাটকোচিত উপস্থাপিত হয় নাই। ইহাতে কোন অঙ্ক বা গর্ভাঙ্কের ব্যবহার নাই। শ্রীবৎসের উপাখ্যানটি নাটকীয় আকারে বিবৃত হইয়াছে মাত্র। নাটকের সংলাপে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণ আছে। এসম্বন্ধে নাট্যকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন : "ইতি পূর্বে এই উপাখ্যানটি গদ্যেতে

করণাভিলাষী হইয়াছিলাম কিন্তু এদেশে নাটক পুস্তকের সংখ্যা স্বল্প হওয়া প্রযুক্ত আমি এই উপাখ্যানটি নাটক ছন্দে লিখিলাম।"২২ পয়ারের বহুল প্রয়োগে যে ইহার নাটকীয়তা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মেঘনাদ বধ নাটক ।। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই নাটকটি রামায়ণের লঙ্কাপর্বের মেঘনাদ বধ কাহিনী উপজীব্য করিয়া রচিত (১৮৬৭)। ইতিপূর্বে মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে ('৮৬১)। স্পষ্টতঃ নাট্যকার মাইকেলের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। কাহিনী বিন্যাসে এবং কয়েকটি উক্তি প্রত্যুক্তিতে নাট্যকার মাইকেলকে বিশেষ ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। তবে মাইকেলের চরিত্রায়নের যে অভিনবত্ব, তাহা অবশ্য ইহাতে নাই। নাট্যকার কাহিনীর উপরই দৃষ্টি রাখিয়াছেন, কোন বৃহত্তর জীবন জিজ্ঞাসা ইহাতে উপস্থাপিত হয় নাই। বীরবাহুর পতনের পর মেঘনাদকে সেনাপতি পদে বরণ করা হইলে লঙ্কায় উৎসব সুরু হইল। কিন্তু জননী মন্দোদরী ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিলেন। ইহা বীর জননীর উপযুক্ত কথা নহে জানাইলে মন্দোদরী অনন্যোপায় হইয়া সন্তানকে বিদায় দিলেন, তবে তিনি মেঘনাদকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞে ইষ্ট দেবতা অগ্নির প্রসাদ লইয়া যুদ্ধে যাইতে বলিলেন। প্রমীলাও আসন্ন সমর কালের দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত ভাঙিয়া বলিলে মেঘনাদ বুঝিলেন তাহা নিকুম্ভিলা যজ্ঞেরই কথা। বীর হৃদয়ও তাহাতে কিছুটা শঙ্কিত হইল। তথাপি যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। রাম শিবিরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও বিভীষণের মধ্যে কথোপকথনে বিভীষণ রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ সম্বন্ধে যথোচিত আশ্বাস দান করিলে লক্ষ্মণও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অতঃপর নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিতের নিধন বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে প্রমীলার সহমরণ দেখাইয়া নাটকের যবনিকা পাত হইয়াছে।

রামায়ণী কাহিনীর সহিত আলোচ্য নাটকের কাহিনীর অনেকখানি পার্থক্য রহিয়াছে। সম্ভবতঃ নাট্যকারের আদর্শ রামায়ণ ছিল না, মাইকেলের মেঘনাদ বধই ছিল তাঁহার লক্ষ্যস্থল। মন্দোদরীর উদ্বেগ ও আশীর্বাদ মাইকেলের অনুরূপ, প্রমীলার পতিসন্দর্শনের ভাবটি নিঃসন্দেহে মাইকেল হইতে গৃহীত, সীতা-সরমার কথোপকথনে মধুসূদনের গভীরতা কিছু প্রকাশ না পাইলেও চিত্রটি তাঁহার সীতা-সরমা সংবাদকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রমীলা-ইন্দ্রজিৎ সংলাপ বোধ করি নাট্যকারের মৌলিক রচনা। প্রমীলার স্বপ্নদর্শনের মধ্যে আসন্ন মেঘনাদ

পতনের চিত্রটি অঙ্কন করিয়া নাট্যকার ইহার ট্র্যাজিক পরিণতির আভাস দিয়াছেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে বিভীষণ-ইন্দ্রজিৎ কথোপকথন প্রায় হুবহু মাইকেল হইতে গৃহীত। যেমন—

বিভীষণ—সে আশা পরিত্যাগ কর। আমি কদাচ পথ ছাড়তে পারবো না, আমি শ্রীরামের শরণ নিয়েছি, এখন আমি তাঁরই অনুচর, তাঁহার মঙ্গল কামনাই আমার কর্তব্য কর্ম, কিরূপে জীবন সত্ত্বে তোমারে পথ ছেড়ে দিব?

ইন্দ্রজিৎ—কি বল্লে? তুমি ভিখারী রামের অনুচর? ধিক তোমাকে। তুমি অজেয় রক্ষঃ কুলে জন্মেছ, তুমি ত্রিভুবন জয়ী দশাননের ভ্রাতা, আমি ইন্দ্রজিত—আমার খুড়া—তোমার মুখে এমন কথা? ধিক তোমাকে![২৩]

ইহার সহিত মাইকেলের বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ সংবাদের মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই।

বিভীষণ— "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান! রাঘবদাস আমি, কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?"

মেঘনাদ— "হে পিতৃব্য, তব বাক্যে—ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!

... ...

হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম?"...[২৪]

নাটকের চরিত্র চিত্রণে মন্দোদরী ও প্রমীলা চরিত্রেই যাহা কিছু স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্যান্য চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছুই নাই। নাটকের শেষে প্রমীলার সহমরণের মধ্যে পৌরাণিক সতীধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। মন্দোদরী প্রমীলাকে বলিতেছেন, "তুমি যে সংকল্প করেছ, তাতে তোমাকে নিবারণ কোরবো না, নিবারণ করায় অধর্ম আছে। আমি জানিনে কি অধর্মের ভোগ ভুগছি, তোমাকে নিবারণ করে আবার জন্মান্তরেও জ্বালা ভুগ্‌ব।"[২৫]

নটনটীর দ্বারা নাটকটির প্রস্তাবনা রচনা করা হইয়াছে।

রামাভিষেক নাটক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস

বাংলার নাটকের ইতিহাসে মনোমোহন বসুর একটি বিশেষ স্থান আছে। তাঁহার অধিকাংশ নাটকই সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে রচিত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক ভাবাতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে। বলিতে কি, বাংলা নাটকের একটি বিশেষ রীতিই তাঁহার নাটকগুলি হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। গীতিবহুলতা এবং উচ্ছ্বসিত ভক্তিরস তাঁহার পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার পরবর্তীকালের নাটকগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাইলেও 'রামাভিষেক নাটকে' (১৮৬৭) ইহার সূচনা হইয়াছে বলা যায়। দর্শকমনের রুচি-প্রকৃতির প্রতি তাঁহার একটি দৃষ্টি ছিল। সেইজন্য আলোচ্য নাটকের প্রারম্ভে নটের মুখ দিয়া তিনি ব্যক্ত করাইতেছেন : "তাঁরা চান—অভিনয়ের নায়ক নায়িকার নির্মল চরিত্র হবে। সুতরাং সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, দান্ত, ধীর—এমন কোনো বীরপুরুষ সম্পর্কে করুণা রসের কোনে একটি অভিনয় যদি দেখাতে পারা যায়, তবে নির্বিবাদে যেমন সর্বমনোরঞ্জন হবে, এমন আর কিছুতেই না।"[২৬]

বলাবাহুল্য, রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র যে এইরূপ একটি সর্বগুণাধার চরিত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। নাট্যকার রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড হইতে নাটকীয় কথাবস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক আয়োজন হইতে তাঁহার বনবাস এবং ইহার প্রতিক্রিয়ায় রাজা দশরথের মৃত্যু অযোধ্যাকাণ্ডের এই অধ্যায়টুকু নাট্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। মনোমোহন বসুর নির্বাচন ক্ষমতাকে প্রশংসা করিতে হয়। রামাভিষেকের মত অত্যন্ত আনন্দকর পরিবেশের সহিত রাম-বনবাসের দারুণ দুঃখকর চিত্রটি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিপরীত ঘটনা প্রবাহ এবং ভাব বিপর্যয় নিঃসন্দেহে নাটকের উপযোগী। তাহা ছাড়া নাট্যকার শ্রীরামচন্দ্রের ধীর ও প্রশান্তরূপের সহিত পাশাপাশি দশরথের চঞ্চল চিত্ত প্রকৃতি ও লক্ষ্মণের পরুষকঠোর চিত্রটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। রামায়ণী কথার মাধুর্য ও সৌন্দর্যকে নাট্যকার সবটুকু রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া 'রামাভিষেক নাটক' সহজেই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

মনোমোহন বসু আদর্শ হিসাবে কৃত্তিবাসকেই সম্মুখে রাখিয়াছেন। সুতরাং কৃত্তিবাসের মধ্যে যেমন বাঙ্গালীর ভাব ও ভাষা ফুটিয়াছে, মনোমোহন বসুর মধ্যেও তেমনি বাংলা দেশের জীবন প্রকৃতি বাঁধা পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন :

" 'রামাভিষেক' কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশ বিশেষের নাট্যরূপ মাত্র। তাঁহার অযোধ্যা বাংলা দেশেরই পঙ্কশেষ পানা পুকুরের তীরে অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম, তাঁহার কৌশল্যা পুত্রের মঙ্গল কামনায় মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রত, পুত্রের অভিষেক উপলক্ষ্যে 'পাড়াপ্রতিবাসিনী'দিগের সঙ্গে 'আমোদ-আহ্লাদ' করিবার অভিলাষ করে, পুত্রের বনগমন উপলক্ষ্যে বাঙ্গালী জননীর মতই সুদীর্ঘ বিলাপে অশ্রুস্নান করেন, তাঁহার দশরথ বহু বিবাহ প্রথা পীড়িত বাংলার সমাজেরই একজন ভুক্তভোগী প্রতিনিধি ...।"[২৭]

বাংলা দেশের সমাজের বহু বিবাহ ও তাহার অনর্থের রূপটি অতীতচারী পৌরাণিক চরিত্রে আরোপিত হওয়ায় হয়ত কালাতিক্রমণ দোষ ঘটিয়াছে, তথাপি এই রীতিতেই দর্শক সাধারণ অতি সহজেই চরিত্রগুলির সহিত একাত্মীভূত হইয়াছে। তবে নাটকের প্রারম্ভে চাষী চরিত্র দুইটির সংলাপের মধ্যে দিয়া পুরাতন অযোধ্যার চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাংলার প্রাকৃত জীবনের সহিত অযোধ্যার জীবন চিত্র ঠিক খাপ খায় নাই।

মনোমোহন বসু হইতেই বাংলার নাট্যজগতে গীতাভিনয়ের প্রবর্তন হয়। আলোচ্য নাটকে ইহার লক্ষণ তেমন স্পষ্ট হয় নাই। তাঁহার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক নাটকগুলি পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে। গীতাভিনয়ের মধ্য দিয়া তিনি যে পৌরাণিক ভাবধারার উজ্জীবন করিয়াছেন, তাহা যথাসময়ে আলোচনা করা যাইবে।

নলদময়ন্তী নাটক ॥ কালিদাস সান্যালের 'নলদময়ন্তী নাটকে'র (১৮৬৮) কথাবস্তু মহাভারতের বন পর্বান্তর্গত নলদময়ন্তী উপাখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছে। নিষধাধিপতি নলের বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কলি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজা নল শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়েন এবং ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনবাস যাত্রা করেন। সহধর্মিনী দময়ন্তী তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিলেন। তথাপি একদিন তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় বনমধ্যে নল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। নলরাজের ভাগ্য বিপর্যয় এবং দময়ন্তীর বিচ্ছেদ বেদনার করুণ কাহিনী সহজেই লোকমনে আবেদন জানায়। নাট্যকার কিন্তু তাহার যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। নলের জীবনে কলির প্রবেশ একান্তই আকস্মিক এবং কার্যকারণ রহিত। কলি যে দময়ন্তীর পাণি প্রার্থী ছিলেন, একথা নাটকে আদৌ পরিস্ফুট হয় নাই। নলের জীবনে তাঁহার প্রভাব শুধু তাঁহার নাম মাহাত্ম্যের জন্যই ঘটিয়াছে মনে হয়। রাজা নলের চরিত্রেও

অসংগতি আছে। দময়ন্তীকে ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে নলের উক্তি যুক্তিহীন বলিয়া মনে হয়: "আমি এঁকে পরিত্যাগ করে ইচ্ছাকৃত দোষে দোষী হচ্চিনে, এঁর বনবাস যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখা নিতান্ত ক্লেশকর হয়েছে। এক্ষণে এঁকে পরিত্যাগ করে গেলে আপনারা এই করবেন, ইনি যেন অনায়াসে আপনার আত্মীয় ব্যক্তিদের নিকট যেতে পারেন।"

পৌরাণিক নাটকে পার্থিব ঘটনাবলীর তাৎপর্য নিরূপণের জন্য কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনারও সমাবেশ থাকে। বশিষ্ট চরিত্র অঙ্কন করিয়া নাট্যকার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়াছেন। নল দময়ন্তীর ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ বশিষ্ট যোগ প্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নাটকের পরিণতি যে মিলনান্তক হইবে, তাহা তাঁহার নির্দেশ হইতে সহজেই জানা যায়। পৌরাণিক নাটকের নাট্যোৎকণ্ঠা এইভাবেই নিবৃত্ত হয়। নাটকটিতে প্রস্তাবনা কিছু না থাকিলেও বিদূষক, কঞ্চুকী প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টিতে এবং গীতিবহুলতায় ইহা সংস্কৃত নাটকের ধারা বহন করিয়াছে।

কীচক বধ ॥ মহাভারতের বিরাট পর্বের অন্তর্গত কীচক বধ পর্বাধ্যায় কাহিনী অংশ লইয়া যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'কীচক বধ নাটক' (১৮৬৮) রচনা করিয়াছেন। পাণ্ডবদের দ্বাদশ বৎসর বনবাস শেষ হইলে এক বৎসরের অজ্ঞাতবাস তাঁহারা বিরাট রাজার নিকট কাটাইবেন স্থির করিলেন। অজ্ঞাত পরিচয়ে থাকিবার উদ্দেশ্যে পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চনামে বিরাট রাজার নিকট কাজকর্ম গ্রহণ করিলেন। দ্রৌপদীর প্রতি সেনাপতি রাজভ্রাতা কীচক কামাসক্ত হইয়া পড়িলে ভীমের হস্তে তাঁহার নিধন হয়। নাট্যকার মূল মহাভারতের কাহিনী হুবহু গ্রহণ করেন নাই। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "আমি মহাভারতীয় বিরাট পর্বের কেবল গল্পটির নাম মাত্র গ্রহণ করিয়া স্বকপোলকল্পিত কীচক বধ নামক নাটক রচনা করিলাম।"[২৮] বিরাট রাজার সভায় পাণ্ডবগণের কালহরণের কোন চিত্রই নাট্যকার আঁকেন নাই। যুধিষ্ঠিরের অক্ষ ক্রীড়ার কুশলতা, মল্লগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ, বৃহন্নলারূপী অর্জুনের নৃত্যগীত, নকুল সহদেবের রাজকর্মপালনের কোন ঘটনাই নাটকে উল্লেখিত হয় নাই। নাট্যকার কীচক ও দ্রৌপদীর ঘটনাবলীর দিকেই মূলতঃ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং সেইরূপে নাটকীয় ঘটনাবৃত্তকে সজ্জিত করিয়াছেন। বৃহদ্বল নামক পিশাচের কবল হইতে ঋষিগণকে রক্ষা করিবার জন্য মৎস্যরাজা যাত্রা করিলে কীচক কিছুদিনের জন্য রাজ্যপরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। মহাভারতে এইরূপ ঘটনার কোন ইঙ্গিত নাই। কীচক সেনাপতি

হিসাবে প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং তিনি দ্রৌপদীকে দেখিয়া প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহাভারতের রাণী সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে পানীয় আনিবার জন্য কীচক সান্নিধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুদেষ্ণা ও কীচকের পূর্ব পরিকল্পনামত রাণী দ্রৌপদীকে কীচক ভজনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। নাট্যকার সুদেষ্ণাকে এখানে হীন করিয়া অঙ্কিত করেন নাই। তিনি দ্রৌপদীর শঙ্কায় সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। মহাভারতে দেখান হইয়াছে সূর্যের আদেশে এক রাক্ষস অদৃশ্যভাবে দ্রৌপদীকে রক্ষা করিত। এখানে দ্রৌপদীর রক্ষার সমূহ দায়িত্ব ভীমের উপরই ন্যস্ত করা হইয়াছে। মহাভারতে দ্রৌপদী রাজার নিকট-কীচকের আচরণের অভিযোগ জানাইয়াছিলেন, রাজা কীচকের অশোভন আচরণের কোন প্রতিকার করেন নাই। সেখানে ব্যর্থ হইয়া তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে আপন অপমানের কথা বলিয়াছেন। যুধিষ্ঠির আপন অসহায়তা জ্ঞাপন করিলে দ্রৌপদী ভীমের নিকট কীচকের দুর্ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছেন—নাট্যকার এই সূত্র ধরিয়া দ্রৌপদী ও ভীমকে নাটকের কেন্দ্রস্থলে রাখিয়াছেন। কীচক পত্র মারফৎ প্রেম নিবেদন করিলে ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী তাঁহাকে রাত্রিকালে নাট্যশালায় আসিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। দ্রৌপদীবেশী ভীমসেনকে নাট্যকার নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন এবং কীচকের সহিত তাঁহার কপট প্রণয়ভাষণকে উচ্চশ্রেণীর হাস্যরস রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। নাট্যকার ভীমের বীর্যবত্তা, অগ্রজানুগত্য ও পত্নীপ্রেমকে সার্থকভাবে পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন। পাণ্ডবদের বিঘ্নিত জীবনের বহু ক্ষেত্রে ভীমসেন যে পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, আলোচ্য 'কীচক বধ' নাটকের মধ্যে তাহারই একটি নিদর্শন দেখান হইয়াছে।

মহাভারতী পটভূমিকায় এই নাটকটিতে সংস্কৃত রীতি গৃহীত হইয়াছে। নান্দী কর্তৃক সরস্বতী বন্দনা শেষ হইলে নটের উক্তি দিয়া নাটক আরম্ভ হইয়াছে। নাটকের মধ্যে যথারীতি বিদূষকের ভূমিকাও রহিয়াছে। নাটকটির প্রধান গুণ ইহার সংহতি। ইহাতে অবান্তর কথাবস্তুর আদৌ অবতারণা নাই। প্রথম যুগের নাটকে গঠনরীতির যে শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়, ইহাতে সে ত্রুটি প্রায় নাই। আর পৌরাণিক নাটকের অন্যতম উপজীব্য যে বীররসের পরিবেশন, ইহাতে তাহা রক্ষিত হইয়াছে। দর্শকমন দ্রৌপদীর অপমানে বিচলিত হইয়াছে এবং কীচক বধের জন্য সোৎসুক প্রতীক্ষা করিয়াছে। ভীমের কৌশলে ও অসীম বীর্যবত্তায় এই সংহার কার্য সম্পাদিত হইলে এইরূপ প্রতীক্ষার ফলশ্রুতি ঘটিয়াছে বলা যায়।

রুক্মিনী হরণ ॥ রামনারায়ণ তর্করত্নের একটি পৌরাণিক নাটক 'রুক্মিণী হরণ' (১৮৭১)। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিপর্বে রামনারায়ণ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকখানি লিখিয়া সামাজিক নাটকের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কৌলিন্য অধ্যুষিত বাংলার সমাজে এই নাটকখানি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। বাংলার সামাজিক রীতিনীতি পর্যালোচনা করিতে করিতে রামনারায়ণ বোধ করি সমাজের নৈতিক দুর্গতির কথাই ভাবিয়া থাকিবেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটক লেখার পিছনে এইরূপ একটি প্রচ্ছন্ন প্রেরণা থাকা বিচিত্র নহে।

রুক্মিণী হরণের বিষযবস্তু নির্বাচন সুন্দর হইয়াছে। বিদর্ভরাজ ভীষ্মক বৃদ্ধ ও অথর্ব হইয়া পড়িলে যুবরাজ রুক্মীর উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু সংসারের আকর্ষণ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। কন্যা রুক্মিণীকে পাত্রস্থ করিবার সম্বন্ধে তিনি চিন্তিত। দেবর্ষি নারদের সহিত আলাপ আলোচনায় দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিনি কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ প্রায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু যুবরাজ বন্ধুস্থানীয় অন্য রাজাদের সহিত যুক্তি করিয়া চেদি অধিপতি শিশুপালকেই রুক্মিণীর পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের গুণরাজি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকেই চিত্ত নিবেদন করিয়াছেন। রুক্মী কর্তৃক শিশুপালকে বরবেশে আসিবার আমন্ত্রণ জানান হইলে রুক্মিণী ভীত হইয়া দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিয়া আপন মনোভাব জানাইলেন এবং শিশুপালের কবল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যথাসময়ে বিদর্ভদেশে আসিয়া বিবাহ প্রাক্কালে রুক্মিণীকে হরণ করিয়া আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ রুক্মী ও অন্যান্য রাজা যুদ্ধাহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিষোদ্গার করিতে লাগিলেন। তখন দেবর্ষি তাঁহাদের জানাইলেন যে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির অর্ঘ্য দান করিবেন, সেই সময় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করিবার সুযোগ পাইবেন। যুবরাজ ও শিশুপাল প্রমুখ রাজন্যবর্গ ইহাতে আপাততঃ শান্ত রহিলেন।

কংস নিধনের পর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় অবস্থান কালে রুক্মিণীর সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়াছে। এ পরিণয় সামাজিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া হয় নাই, তদানীন্তন সমাজে যে বীর্য শুল্ক বিবাহের রীতি ছিল, ইহা তাহাই। বস্তুতঃ এইরূপ সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়া বিবাহের ঘটনাটি নির্বাচন করিয়া নাট্যকার সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন। আবার ইহার নায়ক আর কেহ নহেন,

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারতী মহানায়ক তখনও তিনি হন নাই, তবে তাঁহার বীর্যবত্তার প্রকাশ তখনই অকিঞ্চিৎকর নহে। কংস প্রভৃতি বীরকে বধ করিয়া ইতিমধ্যেই তাঁহার যথেষ্ট বীরখ্যাতি রটিয়াছে। নারায়ণী বিভূতির সম্যক প্রকাশ তখনও না হইলেও তিনি যে নারায়ণের প্রতিরূপ, সে সম্বন্ধে ভক্ত চিত্তে সংশয় নাই। নারদ, রুক্মিণী ও সখী লবঙ্গলতা ভক্তির বিদলে তাঁহাকে অর্চনা করিয়াছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিপদভঞ্জন রূপটিই এখানে প্রকাশ করিয়াছেন। রুক্মিণী-শ্রীকৃষ্ণের যুগল চিত্রের মধ্য দিয়া নাটকটি শেষ হওয়ায় সাধারণ ভক্তচিত্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

রুক্মিণী চরিত্রটি নাট্যকারের অপরূপ সৃষ্টি। প্রথম হইতেই তাঁহার কৃষ্ণময়তা নাটকের সুরটি বাঁধিয়া দিয়াছে। শ্রীরাধার মতই তিনি কৃষ্ণানুরাগে বিভোর। কৃষ্ণই তাঁহার সব। তিনি বলিতেছেন: "কৃষ্ণময়ই যেন এখন জগৎ হয়েছে, আমি যে দিগে চাই, সেই দিগেই যেন সেই নবীন নীরদ মূর্তি আমার নয়ন পথে উপস্থিত হয়।"[২৯] এই কৃষ্ণপ্রাণা নারী চরম সংকটে অনন্যোপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। এক দিকে লজ্জা, সংকোচ ও সংশয়; অন্যদিকে বিশ্বাস ও সমর্পণ একটি গৃহান্তরীণ অন্তঃপুরিকাকে কিভাবে বিচলিত করিতে পারে, নাট্যকার রুক্মিণীর মধ্যে তাহা দেখাইয়াছেন।

দেবর্ষি নারদের পৌরাণিক বৈশিষ্ট্যও এখানে রক্ষিত হইয়াছে। মহান কৃষ্ণভক্তিতে নারদ ভক্তাগ্রগণ্য। আবার দূতের ভূমিকা এবং পারস্পরিক বিবাদ কলহে তাঁহার ভূমিকা সর্বস্বীকৃত। আলোচ্য নাটকে তাঁহার এই দুই দিকেরই পরিচয় আছে। তিনি বিদর্ভরাজকে উৎসাহ দেন কৃষ্ণের সহিত কন্যার বিবাহ ব্যবস্থা করিতে, কৃষ্ণের কাছে সংবাদ আনেন রুক্মিণীর জন্য, বসুদেব-দেবকীকে কৃষ্ণের বিবাহ প্রসঙ্গ তোলেন, পরিশেষে পরাজিত রুক্মী ও অন্যান্য নৃপতির কাছে আসিয়া সান্ত্বনাও দেন। নাট্যকার দূত নারদের চিত্র আঁকিয়া ভক্ত নারদকে ভোলেন নাই। শেষ দৃশ্যে নারদের কৃষ্ণস্তবে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়াছে। দেবতা ও মানবের সম্মিলিত কৃষ্ণবন্দনা নারদের স্তবের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভক্তিরসের প্রস্রবণ বহাইয়া দিয়াছে।

পৌরাণিক নাটক হিসাবে নাটকটি সার্থক হইয়াছে। আঙ্গিক বিন্যাসে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব নাই, ভাষার দিক দিয়া ইহা অত্যন্ত সাবলীল ও জড়তা বর্জিত।

আলোচ্য পর্বে আরও অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক লিখিত হইয়াছে। মহাভারতের নলোপাখ্যান লইয়া উমাচরণ দে'র 'নলদময়ন্তী' (১৮৫৮), রামায়ণ

-কাহিনী হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'জানকী' (১৮৬৩), মহাভারতী কাহিনী হইতে তাঁহার 'জয়দ্রথ বধ' (১৮৬৪), রামায়ণ কাহিনী হইতে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'সীতার বনবাস' (১৮৬৬) (ইহাতে লেখক মূলতঃ বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসকেই অনুসরণ করিয়াছেন), মহাভারতের শ্রীবৎস উপাখ্যান হইতে হরিমোহন কর্মকারের 'শ্রীবৎস চিন্তা' (১৮৬৬), রামায়ণী কথা হইতে তাঁহার 'জানকী বিলাপ' (১৮৬৭), মহাভারতী কাহিনী হইতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রভাস মিলন' (১৮৭০) ও রামায়ণী কাহিনী হইতে তাঁহার 'মৈথিলী মিলন' (১৮৭০)।

রামায়ণী কাহিনী হইতে শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'লক্ষ্মণ বর্জন' (১৮৭০) প্রভৃতি নাটকগুলি বাংলা নাটকের আদিপর্বে রচিত হইয়াছে। এই পর্যায়ের নাটকগুলিতে পৌরাণিক চেতনা স্পষ্ট ছিল না। কোন পৌরাণিক ভাবধারার পুনরুজ্জীবন করিবার প্রত্যক্ষ প্রয়াস ইহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। যাহা স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল তাহা হইল সামাজিক জীবনের রূপ অঙ্কন করা। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের বাংলা সমাজে প্রেরণা অপেক্ষা পীড়ন বেশী। কৌলীন্য সংস্কার, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্ন তখন অত্যন্ত বড় হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য নাট্যকারগণ সামাজিক নাটক রচনার দিকেই মনোযোগ দিয়াছিলেন বেশী। এই সময়ের যুগান্তকারী সৃষ্টি কুলীনকুল সর্বস্ব, নব নাটক, নীলদর্পণ, বা একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, ইত্যাদি নাটক বা প্রহসনের মধ্যে সমাজের এই চঞ্চল ও উৎক্ষিপ্ত রূপই প্রকাশ পাইয়াছে। পুরাতন যাত্রাগানের জের হিসাবে এবং লোকমনের চিরন্তন ধর্মবিশ্বাস ও নীতি নিষ্ঠার আনুগত্যে এই পর্যায়ের পৌরাণিক নাটকগুলি রচিত হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র ও কাহিনী দেশের সামাজিক উপপ্লবের মধ্যেও আবেদন হারায় নাই। কিন্তু ইহাদের দ্বারা যে জাতি গঠনের কাজ করা যায়, তখনও পর্যন্ত সে চেতনা অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং এই সময়ের পৌরাণিক নাটকগুলি সামাজিক নক্সা নাটকের সমান্তরালে দর্শকজনের হৃদয় জয় করিয়াছে, তাহাদের চেতনার উদ্বোধন ঘটায় নাই। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যানুসন্ধানের সচেতন প্রয়াস পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যাইবে। জীবন ও সাহিত্যের বহুধারূপ যখন জাতীয় মানসের অক্ষয় ঐতিহ্যকে অনুসন্ধান করিতেছিল, সেই সময় নাট্য সাহিত্যও দেখা যাইবে তাহার রূপরেখায় এই সনাতন চিন্তাকে নবরূপে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছে॥

— পাদটীকা —

১। দাশরথি রায়ের পাঁচালী—ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী—ভূমিকা পৃঃ ৭

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা—নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী পৃঃ ১৯-২৪

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। ২য় সং। ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৯৭৯

৪। দাশরথি রায়ের পাঁচালী—ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী—ভূমিকা পৃঃ ৯

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। ২য় সং। ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৯৫৯

৬। সাহিত্যের কথা—যাত্রার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত পৃঃ ২৪৩-৪৪

৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। ২য় সং। ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৮২

৮। বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম সং। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ৪৯

৯। তারাচরণ শিকদার প্রণীত ভদ্রার্জুন নাটক—সম্পাদকীয় ভূমিকা ডঃ সুকুমার সেন ও কালিপদ সিংহ, পৃঃ

১০। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৪

১১। কৌরব বিয়োগ নাটক—হরচন্দ্র ঘোষ—ভূমিকা

১২। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ৭৩

১৩। গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্র—মধুস্মৃতি। ২য় সং। নগেন্দ্র নাথ সোম পৃঃ ৫১৫

১৪। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ১১৯

১৫। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত। ৫ম সং। যোগীন্দ্রনাথ বসু পৃঃ ২৪৩

১৬। মধুসূদন—কবি ও নাট্যকার—ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত পৃঃ ১২৭

১৭। কালী প্রসন্ন সিংহ ও তাঁহার নাট্য গ্রন্থাবলী—ডঃ সুশীল কুমার দে, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৪

১৮। স্বর্ণ শৃঙ্খল নাটক—ডঃ দুর্গাদাস কর, ভূমিকা গ

১৯। ঐ ভূমিকা ও

২০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। ২য় সং। ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৭০

২১। উর্বশী নাটক—কামিনীসুন্দরী দেবী—বিজ্ঞাপন

২২। শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান নাটক—পূর্ণচন্দ্র শর্মা. বিজ্ঞাপন

২৩। মেঘনাদ বধ নাটক—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৪১

২৪। মেঘনাদ বধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন—ষষ্ঠ সর্গ

২৫। মেঘনাদ বধ নাটক—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৭৬

২৬। রামাভিষেক নাটক—মনোমোহন বসু, প্রস্তাবনা,

২৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ২৫২

২৮। কীচক বধ নাটক—যাদব চন্দ্র বিদ্যারত্ন, ভূমিকা

২৯। রুক্মিণী হরণ—রামনারায়ণ তর্করত্ন—১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে মূলতঃ গদ্য রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পর্ব হইতে উত্তর যুগের বিভিন্ন শ্রেণীর লেখককুল বিভিন্ন দিক হইতে ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন। ইঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের বহিরঙ্গ রূপটি যেমন সম্পূর্ণতার পথে আসিয়াছে, তেমনি এই সমস্ত রচনার মধ্যে বাঙ্গালী মানসের চিন্তাধারাটিও বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। বিদেশী ভাবের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, দেশ জাতি জীবনের সহস্র অপসঞ্চয়, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অজস্র ক্ষয় ক্ষতির বিরুদ্ধে বাংলার মনীষিকুল অবিরত সংগ্রাম চালাইয়াছেন। শতাব্দীর প্রথম হইতে অবশ্য এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ় হয় নাই। প্রথম দিকে বরং নবাগত বণিকদের কাঞ্চন প্রসাদে এদেশের অনেকেই আত্ম বিক্রয় করিয়াছিলেন। রামমোহনের সময় হইতেই জাতির আত্ম সম্বিত জাগ্রত হয় এবং তাহার ফলে স্বসংস্কৃতি ও স্বধর্মরক্ষার ধর্মযুদ্ধ সুরু হয়। সুতরাং সামাজিক দিকের উত্তপ্ত জিজ্ঞাসাকে উপেক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ সারস্বত সাধনা এইযুগে সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য এই পর্যায়ের রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সৃষ্টির অন্তরালে সমাজ সংস্কারের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রথম দিকে যদিও বা এই উদ্দেশ্য অস্পষ্ট থাকে, রামমোহনোত্তর কাল হইতে ইহা একটি সচেতন প্রয়াস রূপে পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং হিন্দু জাগৃতির সময়ে তাহা একান্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

শতাব্দীর মধ্যভাগের অন্যতম চিন্তানায়ক অক্ষয়কুমার দত্ত বহুলাংশে যুক্তিবাদী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুবিধ আলোচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্মের আওতায় থাকিয়াও তিনি বেদ বেদান্তকে অপৌরুষেয় মনে করিতেন না। নিশ্ছিদ্র জ্ঞানমার্গে আত্মস্থ থাকিয়া তিনি জীবনের সকল দিক পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আস্থা রাখা কঠিন। সেই জন্য হিন্দুর তন্ত্র ও পুরাণকে তিনি বিশ্বাসপ্রদ মনে করেন নাই। পুরাণ-তন্ত্রের ভৌগোলিক বিবরণকে তিনি মিথ্যা ও কাল্পনিক বলিয়া মনে করিতেন।

তবে তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় তিনি অন্যান্য বিষয়বস্তুর সহিত ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তুরও বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতেন। যুক্তিবাদপুষ্ট এই সমস্ত আলোচনা তাঁহার প্রবন্ধ গ্রন্থগুলিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কীয় আলোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের দুইটি খণ্ড যথাক্রমে ১৮৭০ ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলেও ইহাদের অধিকাংশ আলোচনাই তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় অক্ষয়কুমার ভারতীয় ধর্ম দর্শন, মহাকাব্য ও পুরাণের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে ধর্ম দর্শনের এইরূপ ব্যাপক আলোচনায় অক্ষয়কুমারই পথিকৃৎ। রামমোহন একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় বেদান্ত দর্শনকেই সর্বসার করিয়াছিলেন, পুরাণ মহাকাব্যকে তিনি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। অক্ষয়কুমার ভারতীয় দর্শন ও স্মৃতির আলোচনান্তর ভারতীয় মহাকাব্য, পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহের মর্মসন্ধান করিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে রামায়ণই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, এই অভিমতকে অক্ষয়কুমার সমর্থন করিয়াছেন। "রামায়ণের ভাষার প্রাচীনত্ব, তন্মধ্যে সংস্কৃত কথা প্রচলনের নিদর্শন, তাহাতে লিখিত আর্যকুলের বাসসীমা এই কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে পুরাণাদি ত্রিবিধ গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ সমধিক প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠে।"[১] তবে ইহার মধ্যে পরবর্তী কালে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশের সংযোজন হইয়াছে। আদি রচনার উপর নূতন নূতন রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রামায়ণের মধ্যে এতখানি পার্থক্য দেখা যায়। রামায়ণ কাব্যের ভক্তিবাদকে অক্ষয়কুমার ঐতিহাসিক ক্রমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "রামচন্দ্রকে বিষ্ণু অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা প্রচলিত রামায়ণের উদ্দেশ্য বোধ হয়। কিন্তু প্রথমে উহার সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল এরূপ বলিতে পারা যায় না। ...রাম লক্ষ্মণাদিকে বিষ্ণু অবতার বলিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, উত্তরকালে কোন ব্যক্তি রামায়ণের ঐ অংশগুলি তাহাতে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠে।"[২] অক্ষয়কুমার পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ লেসেন, শ্লেগেল প্রভৃতি মনীষীদের মতামত আলোচনা করিয়া রামায়ণের প্রাথমিক রূপ সন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা রাম বা কৃষ্ণের বিষ্ণু অবতার মাহাত্ম্য অংশগুলিকে অসম্বন্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের সিদ্ধান্তও অনুরূপ—"রামায়ন ও মহাভারতে রাম, কৃষ্ণ ও

পরশুরামাদির যে ঐশী শক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মনুসংহিতা সঙ্কলনের পর কল্পিত হইয়াছে বোধ হয়।"[৩]

অনুরূপভাবে মহাভারতও এক সময়ে বা একজনের রচনা নহে। প্রথমে ভারত সংহিতাতে চব্বিশহাজার শ্লোক ছিল, প্রক্ষিপ্ত বচন ও উপাখ্যানে তাহাতে বর্তমানে লক্ষাধিক শ্লোক হইয়াছে। মহাভারত যে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের রচনা, তাহা অক্ষয়কুমার নানাবিধ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। মহাকাব্য দুইটিতে যে ধর্মীয় পরিবেশ আছে তাহাতে বৈদিক এবং পৌরাণিক উভয় রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সিদ্ধান্ত "ঐ উভয়ে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের বিষয় ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। একদিকে বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক উপাখ্যান বিদ্যমান থাকিয়া নিজ নিজ পূর্ব গৌরব প্রকাশ করিতেছে, অপর দিকে পৌরাণিক ধর্ম ও পৌরাণিক উপাখ্যান অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণু শিবাদি পৌরাণিক দেবতাদিগকে হিন্দু সমাজের ধর্মবেদির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেছে।[৪] ইহাদের মধ্যে বেদ ও মনুসংহিতার ধর্ম ব্যবহার যেমন নানাস্থানে প্রকটিত হইয়াছে, তেমনি অনেকক্ষেত্রে সুপ্রাচীন বৈদিক কথাপ্রসঙ্গও বর্তমান আছে। এইরূপ অনেক প্রসঙ্গ আবার অর্বাচীনকালের পৌরাণিক দেব বিশেষের মহিমা প্রকাশ করিয়াছে। এইভাবে মহাকাব্য দুইটি ক্রমশঃ ক্রমশঃ আধুনিক রূপ পাইয়াছে।

শুধুমাত্র বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্মই মহাকাব্যদ্বয়ে প্রকাশ পায় নাই। অক্ষয়কুমার অনুমান করেন মহাভারতের অহিংসাধর্ম, মায়াবাদ ও নির্বাণমুক্তি বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত। হরিবংশকে তিনি পরবর্তী কালে রচিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ীদের গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন।

পুরাণ প্রসঙ্গে লেখক সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। পুরাণের অর্থ অনেক রকম। বেদের সময় হইতেই পুরাণের কথা চলিয়া আসিতেছে। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ বা মহাকাব্যদ্বয়ে যে পুরাণের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা অধুনাতন কালের অষ্টাদশ মহাপুরাণ বা অষ্টাদশ উপপুরাণ নহে। লেখকের মতে ঐ সমস্ত রচনার সময়ে 'পুরাবৃত্ত বিষয়ক গ্রন্থ ও উপাখ্যান বিশেষের' নামই ছিল পুরাণ, পুরাণের সংখ্যা বা ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পুরাণ বা উপপুরাণের উভয়ের সংখ্যাই অষ্টাদশের অধিক এবং ইহাদের প্রাথমিক 'পঞ্চলক্ষণ' বৈশিষ্ট্য পরে পরিবর্তিত হইয়াছে। "এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথন, দেবার্চনা, দেবোৎসব ও ব্রত

নিয়মাদির বিবরণেতেই পরিপূর্ণ। তাহাতে পূর্বোক্ত পঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র।"[৫] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আবার মহাপুরাণের দশাধিক লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। পুরাণের আদি অধ্যায়ের পঞ্চলক্ষণ যে পরে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অক্ষয়কুমার মনে করেন অভিধান কর্তা অমরসিংহের উত্তরকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পর হইতে রঘুনন্দনের সময়ের অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে অর্বাচীনকালের পুরাণগুলি রচিত হইয়াছে।

অতঃপর লেখক বিভিন্ন পুরাণের বিশেষ আলোচনা করিয়া ভাগবত সম্বন্ধীয় বিতর্কে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নহে বলিয়া তিনি মনে করেন। বৈয়াকরণ ব্যোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইহা রচনা করিয়াছেন—পণ্ডিত মহলের এই সিদ্ধান্তকেই তিনি সমর্থন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রেক্ষাপটে অক্ষয়কুমার পুরাণের ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ধর্মীয় উপপ্লবের দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার ঐতিহাসিক মূল্য নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য হইল "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্তির উপাসনা প্রচার ও বিশেষতঃ শিব, বিষ্ণু ও তদীয় শক্তিগণের মহিমা-কীর্তন ও আরাধনা প্রচলন করাই সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য।"[৬] আর ইহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব হইল "ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম একসময় অতীব প্রবল হইয়া উঠে। ... যে সময়ে ঐ ধর্ম এখানে সমধিক ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, সেই সময়ে ও তাহারও উত্তরকালে পুরাণ সকল রচিত হয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব এই ধর্মকে দুর্বল করিয়া হিন্দু ধর্মকে সমধিক প্রবল করাই পুরাণ কর্তাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে। পুরাণে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ উপাখ্যান বিশেষও দৃষ্ট হইয়া থাকে।"[৭]

ভারতের সংস্কৃতি, ইহার ধর্ম ও দর্শন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতীতি ও প্রত্যয় সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' একটি মহাগ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সম্পর্কে যে যুক্তি তর্ক ও তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগের critical আলোচনা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার পার্শ্বে সমসাময়িক অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নায়ক বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রাসঙ্গিক রচনা এই ক্ষেত্রে আলোচ্য। দেবেন্দ্রনাথ সচেতন সাধক, উপনিষদ বেদান্তের আলোচনায় তিনি বেদান্ত ধর্মের

ধারা বহন করিতে চাহিযাছেন। অক্ষয়কুমার যুক্তিবাদী জ্ঞানতাপস, ভক্তি বিশ্বাসের সমূহ নির্মোককে তিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন। তাঁহার কাছে বেদের মাহাত্ম্য খর্ব হইযাছে, পুরাণাদির প্রাধান্য লঘু হইয়াছে, ধর্ম ও দর্শনকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখিযা তিনি ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ ক্ষেত্রে কোনরূপ তত্ত্বালোচনার দ্বারা বিভ্রান্ত হন নাই বা কাহাকেও বিভ্রান্ত করেন নাই। বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ যেমন অক্ষয়কুমারের আশ্রয়, তেমনি তাঁহার আশ্রয় ব্যবহারিক উপযোগিতা।"[৭] "কি করিলে স্বল্পতম সময়ে শ্রেষ্ঠতম ফল পাওযা সম্ভব হইবে সেই চেষ্টায় নিযুক্ত তাঁহার প্রতিভা। তাঁহার বিশ্বাস ছিল নূতন রীতিতে শিক্ষিত হইলে প্রত্যেক উপযুক্ত ছাত্রই দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে।"[৮] সেইজন্য ধর্মান্ধতা বলিতে কোন কিছু বিদ্যাসাগরের ছিল না। তাঁহার মধ্যে স্পষ্টভাবে কোন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীও প্রকাশ পায় নাই। জীবনব্যাপী অনলস কর্মসাধনায় তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে এই শতাব্দীর প্রহেলিকাকে এড়াইয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের একটি স্মরণীয় উক্তির মধ্যে আর্য শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করা যায়। কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জে, আর, ব্যালন্টাইন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্তকে পাঠ্যসূচীর জন্য সুপারিশ করিলে তিনি শিক্ষা পরিষদের সেক্রেটারীকে লিখিযাছেন—**"That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute. These systems false as they are, command unbounded reverence from the Hindus. Whilst teaching these in the Sanskrit course, we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence."**[৯] বেদান্ত সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ, অনেকাংশে ইয়ং বেঙ্গলের বিপ্লবাত্মক কথার প্রতিধ্বনি, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকুলতিলক বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যে অশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়া শাস্ত্রমূল্যকে যে এইরূপ লঘু করিযা দিবেন ইহা কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু এই স্পষ্ট ভাষণের মধ্যেই তাঁহার সমগ্র অন্তর-প্রকৃতি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বিদ্যাসাগর যথার্থই এইরূপ উক্তির দ্বারা ভারতের বহুযুগ সঞ্চিত সংস্কার অহম্মন্যতার মূলে আঘাত করিয়াছেন।[১০]

অপরদিকে লোকাচার ও দেশাচারের উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। একস্থানে তিনি লিখিতেছেন "ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে। ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব ধর্ম বহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিক রক্ষা গুণে, সর্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষ স্পর্শ শূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিক রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্মিকের শেষ, সর্ব দোষে দোষের শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছে।"[১১] বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ নিরোধ করিতে যখন তিনি আন্দোলন সুরু করিলেন, তখন তিনি এই দেশাচারের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। দেশাচার ও স্মৃতির দ্বন্দ্বে তিনি স্মৃতিই গ্রাহ্য বলিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবে তিনি স্মৃতিকার ও শাস্ত্রকার ঋষিদের মতামত আলোচনা করিয়া পরাশর সংহিতা ও বৃহন্নারদীয় পুরাণের নির্দেশকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই শাস্ত্রীয় নির্দেশের সাহায্যেই তিনি লোকাচার নিন্দিত বিধবা বিবাহকে ধর্মানুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাবে তিনি পরাশর সংহিতাকেই বিশেষ ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় বিদ্যাসাগরের যে প্রতিবাদ, তাহা রক্ষণশীল সমাজের শাস্ত্রধর্ম হইতেই উত্থিত। কিন্তু রাধাকান্ত দেবের মত রক্ষণশীল নেতা ও শাস্ত্রধর্মের রক্ষক তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিতে পারেন নাই, আবার র‍্যাডিক্যাল ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেতা রামগোপাল ঘোষও তাঁহাকে আন্তরিক সমর্থন জানাইতে পারেন নাই। শাস্ত্রধর্মের ব্যবহার যে এইরূপ সনাতন পথের বিপরীতমুখী হইতে পারে, ইহা যেমন একদল বুঝিতে পারেন নাই, তেমনি শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া যে এইরূপ প্রগতিশীলতা আসিতে পারে, তাহাও নব্যবঙ্গের অধিনায়কদের অচিন্তনীয় ছিল। যাহা হউক, পুরাণ শাস্ত্রের ব্যবহারের মধ্যে বিদ্যাসাগরের এই সমাজ কল্যাণ কার্যাবলী একান্তভাবে মৌলিক। পৌরাণিক সংস্কৃতির দ্বিবিধ রূপ সমাজে অনুসঞ্চারিত হইয়াছিল। ইহার ভক্তিধর্ম যেমন সাধারণ স্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তেমনি ইহার স্মৃতি বিধান সমাজের উচ্চস্তরের তার্কিক মানস চর্চায় পর্যবসিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর পুরাণ সংস্কৃতির উপর নূতন মানবতা ধর্মের আরোপ করিয়া তাহাকে ব্যবহারিক জীবনোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। শাস্ত্রধর্মের আধ্যাত্মিক গুঢৈষণার প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল না,

কিন্তু তাহাকে সমাজোপযোগী করিবার জন্য তিনি তাহার ব্যবহারিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সাধনার উৎসমূলে একই ব্যবহারিক উপযোগিতার সন্ধান পাওয়া যায়। শুষ্ক সারস্বত দৃষ্টি তাঁহার রচনারাজিকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। জনশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অর্ধ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বর্ণ পরিচয় বা বোধোদয়ের মধ্যে যেমন তিনি জনশিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়াছেন, তেমনি সংস্কৃত উপক্রমণিকা রচনা করিয়া তিনি সংস্কৃত চর্চার পথ সুগম করিয়াছেন। আর এই জনশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপযোগী বিষয়বস্তু হইল প্রাচীন কথা ও সাহিত্য। সেইজন্য বিদ্যাসাগরের রচনার একটি বৃহৎ অংশ ভারতের ক্ল্যাসিক সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার পুরাণ ও মহাকাব্য বিষয়ক রচনাগুলিকে আমরা একে একে আলোচনা করিতে পারি।

বাসুদেব চরিত ॥ বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যরচনা 'বাসুদেব চরিত' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য রচিত হইয়াছিল। ইহা ভাগবতের দশম স্কন্ধের কিছু কিছু ভাবানুবাদ এবং কিছু কিছু ভাষানুবাদ। কিন্তু কলেজের খ্রীষ্টান কর্তৃপক্ষ এইরূপ হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ পছন্দ করেন নাই বলিয়া ইহা মুদ্রিত হয় নাই। পরে ইহার পাণ্ডুলিপিও হারাইয়া যায়। তাঁহার জীবনীকারগণ ইহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন। জীবনীকার বিহারীলাল বলিয়াছেন, "বাসুদেব চরিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণলীলা প্রকটিত, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ভগবদাবির্ভাবের পূর্ণ প্রকটন।"[১২] তবে গ্রন্থটি তাঁহার বৈষ্ণব ধর্মাসক্তির কোনরূপ পরিচয় দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার এই ভাগবত অনুবাদের কারণ সম্বন্ধে ডঃ অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করিয়াছেন "কৃষ্ণজীবনের এই অংশের প্রতি যে মানবীয় রসের প্রভাব আছে, হয়তো মানবরস রসিক বিদ্যাসাগর ভাগবতের এই স্কন্ধের প্রতি সেইজন্যই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।"[১৩] যাহা হউক, এই রচনার দ্বারা বিদ্যাসাগরের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। পরবর্তী কালে তিনি যেমন মহাভারত, রামায়ণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তেমনি সাহিত্য সৃষ্টির প্রারম্ভে ভাগবতকেও চিত্তাকর্ষক কাহিনীরূপেই হয়ত গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

শকুন্তলা (১৮৫৪) ॥ বিদ্যাসাগরের বিখ্যাততম রচনা হইল 'শকুন্তলা' এবং 'সীতার বনবাস'। ভারতীয় ক্ল্যাসিক সাহিত্যের লোকরঞ্জক পরিবেশনে

বিদ্যাসাগর অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার শকুন্তলা উপাখ্যান মহাভারতী শকুন্তলা কাহিনী হইতে আহৃত হয় নাই। ইহা কালিদাসের অমর নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর এই অনুবাদাত্মক রচনার সহস্র ত্রুটি স্বীকার করিলেও ইহা যে সার্থক অনুবাদ কাহিনী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সীতার বনবাস (১৮৬০)॥ রামায়ণ কাহিনীর শেষাংশ লইয়া বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' রচনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অপেক্ষাকৃত পরিণত কালের রচনা। সুতরাং বিদ্যাসাগরের মনোধর্ম কিংবা রচনারীতি ইহার মধ্যে পরিণত হইয়াছে। রামায়ণের শেষ অঙ্ক যে অত্যন্ত করুণ রসাত্মক এবং তাহা যে লোক-সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবে, ইহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইতি-পূর্বে শাস্ত্রধর্মের তীক্ষ্ণ কঠিন যুক্তিগুলি লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াও তিনি ঠিক তাহাদের বিশ্বাস অর্জন করিতে পারেন নাই। সেই লোক সমাজ যে রামায়ণ কাহিনীর পরিচিত অধ্যায়ের প্রতি বিরূপ থাকিবে না, ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যুগ যুগ ধরিয়া রামায়ণ কাহিনী ও রাম সীতার চরিত্র জনমনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। সেই চিত্র চরিত্র কাহিনীকে একেবারে স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিবে, এমনই রচনা হইল 'সীতার বনবাস'। সুতরাং ইহার অন্তরালে একটি লোকরঞ্জন প্রচেষ্টা নিহিত আছে, সন্দেহ নাই। সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়া তিনি ইতিপূর্বে যেমন লোকমনকে প্রবুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তেমনি সীতার বনবাসের মত সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়া লোকমনকে সঞ্জীবিত করিতে চাহিয়াছেন। সকল দেশেই ক্লাসিক সাহিত্যের একটি লৌকিক রূপায়ণ আছে। ইহাতে জনসাধারণ সহজতম উপায়ে জাতির শ্রেষ্ঠ রচনার সহিত পরিচিত হয়। সীতার বনবাস এইরূপ ক্লাসিক রচনার লৌকিক রূপায়ণ।

এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন, "সীতার বনবাস প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তর রামচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত, অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তক বিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তর কাণ্ড অবলম্বন পূর্বক সঙ্কলিত হইয়াছে।"[১৪] লক্ষ্য করিবার বিষয়, সীতার বনবাসকে বিদ্যাসাগর 'প্রচারিত' করিয়াছেন। ধর্ম প্রচারের মত বিদ্যাসাগর এই সনাতন মহাকাব্য কাহিনীকে লোক সমক্ষে প্রচারিত করিতে চাহিয়াছেন। আর ইহা ঠিক বাল্মীকি রামায়ণের ভাবানুবাদ নহে। রামচরিত অবলম্বন করিয়া উত্তর কালে যে কাব্য নাটকাদি

রচিত হইয়াছে, ভবভূতির 'উত্তর রাম চরিত' তাহাদের অন্যতম। বিদ্যাসাগর ভবভূতির করুণ চিত্রের সহিত বাল্মীকির করুণ রসের সংমিশ্রণ করিয়া সীতার বনবাস রচনা করিয়াছেন।

করুণ রস উদ্বোধনে বিদ্যাসাগর বাল্মীকি বা ভবভূতি প্রদর্শিত পথে যান নাই। বাল্মীকি বা ভবভূতির মধ্যে অলৌকিকতার অবকাশ আছে। বাল্মীকি দেবতা বা ঋষিগণের সমক্ষে রামের দ্বারা সীতার পবিত্রতা ঘোষণা করিয়াছেন। বৈদেহী আপন সতীধর্মের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য মাধবী দেবীর বক্ষে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন—

সর্বান্ সমাগতান্ দৃষ্টা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টির বাঙ্‌মুখী ॥
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্মনা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥[১৫]

বৈদেহীর দৃঢ় নিষ্ঠা ও পাতিব্রত্যের সমর্থনে ঋষি কবি পরম অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূতলোত্থিত দিব্য রথে ধরণী দেবী জানকীকে বসাইলেন—

তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতম্।
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসানমনুত্তমম্ ॥
ধ্রিয়মানং শিরোভিস্ত নাগৈরমিত বিক্রমৈঃ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্ন বিভূষিতৈঃ ॥
তস্মিংস্তু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥[১৬]

বিদ্যাসাগর সীতা জীবনের শেষ পর্বে এইরূপ কোন অলৌকিকতা রাখেন নাই। তাঁহার "সীতা বাল্মীকির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, নিতান্ত আকুল হৃদয়ে প্রতিক্ষণেই পরিগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবণ মাত্র বজ্রাহতার প্রায় গতচেতনা হইয়া বাতাহত লতার ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।"[১৭] ইহাই সীতার অন্তিম শয্যা। এইভাবে বিদ্যাসাগরের সীতা 'মানবলীলা সংবরণ' করিয়াছেন, ভূতলোত্থিত কোন দিব্য সিংহাসন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসে নাই।

অনুরূপ ভাবে ভবভূতির ছায়াসীতার কল্পনা ও তাহার সহিত রামচন্দ্রের মিলন দৃশ্যও তিনি পরিহার করিয়াছেন। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী মন এইরূপ কোন অলৌকিকতার ছায়াপথে পরিভ্রমণ করে নাই। সর্বত্রই তিনি কাহিনীকে জীবনরূপ করিয়া উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। একদিকে রামায়ণ কাহিনীর মহত্ত্ব রক্ষা করা, তাহার দেবোপম চরিত্র সমূহের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা, অন্যদিকে তাহার মধ্যে বাস্তবানুগ জীবনানুভূতি প্রকাশ করার দুরূহ কাজটি তিনি সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। মূল রামায়ণ কাহিনীর মর্যাদাহানি না ঘটাইয়া তাহার উপর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করিয়া সীতার বনবাসকে বিদ্যাসাগর আধুনিক কালের বিয়োগান্ত রচনা করিয়া তুলিয়াছেন।

মহাভারতের উপক্রমণিকা (১৮৬০)॥ বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুবাদ কার্যেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই অনুবাদের কিছু কিছু প্রকাশ হইতে থাকে। পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারত অনুবাদে অবতীর্ণ হইলে বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রচেষ্টা হইতে নিরস্ত হন। বিদ্যাসাগরের অনূদিত মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

রামের রাজ্যাভিষেক (১৮৬৯)।। ইহা বিদ্যাসাগরের একটি অসম্পূর্ণ রচনা। বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, চরম বয়সে, 'রামের রাজ্যাভিষেক' নাম দিয়া একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিয়দংশ লিখিত হইলে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রামের রাজ্যাভিষেক' প্রকাশিত হয়। এজন্য, পিতৃদেব, তদীয় উদ্যম হইতে বিরত হয়েন।"-৮ তিনি ইহার সহিত আরও কিছু সংযোজন করিয়া 'রামের অধিবাস' নামক একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের লিখিত অংশতে রামের রাজ্যাভিষেকের প্রারম্ভিক পর্যটুকু আলোচিত হইয়াছে। রাজা দশরথ শারীরিক অশক্ত হইয়া পড়িলে যোগ্য পুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষেক করিতে চাহিলেন। আমাত্যবর্গের নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তিনি পৌরজন, জনপদবর্গ এবং অনুগত ও শরণাগত নৃপতিবৃন্দের মতামত জানিবার জন্য সকলকে রাজসভায় আহ্বান জানাইলেন। রাজা দশরথের প্রস্তাব সকলে একবাক্যে অনুমোদন করিলেন। অতঃপর রাজা সুমন্ত্রকে আদেশ করিলেন রামচন্দ্রকে রাজসভায় আনিতে। রামচন্দ্র আসিয়া যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ

সহকারে পিতৃচরণ বন্দনা করিলেন। রাজা দশরথ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং সকলকে অপরাহ্নে অধিবাস দর্শনের নিমন্ত্রণ করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। রামচন্দ্র অতঃপর লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে জননীদের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া এই আনন্দ সংবাদ পরিবেশন করিলেন। এই পর্যন্ত বিদ্যাসাগর রচনা করিয়াছেন।

সীতার বনবাস যেমন রামায়ণ কাহিনীর সর্বশেষ অংশ, রামের রাজ্যাভিষেক তেমনি ইহার প্রারম্ভিক অংশ। সমগ্র রামায়ণ কাহিনীতে রামচন্দ্রের মহোত্তম চরিত্রটি অপূর্ব ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ সর্বগুণোপেত চরিত্রই ভারতীয় আদর্শে রাজা হইবার উপযুক্ত। রাজ্যাভিষেক প্রাক্কালে স্বয়ং রাজা দশরথ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই রামচরিত্রের অনুপম মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। রামায়ণ কাহিনীর প্রারম্ভে বাল্মীকি রামচরিত্রের যে অপূর্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন, আলোচ্য ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের মধ্যে তাহাই আভাসিত হইয়াছে। শকুন্তলা ও সীতার বনবাসের মত ইহাও যে বিদ্যাসাগরের একটি লোকরঞ্জন প্রচেষ্টা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্ম ধর্মের যে প্রচার এবং প্রসার ঘটিয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়ায় পৌরাণিক ও শাস্ত্র-গ্রন্থের অনেকগুলি অনুবাদ ও অনুবাদাত্মক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম ব্যাখ্যানে নন্দকুমার কবিরত্নের 'সন্দেহ নিরসন' ও 'জ্ঞানসৌদামিনী' এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য রচনা। কাশীনাথ বসু 'বিজ্ঞান কুসুমাকর' (১৮৪৭) নিবন্ধে পুরাণের সৃষ্টি প্রলয়াদি বর্ণনা করিয়াছেন। লোকনাথ বসুর 'হিন্দু ধর্মমর্ম' (১৮৫৬) এই সময়ের আর একটি বিশিষ্ট রচনা। ডঃ সুকুমার সেন শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে রচিত 'জ্ঞানরত্নাকর' নামক গ্রন্থটিকে একটি বিশ্বকোষ জাতীয় রচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১৯] বহুবিধ বিষয়ের আলোচনার সহিত গ্রন্থটিতে শাস্ত্রাদির মর্ম, বিবিধ ধর্মমত ও ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার তথ্য সংগ্রহে অক্ষয়কুমারের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

বাংলাদেশের নারী সমাজের সম্মুখে পৌরাণিক যুগের মহিমময়ী নারীকুলের চরিত্র তুলিয়া ধরিবার জন্ত বিদ্যাসাগর অনুবর্তী লেখক নীলমণি বসাকের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'নবনারী'র (১৮৫২) মধ্যে তিনি রামায়ণ কথা ও ভারত কাহিনী হইতে কয়েকটি বরণীয়া চরিত্রের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

নয়টি নারী চরিত্রের মধ্যে সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী ও দ্রৌপদী এই কয়টি চরিত্র রামায়ণ এবং মহাভারত হইতে গৃহীত। অন্তগুলি প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের ইতিহাসাশ্রিত চরিত্র। লেখক এই মহীয়সী নারীকুলের চিত্র আঁকিয়া আধুনিক যুগের নারী সমাজের কর্তব্য নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। প্যারিচাঁদ মিত্রও ভারতীয় নারীর আদর্শ প্রতিপাদনে অনুরূপ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৮) গ্রন্থে তিনি কয়েকটি পৌরাণিক নারীচরিত্রের কথা আলোচনা করিয়াছেন। প্যারিচাঁদ মিত্র বাঙ্গালী সমাজের একটি সুস্থ রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষার দ্বারা নারী সমাজকে প্রবুদ্ধ করা যাইতে পারে, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। পৌরাণিক জীবনচিত্রকে তিনি সম্পূর্ণরূপে সামাজিক উপযোগিতার দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন।

ডঃ সুকুমার সেন বিদ্যাসাগর অনুবর্তী আরও অনেকগুলি লেখকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন[২৭] যাঁহারা বিবিধ অনুবাদাত্মক রচনা দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর গদ্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আমাদের প্রাসঙ্গিক লেখক হিসাবে কয়েকজনের নাম করা যাইতে পারে। রাখালদাস সরকারের 'রাম চরিত্র' (১৮৫৪), হরানন্দ ভট্টাচার্যের 'নলোপাখ্যান' (১৮৫৫), গোপালচন্দ্র চূড়ামণির 'সীতাবিলাপ লহরী' (১৮৫৬), শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণের 'রামবনবাস' (১৮৮০) প্রভৃতি রচনা রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনী লইয়া লিখিত হইয়াছে। অনুবাদমূলক সাহিত্য হিসাবেই ইহাদের মূল্য সমধিক, তবে পরোক্ষভাবে এইগুলি যে বাঙ্গালী সমাজকে তাহার সনাতন ঐতিহ্য বিষয়ে সজাগ রাখিয়া দিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

অতঃপর প্রাক্ বঙ্কিম যুগে হিন্দু জাগৃতির অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালে হিন্দু কলেজ গোষ্ঠীর কয়েকজন চিন্তানায়কের কথা স্মরণ করিতে হয়। হিন্দু কলেজের প্রথম যুগ বিশেষভাবে বিদ্রোহের যুগ। প্রথম যুগের উত্তপ্ত আবেগ প্রশমিত হইলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু কলেজের রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু সংস্কৃতি উজ্জীবনে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছেন। মধুসূদনও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তীব্র আবেগাহত চিত্তে অদ্ভুত ভাঙন-নাশনের মধ্য দিয়া তিনি কাব্যসৃষ্টিতে যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সংস্কারজীর্ণ সমাজের একটি প্রবল বিস্ময়। হিন্দু সংস্কৃতির সুবিস্তৃত ছায়াতলে বসিয়া তিনি প্রণয় বীণা বাজাইয়াছেন। সে স্বরগ্রাম নিখিলের সারস্বত দরবার স্পর্শ করিলেও তাহা হিন্দু সংস্কৃতিকে ঘিরিয়া নবরাগিণীতে আবৃত্ত হইয়াছে।

আমরা সে প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। রাজনারায়ণ ভূদেবের মধ্যে তাঁহার সমুদ্র শংখের ধ্বনি উত্থিত হয় নাই। উপরন্তু রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম সমাজেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তথাপি হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথে তাঁহার অবদান গভীর ভাবে স্মরণীয়। রাজনারায়ণ বসু তত্ত্বালোচনার দ্বারা হিন্দুধর্মের সারসন্ধান করিতে চাহিয়াছেন এবং ভূদেবচন্দ্র গার্হস্থ্য ও পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া হিন্দু শাস্ত্র ও নীতিধর্মকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। উভয়েব প্রাসঙ্গিক রচনাগুলি হিন্দু জাগৃতির সমকালে বা পরবর্তীকালে লিখিত হইয়াছে বলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে সেগুলি আলোচ্য।

বাংলা কাব্য বা নাটকের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণ কাহিনী যেমন একটি সাহিত্যের আবেদন লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, গদ্য রচনাগুলির মধ্যে ঠিক সেইরূপ হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থগুলি একটি উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হইয়াছে। লোকশিক্ষা বা ধর্মকলহে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ—এইরূপ একটি প্রত্যক্ষ কারণ সম্মুখে রাখিয়া গ্রন্থগুলি লেখা হইয়াছে। অক্ষয়কুমার প্রভৃতি কয়েকজন লেখকের ক্ষেত্রে এগুলি critical আলোচনার বিষযবস্তু হইয়াছে। মননশীল আলোচনার দ্বারা পৌরাণিক আচার সংস্কৃতির মূল্য নিরূপণ আধুনিক যুগের একটি বিশিষ্ট চেতনা। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে এই অনুসন্ধিৎসা একটি সংহত রূপ ধারণ করে। আলোচ্য পর্বে যেন তাহারই ভূমিকা রচিত হয়। সর্বোপরি এই রচনাপঞ্জী একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের পূর্বাভাস সূচিত করিয়াছে। বাংলা দেশের সঞ্চিত ও আগত বিভিন্ন বিপরীতমুখী চেতনা একটি সমন্বয়ের অপেক্ষা করিতেছিল। প্রধানতঃ ধর্ম বিষয়ক বিতর্ক আলোচনা সমাজ চিন্তার কেন্দ্রে ছিল বলিয়া এই সমন্বযের প্রকৃতি যে হইবে ধর্মকেন্দ্রিক, তাহাতে সংশয় ছিল না। রক্ষণশীল চেতনা ক্রমাগত প্রতিরোধ রচনা করিয়া হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, নব্য ইয়ংবেঙ্গল উত্তেজনা শেষে স্নায়ুদুর্বল হইয়া পড়িতেছে, ব্রাহ্ম সমাজ আভ্যন্তরীণ বিভেদ-অনৈক্যে জর্জরিত হইয়া পড়িতেছে—এমত সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংস্কৃতিলোকে নিষ্প্রভ নীহারিকা কণার মত জাগিয়া ছিল। ঐতিহাসিক গতিপথে জাতীয় চিন্তা স্বমার্গে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিলে এই শ্রেণীর রচনা বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হইয়া সূর্যলোকের আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে।

—পাদটীকা—

১। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। ২য় সং। ২য় ভাগ—অক্ষয়কুমার দত্ত পৃঃ ৯০
২। ঐ পৃঃ ৯৭-৯৮
৩। ঐ পৃঃ ৯৯
৪। ঐ পৃঃ ১৬৫
৫। ঐ পৃঃ ১৯৯
৬। ঐ পৃঃ ২৩১
৭। ঐ পৃঃ ২২৩
৮। বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত—ভূমিকা
৯। Council of Education-এর সেক্রেটারী F I. Mouatকে লিখিত বিদ্যাসাগরের পত্র, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩
১০। বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত—ভূমিকা
১১। বিধবা বিবাহ—দ্বিতীয় পুস্তক—বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সমাজ, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস পৃঃ ১৮৫
১২। বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার, পৃঃ ১৪৫
১৩। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৩১৭
১৪। সীতার বনবাস—বিজ্ঞাপন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৫। বাল্মীকি রামায়ণ ৯৭।১—১৬
১৬। ঐ ৯৭।১৭-১৯
১৭। সীতার-বনবাস—বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত পৃঃ ৬১
১৮। রামের অধিবাস—বিজ্ঞাপন, নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন
১৯। বাংলা সাহিত্যে গদ্য। ২য় সং। ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৯৮
২০। ঐ পৃঃ ১১০-১১

সপ্তম অধ্যায়

হিন্দু জাগৃতির স্বরূপ—উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ বাংলাদেশের সমাজজীবনে একটি খর আবর্তের সূচনা করিয়াছে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তার ও ইহার অন্তরালে এ দেশীয় জনগণের ধর্মান্তরিত করিবার সংগুপ্ত প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল চেতনাকে প্রকম্পিত করিয়াছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষা প্রভাব ও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর ভাঙন নাশন প্রচেষ্টা সর্ববিধ দেশীয় সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। ইহার প্রতিরোধ কল্পে রক্ষণশীল সম্প্রদায় যে সম্মিলিত আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা যথেষ্ট দূরদর্শিতার অভাবে সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয় নাই। খ্রীষ্টধর্মের অত্যুগ্র প্রচার ব্যবস্থায় দৃঢ় অবরোধ রচনার জন্য রক্ষণশীল গোষ্ঠী অংভাবে প্রাচীন সংস্কৃতির জীর্ণধারাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। সেইজন্য উনবিংশ শতকের সদ্য জাগ্রত বাঙ্গালী মানসের আহার্য-উপকরণ তাঁহারা সরবরাহ করিতে পারেন নাই। এই যুগসন্ধির সংক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসাকে নিরসন করিতে চাহিয়াছিল ব্রাহ্ম সমাজ। বস্তুতঃ ধর্মান্দোলনের প্রেক্ষাপটে ও যুগ সংকটের চাহিদায় সময়োচিত কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম আন্দোলন সাফল্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও শেষ পর্যন্ত জনমনের আস্থা অর্জন করিতে পারে নাই। খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্ম ধর্মের উভয় ক্ষেত্রের উগ্রতা এবং ঐতিহ্য বিরোধী চেতনা হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করিয়াছিল। হিন্দুধর্মের রক্ষকবৃন্দও শাস্ত্রধর্মের রক্ষার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিলেন। এই আক্রমণ ও নিরোধ, এই অবিরত আঘাত ও প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্যে বাঙ্গালীর একটি প্রতিরোধ শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় জীবনের নিদ্রিত কুণ্ডলিনী শক্তি শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে জাগ্রত হইল। বাংলা দেশের সমাজ, জীবন ও সাহিত্যে এই সুপ্তোত্থিত জীবনচেতনার সুদূর প্রসারী ফলাফল আছে। ইহাই ঐতিহাসিক হিন্দু জাগৃতি, যাহার প্রভাব জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভূত হইয়াছে।

বাংলা দেশের হিন্দু জাগৃতি কোনরূপ আকস্মিক অভ্যুদয় নহে। ইহার পশ্চাতে নিম্নলিখিত কারণগুলি লক্ষ্য করা যায়:

(ক) ক্ষীয়মাণ মিশনারী প্রচেষ্টা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি।

(খ) অবক্ষয়ী ব্রাহ্মচেতনা ও ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্বিভেদ।

(গ) বহিরাগত ভাবচেতনা: আর্যসমাজী আন্দোলন ও থিয়োসফিক্যাল আন্দোলন।

(ঘ) ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত সমাজের মিশ্ররূপ।

(ঙ) নব্যস্বাদেশিকতাবোধ।

(ক) ক্ষীয়মাণ মিশনারী প্রচেষ্টা ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি॥ খ্রীষ্টান মিশনারীদের সুপরিকল্পিত ধর্মপ্রচার ব্যবস্থা ও শিক্ষাত্মক কার্যক্রম এদেশীয় জনমনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। একদিকে কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা কামনা ও অন্যদিকে এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজনে তাঁহাদের বহুল প্রচেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে। ইঁহাদের সমূহ কর্মপ্রচেষ্টার অন্তরালে ধর্মপ্রচারের উগ্র আগ্রহ চাপা পড়ে নাই। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মোদ্যোগ বাংলা দেশে বা ভারতবর্ষের অন্যত্র কিছুটা কার্যকরী হইলেও ধর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের 'মিশন' বিশেষ সফল হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে তাঁহারা যে পরিমাণে বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা কুড়াইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই। ভূরি প্রমাণ বাইবেল অনুবাদ করিয়াও তাঁহারা বাইবেলী সুসমাচারকে জনমনে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। ইহা অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সূচনা শিক্ষিত জনমনের চিন্তা ও চেতনার আলোড়নে অনেক বেশী কার্যকর হইয়াছে। হিন্দু কলেজ ও ইয়ং বেঙ্গলের চেতনা পরোক্ষভাবে মিশনারীদের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিতেছিল। হিন্দু কলেজের দেশীয় উদ্যোক্তাবৃন্দ যুবকদিগের পাশ্চাত্ত্যধর্ম প্রীতিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। প্রথম মদিরাপানের উত্তেজনা এই শিক্ষিত সমাজকে যখন গৃহবিমুখ করিয়াছিল, তখন তাঁহারা হিন্দু কলেজের শিক্ষাধারাকে প্রশস্তি জানাইতে পারেন নাই। শিক্ষা সমৃদ্ধ ছাত্রসমাজের নিকট যখন দেশীয় রীতিনীতি বহুলাংশে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তখন আলেকজাণ্ডার ডাফ ও ডিয়ালট্রির মত মিশনারী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুবর্ণ সুযোগ দেখিতে পাইলেন। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল, হিন্দু সমাজ আতঙ্কিত হইল। কলেজ কর্তৃপক্ষের দেশীয় সদস্যবৃন্দ কলেজের ভিতরে ও বাহিরে ছাত্রদের চিন্তাধারাকে সংযত করিতে চাহিলেন। তাঁহারা কলেজ হইতে ডিরোজিওকে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বাহিরে ডাফ বা ডিয়ালট্রির বক্তৃতা শোনাও নিষেধ বলিয়া আদেশ দেওয়া হইল।[১]

বস্তুতঃ হিন্দু সমাজের এইরূপ আতঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। স্বাধীন চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ হইয়া নব্যযুবকবৃন্দ বহু ক্ষেত্রেই দেশীয় সংস্কৃতিকে

তাচ্ছিল্য করিতেছিলেন। এই উপেক্ষা এবং অবমাননার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হইল অনেকের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ। মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিকেই খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন। ইহার পর একে একে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, গুরুদাস মৈত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে থাকেন। অতঃপর উমেশ চন্দ্র সরকারের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ব্যাপার লইয়া মিশনারীদের সহিত হিন্দু সমাজের ভীষণ সংঘর্ষের সূচনা হয়। ভিলান্ট্রিন প্ররোচনায় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ মিশনারীদের একটি উজ্জল সাফল্য। এইভাবে নব্যবঙ্গের প্রতিভাধর তরুণ সম্প্রদায় যখন খ্রীষ্টধর্মের গণ্ডীভূত হইলেন, তখন হিন্দু সমাজের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল।

ডাফের এই উগ্র ধর্মৈষণা হিন্দু সংহতির একটি প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং হিন্দু সমাজের কর্ণধারগণ সম্মিলিত ভাবে ডাফের প্রচার কার্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের দেবেন্দ্রনাথ খ্রীষ্টীয় বিরোধী দলের অগ্রণী হইলেন। কলিকাতার ভদ্র গৃহস্থগণ এক মহাসভা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহাদের মিলিত প্রচেষ্টায় 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন।[২] আভ্যন্তরীণ গোলযোগে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় বেশী দিন না চলিলেও ইহা যে হিন্দু পক্ষের একটি সবল প্রতিরোধ রচনা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর হইতে মিশনারী প্রচেষ্টা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া যায় এবং হিন্দু সমাজের আবেদন প্রবলতর রূপ গ্রহণ করে।

ডাফের নেতৃত্বে মিশনারী প্রচেষ্টা এবং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত এ দেশীয় কয়েকজন যুবকের ভূমিকা উনবিংশ শতকে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের শেষ আয়োজন। প্রথম যুগের মিশনারীদের মত ডাফের প্রচার পন্থাও ছিল সুপরিকল্পিত। হিন্দুধর্মের বৃহৎ ব্যাপ্তি তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিল, কিন্তু ইহা তাঁহার কাছে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। সুতরাং ডাফ এ দেশীয় তরুণ মনের ভাবতরল ছিদ্রপথে খ্রীষ্টধর্ম-মাহাত্ম্য প্রবেশ করাইতে এক প্রবল প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। ডাফের ধর্ম প্রচার এবং ধর্মান্তরিতকরণের চেষ্টা তাঁহার দীক্ষিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভালভাবেই চালাইয়াছিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় খ্রীষ্ট ধর্ম দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী বিন্দুবাসিনী, যদুনাথ ঘোষ, স্বীয় ভ্রাতা কালীমোহন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এতগুলি ব্যক্তির ধর্মান্তর গ্রহণ নিঃসন্দেহে সে দিনের হিন্দু সমাজকে বিচলিত করিয়াছিল।

খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত লালবিহারী দে তাঁহার সম্পাদিত 'অরুণোদয়' কাগজের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক নীতি উপদেশ প্রকাশ করিতেন। "...এতৎ নূতন পত্রিকা কেবল সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং বিজ্ঞান বার্তাদিতে পূরিত না হইয়া সত্য ধর্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান ধর্মসূচক উপদেশ ও নানাবিধ পরমার্থঘটিত প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইবে।"[৩]

কিন্তু ইহাই বুঝি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের শেষ প্রচেষ্টা। দেশীয় খ্রীষ্টানদের অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কৃষ্ণমোহন প্রমুখ প্রতিভাধর যুবকবৃন্দ দেশাচারের উর্ধ্বে দাঁড়াইয়া আপন শক্তিমত্তায় সমাজ ও জাতীয় জীবনে আসন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম তাহাদের কোন স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে নাই। নেটিভ খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন সিংহ কৌতুককর বর্ণনা দিয়াছেন: "শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগ্‌লো, কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও দুরবস্থার সেবা কর্ত্তে লাগলেন। কৃশ্চানি হুজুক রাস্তায় চল্‌তি লণ্ঠনের মত প্রথমে আশপাশ আলো করে শেষে অন্ধকার করে চলে গ্যালো।"[৪]

ইতিমধ্যে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ধর্ম সম্বন্ধে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ নীতি-বদলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। তাঁহারা মিশনারীদের শিক্ষা প্রচার তথা ধর্ম প্রচারকে নিরুৎসাহিত করিলেন। Lord Ellenborough-এর Despatch-এর মধ্যে মিশনারীদের স্কুলে সাহায্য প্রদান করা অযৌক্তিক বিবেচিত হইয়াছে:

> I feel satisfied that at the present moment no measure could be adopted more calculated to tranquilize the minds of the natives, and to restore to us their confidence, than that of withholding the aid of Government from schools with which missionaries are connected.[৫]

যদিও মিশনারীদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি তর্কের আলোচনা হইয়াছিল, তথাপি দেখা যায় রাণী ভিক্টোরিয়া শাসনকার্যে ধর্মবিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের ঘোষণা করিয়াছেন। মিশনারী প্রচেষ্টার উপর এই নিষেধাজ্ঞা অতঃপর এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকে নিরস্ত করিয়াছে। ডাফ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং স্বাভাবিক ভাবেই অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রচারকার্য স্তিমিত হইয়া পড়ে। এইভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা প্রশমিত হইলে হিন্দু সংস্কৃতির স্বস্বরূপ প্রকাশিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং তাহার ফলাফলও বাঙ্গালী মানসের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে। ডেভিড হেয়ার-ডিরোজিও যে শিক্ষা-ধারার উদ্বোধন করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তীকালে এ দেশের শিক্ষিত সমাজ উৎসাহিত হইয়া গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু কলেজে এই শিক্ষার সূত্রপাত হইলেও তাহা সমগ্র দেশের মধ্যে আলোড়ন তুলিয়াছিল। এই শিক্ষার মধ্যে যে পরিমাণ emotional রূপ ছিল, সে পরিমাণ rational বোধ ছিল না। সুতরাং শিক্ষার্থী মণ্ডলীর মধ্যে কোনরূপ স্থির চিন্তার অবকাশ ছিল না। ইহার ফলে তাঁহারা দেশের সর্বত্রই জীর্ণতা এবং কুসংস্কার লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

শিক্ষাধারার দ্বিতীয় পর্যায়ে লর্ড মেকলে উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সাহায্যে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। লর্ড মেকলের সদম্ভ উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> **I have never found one among them (Orientalists), who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia.**[৬]

শিক্ষার উদারতার দিকে শিক্ষিত তরুণকুল যেমন ডিরোজিও পন্থী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তেমনি শিক্ষার বিস্তৃতির দিকে তাঁহারা মেকলের পূর্ণ সমর্থন জানাইলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন :

> তাঁহারা যে কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্বত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাঁহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন যে, এক সেল্‌ফ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি তাঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল, বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।[৭]

এইরূপ উৎকেন্দ্রিক চিন্তার একটি কারণ অনুমান করা যায়। জীবন ও সংস্কৃতির যে রুদ্ধ গৃহে এতদিন এখানকার মানুষ আবদ্ধ ছিল, তাহা হইতে আকস্মিক মুক্তি পাইয়া মুক্তির প্রত্যক্ষ কারণকেই নব্য শিক্ষিত সমাজ জয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা মুক্তি আনিয়াছে—সংস্কারের বন্ধন মুক্তি, লোকাচারের দাসত্ব মুক্তি। পাশ্চাত্য শিক্ষা স্বাধীনতা আনিয়াছে—ব্যক্তি চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতা, আচার ও

আচরণের স্বাধীনতা। একান্নবর্তী সংসারে, অভিভাবক নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থায় ইহা নিতান্ত তুচ্ছ কথা নহে। এইরূপ একটি বন্ধাহীন মানস কল্পনায় তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাগত জানাইয়াছিলেন এবং সেই প্রেক্ষাপটে দেশীয় চিন্তা চেতনাকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ধীরে ধীরে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে এই প্রাথমিক উত্তেজনা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। মেকলের পরবর্তী কাল হইতে মেটকাফ, লর্ড অকল্যাণ্ড এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের মধ্যে দেশীয় শিক্ষার কিছু কিছু আনুকূল্য দেখা যাইলেও তাঁহারা মূলতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছেন। সরকারী কাজে ইংরেজী ভাষা মাধ্যম হইয়া পড়িল এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করিলেন, The Governor General.......has resolved that in every possible case a preference shall be given in the selection of candidates for public employment to those who have been educated in the institutions thus established, and especially to those who have distinguished themselves therein by a more than ordinary degree of merit and attainment.[৮]

এই ঘোষণার ফলে দেশের সর্বত্র ইংরেজী শিক্ষার প্রসার সুগম হইয়া যায়। ইংরেজী ভাষার মাধ্যম, ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রকৃতি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে দেশের মধ্যে বিস্তৃত হইল। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারেরই পরিণতি।

এইরূপ পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কোন উৎকেন্দ্রিক চিন্তার স্থান হইতে পারে না। প্রথমতঃ প্রয়োজনের দৃষ্টিতে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ইহা নিছক মানসিক চর্চার বিষয়বস্তু হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে উদার নৈতিক শিক্ষার (Liberal Education) যথেষ্ট অবকাশ থাকায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও গভীর হইয়াছিল। প্রথম যুগের উত্তপ্ত আবেগের স্থানে এই যুগে স্থির বুদ্ধি ও প্রত্যয়দীপ্ত অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়াছে। হিন্দু কলেজ গোষ্ঠীর উত্তর যুগ বহুদিক দিয়াই পূর্বসূরীদের হইতে স্বতন্ত্র। মধুসূদনের দৃষ্টিভঙ্গী বৈপ্লবিক হইলেও তাহা অনুসন্ধিৎসা প্রসূত, তাহা একটি জীবনদর্শনানুগ। ভূদেব বা রাজনারায়ণের শিক্ষা তাঁহাদের উন্মার্গগামী করে নাই। আবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রচলনের ফলে যে বিবিধ বিষয়বস্তুর

পর্যালোচনা শুরু হইল, তাহার মধ্যে দেশ বিদেশের সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন পাঠের সমান্তরালে এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শনের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং হিন্দু জাগৃতির পশ্চাদপটে মননশীল বাঙ্গালী সমাজের আত্মানুসন্ধানের পথে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারতা কিছুটা সাহায্য করিয়াছে সহজেই অনুমান করা যায়।

খ। অধক্ষয়ী ব্রাহ্ম চেতনা ও ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্বিভেদ

বাংলা দেশের ব্রাহ্ম আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য রাখিলে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ব্রাহ্ম সমাজ ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে এবং এই আভ্যন্তরীণ মতানৈক্য পরিণতিতে হিন্দু জাগৃতিকে সহায়তা করিয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজ রক্ষণশীল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রগতিবাদী এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গণতান্ত্রিক নীতির পক্ষপাতী ছিল। আদি ব্রাহ্ম সমাজ অনেকাংশে হিন্দু সংস্কার ও আচরণগুলি মানিয়া লইয়াছিল কিন্তু কেশব সেনের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রকৃতি বহুলাংশে বিপ্লবাত্মক ছিল। ব্রাহ্ম আন্দোলন রামমোহনের সময় হইতেই হিন্দু গোষ্ঠীর বিরোধিতা পাইয়া আসিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ জনমনের হিন্দু প্রকৃতির কথা বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। সেইজন্য তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে বরাবরই হিন্দু ধর্মের কাছাকাছি রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কেশব সেনের নেতৃত্বে ইহার অহিন্দু রূপ যখন প্রকট হইয়া উঠিল, তখন হিন্দু গোষ্ঠীর বিরোধিতাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এক দিকে হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা ও অন্যদিকে নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলন হীনবল হইয়া পড়িতেছিল। আচার সংস্কার, উপাসনা পদ্ধতি, উপাসনা ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের আসন, নিয়মতন্ত্র প্রচলন, বিবাহনীতি প্রভৃতি গুরু ও লঘু বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সমাজের প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে এবং নবীন ও নবীনদের মধ্যে অন্তর্বিভেদ প্রবল হইয়া উঠিল। আচার সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রগতিবাদী সম্প্রদায় কোন প্রকার হিন্দু সংস্কার রাখিতে চাহেন নাই। আদি ব্রাহ্ম সমাজ জাতিভেদকে পরিহার করিতে পারেন নাই; জাতিভেদের স্মারকচিহ্ন উপবীত গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহারা হিন্দু রীতি অনুসরণ করিতে চাহিতেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজ উপনিষদ উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া উপাসনা করার পক্ষপাতী ছিল, প্রগতিবাদীগণ সাধারণ লোকমনের উপযোগী ভাবিয়া সেগুলি মাতৃভাষায় সম্পাদন করিতে চাহিতেন। আবার উপাসনা ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের আসন লইয়া প্রাচীন ও নবীন উপাসকদের মধ্যে মহাকলহ সুরু হইল। নবীন

উপাসকমণ্ডলী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য আসন দাবী করিলে প্রাচীন সম্প্রদায় তাহা সমর্থন করিলেন না। কিন্তু নবীন সম্প্রদায় উগ্রতার বশবর্তী হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আসন অধিকার করিতে নিষেধ করা হইল। কেশবচন্দ্রের এই নির্দেশে ক্ষুব্ধ হইয়া নবীন সম্প্রদায় উপাসনা মন্দিরে যাতায়াত বন্ধ করিলেন এবং অন্যত্র একটি স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে এই আসন গ্রহণের অধিকার স্বীকৃত হইলে প্রতিবাদীগণ আবার পুরাতন ব্রহ্ম মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন।*

উপাসনার প্রশ্নটি মীমাংসিত হইলেও নবীন সম্প্রদায় কেশবচন্দ্রের কর্ম পদ্ধতিকে সর্বথা সমর্থন করেন নাই। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য কেশবচন্দ্রের ভারতাশ্রমের সমান্তরালে নূতন শিক্ষায়তন 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্ম সমাজে অন্তর্বিভেদের সুর ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠিতে লাগিল।

ব্রাহ্ম সমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন বিষয়টিও এই সময়ে বিতর্কের সূচনা করে। প্রগতিবাদীদের অনেকেই ইহার জন্য সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র ইহা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। নিয়মতন্ত্রের সমর্থকগণ সমদর্শী নামে একটি পত্রিকা বাহির করিলেন এবং সমদর্শী নামে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করিলেন। স্ত্রী স্বাধীনতার সমর্থকবৃন্দের অনেকেই এই দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। সুতরাং ব্রাহ্ম সমাজের গৃহবিচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া উঠে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়টি হইল বিবাহনীতি। দেবেন্দ্রনাথ যে বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছেন, তাহাতে সাকারোপাসনা, হোম প্রভৃতি কতকগুলি আনুষ্ঠানিক আচার ব্যতীত অধিকাংশই হিন্দু পদ্ধতির অনুরূপ ছিল। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল দেবেন্দ্রনাথের পদ্ধতি পরিবর্তিত করিয়া নিজেদের মনোমত একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে চাহিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নীতির বৈধতা প্রমাণ করিতে চাহিলেন। কেশবচন্দ্রও সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হইলেন। তাঁহাদের মতামত অনুসারে তিনি জানাইলেন উভয় সমাজের বিবাহ পদ্ধতিই অসিদ্ধ।[১০] ব্রাহ্ম সমাজের বিবাহ বিধির অনুকূলে সরকার পক্ষ হইতে 'ব্রাহ্ম ম্যারেজ বিল' পাশ করিবার যে উদ্যোগ চলিতেছিল, তাহা এই মত বিরোধের জন্য রহিত হইয়া যায়। অতঃপর সরকার Native-Marriage Bill নামে একটি নূতন আইন প্রবর্তনের সংকল্প করেন। কিন্তু তাহাও হিন্দু পক্ষের সমর্থন লাভ করিল না। অতঃপর বহু মতবিরোধের মধ্যে Special Marriage Act (Act No. III of 1872) আইনটি পাশ হইল। ইহার

Preamble এ লিখিত হইয়াছে : "Whereas it is expedient to provide a form of marriage for persons who do not profess the Christian, Jewish, Hindu, Muhamadan, Parsi, Buddhist, Sikh or Jaina religion and for persons who profess the Hindu, Buddhist, Sikh or Jaina religion and to legalize certain marriages the validity of which is doubtful."[১] প্রগতিশীল ব্রাহ্ম দল এই আইনের নির্দেশ কাজে লাগাইতে চাহিলেন। সুতরাং হিন্দু ধর্মের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক শেষ হইয়া গেল। কেশবচন্দ্র ঘোষণা করিলেন 'The term Hindu does not include the Brahmo." ইহার প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। আদি ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজের সহিত হাত মিলাইয়া এই প্রতিক্রিয়াকে সবল করিয়া তুলিল। সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা হিন্দু ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা সুরু করিল। নবগোপাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভায় আদি ব্রাহ্ম সমাজের রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। এইভাবে ব্রাহ্ম সমাজের শক্তি হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে।

অতঃপর কুচবিহারের নবীন মহারাজার সহিত কেশবচন্দ্রের নাবালিকা কন্যার বিবাহ যে এতদিনের বিরোধের প্রকাশ্য পরিণতি দান করিয়াছিল, তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এ বিবাহ ছিল নামান্তরে হিন্দু বিবাহ। পৌত্তলিক হিন্দু বংশের সহিত পৌত্তলিক ব্রাহ্ম বংশের বৈবাহিক সম্পর্ককে কেশবচন্দ্রের অনুরাগীবৃন্দ সমর্থন জানাইলেন না। কেশবচন্দ্রের আনুগত্য কাটাইয়া তাঁহারা স্বতন্ত্র ভাবে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ব্রাহ্ম আন্দোলন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতিরোধ এবং হিন্দু ধর্মের সংস্কার—এই উভয় দায়িত্ব সম্পাদনের ভার লইয়াছিল ব্রাহ্ম সমাজ। তাঁহারা খ্রীষ্ট ধর্মের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিয়াছেন। শেষ পর্বে খ্রীষ্ট ধর্মের সহিত সংঘর্ষের প্রকৃতি অন্যরূপ। তখন খ্রীষ্টীয় চেতনা ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে বহুলাংশে সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে কেশবচন্দ্র ও উত্তরকালের ব্রাহ্ম ধর্মের প্রকৃতিই পরিবর্তিত হইতেছিল। খ্রীষ্ট ধর্মের উদার রূপ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহা বিরোধজনিত নিষ্পত্তি নহে, স্বীকরণজনিত মীমাংসা। কিন্তু হিন্দু ধর্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্মের সম্পর্কটি প্রথম হইতে একেবারে বিরোধমূলক নহে। আদি ব্রাহ্ম ধর্ম একপ্রকার হিন্দু ধর্মেরই পরিবর্তিত সংস্করণ। হিন্দু ধর্মের আচার অনুষ্ঠান, পৌত্তলিকতাপুষ্ট

উপাসনা পদ্ধতি, বর্ণাশ্রমধর্মের দৃঢ়তা, জাতিভেদ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক দিকগুলিকে ব্রাহ্ম ধর্ম পরিমার্জনা করিতে চাহিয়াছিল। এইগুলি সংস্কার করিবার পথে ব্রাহ্ম আন্দোলন যে পরিমাণে হিন্দু ধর্মের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে, সেই পরিমাণে তাহা লোকপ্রিয় হইয়াছে। প্রগতিবাদীদের সংস্কার প্রচেষ্টা যেখানে সনাতন বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, সেখানেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। অন্তর্ভেদজনিত বিশৃঙ্খলায় এবং নিয়মনিষ্ঠার ক্ষেত্রে চরমপন্থী হওয়ায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাব জনমনে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। ব্রাহ্ম ধর্মের ক্রমাগত প্রসারে হিন্দু ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার কার্য চলিতেছিল। অতঃপর তাহার প্রভাব হ্রাস পাইলে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

গ। বহিরাগত ভাবচেতনা। আর্যসমাজী আন্দোলন ও থিয়োজফিক্যাল আন্দোলন।

বাংলা দেশের হিন্দু জাগৃতিতে বহিরাগত চেতনা হিসাবে আর্যসমাজের ভাবধারা এবং থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির চিন্তাধারা উল্লেখযোগ্য উপাদান সংযোজন করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে গুজরাটের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক ধর্মের প্রবক্তারূপে সর্ব ভারতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ যে আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহাতে ভারতের অন্যান্য ধর্মমত বিশেষভাবে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ আধুনিক কালে সনাতন বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ সুপরিকল্পিত আয়োজন আর হয় নাই। বাংলা দেশেও এই আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছিল এবং ইহার ফলে এ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। রামমোহনের বৈদিক চিন্তাধারা জনমানসে বেদ চর্চায় যে সম্ভাবনা সূচিত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার উত্তরসূরীগণ পরিপুষ্ট করিতে পারেন নাই। রামমোহন বেদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং বেদান্তের সাহায্যে অন্য মতবাদ খণ্ডন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। স্বামী দয়ানন্দ বেদকেই সর্বসার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার সাহায্যে তিনি হিন্দু খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম—সর্ব মতের অলৌকিকতাপুষ্ট চিন্তা ও দর্শনকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ব্রাহ্ম আন্দোলন সর্বভারতে প্রভাব বিস্তার করিলে—মহারাষ্ট্র অঞ্চলে প্রার্থনা সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। তবে বাংলা দেশের ব্রাহ্ম সমাজের সহিত ইহার মৌলিক পার্থক্য ছিল। প্রার্থনা সমাজ ধর্মক্ষেত্রে কোন নূতন মতবাদ

প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে নাই। সামাজিক ক্ষেত্রে শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারের মধ্যেই তাহার কর্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার কার্যবিধির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও দর্শনের প্রাধান্য ছিল। ইহার মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের অতিরিক্ত প্রভাবহেতু দেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। সমসাময়িক কালে স্বামী দয়ানন্দের আবির্ভাবে পশ্চিম ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের নব উজ্জীবন শুরু হয় এবং অচির কালে তাহার প্রভাব সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

বেদ ব্যতীত অন্য শাস্ত্রগ্রন্থকে স্বামী দয়ানন্দ প্রামাণিক বা সত্য বলিয়া মানেন নাই। তবে তাঁহার মতে অন্য শাস্ত্রে যদি কোন নিরপেক্ষ মতামত আলোচিত হয় এবং তাহা মানুষের মঙ্গল সাধন করিতে পারে, তাহা গৃহীত হইবার যোগ্য। তিনি জানাইয়াছেন, "যদি কেহ মনুষ্য মাত্রেরই হিতৈষীরূপে কিছু জানান, তবে তাহা সত্য বলিয়া বুঝিলে তাঁহার মত গৃহীত হইবে। আজকাল প্রত্যেক মতেই বহু বিদ্বান আছেন। যদি তাঁহারা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত অর্থাৎ যে সকল বিষয় সকলের অনুকূলে এবং সকল মতে সত্য, সেই সব গ্রহণ করিয়া এবং পরস্পরের বিরুদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করিয়া প্রীতি পূর্বক আচরণ করেন ও করান, তবে জগতের পূর্ণহিত সাধিত হইতে পারে।"[১২] বিভিন্ন মতামতের মধ্যে তিনি সত্যকেই অনুসন্ধান করিতে চাহিয়াছেন। "মতমতান্তর সমূহের মধ্যে যে সব সত্য কথা আছে সে সবকে সকলের পক্ষে অবিরুদ্ধ হওয়ায় স্বীকার করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন মতের মধ্যে যে সব মিথ্যা কথা আছে তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে"[১৩] —এই আলোকে তাঁহার 'সত্যার্থ প্রকাশ' রচনা। ইহার মধ্যে তিনি আর্যাবর্তীয়দের বিভিন্ন ধর্মচিন্তার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যে সত্য মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বেদোক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি মান্য করিতে চাহিয়াছেন এবং নবীন পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থের বাক্যগুলি খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন। অতঃপর ইহার মধ্যে তিনি চার্বাক দর্শনের অসারত্ব দেখাইতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে চার্বাক সর্বাপেক্ষা বড় নাস্তিক, তাঁহার মতবাদ প্রচারকে রোধ করা কর্তব্য। চার্বাক দর্শনের সহিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতের কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকায় ইহারাও দয়ানন্দ স্বামীর সমালোচনার বিষয়। জৈনদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বহু অসম্ভব কথায় পূর্ণ বলিয়া সেগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল প্রসঙ্গে তিনি অভিমত দিয়াছেন, "এই পুস্তকে অল্প কয়েকটি মাত্র সত্য আছে, অবশিষ্ট মিথ্যায় পরিপূর্ণ। অসত্যের সংসর্গে সত্য ও বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না, এই কারণে বাইবেল বিশ্বাসযোগ্য নহে।"[১৪] ইসলামের

ধর্মগ্রন্থ কোরাণ সম্পর্কে তাঁহার অভিমত—"এই পুস্তকে যে কয়েকটি সত্য আছে, ঐ সকল বেদ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুকূল বলিয়া আমার পক্ষে যেমন স্বীকার্য্য, সেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ দুরাগ্রহ ও পক্ষপাত রহিত বিদ্বান এবং বুদ্ধিমানদিগের পক্ষেও স্বীকার্য্য। অবশিষ্ট সমস্ত অবিদ্যা এবং ভ্রমজাল ব্যতীত কিছুই নহে। তাহা মানব আত্মাকে পশুতুল্য করিয়া মানবজাতির মধ্যে শান্তিভঙ্গ, উত্তেজনা, উপদ্রব এবং দুঃখ বৃদ্ধি করে।"[১৫]

স্বামী দয়ানন্দ পৌরাণিক সংস্কৃতির পক্ষপাতী ছিলেন না। হিন্দুধর্মের পুরাণতন্ত্র বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদের তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মহর্ষি জৈমিনি পর্য্যন্ত সকলের মত এই যে, বেদ বিরুদ্ধ মত স্বীকার না করা এবং বেদানুকূল আচরণ করাই ধর্ম। কেননা বেদ সত্যার্থ প্রতিপাদক। ইহা ছাড়া যাবতীয় তন্ত্র ও পুরাণ বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া মিথ্যা। সুতরাং বেদ বিরুদ্ধ গ্রন্থোক্ত মূর্তি পূজাও অধর্ম। জড় পূজা দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান কখনও বর্ধিত হইতে পারে না বরং মূর্তি পূজা দ্বারা যে জ্ঞান আছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। অতএব জ্ঞানীদিগের সেবা ও সংসর্গই জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ, পাষাণাদি নহে।"[১৬] পুরাণের মূর্তিপূজাকে তিনি শাণিত যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন। মূর্তিপূজার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে তিনি বলিতে চাহেন যে সাকার উপাসনায় আমাদের মন কখনও স্থির হইতে পারে না, মন নিরাবয়ব বলিয়া নিরাকারেই স্থির হয়। মূর্তিপূজাকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সাধন মনে করিয়া লোকে পুরুষকার রহিত হয়। বিবিধ বিরুদ্ধ স্বরূপ, নাম ও চরিত্র বিশিষ্ট মূর্তিসমূহের পূজারীবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদ বুদ্ধির সূচনা হয়। মূর্তিপূজায় উৎকৃষ্ট ধন ঐশ্বর্যে পূজারীদের চরিত্র-দোষ ঘটে। জড় পদার্থের ধ্যান করিলে মানুষের আত্মাও জড়বুদ্ধিগ্রস্থ হয়। ভারতীয় পঞ্চোপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত—শিব, বিষ্ণু, অম্বিকা গণেশ বা সূর্যের মূর্তি পূজা কোনরূপ পঞ্চায়তন পূজা নহে। তিনি বেদানুকূল পঞ্চায়তন পূজার নির্দেশ দিয়াছেন। মাতা, পিতা, আচার্য, অতিথি এবং স্ত্রীর পক্ষে পতি ও স্বামীর পক্ষে পত্নী—ইহারাই মূর্তিমান দেব। ইহারাই পরমেশ্বর প্রাপ্তির সোপান স্বরূপ।[১৭]

মূর্তি পূজার প্রচলন সম্বন্ধে তিনি বলেন ইহা জৈনদের নিকট হইতে প্রচলিত হইয়াছে। জৈনদের তীর্থঙ্কর, অবতার, মন্দির ও মূর্তির অনুরূপ পৌরাণিক পোপ-গণও ঐগুলি নির্মাণ করাইয়াছেন। জৈনদিগের আদি ও উত্তর পুরাণাদির ন্যায় পৌরাণিকদের অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইয়াছে।

প্রচলিত লোক বিশ্বাসে মহর্ষি বেদব্যাসকে অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা বলিয়া মনে করা হয়। সুতরাং তাঁহার লিখিত গ্রন্থরাজি অপ্রামাণিক হইতে পারে না। বেদার্থ জ্ঞাপক বলিয়া পুরাণবিদ্যাও বেদানুরূপ বলিয়া গৃহীত হয় এবং ইহাদিগকে পঞ্চম বেদ নামেও আখ্যায়িত করা হয়। স্বামী দয়ানন্দ ইহা সত্য বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন, "যে সকল পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ী লোকেরা ভাগবতাদি নবীন কপোলকল্পিত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্যাসদেবের গুণের লেশমাত্রও ছিল না। আর বেদশাস্ত্রের বিরুদ্ধ অসত্য কথা লেখা ব্যাসদেবের ন্যায় বিদ্বান পুরুষের কার্য নহে। কিন্তু তাহা বিরোধী, স্বার্থপর, মূর্খ এবং পাপীদের কার্য।"[১৮] তবে ইহাতে "কিঞ্চিৎ সত্যও আছে। যাহা সত্য তাহা বেদাদি সত্য শাস্ত্রের, কিন্তু যাহা মিথ্যা তাহা পোপদের পুরাণরূপ গৃহের।"[১৯]

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা এবং সমাজ বিধানের ক্ষেত্রে বেদের নির্দেশকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ, উভয়ের সম্পর্ক, সৃষ্টিতত্ত্ব বন্ধন ও মুক্তি, চতুর্বর্গ, বর্ণাশ্রম বিভাগ, রাজা-প্রজা, দেব, অসুর রাক্ষস পিশাচ, পুরাণ-তীর্থ, আচার্য-শিষ্য-গুরু, পুরোহিত-উপাধ্যায়, প্রমাণ, পরীক্ষা, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-নিয়োগ, স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা, স্বর্গ নরক ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক প্রশ্নসমূহ বেদ সমর্থিত উপায়ে মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন এইরূপ সত্য চিন্তাই মানুষের সামগ্রিক মঙ্গল সাধন করিবে।

বস্তুতঃ দয়ানন্দ স্বামীর বৈদিক চিন্তাধারা কলহাকীর্ণ ভারতবর্ষে একটি নূতন পথনির্দেশ দিয়াছিল। ধর্মক্ষেত্রে বৈদিক চিন্তাধারার সমান্তরালে কর্মক্ষেত্রে তাঁহার সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মূল্য কম নহে। সামাজিক ক্ষেত্রে তিনিই শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তক। খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুদের পুনরায় স্বধর্মে ফিরাইয়া আনিবার প্রচেষ্টায় শুদ্ধি আন্দোলনের সূত্রপাত। পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বৈদিক চিন্তাধারার অনুসন্ধানে আর্য সমাজের প্রচেষ্টা সবিশেষ কার্যকরী না হইলেও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে শুদ্ধি আন্দোলন নিঃসন্দেহে সমাজ নায়কদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

বাংলা দেশে আর্য সমাজের কার্য এবং দয়ানন্দ স্বামীর ধর্মপ্রচার বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। কিছু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী ও ব্রাহ্ম সমাজের নেতাগণ

তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিতেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, অধ্যাপক তারানাথ তর্ক বাচস্পতি, পণ্ডিত রাজনারায়ণ গৌড়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডঃ মহেন্দ্র লাল সরকার প্রভৃতি বিদগ্ধ মনীষিবৃন্দ তাঁহার কাছে শাস্ত্র ধর্মের আলোচনা করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম ধর্মের তিন প্রধানই তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বৈদিক ধর্মমত সকলের মনঃপূত হয় নাই। বাংলা দেশের নানাস্থানে তিনি বৈদিক ধর্মমত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে এখানকার শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতমণ্ডলী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। চুঁচুড়ার এক ধর্ম সভায় ধর্ম সম্বন্ধীয় বিতর্ক আলোচনায় তিনি বৈদিক ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মাত্র চারিমাস কাল এদেশে অবস্থান করিয়া তিনি বিপুল আলোড়ন তুলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার বিরুদ্ধে এখানকার পণ্ডিত সমাজ এক প্রতিবাদ সভারও আয়োজন করিয়াছিলেন।

হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবর্গ যখন স্বকীয় উপায়ে ধর্মকে রক্ষণ ও সংস্কৃত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, সেই সময় স্বামী দয়ানন্দও বৈদিক চিন্তার মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ও শাস্ত্র বিচার, তাঁহার প্রবর্তনায় প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার আর্যসমাজ, 'আর্য্যাবর্ত' হিন্দী সমাচার পত্র এবং বহু বৈদিক গ্রন্থের প্রকাশনা বাংলা দেশের হিন্দু জাগৃতির একটি বলিষ্ঠ উপাদান রচনা করিয়াছে। অবশ্য একথা ঠিক, তাঁহার ধর্মচিন্তা ও সত্য সন্দর্শনের রীতি বাংলা দেশে সর্বথা গৃহীত হয় নাই। পাঞ্জাব অঞ্চলে তাঁহার যে সাফল্য ঘটিয়াছিল, বাংলা দেশে তাহা ঘটে নাই। পাঞ্জাবের হিন্দু সমাজ ইসলাম এবং খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের দ্বারা পৌত্তলিক এবং বহুদেববাদের অভিযোগে ক্রমাগত আক্রান্ত হইতেছিল। দয়ানন্দ স্বামীর বাণীতে সেখানকার হিন্দু সমাজ একটি আত্মরক্ষার আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছিল। খ্রীষ্টান এবং ইসলাম ধর্মের অসম্পূর্ণতা দেখাইলে তাঁহারা হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে উৎসাহবোধ করিয়াছিলেন। আবার পাঞ্জাবে তাঁহার বৈদিক ধর্মের ব্যাখ্যাকে কোনরূপ সমালোচনার দৃষ্টিতেও দেখা হয় নাই। কিন্তু বাংলা দেশের সচেতন পণ্ডিত সমাজ তাঁহার ব্যাখ্যাকে নানারূপ জিজ্ঞাসা ও বিতর্কের মাধ্যমে দেখিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার সিদ্ধান্ত অনেক সময় স্বল্পনির্ভরযোগ্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। পৌত্তলিকতা ও বহুদেববাদ সম্পর্কে তাঁহার সিদ্ধান্ত এদেশের মনঃপূত হয় নাই। বাংলা দেশের স্মার্ত পণ্ডিতসমাজ আচার ধর্মে যেমন স্মৃতি ও শাস্ত্রকে অবলম্বন করিতে

চাহিয়াছেন, তেমনি এদেশের বৃহৎ সাধারণ সমাজ পৌরাণিক পৌত্তলিকতার মধ্যে ঈশ্বর শক্তির বিবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা জড় পৌত্তলিকতা বা অর্থহীন বহুদেববাদ নয়। ইহাই স্বামী দয়ানন্দের ধর্মপ্রচারকে জনপ্রিয় করে নাই।[২০] তবে জাতির পুরাণচারী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁহার আবেদন সার্থক না হইলেও সামগ্রিকভাবে হিন্দু সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে তাঁহার প্রচেষ্টা যে আলোক-বর্তিকার কাজ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বহিরাগত থিয়োজফিক্যাল আন্দোলন কয়েক দিক দিয়া হিন্দু জাগৃতিকে পুষ্ট করিয়াছে। থিযোজফি কথাটির অর্থ হইল God wisdom বা ভারতীয় ভাষায় ব্রহ্মবিদ্যা। ইহা কোন বিশেষ ধর্মমত নহে। থিযোজফিক্যাল সমাজের বাহিরেও প্রকৃত থিযোজফিষ্ট থাকিতে পারেন। তবে এইরূপ একটি বিশ্বনীতি ও সর্বধর্মবিশ্বাস লইয়া যে একটি বিশেষ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রসারিত হইযাছিল, তাহাই থিয়োজফিক্যাল আন্দোলন। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা কোন বিশেষ জাতি বা ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। সকল ধর্মের শাস্ত্র গ্রন্থে এই সনাতন চিন্তার অস্তিত্ব আছে। ইহাতে যে দর্শনের কথা আছে তাহা নিখিল মানব জাতির ন্যায়নীতি ও প্রীতি মৈত্রীর সূচনা করিবে। পৃথিবীকে বস্তুতন্ত্রের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য মৈত্রীভিত্তিক সর্বধর্ম বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি বহন করিযা এই আন্দোলন গড়িয়া উঠে।

এই সোসাইটির উৎস দেশ হইল আমেরিকা। কর্ণেল ওলকট এবং মাদাম ব্লাভাটস্কি ইহার উদ্যোক্তা। তাঁহারা ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে পদার্পণ করেন এবং মাদ্রাজে তাঁহাদের কার্য প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারতে থিয়োজফিক্যাল আন্দোলনের সবিশেষ কৃতিত্ব কর্ণেল ওলকট পরবর্তী সোসাইটির সভাপতি অ্যানি বেসান্তের। কিন্তু প্রথম হইতে অর্থাৎ ভারতে সোসাইটির কার্যারম্ভের কাল হইতে অ্যানি বেসান্তের মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯৩৩) সুদীর্ঘ সময়ে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি নিজস্ব প্রকৃতিতে ঐতিহ্যাশ্রয়ী হিন্দু সমাজকে পরিপুষ্ট করিয়াছে।

থিয়োজফিষ্টগণ কি অর্থে হিন্দু জাগৃতির পরিপোষক হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। তাঁহাদের আগমনের পূর্বে হিন্দু ভারতের অবস্থা ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্ম ও সমাজের সংস্কারের উদ্যোগ চলিলেও ধর্মাদর্শের ধ্রুব লক্ষ্য সম্বন্ধে জাতীয় মানস নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। পৌরোহিত্য অনুশাসনের সুদৃঢ় নিগড়ে স্বাভাবিক ধর্ম

চেতনা বাঁধা পড়িয়াছিল। বেদ উপনিষদ ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থের কোন ব্যাপক অনুশীলন না থাকায় জনসাধারণ তাহাদের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে অনবহিত ছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ দেশীয় ধর্ম সংস্কৃতি সম্বন্ধে এক-রূপ বিরূপতা পোষণ করিতেন। জাতীয় জীবনের এই দুর্বলতার ফাঁকে বিদেশী ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সময়ে প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার উদ্বোধন, তাহার গূঢ় মর্মার্থের অনুধাবন এবং প্রাচীন জিজ্ঞাসা বর্তমানের সহিত কি পরিমাণে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে, তাহা পর্যালোচনা করা একান্ত আবশ্যিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেশের অতীত সম্পদ সম্বন্ধে শিক্ষিত জনমানসকে যথার্থভাবে অবহিত করার প্রশ্ন আসিয়াছিল। সর্ব ভারতের বিক্ষিপ্ত ধর্মান্দোলনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, সর্বত্রই এইরূপ একটি অতীতচারণা সুরু হইয়াছে। ভারতীয় অধ্যাত্মবোধের উৎস বেদ সম্বন্ধে নূতন অনুশীলনেরও সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদের এই সংস্কৃতির সন্ধানের পথে থিয়োজফিস্টগণ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। সমকালীন ইতিহাসে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শনকে শ্রদ্ধা করা দূরের কথা, ইহার বিধি-বিধানের উপর অযথা আক্রমণ চালাইয়া গিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে বিদেশীদের পক্ষ হইতে এই আচার সংস্কারের সমর্থন যে আমাদের অতিমাত্রায় উৎসাহিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ ছিল না।

থিয়োজফিষ্ট চিন্তাধারা হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস ও আচরণগুলি সমর্থন করিয়াছে। আধুনিক যুক্তিবাদ যাহা করিতে পারে নাই, শিক্ষিত সমাজের জাগ্রত বোধ ও সনাতন বিশ্বাসের মধ্যে ইহা সেই দুরূহ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছে। ইহা নব্য সম্প্রদায়কে বলিয়াছে যে আধ্যাত্মিক স্ফূর্তির জন্য সামাজিক শুচিতা রক্ষা এবং নৈতিক অনুশাসন পালন করার প্রয়োজন আছে। বিশ্বভ্রাতৃত্ব লাভের পথে স্বধর্মাচরণ পরিত্যাজ্য নহে এবং এইরূপ পূজার্চনার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির যথোচিত বিকাশ ঘটিতে পারে, ইহাও প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল হিন্দু ধর্মে থিয়োজফিষ্ট চিন্তাধারার এই প্রভাব নিরূপণ করিয়াছেন :

"As on the one hand belief in these gods and goddesses did not imply what is called polytheism or meant a denial of the fundamental Unity of the Supreme Being, the Author and Governor of the Universe, and on the other as the

worship of these gods and goddesses by means of sacred texts, resulted in the development of psychic forces capable of contributing to the well being of the worshipper, Theosophy found a new exegesis and apology even for the worship of the most recent additions to the Hindu Pantheon".[২১]

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা অনুপ্রবিষ্ট হইবার পর মিশনারীদের আক্রমণ ও সমালোচনা হিন্দু ধর্মকে আঘাত করিতেছিল। কিন্তু এই বহিরাক্রমণ অপেক্ষা আত্মসংশয়ই আমাদের গভীর শংকার কারণ হইয়াছিল। ইহার ফলে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক দিকই অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি নিন্দনীয় হীনমন্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। থিয়োজফিষ্ট চিন্তাধারা হীনমন্যতা হইতে আমাদের কতকাংশে মুক্তি দিয়াছে। উদার ধর্মমতে বিশ্বাসী বলিয়া থিয়োজফিষ্টগণ মিশনারীদের মত হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করেন নাই। পরন্তু তাঁহার সযত্ন প্রচেষ্টায় ইহার মর্মানুসন্ধান করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। এইরূপ এই আন্দোলন আমাদের ঐতিহ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি বাস্তব প্রেরণা দান করিয়াছিল। সনাতন হিন্দুধর্মের সুবিপুল আধ্যাত্মিকতাকে পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দান করিলে আমাদের বহির্মুখী চেতনা অন্তর্মুখী হইয়াছে এবং আপন ধর্ম-সংস্কৃতির উপর আমাদের আস্থা বর্ধিত হইয়াছে।

ঘ। ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত সমাজের মিশ্ররূপ

আধুনিক কালের এক চিন্তাশীল গবেষক হিন্দু জাগৃতির সামাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে দেশে মধ্যবিত্ত সমাজের বিবর্তনের সহিত হিন্দু পুনরুত্থান ধারার একটি সংযোগ আছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে লর্ড ডালহৌসির আমল হইতে সাধারণ উন্নয়ন কর্মের খাতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সরকারী কাজে অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত হইত। শিক্ষার হার বেশী হওয়ায় শুধুমাত্র উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের লোকই নহে, মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও এই কাজের সুযোগ লাভ করিত। আর্থিক আয় এবং শিক্ষার হার দুই-ই বর্ধিত হওয়ায় সমাজে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কলেবর বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বাংলা দেশে উচ্চ মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমবায়ে একটি মিশ্র মধ্যবিত্ত সমাজ গড়িয়া উঠে। এই সমাজ একান্তই হিন্দুপ্রধান, ইহাতে মুসলমানের হার ছিল অত্যন্ত অল্প। মধ্যবিত্ত সমাজ যখন উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখন তাহার নীতি

ও দৃষ্টিভংগী অনেক উদার ছিল। পরে সমাজের মিশ্ররূপ গড়িয়া উঠিলে তাহার চিন্তাধারা খানিকটা প্রাচীনতা কেন্দ্রিক হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়াছেন :

> সমাজের বর্ণ বিন্যাসের যত নিম্নস্তরে যাওয়া যায়, তত দেখা যায়, তার ঐতিহ্য গোঁড়ামি বাড়ছে। যে কোন সমাজের ক্ষেত্রে একথা সত্য, হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে তো বটেই। সুতরাং বহু বর্ণের সংমিশ্রণে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন বিশাল আকার ধারণ করতে লাগল, তখন তাহার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীও খানিকটা ঐতিহ্য গোঁড়ামির দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করল।[২২]

বস্তুতঃ এইরূপ সিদ্ধান্ত সমাজতত্ত্ব সম্মত। বাংলা দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের কার্যক্রমের সহিত সমাজ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নিঃশব্দ পদচারণা দেশের সামাজিক কাঠামোকে নবরূপ দিতেছিল। শিক্ষা দীক্ষা ও রুজি-রোজগারের বাস্তবক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব ভূমিকা স্বাভাবিক গতিতে আগাইয়া গিয়াছে। এইরূপ বিরাট একটি সামাজিক গোষ্ঠী স্বভাবতঃই তাহার চিন্তাধারাকে সমাজের সর্বস্তরে অনুসঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছে। সুতরাং তাহার ঝোঁক যখন পুরাতন ঐতিহ্যের দিকে পড়িয়াছে, তখন তাহা যে সমগ্র দেশের চিন্তা চেতনাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিবে, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। সমাজ নায়কদের সুপরিকল্পিত সংস্কার মার্জনার অন্তরালে সামাজিক ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত এই সংরক্ষণ প্রচেষ্টা মন্থর হইলেও যে শক্তিশালী ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার নহে।

৬। নব্যস্বাদেশিকতাবোধ

সর্বশেষে বাংলার হিন্দু জাগৃতির পশ্চাতে এদেশের নব্য স্বাদেশিকতাবোধের বিশেষ পরিচয় দিতে হয়। স্বদেশ প্রীতি ও স্বাজাত্যবোধের একটি নবোত্থিত প্রেরণা ধীরে ধীরে সমগ্র সঞ্চারিত হইতেছিল। সমাজ চিন্তার পথে যাঁহারা নানা দিক দিয়া পদক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারাই জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের নিজস্ব বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিলেন। সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু প্রাধান্যের ফলে এই জাতীয়তাবোধ হিন্দুরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সেজন্য যদিও ইহার মধ্যে জাতীয় জীবনের সর্বাত্মক উন্নতির পরিকল্পনা ছিল, তথাপি ইহা স্পষ্ট ভাবেই হিন্দু সংস্কৃতির অনুশীলন চর্চায় পর্যবসিত হইয়াছিল। জাতীয়তাবোধের এই উদ্বোধন ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখযোগ্য যে কয়টি প্রচেষ্টা দেখিতে পাই, সেগুলি হইল রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা', নবগোপাল মিত্রের

উদ্যোগে 'হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা' এবং সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। এই সংস্থাগুলি সেদিনের বলিষ্ঠ চিন্তাধারায় বাংলা দেশের রাজনৈতিক জাগরণের পথিকৃৎরূপে সামাজিক আন্দোলনের পরিপোষক হইয়াছে।

মনীষী রাজনারায়ণ বসু উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের সামাজিক আন্দোলনের বহু দিকে জড়িত ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের নেতারূপে, হিন্দু ধর্মের প্রবক্তারূপে, বিবিধ সমাজ উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের হোতারূপে জাতীয় জীবনে তিনি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বহুবিধ কর্মসূচীর একটি ছিল 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' বা 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজীতে রচিত একটি অনুষ্ঠান পত্রে তিনি ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার কিয়দংশ এইরূপ—

> A restless fermentation is going on in Bengalee Society. A desire for change and progress is everywhere visible. People discontented with old customs and institutions are panting for reform. Already a band of young men have expressed a desire to sever themselves at once from Hindu Society and to renounce even the Hindu name. It is to be feared that the tide of revolution may sweep away whatever good we have inherited from our ancestors. To prevent this catastrophe and to give a national shape to reforms, it is proposed that a Society be established by the influential members of native Society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal. Without due cultivation of national feeling, no nation can be eventually great. This is a fact testified to by all history.[২৩]

এই অনুষ্ঠান পত্র ঐ সালে নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল পেপারে এবং তথা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করিয়াই নব গোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত করিবার বিষয় চিন্তা করেন। অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই হিন্দু মেলার উদ্বোধন হয়।

এই হিন্দু মেলা, চৈত্র মেলা বা জাতীয় মেলা নামেও অভিহিত হইয়াছিল। ১৮৬৭ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। সেই জন্য ইহার প্রথম নাম ছিল চৈত্র মেলা। পরে ইহা হিন্দুমেলা নামে পরিচিত হইয়াছে। চতুর্থ বর্ষ হইতে ইহার অধিবেশনের তারিখ পরিবর্তিত হইয়া মাঘ সংক্রান্তি ও ফাল্গুনের প্রথম কয়েক দিবস নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার যদ্যপি ফল আপাততঃ কিছু দৃষ্টি গোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই।

> একদিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম সাধন, উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয়, ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহাদিগের জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।
>
> ইহার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ, আমরা এই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব।....... অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।[২৪]

হিন্দু মেলার বাৎসরিক অধিবেশনগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সমাজের সংহতি ও উন্নতি বিধায়ক বিবিধ প্রস্তাব, বিদ্যানুশীলনে উৎসাহ দান, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী ব্যবস্থা, স্বদেশী সংগীতের প্রচলন ও নানাপ্রকার দৈহিক ব্যায়াম চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করাই ছিল ইহার বিস্তৃত কর্মসূচী। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া এই মেলার নিয়মিত বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে এক একজন প্রধান বক্তা মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা দিতেন। এই বক্তৃতা

দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া মেলার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করিত। বক্তৃতার সমান্তরালে জাতীয় সংগীত রচনার উদ্যোগ চলিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন : "নবগোপালের সময় থেকে এই নেশন্যাল কথাটা দাঁড়াইয়া গেল। নেশন্যাল সঙ্গীত রচনা হইতে আরম্ভ হইল।"[২৫]

জাতীয় মেলার আদর্শকে কার্যকরী করিবার জন্য জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ জাতীয় মেলা এবং জাতীয় সভা একে অপরের পরিপূরক। জাতীয় সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

> হিন্দু মেলার স্বাক্ষরকারীগণ কর্তৃক এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দু জাতির সর্ব শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ভাবের বর্দ্ধন এবং তাঁহাদিগের স্বাবলম্বিত যত্ন দ্বারা বিবিধ উন্নতি সাধন করাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য। অন্যূন এক মুদ্রা বার্ষিক দান করিলেই হিন্দু নামধারী মাত্রেই এই সভার সভ্যতা পদের অধিকারী হইবেন।
>
> সভা দ্বারা 'হিন্দু মেলা' নামে একটি বার্ষিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সর্ব সাম্প্রদায়িক হিন্দু সমবেত হইয়া স্বজাতীয় সর্ব প্রকার উন্নতি পক্ষে উৎসাহদান ও উপায়াবলম্বন করা হইয়া থাকে। আর প্রতি মাসে একটি করিয়া সভার অধিবেশন হইয়া সভ্যগণ কর্তৃক স্বজাতীয় হিতকর বিষয়াদি আলোচিত এবং দেশীয় পুরাকালিক শাস্ত্রাদি গ্রন্থের অন্তঃসারত্ব প্রদর্শিত হয়।[২৬]

বস্তুতঃ জাতীয় সভার উদ্যোগে আয়োজিত বক্তৃতাগুলি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলা দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ইহাতে আহূত হইয়া সমাজ, ধর্ম, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দিতেন।

ইহার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা হইল ১৮৭২ সালের তৃতীয় অধিবেশনে মনীষী রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা ও রীতি সংস্থাপনী সভা', চতুর্থ অধিবেশনে তাঁহার 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা', পঞ্চম অধিবেশনে মনোমোহন বসুর 'হিন্দু আচার ব্যবহার—সামাজিক ও পারিবারিক', ষষ্ঠ অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা প্রভৃতি। ইহার অষ্টম অধিবেশনে উড়িষ্যা-বাসী পণ্ডিত হরিহর দাস 'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে এই সভার গণ্ডী বহুদূর প্রসারিত হয়। ক্রমে জাতীয় সভার কার্যক্রম শুধু মাত্র প্রবন্ধপাঠ বা বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না, সমাজ হিতকর নানা বিষয়েও ইহা হস্তক্ষেপ করে।

জাতীয় মেলার মধ্যমণি ছিলেন নবগোপাল মিত্র। বস্তুতঃ তাঁহার নিরলস

প্রচেষ্টাতেই ইহা এতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার অন্যতম সহকর্মী মনোমোহন বসু যথার্থই বলিয়াছেন, "যে সকল গুণ দ্বারা বহুজন সাধ্য বৃহৎকাণ্ডের আবিষ্কর্তা ও নিয়ন্তা হওয়া সম্ভব, তাঁহাতে সে সমস্ত গুণ সর্বতোভাবে বিদ্যমান আছে। সেই মহৎ গুণাবলীর শৃঙ্খলে অন্যান্য স্বদেশ হিতৈষী মহাশয়েরা আবদ্ধ রহিয়া কয়েকটি মধুমক্ষিকার ন্যায় অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে স্বদেশের সৌভাগ্য মধুচক্র একখানি রচিত করিয়া তুলিতেছেন।"[২৭]

মিত্র মহাশয়ের কার্যের প্রথম হইতেই সহায়ক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার সম্পর্কেও মনোমোহন বসু মহাশয়ই সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়াছেন। মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক দেখাইয়া তিনি বলেন, "রোম নগরের এক সেনাপতিকে তরবার, অন্যকে ঢাল বলিয়া যেমন উপমা দেওয়া হইত, আমাদিগের বর্তমান জাতীয় অনুষ্ঠান পক্ষে ঐ উভয় মহাশয়ই সেইরূপ সমহিতকারী হইতেছেন।"[২৮] আবার স্বয়ং মনোমোহন বসু মহাশয়ও ইহার একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভার বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। মেলার বিভিন্ন বার্ষিক অধিবেশনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তাঁহার বক্তৃতা। ইহা ছাড়া রাজা কমলকৃষ্ণ, রাজা চন্দ্রনাথ রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাণনাথ পণ্ডিত, শ্যামাচরণ শ্রীমানী প্রভৃতি মনীষিবর্গের প্রত্যেকেই জাতীয় মেলা বা জাতীয় সভার উন্নতির সবিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

জাতীয় মেলা এবং জাতীয় সভা নিঃসন্দেহে তাহাদের প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া গিয়াছে। দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবর্গের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া তাঁহাদের চিন্তাদর্শকে লোক সমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া, স্বদেশী বিষয়বস্তু ও আচার নিষ্ঠার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং সর্বোপরি অকৃত্রিম দেশাত্মবোধের উজ্জীবন ঘটাইয়া জাতীয় মেলা বঙ্গ সমাজের ইতিবৃত্তে একটি প্রধান ঘটনারূপে পরিগণিত হইয়াছে। দেশাত্মবোধক গান বা জাতীয় সঙ্গীত রচনায় ইহাদের দান অপরিমেয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান', গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে' এবং মনোমোহন বসু ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত বাংলা দেশে একটি নব জীবনের স্রোত বহাইয়া দিয়াছিল।

হিন্দু জাগৃতির সহিত জাতীয় মেলার সংযোগ সূত্র আবিষ্কার করা কঠিন নহে। জাতীয় মেলায় যাঁহারা দেশের উন্নতি-অগ্রগতির কথা চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহাদের

সম্প্রদায় ছিল মোটামটি হিন্দু সম্প্রদায়। দেশের উন্নতি অবনতি বলিতে সাধারণ ভাবে হিন্দু সমাজেরই উন্নতি অবনতি বুঝাইত। কেহ কেহ অবশ্য প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন হিন্দু সমাজের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ থাকিলে 'জাতীয়' নামের সার্থকতা কোথায়? ন্যাশন্যাল পেপার ইহার উত্তর দিয়াছিল: "We do not understand why our correspondent takes exception to the Hindoos who certainly form a nation by themselves, and as such a society established by them can very properly be called a national society."[২৯]

আসলে জাতীয়তার ব্যাপক অর্থ তখনও বুঝিবার সময় আসে নাই। বাংলা দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক চিন্তা তখন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কৃষ্টি সম্পন্ন হিন্দু গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়াছিল, অহিন্দু উপাদান প্রকট হইয়া সমাজের গতিবিধিকে বহুমুখী করে নাই। সেইজন্য জাতীয় মেলা সর্বাত্মক গঠন সূচীতে হিন্দু ঐতিহ্যকেই আঁকড়াইয়া ছিল।

বাংলা দেশে জাতীয়তাবোধের ধারাটি হিন্দু মেলা কর্তৃক আরম্ভ হইলে বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃতি ও রাজনীতিমূলক নানা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। অগ্রগণ্য সংস্থারূপে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশির-কুমার ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি, কালীমোহন দাস প্রভৃতি নেতৃবর্গের উদ্যোগে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠিত হইল। লীগের কর্মধারাকে আরও গণতান্ত্রিক করিবার উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ ইহার বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইহারা পৃথক হইয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইণ্ডিয়ান লীগ ধীরে ধীরে ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিল। এইভাবে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বাংলা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি শক্তিশালী সংস্থারূপে গড়িয়া উঠিল। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনই জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন ও বিস্তারের দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা আনিয়া দিয়াছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ বিশেষ ভাবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিল। এই এসোসিয়েশনের মাধ্যমে তাহাদের মর্মবাণী প্রকাশিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। ইহার প্রভাব সম্পর্কে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল লিখিতেছেন:

The Indian Association was the first to organise the political

thoughts and sentiments of this growing educated middle-class directly in Bengal and indirectly outside this province also. The Indian Association was inspired from its birth by the ideal of Indian Unity, and at once set to work to bring the educated intelligentsia of the different Indian provinces upon one broad political platform.[৩০]

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করিয়াছে। আমাদের অধিকারবোধ স্ফুরণের এবং অধিকার পরিপূরণের পথে এই সংস্থার মূল্য অপরিসীম। ইহার সাহায্যে আমরা অত্যাচারী বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার প্রাথমিক প্রয়াস পাইয়াছি। স্বাধিকার লাভের পথে এই রাজনৈতিক প্রচেষ্টা আমাদের সাংস্কৃতিক অন্বেষণকে সুতীব্র করিয়াছে, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। জাতীয় মানসের যে দিকটি উত্তপ্ত জিজ্ঞাসায় বিদেশী শাসকের কাছে আপনার দাবী তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছে, তাহাই অন্য দিকে দেশের সংগুপ্ত ঐশ্বর্যকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিয়াছে। হিন্দু মেলা, জাতীয় সভা বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্যধারা জাতির গঠনাত্মক কর্মসূচী রচনা করিবার পথে তাহার অতীত সম্পদ, ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতির সযত্ন অনুশীলন করিতে চাহিয়াছে।

নব্য হিন্দুধর্মের প্রবক্তাবৃন্দ ॥ রাজনারায়ণ বসু

হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানে যে কয়জন মনীষী আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্ম ধর্মের উন্নতি ও প্রসার কল্পে তিনি জীবনব্যাপী যে অনলস সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে একদিকে যেমন ব্রাহ্ম ধর্মের নব ব্যাখ্যান হইয়াছে, তেমনি অন্য দিকে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। লোকের ধর্মমত আক্রমণ না করিয়া ধর্মে লওয়ানো 'ব্রাহ্ম ধর্মে ব্রহ্মাস্ত্র' বলিয়া তিনি অভিমত পোষণ করিয়াছেন। সেই সময় হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যে যে বিরোধ সংঘর্ষের প্রবলতা ছিল, তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহা নিরসন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে হিন্দু ধর্মেরই একটি বিশোধিত সংস্করণ রূপে দেখিতে চাহিয়াছেন। তৎকালে বিপন্ন হিন্দু ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য যে সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল তিনি তাহাদের মধ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ

করিয়াছিলেন। সেইজন্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহাকে হিন্দু ধর্মের প্রবক্তারূপে গ্রহণ করা অসঙ্গত হইবে না।

রাজনারায়ণ বসুর যুগান্তকারী বক্তৃতা 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নিঃসন্দেহে তাঁহাকে নব্য হিন্দু ধর্ম আন্দোলনের পুরোধা রূপে অভিহিত করিয়াছে। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভায় আহূত হইয়া তিনি এই বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হইয়াছিল। এই বক্তৃতার মধ্যে তিনি হিন্দু ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিকতা ও গূঢ় মর্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই বক্তৃতা হিন্দু ধর্ম বিষয়ে একটি সর্বাত্মক আলোচনা। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র—হিন্দু ধর্মের এই সর্বগ্রাহ্য শাস্ত্রগুলিতে পরব্রহ্মেরই আরাধনা করা হইয়াছে। শ্রুতির মধ্যে পরব্রহ্মের স্বরূপ, স্মৃতির মধ্যে মানবিক কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা ব্রহ্ম লাভের উপায় ও পুরাণ-তন্ত্রে ব্রহ্মলাভের চরিতার্থতার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। পুরাণ তন্ত্রের বহু দেবদেবী এক ব্রহ্মেরই বহু শক্তিকে রূপক ছলে প্রকাশ করিয়াছে।

হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে প্রথমে তিনি হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে প্রচলিত অমূলক প্রবাদগুলি খণ্ডন করিয়াছেন, অতঃপর অন্য ধর্মের তুলনায় ইহার উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন এবং পরিশেষে ইহার জ্ঞান কাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই প্রচলিত প্রবাদসমূহের কতকগুলি ভাবাত্মক এবং কতকগুলি অভাবাত্মক। ভাবাত্মক প্রবাদগুলি হইল—ইহা পৌত্তলিকতাপ্রধান ধর্ম, ইহা অদ্বৈতবাদাত্মক, ইহা সন্ন্যাসধর্মের পরিপোষক, ইহা কঠোর তপস্যা বিধায়ক, ইহা ভক্তি প্রীতি বিবর্জিত নীরস ধর্ম এবং ইহা জাতিভেদ সমর্থক। ইহার অভাবাত্মক দিকগুলি হইল—ইহাতে অনুতাপাশ্রয়ী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নাই, ইহাতে ত্যাগ স্বীকারের কথা নাই, ইহা শত্রুর উপকারের কথা বলেনা, ইহা ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া জ্ঞান করে না। রাজনারায়ণ বসু যমদগ্নি স্মৃতি, মনুস্মৃতি, বিষ্ণু পুরাণ, কুলার্ণব, মহানির্বাণ তন্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, অষ্টাবক্র সংহিতা, মহাভারত ও বিবিধ বেদগ্রন্থ হইতে প্রমাণাদির সাহায্যে এই উভয়বিধ সমালোচনাগুলি খণ্ডন করিয়াছেন। হিন্দু ধর্মের প্রবলতম প্রতিবাদ যে পৌত্তলিকতা, তাহার নিরসন কল্পে বিভিন্ন শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত দ্বারা তিনি বলেন, "যে সকল অল্পবুদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তি নিরাকার অনন্ত পরমেশ্বরকে ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহাদিগের উপাসনার সহায়তার নিমিত্ত ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ কল্পনা হইয়াছে ও বিবিধ পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপের বিধান হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপকে না জানিলে কদাপি মুক্তি লাভ

হয় না। এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে হিন্দু ধর্ম পৌত্তলিকতা প্রধান ধর্ম নহে।"[৩১]

অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইহার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে গিয়া তিনি বলেন যে ইহা সনাতন ধর্ম, অন্য ধর্মের মত কোন ব্যক্তি-নামাঙ্কিত নহে। ইহাতে ব্রহ্মের কোন অবতার স্বীকৃত হয় না। সেমীয় ধর্মগুলির মত ইহাতে কোন মধ্যবর্তী উপাসনা নাই, পরন্তু ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত জানিয়া উপাসনা করা যায়। ইহাতে সকাম এবং নিষ্কাম উপাসনার কথা থাকিলেও ইহা নিষ্কাম উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে। ঈশ্বর মানবের সংযোগ (communion) ইহাতে যেমন যোগ বিষয়ক নিয়ম রীতিতে বিবৃত হইয়াছে, তাহা অন্য ধর্মে নাই। তাহা ছাড়া সর্বজীবে দয়া, পরলোক সম্বন্ধীয় ধারণা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং উদারতায় ইহা অন্যান্য ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। হিন্দু ধর্ম বলে যাহার যে ধর্ম, সে ব্যক্তি সেই ধর্ম আচরণেই উদ্ধার পাইবে। এইরূপ উদারতার জন্য হিন্দুর পৌত্তলিকতা নিন্দনীয় নহে। "যাহারা পুত্তলিকা পূজা করে, তাহারা ব্রহ্মকে না জানিয়াই পুত্তলিকাকে ব্রহ্মের স্থানীয় করিয়া পূজা করে। নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে দেবদেবীর উপাসনা করা কর্তব্য, কিন্তু পৌত্তলিকদের পৌত্তলিকতা পাপকর্ম নহে, তাহা কেবল ভ্রম মাত্র।"[৩২] জীবনের সকল দিকে ও সকল কর্মে এই ধর্মের ক্রিয়া আছে। ইহা শরীর মন, আত্মা বা সমাজ কাহাকেও অবজ্ঞা করে না। ইহাতে রাজনীতি, সামরিক নীতি, সামাজিক নীতি ও গার্হস্থ্য নীতি সকলকেই ধর্মের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ সর্বার্থ সাধক ধর্ম অন্য কোথাও নাই। আবার ইতিহাসের দিক দিয়া ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তবে এই প্রাচীনত্ব ইহাকে অন্তঃসার শূন্য করে নাই, পরন্তু ইহার আভ্যন্তরিক সারবত্তা ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

অতঃপর ইহার জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব। ব্রহ্মের স্বরূপ এবং উপাসনা পদ্ধতি লইয়াই হিন্দু ধর্মের জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদ ইহার প্রধান গ্রন্থ। এই জ্ঞান শাস্ত্র বলে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, মধ্যবর্তীর সহায়তা না লইয়া অব্যবহিতরূপেই ইহাকে দর্শন করা যায়। জ্ঞান আরও হইলে কোন কিছু বস্তু অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, "যেমন শ্যেন মৎস্য উল্কা হস্তে লইয়া প্রার্থিত দ্রব্য দর্শনান্তর হস্তস্থিত উল্কা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞানীব্যক্তি জ্ঞেয় ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া জ্ঞানের গ্রন্থ পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে, তাহার যেমন জলে প্রয়োজন নাই, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি পরম পদার্থকে জানিলে

তাঁহার বেদে প্রয়োজন নাই।"[৩৩] জ্ঞানের উপলব্ধিতে বস্তুর মত কর্মও পরিত্যাজ্য। জ্ঞান একান্তই ধ্যান প্রধান। জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বরোপাসনার স্থানকাল সীমাবদ্ধ নহে, তীর্থও তাঁহার কাছে বাহুল্য মাত্র। উপনিষদ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দ পুরাণ ও মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া তিনি জ্ঞানকাণ্ডের এই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এইভাবে বিভিন্ন দিক হইতে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া উপসংহারে তিনি ইহার সম্বন্ধে সুগভীর আশা পোষণ করিয়াছেন—'আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উথিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে, হিন্দু জাতির কীর্তি গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।"[৩৪]

অশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তৃতা সেদিন হিন্দু সমাজকে নববল দিয়াছিল। ইহার সমর্থনে ও প্রতিবাদে সেই সময় নানারূপ আলোচনা চলিয়াছিল। সোমপ্রকাশের দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণ, সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার কালীকৃষ্ণদেব বাহাদুর তাঁহাকে হিন্দু ধর্মের রক্ষক হিসাবে অকুণ্ঠ প্রশংসা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এমনকি ইংলণ্ডের টাইমস্ পত্রিকাতেও ঐ বক্তৃতার সারাংশ এবং তাহার প্রশংসা বাহির হয়। বস্তুতঃ এই বক্তৃতায় তাঁহার যুক্তি, অনুভূতি ও সিদ্ধান্ত হিন্দু ধর্মের উত্থানে যে প্রবল উদ্দীপনা[৩৫] সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু ধর্ম রক্ষণে তাঁহার আরও একটি প্রয়াস স্মরণীয়। শেষ জীবনে দেওঘর বসবাস করিবার সময়ে তিনি মহাহিন্দু সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার কিরূপ নিষ্ঠা ছিল, ইহাতে তাহা প্রমাণিত হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইংরাজীতে একটি প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটির বঙ্গানুবাদ 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং মূল ইংরাজী প্রস্তাবটিও **'The Old Hindu's Hope'** নামে তিন বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের ভূমিকায় তিনি এই সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন: "হিন্দুদিগের ধর্ম সম্বন্ধ সত্ত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয়ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্য হইবে।"[৩৬] এই মহাহিন্দু সমিতি একান্তই ধর্মমূলক। তিনি বিশ্বাস করিতেন হিন্দু জাতির উন্নতি সাধনে কোন সভা করিতে হইলে তাহাকে অবশ্যই ধর্মকেন্দ্রিক করিতে

হইবে, কারণ হিন্দুর ক্ষেত্রে ধর্ম অপরিহার্য। প্রস্তাবের মধ্যে তিনি হিন্দুত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত হইল, ভারতীয় আর্য বংশোদ্ভব না হইলে হিন্দু হইবে না, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকে পুরাকালীন ইতিহাস বলিয়া না মানিলে হিন্দু হইবে না, সংস্কৃত ভাষা বা তজ্জাত অথবা তদ্ প্রভাবিত ভাষাভাষীরাই হিন্দু, হিন্দুর সংস্কৃত নাম অথবা সংস্কৃত জাত কোন নাম থাকিবে। সর্বশেষে তিনি বলিতে চাহেন যাহারা পরব্রহ্মকে অথবা কোন দেবদেবীকে পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, তাহারা হিন্দু। তাঁহার হিন্দু ধর্মের অভিধা অত্যন্ত ব্যাপক। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীরাও হিন্দু বলিয়া স্বীকার্য। হিন্দু শাস্ত্রে নিরাকার উপাসনা যখন স্বীকার্য, নিরাকার উপাসনাপন্থী ব্রাহ্মগণও তখন অবশ্যই হিন্দুরূপে গ্রাহ্য। নিষ্ঠাবান হিন্দুর মত তিনি মহা হিন্দু সমিতির সভ্যবৃন্দকে গোরক্ষণে যত্নশীল হইতে বলিয়াছেন।

এইরূপে রাজনারায়ণ বসু বহুমুখী কর্মসূচীতে হিন্দু ধর্মের রক্ষণ ও উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

শশধর তর্কচূড়ামণি

অতঃপর হিন্দুধর্মের রক্ষণ ও পুনরুত্থান প্রচেষ্টায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তর্কচূড়ামণি মহাশয় নৈয়ায়িক দৃষ্টি, তার্কিক বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লইয়া হিন্দুধর্মের মর্মে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি এককালে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। এগুলি মূলতঃ ছিল ধর্ম ব্যাখ্যা। ইহাদের মধ্যে তিনি ধর্মের লক্ষণ-প্রকৃতি, ধর্মের প্রয়োজন, ধর্মের উপাদান নির্ণয়, সমাধি লক্ষণ ইত্যাদি গূঢ় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার কয়েকটি ধর্মব্যাখ্যা আলোচনা করা যাইতে পারে। মানবচিত্তে ধর্মের বিকাশ সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> আত্মার যে শক্তি বিশেষের দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির চঞ্চলতা এবং বাহ্য বিষয়াভিমুখ গতি বা বাহ্য বিষয়ে পরিচালনা নিরুদ্ধ হইয়া নির্বাত প্রদীপের ন্যায় উহাদের স্থিরতা সম্পাদিত হয়, সেই শক্তিই সমস্ত ধর্মের বীজভূত ধর্ম। এই শক্তিটির নাম 'নিরোধ শক্তি'। জল সেচনাদি কারণ দ্বারা যেরূপ বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যজ্ঞ ব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা এই নিরোধ শক্তি হইতেই বহুবিধ ধর্ম বিকশিত হয়।[৩৮]

এই ধর্ম বিকাশে হিন্দুধর্মের যজ্ঞব্রতাদির অনুষ্ঠানকে তিনি অপরিহার্য বলিয়া

বিবেচনা করিয়াছেন। হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ তত্ত্ব এবং বর্ণাশ্রমের সমর্থন করিয়া তিনি বলেন :

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনবাসী, ভিক্ষুক—এই চার আশ্রমী দ্বিজাতিরাই একান্ত যত্ন সহকারে দশবিধ ধর্মের সতত সেবা করিবেন। যথা—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়,শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধীশক্তি, আত্মজ্ঞান, যথার্থ ভাব, অক্রোধ—এ দশটিই ধর্মের স্বরূপ।[৩৮]

চূডামণি মহাশয় ধর্মবোধ প্রবুদ্ধ প্রাচীন ভারতের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। সেই আধ্যাত্মিক সমুন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ভারতবর্ষের অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু একদিন এই দেশে সহস্র আত্মদর্শী পরম ঋষির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ভারত ইতিহাসে তাঁহারাই ধর্মের আলোকবর্তিকা। সেই ঋষিকুল এবং তীর্থভূমিসমূহ আমাদের প্রণম্য।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া শারীরতত্ত্বের দিক হইতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলি পালন করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যোগ সমাধিতে শরীর যন্ত্রের কিরূপ উপকার ঘটে, তাহা তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

বিবেকাদির চরম অবস্থায় আত্মা বহুলাংশে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে। আত্মার কোন প্রকার যত্ন বা প্রেরণা শরীরের উপর থাকে না। এই অবস্থায় ফুসফুস হৃদপিণ্ডাদির ক্রিয়া একেবারে নিরুদ্ধ হয়। নিরোধ শক্তির কার্যকালে ব্যুত্থান শক্তির কার্য শিথিল হয়। তখন সমস্ত শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার ন্যূনাতিরেক না থাকিয়া সামঞ্জস্য হয় এবং তাপতড়িতেরও সামঞ্জস্য হয়। এই সময়ে ব্যাধি থাকিলেও শরীর নির্ব্যাধি হয়।[৩৯]

ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রধর্ম এবং শাস্ত্রীয় মীমাংসাকে তিনি চূড়ান্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। সহস্র বৎসরের বিচার বিতর্ক অতিক্রম করিয়া সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত নির্দেশ সত্য, কারণ এগুলি আন্তরিক উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত। "বহিশ্চক্ষু দ্বারা যেরূপ বহিঃস্থ দ্রব্য সকল প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্তশ্চক্ষু দ্বারাও তদ্রূপ অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহের প্রত্যক্ষ করা যায়। তদ্রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াই মহর্ষিগণ—এক একটি অধ্যাত্ম তত্ত্বের নির্ণয় করিয়াছেন।"[৪০]

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আধুনিক যুগে ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার পুনরুজ্জীবন অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। সেই জন্য একদিকে যেমন তিনি হিন্দু ধর্মের প্রত্যক্ষ আবেদনগুলি লোক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন,

তেমনি অন্যদিকে তুমুল তার্কিক দ্বন্দ্বে ব্রহ্মবাদী প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার পথে ধর্মাচরণের লৌকিক পথই অনুসরণ করা বিধেয়, ব্রহ্মবাদীর নিরাকার চিন্তা সেখানে ফলপ্রসূ নয়। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে জনসাধারণের চিন্তাধারা যখন একদেশদর্শী হইয়া পড়িতেছিল, সেই সময় চূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দু ধর্মের অভিনব ব্যাখ্যা তাহাদিগকে সনাতন ধর্মের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "ব্রাহ্মরা সেদিন ঈশ্বরকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করেছিলেন, ঈশ্বর ভক্তি অল্প সংখ্যক লোকের জন্য যে আন্তরিক ব্যাপার ছিল তা মিথ্যা নয়, কিন্তু অনেকের জন্য ছিল মোটের উপর ভাব বিলাসের ব্যাপার—একটি চলতি ধারা; ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয় এই কথা জোর দিয়ে বলায় সেই ভাববিলাসের ঘোর সহজেই কেটে যাওয়া আশ্চর্য নয়।"[৪১] তবে তাঁহার শাস্ত্র ধর্মের তার্কিক ব্যাখ্যা জনসাধারণের মনে স্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে নাই। শাস্ত্র ধর্মের আরও উদার ও যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। ব্রহ্ম নিরাকারে লভ্য, এই ধারণা যেমন সাধারণ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তেমনি নৈয়ায়িক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের উপলব্ধি—ইহাও বৃহৎ সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন

ধর্মান্দোলন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইনি পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে পরিচিত। সাধনার ক্ষেত্রে তিনি যে পথটি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইল ভক্তি মার্গ। বেদান্তের ব্রহ্মচিন্তা, শাস্ত্রীয় যোগসাধনা অথবা তন্ত্রের প্রক্রিয়াদি স্ব স্ব পথে ঈশ্বরোপলব্ধির উপায় নির্দেশ করিয়াছে। এগুলি নিতান্তই জ্ঞান সাপেক্ষ, সাধারণের শক্তি অতদূর পৌঁছাইতে পারে না। কৃষ্ণানন্দ স্বামী সাধারণের ঈশ্বরোপলব্ধির কথাই বলিয়াছেন:

> ব্রহ্মের যাহা নিরুপাধিক, অনবগুণ্ঠিত অনাবৃত স্বরূপ, আমাদের হৃদয় তাহা স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু সেই ব্রহ্ম উপাধ্যবচ্ছিন্ন হইয়া সমষ্টি মায়াশক্তির আবরণে আবৃত হইয়া ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাদিরূপে পরিণত হইয়া যখন আবির্ভূত হন, তখনই আমাদের অন্তঃকরণ তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে। অনন্ত ব্রহ্মকে সান্ত করিয়া অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া—ব্যাপক ব্রহ্মকে কাটিয়া ছাঁটিয়া নিজোপযোগী করিয়া লইতে হইবে।[৪২]

এই দিক দিয়া তিনি পৌরাণিক ভক্তিবাদের সমর্থক।

ভারতীয় সাধনার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি তত্ত্বের কথা তিনি আলোচনা করিয়াছেন:

প্রকৃতির উচ্ছৃংখল প্রকাশকে প্রশ্রয় না দিয়া তাহার স্রোতকে বিপরীতমুখী করিয়া অনাদ্যা প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত করিতে পারিলে ইহা আর বন্ধনের হেতু হইবে না। দুর্মর প্রবৃত্তি মানুষের উপর আধিপত্য করিলে তাহার চেতনা বিনষ্ট হয়। ঈশ্বরোপলব্ধির প্রাথমিক স্তরে এই প্রবৃত্তি সংযম অপরিহার্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে বহির্মুখী গতিকে তিনি সমর্থন করেন নাই। খ্রীষ্টধর্মের যে নির্দেশ বলে—'অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া চল' তাহার মধ্যে অন্ধকারতত্ত্বের গূঢ় উপলব্ধি নাই। ভারতীয় অন্ধকারতত্ত্ব কোনরূপ শূন্যতা নহে। সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর এই অন্ধকার তাহার মধ্য হইতে আলোক নিঃসৃত হইতেছে। এই অন্ধকারই সাধন রাজ্যের প্রধান সহায়। তন্ত্রে অন্ধকারের গুরুত্ব স্বীকৃত, পুরাণেও দেখা যায় অন্ধকারের মধ্যে বিগতাত্মা পিতৃগণের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং যে অন্ধকার সাধন শক্তির উন্মেষক, তাহা পবিত্র দৈবশক্তির প্রস্রবণ, পাশ্চাত্য মানদণ্ডে তাহাকে নিন্দনীয় করা সমীচীন নহে।

আর্যভারতের চারি যুগ, চতুরাশ্রম ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আধ্যাত্মিকতা-শূন্য বর্তমান দিনের কথা চিন্তা করিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। প্রাচীন জীবন চর্যার মহিমা ঘোষণা করিয়া তিনি বর্তমান জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন:

> চতুর্বর্ণাশ্রমিগণ। প্রাণের পুত্তলিকে—সাধের সামগ্রীকে—শাস্ত্রের বিধিবোধিত রীতিনীতি ও কর্মকে বিসর্জন দিবেন না। আলাদীনের পুরাতন প্রদীপের ন্যায় ইহা পুরাতন হইলেও অতি বিস্ময়জনক ও পরমসিদ্ধিদায়ক। নব্য চাকচিক্যময় হাবভাব বিলাসময় যৌবন বঙ্গ তরঙ্গ কুসঙ্গময় প্রদীপের পরিবর্তে যেন সেই পুরাতন জ্বলন্ত দীপ বিসর্জন করিও না।[৪৩]

হিন্দুধর্মের জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদকে তিনি প্রকৃতিতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিয়াছেন। শারীরিক, মানসিক ও প্রকৃতিগত বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা জীবের উর্ধ্বগতি সম্ভব। স্বক্ষেত্রের কর্তব্য সম্পাদন করিলে প্রকৃতি এই উর্দ্ধগতির সহায় হইবে। এইজন্য সাধক, বৈষ্ণব, শৈব বা শাক্ত যাহাই হউন না কেন, তাঁহার বিশিষ্ট রীতি পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহার মতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অঙ্গাভরণও এক একটি উদ্দেশ্য জ্ঞাপক। ইহাতে তাঁহাদের স্বধর্ম থাকে। ইহা না বুঝিয়া তাঁহাদের জীবনচর্যায় হস্তক্ষেপ করিলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।

কৃষ্ণানন্দ স্বামী সহজ সাধনার পথিক। বৈষ্ণব ও শাক্তের ভক্তিবাদই তাঁহার অবলম্বন। বৈষ্ণবের দীনতা ভগবৎ কৃপালাভের অনুকূল, কারণ, "ভিক্ষার দিকেই

ভগবৎকৃপা গতিশীল হয়। হীনতাই ভগবানের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে। অভাবই ভাবশক্তিকে আহ্বান করে। শূন্যতাই পূর্ণতার আবির্ভাব করে। সুতরাং রীতিমত ভিখারী হওয়া বড় সৌভাগ্যের কথা, দুর্দশার কথা নহে।"[৪৪] আবার শাক্তের মাতৃ উপাসনাই সর্বাপেক্ষা সহজ, কারণ, "যে মাতৃভাব আমাদের অস্তিত্বের আদি হইতে আমাদের মন, প্রাণ অন্তরাত্মায় ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত, ভাবস্বরূপ ভগবানকে পাইবার জন্য সেই ভাবই আমাদের সহজ সাধ্য সাধনা। কেননা উহাই প্রাকৃতিক পন্থা।"[৪৫] বৈষ্ণব ও শাক্তের তথাকথিত বিরোধকে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই, ইহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ভক্তিবাদকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন। সমসাময়িক কালে হিন্দুধর্ম সম্পর্কীয় উত্তপ্ত আলোচনায় যে বিশুষ্ক জ্ঞানচর্চা ও শাস্ত্রীয় বিতর্কাদি চলিতেছিল, সে ক্ষেত্রে তাঁহার সহজ ভক্তিবাদের আহ্বান জনচিত্তকে গভীর আশ্বাস দিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র

হিন্দুধর্মের প্রবক্তারূপে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব পূর্ববর্তী মনীষিবর্গের অপেক্ষা ন্যূন নহে, পরন্তু অনেকাংশে তাঁহাদের অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরব অধিক। ইহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশ ও জীবনের একটি অবিস্মরণীয় প্রভাবরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সমকালীন দেশ জীবন, উত্তরকালের জীবনাদর্শ এবং পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্য তাঁহার দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সুনিপুণ শিল্পী হিসাবে তিনি যেমন 'সাহিত্য সম্রাট' নামে অভিহিত হইয়াছেন, তেমনি যুগ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে চিন্তানায়ক আখ্যা প্রদান করাও অসঙ্গত নহে। বস্তুতঃ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর সংশয়-সংকট-বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্বকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া একটি যুক্তি-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা সমন্বিত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই নির্দেশনা হিন্দুধর্মের পক্ষপুট আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সুদীর্ঘ কালের জীবনচিন্তায় তিনি বিবিধরূপে ইহার আন্তর সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ববর্তী কালে দ্বন্দ্ব-কলহের ক্রমাগত সংঘর্ষে কোন স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। বলিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রই বহুল বিতর্কিত ধর্ম জিজ্ঞাসার একটি স্থায়ী মীমাংসা দিয়াছেন এবং তাহাই পরবর্তী কালে আরও সম্পূর্ণ ও পল্লবিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যানে বঙ্কিমচন্দ্রের সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাঁহার জীবনের শেষ পর্যায়ে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন, "'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র সূচনা কাল হইতেই তিনি শান্তির পথ সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন এবং পিতামহ

ভীষ্মের মত পথভ্রান্ত বাঙালীকে পথের নির্দেশ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যকে তিনি সম্মান করিতেন এবং সমসাময়িক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বুঝিযাছিলেন যে, আত্মবিস্মৃতিই হিন্দুজাতিব অবনতির কারণ। আত্মবিস্মৃতকে আত্মসচেতন করাই তাঁহার শেষ জীবনের লক্ষ্য ছিল।"[৪৬] কিন্তু ইহার পূর্বেই তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতেই তাঁহার সাহিত্য সাধনা ও চিন্তাদর্শ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহা যে কোন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা নহে, তাহা তিনি স্পষ্ট-ভাবেই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যা পত্র সূচনাতে তিনি বলিযাছেন, "এই পত্র কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয নাই।"[৪৭] বঙ্গদর্শনে বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা প্রকাশিত হওয়ায় এই পত্র সূচনার তাৎপর্য সিদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। আধুনিক গবেষক বঙ্গদর্শনের রচনাগুলির শ্রেণী বিভাগ দেখাইয়া তাহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-চিন্তার অঙ্কুর লক্ষ্য করিয়াছেন।[৪৮] ইহার প্রথম শ্রেণীর রচনায় আছে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনা, নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ, য়ুরোপীয সভ্যতার আলোচনা ইত্যাদি, দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা হইল উদ্দীপনামূলক। ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনার দ্বারা বাঙ্গালীকে কর্মগৌরবে উদ্দীপিত করাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য। আর তৃতীয় শ্রেণীর রচনা হইল উপন্যাস কবিতা ইত্যাদি। লেখক যথার্থই অনুমান করিয়াছেন, "পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র শাণিত করতে চেয়েছেন বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মশক্তিকে আর এই সৃষ্টিমূলক রচনায় শাণিত করতে চেযেছেন বাঙালীর হৃদয় এবং রসানুভব শক্তিকে। পরে বঙ্কিম মনুষ্যত্বকে জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী এই তিন বৃত্তির সমন্বয় বলে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র তারই সূত্রপাত করেছিলেন, যদিও এই সময়ে অনুশীলনতত্ত্ব স্পষ্টরূপে তাঁর মনে ধরা দেয় নি।"[৪৯] বঙ্গদর্শনের এই ধারা তাঁহার সম্পাদিত চারি বৎসরের মধ্যেই শুধু রক্ষিত হয় নাই, পরবর্তীকালেও অনুসৃত হইযাছে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা বা ধর্মতত্ত্বের আলোচনা বঙ্গদর্শনেই সূচিত হইযাছে বলা যায় এবং এই আলোচনার পরিণতি ঘটিযাছে 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'। তবে বঙ্গদর্শন ও প্রচার-নবজীবনের ধর্মজিজ্ঞাসা এক নহে। রসস্রষ্টা বঙ্কিম পরিণতিতে হিন্দুধর্মের গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং রস সাহিত্য বা ধর্মালোচনা সব কিছুর মধ্যেই তিনি পরম অভিষ্টকে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন।

যুগের সকল মনীষীর মত বঙ্কিমচন্দ্রকেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকের সহিত সংঘর্ষে নামিতে হইয়াছে। এই সংঘর্ষের সূত্রপাতেই তাঁহার হিন্দুধর্ম আলোচনা স্পষ্টরূপ লাভ করে। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ পাদরী হেষ্টির সহিত বাদানুবাদ তাঁহার ধর্মীয় জীবনেতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শোভাবাজার রাজবাড়ীর শ্রাদ্ধসভায় গৃহবিগ্রহ গোপীনাথজীকে রৌপ্য সিংহাসনে স্থাপন করা হইলে হেষ্টি সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং হিন্দুধর্মকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'রামচন্দ্র' ছদ্মবেশে এই আক্রমণ প্রতিরোধে অবতীর্ণ হইলেন। 'স্টেটস্‌ম্যান' সংবাদ পত্রে উভয়ের দীর্ঘ মসীযুদ্ধ চলে। আমরা ইহার মধ্যে হিন্দুধর্ম রক্ষক বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি।

হিন্দুধর্মের কতকগুলি বিষয়ের উপর হেষ্টিসাহেব নির্মমভাবে আক্রমণ করিয়াছে। হিন্দুর দেবমূর্তি সম্বন্ধে তিনি শ্লেষাত্মক মন্তব্য করিয়াছেন:

> No delicate mind can look into a 'Shiva' temple without a shudder. The horrid and bloody 'Kali', with her protruding tongue, her necklace of Skulls and her girdle of giant hands, is fitted only to excite terror and despair. The elephant headed, huge paunched Gonapati may excite the ridicule even of children, but can never draw forth their love. And to take the special example in point of the Krishna cult, what is at the best, with all its merry music and mincing movements, but the apotheosis of sensual desire and the idolatry of merely finite life.[৫]

হিন্দুর প্রতিমা পূজাকে তিনি তীব্রতর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন:

> And this debasing idolatry produced, according to the painful testimony of native writers themselves, a mass of shrinking cowards, of unscrupulous deceivers, of bestial idlers, of filthy songsters, of degraded women and of lustful man... ...It has encouraged and consecrated every conceivable form of licentiousness, falsehood, injustice, cruelty, robbery and murder. It has taught the millions every possible iniquity by the example of their gods.[৬]

ইউরোপীয় যুক্তি ধর্মের বিচারে তিনি হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থতা প্রমাণের জন্য দ্বান্দ্বিক আহ্বানও জানাইয়াছেন :

It is really a challenge to all the Pandits of Bengal to show that they understand their own sacred literature and are able to defend it at the bar of modern science.[৫২]

বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি পত্রে এই আক্রমণাত্মক অভিযোগগুলির উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যুত্তরের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়।

প্রথমত: বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মকে কতকগুলি বিশুদ্ধ তত্ত্বের সমষ্টি বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন ইহা গভীর নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সজীব সত্তা বিশেষ :

Hinduism, like every other fully developed religious system, consists of firstly, a doctrinal basis or the creed ; Secondly, a worship or rites ; and lastly, of a code of morals more or less dependent upon the doctrinal basis. This is the whole field of study.......So long as the student of Hinduism keeps this great idea before him, he will find Hinduism a living organism which has grown, and not a collection of dead formula lumped together by finest craft.[৫৩]

আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতিকে যে শক্তির বহিঃপ্রকাশ বলিয়া মনে করে, তাহা হিন্দু শাস্ত্রে স্বীকৃত। হিন্দুর শক্তিসাধনা এই প্রকৃতি জয়েরই প্রচেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে শক্তিতত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুর ত্রিমূর্তি উপাসনা :

They worship nature as 'Force', 'Shakti' literally and ordinarily means force or energy. As destructive energy, force is 'Kali' hideous and terrible, because destruction is hideous and terrible. As constructive energy, force is the bright and resplendent 'Durga.' The Universal soul is also worshipped, but in three distinct aspects, corresponding to the three qualities ascribed to it by Hindu philosophy. These are known in English translations as Goodness, Passion and Darkness. I translate them as Love, Power

and Justice. Love creates, Power preserves, Justice dooms. This is the Hindu idea of Brahmā, Vishṇu and Śiva."[৫৪]

মূর্তি কল্পনার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন :

The passionate yearnings of the heart for the Ideal in Beauty, in Power and in Purity, must find an expression on the world of the Real Hence proceed all poetry and all art. Exactly in the same way the Ideal of the Divine in Man receives a form from him and the form an image.[৫৫]

হিন্দুধর্মের আবশ্যিক উপাদানগুলিই বঙ্কিমচন্দ্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহার সহিত অনেক প্রয়োজনাতিরিক্ত উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে যেগুলি বহুলাংশে সমাজ-নীতি সংক্রান্ত, সর্বতোভাবে ধর্ম সংক্রান্ত নহে। আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য, সামাজিক বর্ণভেদ প্রভৃতি সমাজনীতিরই অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসায় এগুলি একেবারে অপরিহার্য নহে। প্রতিমাপূজার মধ্যেও প্রতিমার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অভিষ্ট, ইহার বহিরূপের উপাসনা ভ্রান্তিমূলক। এইভাবে গ্রহণ ও পরিবর্জনের মধ্য দিয়া তিনি হিন্দুধর্মের সার তত্ত্ব'কই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন—"I leave the kernel without the husk."

হেষ্টিসাহেবের অহঙ্কারোক্তি ছিল :

If none of them—not even the modern 'Ramchandra' himself—can come forward and bend this bow of a Western Janaka, let the champions of Hindu idolatry henceforth 'hide their diminished heads' before the more powerful scholars of Europe.[৫৬]

দীর্ঘ পত্রযুদ্ধ হিন্দু ধর্মের প্রকর্ষ উদ্ঘাটিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পরিশেষে বলিলেন :

I hope Mr. Hastie now understands how I dispose of his challenge. The modern Ramchandra turns away from the Western Janaka's bow without touching it even with the tip of his little finger......If Mr. Hastie knows anything of Hinduism, he knows that the Hindu places the wreath round the full, not round the empty vessel.[৫৭]

এমন প্রকাশ্যভাবে বঙ্কিমকে কোনদিন ধর্মযুদ্ধে নামিতে হয় নাই। ইহার মধ্যে তাঁহার প্রতিরোধ ব্যবস্থার সুনিপুণ ব্যূহরচনাই শুধু দেখিতে পাই না,

তাঁহার ধর্মান্বেষণের প্রকৃতিও উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই বিতর্ক আলোচনার সূত্র ধরিয়াই বঙ্কিমের ধর্ম জিজ্ঞাসা পরবর্তী কালে সম্পূর্ণতা লাভ করে।

বঙ্কিম সমসাময়িক কালে দেশের মধ্যে হিন্দুজাগৃতির সূচনা হইয়াছে। তিনি ইহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মতামত অত্যন্ত যুক্তিবাদী। ধর্মকে কোনদিনই তিনি আচার অনুষ্ঠান বা শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের মধ্য দিয়া দেখেন নাই। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত এইখানে তাঁহার পার্থক্য ছিল। চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম নির্দেশ আদৌ স্থায়ী হইবে না, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কারণ ইহা একান্তই আচারনিষ্ঠ। সমস্ত আচার ধর্মানুগ বা মানবহিতকারী নহে বলিয়াই ধর্মের কষ্টি পাথরে এগুলি গ্রাহ্য নহে। হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ মনুসংহিতার নির্দেশ মত সর্বদা সমাজে বসবাস করাও সম্ভব নহে। বিভিন্ন উদাহরণ দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে "সর্বাংশে শাস্ত্র সম্মত যে হিন্দু ধর্ম, তাহা কোনরূপে এক্ষণে পুনঃ সংস্থাপিত হইতে পারে না, কখন হইয়াছিল কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। আর হইলেও সেরূপ হিন্দুধর্মে এক্ষণে সমাজের উপকার হইবে না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।"[৫৮] যুগ যুগান্তের পরিচর্যায় হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় দিকটি অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা যে ধর্মের অন্তর রহস্যকে বহুলাংশে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এইখানেই প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। সনাতনপন্থীদের তিনি বলিয়াছেন যে কেবল মাত্র সত্যের লক্ষণ দেখিয়াই এই বিশাল কলেবর হিন্দুধর্মের মর্মোদ্ঘাটন করা সম্ভব, কোন শাস্ত্রীয় নির্দেশে নহে।

আবার ব্রাহ্ম সমাজের সহিতও তাঁহার ধর্মীয় দৃষ্টির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। সনাতন হিন্দু সমাজ যেমন অনুশাসনের ভক্ত ছিল, ব্রাহ্ম সম্প্রদায় তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা ভক্তি প্রণোদিত পৌরাণিক সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম চেতনাকে চরম এবং পরম করার ফলে তাঁহারা ধর্মের মানবিক আবেদনকে যথোচিত মূল্য দিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র মানববাদী দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের আলোচনা করিলে তাঁহাদের বিরাগ ভাজন হন। এমনকি, মনীষী রাজনারায়ণ বসুর মত হিন্দুধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিও এজন্য তাঁহাকে 'নাস্তিক অথচ কোমৎ মতাবলম্বী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের পৌরাণিক আবর্জনাকে সযত্নে পরিহার করিয়াছেন, কোনরূপ অলৌকিকতা বা অতিভক্তিকে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু তিনি যে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন পৌরাণিক চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ মানবরূপকে।

তিনি হিন্দুধর্মকে নিষ্কাশিত করিয়া একপ্রকার অনুশীলন তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার সার কথা হইল 'শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসকলের অনুশীলন। তজ্জনিত স্ফূর্তি ও পরিণতি। সেই সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য। তাদৃশ অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃপ্তি।'[২৯] কিন্তু বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে ধর্ম সম্যক স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টিয়ানের ধর্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল। 'Impersonal God'-এর উপাসনা নিষ্ফল, যাঁহাকে Personal God বলা যায় তাঁহার উপাসনাই সফল। আর এই জন্যই ঈশ্বরের সর্বগুণ সম্পন্ন যে কৃষ্ণ চরিত্র যাঁহার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে, যাঁহার মধ্যে স্ফূর্ত বৃত্তিসমূহ সর্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং তজ্জনিত যিনি সর্বলোকের সর্বহিতে রত, তিনিই আরাধ্য।[৩০]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই নব্য হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মবাদীগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহার উপর কতকগুলি অভিযোগ আরোপ করিয়াছিলেন। তিনি নিরীশ্বরবাদী (দ্বিজেন্দ্রনাথ), তিনি নাস্তিক কোম্‌তবাদী (রাজনারায়ণ বসু), তিনি অসত্যের সমর্থক (রবীন্দ্রনাথ)। বঙ্কিমচন্দ্র 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' প্রবন্ধের মধ্যে অভিযোগগুলির উত্তর দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে তাঁহার ধর্মব্যাখ্যা আদি ব্রাহ্ম সমাজীদের মনঃপুত না হওয়ায় তাঁহারা অকারণেই তাঁহার প্রতি নাস্তিকতার অভিযোগ আনিয়াছেন। পূর্ব সংস্কারবশতঃ তাঁহারা তাঁহার সম্পূর্ণ আলোচনা না শুনিয়াই এরূপ বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। স্বভাবসুলভ পরিহাসের ভঙ্গীতে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীগণ যদি তাঁহার অভিষ্ট ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম সংস্কারের কোন প্রয়োজনই নাই। আর অসত্যের সমর্থন সম্বন্ধে তিনি বলেন, সত্যের নিরপেক্ষ মূল্য নির্ধারণ করা সর্বদা সমীচীন নহে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুসারে সময় বিশেষে সত্যচ্যুতিই ধর্ম, সেখানে মিথ্যাই সত্য হয়।[৩১] তবে এইরূপ মতানৈক্যের সৃষ্টি হইলেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাই ছিল। দেশের সাধারণ ধর্মীয় উজ্জীবনের ক্ষেত্রে আদি ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকাকে তিনি প্রশংসাই করিয়াছেন—"আদি ব্রাহ্ম সমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা এদেশে ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব, এমন আশা রাখি।"[৩২]

যুক্তিবাদী বঙ্কিমের আর এক রূপ তাঁহার ভগবদগীতার ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। প্রাচীন আচার্যদের প্রাচীন রীতির আলোচনা আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সকল সময় বোধগম্য হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্মব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ আলোচনাই আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপযোগী হইবে। ইহাতে তিনি পূর্বসূরীদের মতামত আলোচনা করিয়াছেন অবশ্য এবং তাঁহাদের মতামতকে যেখানে গ্রহণ-যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, সেখানে গ্রহণও করিয়াছেন। তবে ইহার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের যুক্তি চিন্তাকেও তিনি বিশেষ মূল্য দিয়াছেন। তাঁহার উক্তি "যাঁহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্ব পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্ত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।"[৬৩]

প্রচলিত পথের গীতাভাষ্য হইতে তাঁহার টীকা স্বতন্ত্র। ইহার সব কথাকে তিনি ভগবানের উক্তি বলিয়া মনে করেন না। ইহার বৈজ্ঞানিক উক্তি সম্বন্ধে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এগুলি ভগবদুক্তি বলিয়া বিশ্বাস করা সমীচীন নহে, এগুলি সংকলয়িতাদেরই নিজস্ব মতামত। সবচেয়ে বড় কথা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট মানব শরীরধারী ঈশ্বর। "তাঁহার মানুষী শক্তি ভিন্ন ঐশী শক্তির দ্বারা কার্য করা অসম্ভব, কেন না কোন মানুষেরই ঐশী শক্তি নাই, মানুষের আদর্শেও থাকিতে পারে না। কেবল মানুষী শক্তির ফল যে ধর্মতত্ত্ব, তাহাতে তিন সহস্র বৎসর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা করা যায় না।"[৬৪] এইরূপে শতাব্দীর অমোঘ সত্যের উপর বঙ্কিমের গীতাব্যাখ্যা এক নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে। ঈশ্বর ও মানবের মিলন—ঈশ্বরের মানবিক রূপ এবং মানবের ঈশ্বর পদে উন্নয়ন—তাহাই বঙ্কিমের শরণ্য, তাঁহার গীতা সেই মানবভাষ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন না। তাঁহার ধর্মতত্ত্বে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মানব সীমায় তাঁহার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিফলনের জন্য তিনি কৃষ্ণ চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তবুও ইহাতে যে তাত্ত্বিক দিক প্রধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্যই তিনি উপন্যাসত্রয়ীর কল্পনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যায় ধর্মোপদেষ্টার কোন বিবিক্ত আসন হইতে তিনি ধর্মীয় অনুজ্ঞার নির্দেশ দেন নাই। প্রবন্ধ ও আলোচনার সমান্তরালে উপন্যাসের রসানুভূতিতেও তিনি তাঁহার ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম উপন্যাসকে তিনি অনুশীলন তত্ত্বপ্রচারের 'কল'

বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উপন্যাস ত্রয়ীতে নিষ্কাম ধর্মের একটি উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, দেবীচৌধুরাণীতে প্রফুল্লের নিরাসক্ত কর্মের আয়োজন ও সীতারামের হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনার মধ্যে ধর্মতত্ত্বের ব্যবহারিক রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাদের কোনটির মধ্যেই হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতার পরিচয় নাই। বঙ্কিম হিন্দুধর্মকে একটি বৃহত্তর ব্যাপ্তি দিয়া সকল সম্প্রদায়ের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমের সাহিত্য জীবনের সূচনা হইতে বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ নিবন্ধ, খ্রীষ্টান মিশনারী ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত বিতর্ক আলোচনা, ধর্মতত্ত্ব কৃষ্ণচরিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইত্যাদির গূঢ় ধর্মালোচনা, উপন্যাসত্রয়ীর প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু ও প্রচার নবজীবন সাধারণীর প্রবন্ধাবলী তাঁহাকে নিঃসংশয়ে হিন্দুধর্মের একজন পুরোধারূপে পরিচিত করিয়াছে। বঙ্কিম সাহিত্য পরিক্রমায় ইহাদের একটি সাহিত্য মূল্য নির্ধারিত করা যাইবে। তাহার পূর্বে ইহাদের মধ্যে প্রতিভাত তাঁহার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে বঙ্কিম হিন্দুধর্মের একজন প্রধান সংস্কারকই শুধু নহেন, একজন তীক্ষ্ণধী মুখপাত্রও। রামমোহনের শুষ্ক যুক্তিবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই, আদি ব্রাহ্ম সমাজের নির্গুণ ব্রহ্মচিন্তায় তিনি চিত্তের সার্থক্য অনুভব করেন নাই, সনাতন হিন্দু পন্থীদের সংস্কারপ্রিয়তা ও আচারনিষ্ঠতাকেও তিনি অহেতুক মনে করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি আশ্রয়ী চিন্তাধারা ভক্তি ও প্রীতির আনুগত্যে হিন্দুধর্মের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ঘুরিয়া ইহার মানব কেন্দ্রিক মহাশক্তিকে অন্বেষণ করিয়াছে। এইরূপ হিন্দু ধর্মকেই তিনি সম্পূর্ণ ধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন:

> ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ, কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী, সর্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম কি আর আছে?[৬৫]

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

পরিশেষে সাধনা ও অধ্যাত্মচিন্তার ক্ষেত্রে বিজয়কৃষ্ণ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দিব্যানুভূতির কথা আলোচনা করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই

সাধকত্রয় অলোকসামান্য ঐশী শক্তির পরিপ্রকাশ দেখাইয়া সংশয়াকুল দেশজীবনে একটি অস্তিবাচক সমাধান দিয়াছেন। পথ ও মতের সহস্র দ্বন্দ্ব, ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মজিজ্ঞাসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা, সংস্কার ও পরিমার্জনার বিপুল আয়োজনেও এতদিন কোনরূপ সত্যের দিক নির্ণয় হয় নাই। শতাব্দী অনুসৃত আচার আচরণের বিরাট প্রলেপকে কাটাইয়া জাতীয় মানস আধ্যাত্মিক বুভুক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে মাত্র। বিজয়কৃষ্ণ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নিজেদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার চরম স্ফূর্তি দেখাইয়া সাধনার ধ্রুব পরিণতিকে 'তর্কে বহু দূর' প্রমাণিত করিয়াছেন।

হিন্দু আন্দোলনের সহিত বিজয়কৃষ্ণের যোগ কোনরূপ সংস্কারকের ভূমিকায় নহে, একান্তই সাধকের ভূমিকায়। পূর্ববর্তী চিন্তানায়কদের সহিত এইখানে তাঁহার মৌলিক পার্থক্য। সাধনার অমেয় শক্তি এবং দিব্যানুভূতির অধিকারে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সিদ্ধ পুরুষরূপে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার সাধনাক্ষেত্রের এই সিদ্ধিই পুরাণস্মর দেশ জীবনে ভাগবত বিশ্বাস উজ্জীবন করিয়াছে। তিনি যে লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহা কোন বিধি বিধান বা শাস্ত্রের লক্ষ্য নহে, তাহা সর্বতোভাবে সাধকের লক্ষ্য। সকল মত, সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট জীবনচর্যার মধ্যে যাহা পরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সাধন জীবনে তাহারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

তাঁহার ধর্মীয় জীবনের দুইটি রূপ লক্ষ্য করা যায়—সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। তাঁহার সামাজিক ধর্ম ছিল ব্রাহ্ম ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ধর্ম ছিল গভীর ভাগবত অনুভূতি। এই শেষোক্ত উপলব্ধির দ্বারাই তিনি দিব্য জগতে উত্তরণ করিয়াছেন। প্রগাঢ় ভাগবত অনুভূতির ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু ধর্মের বহুল সমালোচিত দিকগুলিকেও গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি ব্রহ্ম জ্ঞানী হইয়াও ভক্তিবাদী, পৌত্তলিক বিরোধী হইয়াও পৌত্তলিক, অবতারবাদের অসমর্থক হইয়াও গুরুবাদে বিশ্বাসী।

বিজয়কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক মনোজগৎ একটি বিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। সঙ্গীত যেমন বিচিত্র মূর্ছনার মধ্য দিয়া সমে আসিয়া দাঁড়ায়, তেমনি তাঁহার অধ্যাত্ম পরিক্রমাও বিবিধ অনুধ্যানের মধ্য দিয়া নিজ নিকেতনে প্রত্যাগত হইয়াছে। তাঁহার জন্মই হইল বৈষ্ণব চূড়ামণি অদ্বৈতাচার্যের বংশে। তাঁহার চরিতকার লিখিতেছেন, "পূর্ব্বপুরুষগণের ভক্তিপূত শোণিত প্রবাহ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের দেহে বিদ্যমান থাকায় আর তপস্যানিরত, হরিভক্তিপরায়ণ, অধ্যাপকের শিক্ষাধীনে এবং সংসর্গে বাস করায়, তপস্যার প্রভাব ও হরি নামের

মাহাত্ম্য যে তাঁহার চরিত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।"[৬৬] উচ্চশিক্ষার্থে কলিকাতায় আসিলে সর্ব প্রথম তিনি আত্মিক সংকটে পতিত হন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি বেদান্ত আলোচনা সুরু করেন এবং ইহার ফলে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার অনাস্থা জাগিয়া উঠে। কৌলিক চিন্তাধারা পরিবর্জন করিয়া তিনি বৈদান্তিক হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম একাত্মতা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। জীব ও স্রষ্টার অভিন্ন চেতনার মধ্যে ভক্তি প্রীতির অবকাশ নিতান্ত স্বল্প থাকায় ইহা তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে নাই। বিজয়কৃষ্ণের ইহা এক চরম আধ্যাত্মিক সংকটের মুহূর্ত। জীবন চরিতকার ইহার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন—"যখন হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তখন তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠান—পূজা, অর্চনা, তিলকাদি ধারণ করিয়া তাঁহার দিন শান্তিতে অতিবাহিত হইত, কিন্তু বেদান্তের অহং ব্রহ্মবাদ তাঁহার সেই শান্তির ভূমি উৎখাত করিয়া দিয়াছে। আবার তৎপরিবর্তে সত্য-ধর্ম কি এবং কি উপায়ে সেই ধর্ম অর্জন করিতে হয়, তাহাও তাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সময় সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি এবং তজ্জনিত শুষ্কতায় তাঁহার অন্তরে যে যাতনার সঞ্চার হইয়াছিল অন্তর্যামী ভিন্ন অপরে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই।"[৬৭] এইরূপ সংকট মুহূর্তেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সান্নিধ্যে আসিলেন এবং 'মহর্ষির জীবন্ত উপদেশে গোস্বামী মহাশয়ের স্বাভাবিক ধর্মতৃষ্ণা—যাহা বেদান্তের শুষ্ক তর্কে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা সহজেই জাগ্রত হইয়া উঠিল।'[৬৮]

অতঃপর সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যখন বিবিধ বিধি বিধান ও স্বতন্ত্র অনুশাসন লইয়া একই ব্রাহ্ম সমাজের আনুষ্ঠানিক রীতিপ্রকৃতির পরিবর্তন ও রূপান্তর করিতেছিল, তখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রচারকের ভূমিকায় থাকিয়া ব্রাহ্ম সমাজের আভ্যন্তরীণ সত্যকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুসঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন। সমাজের রূপ পরিবর্তনের সংগে সামাজিক আনুগত্যে তিনিও বাদ-প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদের কলরবে তাঁহার অধ্যাত্মচেতনাটি কোথাও আচ্ছন্ন হয় নাই। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিয়া তিনি পূর্ণ ব্রাহ্মের মতই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন—"যাঁহারা পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব রাখেন এবং উপবীত প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করেন, তাঁহারা যদি ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন তাহা হইলে ভয়ানক কপটাচার করা হয়। যিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্বক শান্ত সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরকে প্রীতি করেন

এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করেন, তিনিই ব্রাহ্ম। এইরূপ ব্রাহ্ম হইবে।"[৬৯] আদি ব্রাহ্ম সমাজ জাতিভেদকে স্বীকার না করিয়াও জাতিভেদের চিহ্ন উপবীত ধারণ করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ ইহা সমর্থন করেন নাই। তিনি উপবীত বর্জন করিলেন। সামাজিক সংস্কারের দিক দিয়া ইহা অশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট ইহাই স্বাভাবিক। এজন্য তিনি ব্রাহ্ম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন নাই।

সমগ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনে বিজয়কৃষ্ণের ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ব্রাহ্ম ধর্ম তাঁহার ভগবতোপলব্ধির অনুকূল পরিবেশ রচনা করিয়াছিল বলিয়া তিনি ইহার সেবায় মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়, ব্রাহ্ম ধর্ম তাঁহাকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছিল, তিনিও সেইরূপ ব্রাহ্ম ধর্মকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্মের যথার্থ উদ্গাতারূপে বিজয়কৃষ্ণের সম্যক পরিচয় নহে, ব্রাহ্ম সমাজে ভক্তিবাদের সার্থক প্রবক্তারূপেই তাঁহার সত্যকার পরিচয়। এই অর্থে তিনি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়াও ভক্তিবাদী সাধনার অনুবর্তী।

তবে ব্রাহ্ম সমাজে ভক্তিবাদের একটি ক্রমাভিব্যক্তি আছে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মবাদকে জ্ঞানমার্গী করিলেও তাহাকে ভক্তিশূন্য ভাবেন নাই। তবে তাঁহার ব্রাহ্ম সমাজ একেবারে প্রাথমিক স্তরে অবস্থিত ছিল। ভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রস্রবণ তখন তাহাতে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র বা বিজয়কৃষ্ণ কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজে ভক্তিবাদ সঞ্চারিত হইলে দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে স্বাগত জানাইয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণের ভক্তি চেতনাকে পূর্ণ স্বীকৃতি জানাইয়া মহর্ষি বলিয়াছেন—"জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞান কেবল কথার কথা। প্রেম ভক্তিই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন এই চারিটি একসঙ্গে না থাকিলে ঠিকমত ধর্ম লাভ হয় না। তোমাতে এই চারিটি উপযুক্ত রূপে আছে। তুমি ঠিক ধর্ম লাভ করিয়াছ। এখন তুমি যাহাই কর না কেন পরমেশ্বর তাহাই অতি সুন্দর দেখিতেছেন।"[৭০] বিজয়কৃষ্ণের আত্যন্তিক ভক্তিভাব ও তজ্জনিত সামাজিক রীতি লংঘন সমাজে নিন্দিত হইলে মহর্ষি তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের সংমিশ্রণ হইয়াছিল বলিয়া ভক্তিকে তিনি বর্জন করেন নাই। তবে তাঁহার ভক্তিবাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তাঁহার মধ্যে বেদান্তের ভক্তি এবং ইসলামী ভক্তির সমন্বয় হইয়াছিল। জীবনের শেষ পর্বে পারসী কবি সাদী এবং হাফেজের কবিতা তিনি বিমুগ্ধ ভাবে আবৃত্তি করিতেন। এই ভক্তিই অন্যরূপে পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম সমাজে অনুসঞ্চারিত হইয়াছে।

বলিতে গেলে আচার্য কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্ম সমাজে এই নব ভক্তিবাদের প্রবর্তক। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও সাধক বিজয়কৃষ্ণ পরস্পরের পরিপূরক। কেশবচন্দ্র প্রেরণা, বিজয়কৃষ্ণ প্রকাশ; কেশবচন্দ্র প্রারম্ভ, বিজয়কৃষ্ণ পরিণতি। কেশবচন্দ্রের সমগ্র জীবন এক অপূর্ব কর্মসংগ্রামের ইতিহাস। সত্যান্বেষণে বহির্গত হইয়া তীর্থযাত্রীর মত তিনি বিভিন্ন মত ও পথের দ্বারস্থ হইয়াছেন। অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত বাংলার ধর্মমণ্ডলকে দীপ্যমান করিয়া তিনি এক সমন্বয় সাধনার পথিকৃৎ হইয়াছেন। তাঁহার বহুমুখী সাধন জীবন সম্বন্ধে ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন—"অন্তঃস্থ দৈবশক্তির দুর্জয় বেগে ক্ষিপ্ত গ্রহের ন্যায় চঞ্চল হইয়া কেশবচন্দ্র জীবন রঙ্গভূমিতে কত লীলাভিনয়ই সম্পন্ন করিলেন। তিনি যীশুদাস, তিনি উগ্র ব্রাহ্ম সংস্কারক, তিনি নববিধানের পুরোহিত, তিনি বাঘাম্বর পরিধান করিয়া একতন্ত্রী হস্তে মহাদেবের ন্যায় ধ্যানস্থ গৃহস্থ যোগী, তিনি মস্তক মুণ্ডিত করিয়া গৈরিক খিলকা ও কৌপীন ধারণ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে বৈরাগী ভিক্ষুক, মহানগরী কলিকাতার রাজপথে নগর কীর্তনে রত তিনি নবগৌরাঙ্গ।"[১১] তবে বহুরূপে প্রকাশিত এই সাধনজীবনের একটি কথা সত্য এই যে তিনি পরম ভক্ত এবং দ্বৈতবাদী চেতনায় ভক্তির দ্বারাই তিনি ঈশ্বরোপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্মের অন্তরে এই বৈষ্ণবী চেতনার প্রক্ষেপ কেশবচন্দ্রের অভিনব সংযোজন।

বাংলা দেশের ভক্তি আন্দোলনের ধারা ক্রমশঃ দুইটি স্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের বৈদান্তিক ভক্তি ব্রাহ্ম ধর্মের গণ্ডীতে তেমন সুস্পষ্টরূপ লাভ করিতে পারে নাই। এই নব বৈদান্তিক চেতনা শাক্ত রূপাশ্রয়ী হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হিন্দু ধর্মের গণ্ডীতে বিশেষ স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং ইহাকেই সার্থক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। আর নববৈষ্ণব চেতনার সূত্রপাত করিয়াছেন কেশবচন্দ্র। তাহাও ব্রাহ্ম ধর্মের গণ্ডীতে সার্থক হয় নাই। ইহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের মত স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন সাধক বিজয়কৃষ্ণ। ব্রাহ্ম ধর্মের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় বৈষ্ণব চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। বৈদান্তিক ভক্তি ধারা অনুকূল পরিবেশে যেমন সাধক পরম্পরায় বিকশিত হইয়াছে, বৈষ্ণবধারা তেমন হইতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র ইহার প্রবর্তক রূপে পরিগণিত হইলেও ব্রাহ্মধর্মের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ও আভ্যন্তরীণ রীতিনীতির কলহ বিসম্বাদে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। এই কাজটি করিয়াছেন বিজয়কৃষ্ণ। এক্ষেত্রে বিরোধিতা পাইলেও তিনি নিজের আধ্যাত্মিক দৃঢ়তায় তাহাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণের বিবেকানন্দ

ছিল না। সেই জন্য নব বৈষ্ণবচেতনার অনুরূপ prophet রূপে বাংলা দেশে কাহাকেও দেখা যায় নাই। সমন্বয় যুগে ভক্তিবাদী চিন্তা চেতনার প্রসারে এই বৈষ্ণবীয় ধারাটি জনমানসে স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া মিশিয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণের বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ তাঁহাকে ব্রাহ্ম ধর্মের কোঠা হইতে হিন্দু ধর্মের আওতায় আনিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীগণ এইজন্য তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের গুরুবাদকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্তাভজার গুরুবাদ, আনুষঙ্গিকভাবে দেবমূর্তিকে প্রণাম, উপাসনা কালে কালী, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর নাম গ্রহণ, রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদের লীলাবিহার সংক্রান্ত ছবি উপাসনাস্থলে রক্ষা করা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবৃন্দ গভীর সমালোচনা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাকে প্রচারকের পদ ত্যাগ করিতে হয়। বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার আধ্যাত্মিক স্ফূর্তিতে যে উপায়গুলিকে অনুকূল মনে করিয়াছেন, সেগুলি রক্ষা করিয়াছেন। ইহার জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজের সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইলেও তিনি ক্ষুণ্ন হন নাই। তাঁহার পদত্যাগ পত্রকে ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দলিল রূপে গ্রহণ করা যায়। ইহাতে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে সার্বভৌমিক ধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাজনারায়ণের ব্রাহ্ম ধর্ম যেমন হিন্দু ধর্মের উন্নত সংস্করণ, বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মধর্ম তেমনি অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্ম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সমাজ, জীবন ও ধর্মে যে সমন্বয়ের সাধনা হইয়াছিল, বিজয়কৃষ্ণ তাহার সার্থক সূচনা করিয়াছেন। তিনি উদার ভক্তিবাদে সব কিছুকেই গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। অষ্টবিভূতি সমৃদ্ধ গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ স্বামী তাঁহাকে যে সাধন পথের নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহা একান্তই আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয়। সেই জন্য তর্ক বুদ্ধিতে তাহা পর্যালোচনা করিবার প্রয়োজনই তাঁহার হয় নাই। এমনি প্রত্যেকটি দিকে, দেবপূজা, মূর্তিপূজা, পট নিরীক্ষণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় তাঁহাকে আধ্যাত্মিক সমুন্নতি দিয়াছিল বলিয়াই তিনি সেগুলিকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবলতম আপত্তি গুরুবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই যোগশক্তি বর্তমান আছে। এই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য একজন জাগ্রত শক্তিশালী মনুষ্যের সাহায্যের আবশ্যক। যেমন চক্ষের দৃষ্টিশক্তি ভগবান দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যদি কোন কুটী পড়ে তাহা অন্যের দ্বারা না উঠাইলে চলে না।"[৭২] প্রতিমা পূজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দেবতার মন্দিরে কালী দুর্গা বা অন্য প্রতিমার সম্মুখেই যদি আবার ব্রহ্মস্ফূর্তি হয় তবে সেইখানেই আমি আত্মহারা

হইয়া যাই ও আমার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়াও হয়ত সেইখানে গড়াগড়ি দিয়া চরিতার্থ হই। আমার ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সুতরাং আমি যেখানেই তাঁহার দর্শন পাই সেইখানেই মুগ্ধ হই, স্থানের বিচার থাকে না।[৭৩] আবার ভক্তের উপাসনাকালে ভগবানকে বিভিন্ন নামে ডাকিলে তিনি আপত্তির কোন কারণ দেখেন না। এই বিভিন্ন নামচিন্তার মধ্যে তিনি রাধাকৃষ্ণভাবকেই সবিশেষ মূল্য দিয়াছেন—"রাধা-কৃষ্ণের ভাবের মত ধর্ম ও যোগপথের সহায় অন্য কোন ভাব নাই মনে করি। রাধাভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা পরমেশ্বর ; এজন্য সর্বপ্রযত্নে আমি ঐভাব সাধনের চেষ্টা করি ও যাঁহারা ঐ আধ্যাত্মিকভাবে উপকার পান তাঁহাদিগকে লইয়া একত্রে রাধাকৃষ্ণের গান করিয়া থাকি।"[৭৪]

অতঃপর বিজয়কৃষ্ণের সিদ্ধিলাভ। ঢাকার উপকণ্ঠে গেণ্ডারিয়ার নির্জন অরণ্য প্রান্তরে তাঁহার যে কৃচ্ছ্র সাধনা তাহা প্রাচীন পঞ্চতপা সাধনাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। সহস্র লোভ প্রলোভন জয় করিয়া, অনিদ্রা অনাহারে দেহধর্মকে পীড়িত করিয়া তিনি যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। জীবনীকার তাঁহার এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন—"তিনি কালত্রয়দর্শী হইলেন। স্থান ও কালের ব্যবধান তাঁহার নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। ব্রহ্মাণ্ডের কোন ঘটনা বা তত্ত্ব তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। অষ্টসিদ্ধি দাসী হইয়া তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল। তিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মবিদ হইলেন। উপনিষদের ত্রিতত্ত্ব অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্ম পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন।"[৭৫]

বিজয়কৃষ্ণের সিদ্ধিলাভ নিঃসন্দেহে যোগ সাধনার সিদ্ধি। কিন্তু এই সিদ্ধিজনিত ঐশ্বর্য প্রকাশ তিনি করেন নাই। তিনি ভক্তিপথের উপাসনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্মের নব প্রবক্তারূপে তিনি তীর্থে তীর্থে রসস্বরূপ ভগবানকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া একটি পরিণতিতে পৌঁছাইয়াছে। প্রবল অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় তিনি যেমন সত্যকে অন্বেষণ করিয়াছেন, তেমনি প্রগাঢ় উপলব্ধিতে সেই অভীষ্ট সত্যকে লাভও করিয়াছেন। বাংলার ধর্মীয় পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে বিজয়কৃষ্ণ, রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণের মতই সিদ্ধ পুরুষ। তাঁহার ভক্তিবাদ নিঃসন্দেহে স্বমার্গাভিমুখী জাতীয় মানসকে আপন ধর্ম ও বিশ্বাসে স্থিতধী হইবার মহামন্ত্র দিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অত্যুজ্জ্বল আধ্যাত্মিক আদর্শ ও দেশজীবনে তাহার সুবিপুল প্রভাবের মধ্যে আমরা বাংলাদেশের হিন্দু জাগৃতির পরিণতি লক্ষ্য

করিতে পারি। ভারতধর্মের ইতিহাসে ঐশী উপলব্ধি ও ভাগবত সাধনার এক একটি পরিণতি দেখা যায়। দেশকাল বিস্মৃত লোকাচার ও শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞা নূতন বোধ ও বুদ্ধির আলোকে সমালোচিত হইতে থাকে। নূতন প্রত্যয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে পুরাতনের সত্যস্বরূপটি উপেক্ষিত হইয়া প্রায় ক্ষেত্রেই প্রতিবাদাত্মক কর্মপন্থা অনুসৃত হয়। এইজন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে সনাতন ধর্মাদর্শের ধারণা থাকিলেও সংস্কারের সূত্র ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের সূচনা হইয়াছে। প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই আন্দোলনের বিরাম নাই। সনাতন বিশ্বাস হইতে বহুদূরে সরিয়া আসিলে যে স্বাভাবিক বিকৃতি ও উৎকেন্দ্রিকতা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তাহা জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। জাতীয় জীবনের এইরূপ সংকট মুহূর্তেই এক একবার ভাগবত সাধনার পরিণতি দেখা দিয়াছে। আচার্য শঙ্কর এইরূপ একটি পরিণতি, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এইরূপ আর এক পরিণতি, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসও এইরূপ অন্য এক পরিণতি। পরিণতির অর্থ পরিসমাপ্তি নহে। ধর্মেরও একটি গতি বা বিকাশ রূপ আছে। ইহাদের সাধনায় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা শাশ্বত মহিমায় সংশয়াচ্ছন্ন যুগমানসে নূতন রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন নিঃসন্দেহে ভারতীয় সাধনার চরম অভিব্যক্তি। ভারত দর্শন যাহা বলিতে চায় সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন, অন্তর্দৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি—তাহাই তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়াছে। আর এই উপলব্ধিতে পৌঁছাইবার যে সুবিপুল ধারা বিচিত্রভাবে ভারতবর্ষে প্রবহমান, তাহা অভিনব। বেদ, উপনিষদ, যোগ, তন্ত্র—সব কিছুই সেই চরম লক্ষ্যকে অন্বেষণ করিয়াছে। এইগুলিই সনাতন জীবনচিন্তার উপকরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে সাধনার বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করিয়া সিদ্ধির স্বর্ণতোরণে পৌঁছাইয়াছেন।

তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ একটি তত্ত্ব। বিভিন্ন তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া বহু বিচিত্র পথ পরিক্রমণ করিয়া তিনি নিজেই একটি তত্ত্বসার রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভারতীয় সাধনার দ্বৈতরূপ—ধ্যান ও প্রকাশ, যোগ ও কর্ম, স্থিতি ও গতি সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় রূপের প্রয়োজন ছিল। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সব হইয়াও যেমন সব নয়, অর্জুনকে তাঁহার প্রয়োজন ছিল ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে, সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ সব হইয়াও সব নয়, তাঁহার দ্বিতীয় শক্তির প্রয়োজন ছিল উপলব্ধ সত্যের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সেই দ্বিতীয় শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন নিঃসৃত যে মহৎ ভাগবত বাণী তাহা বিশ্বসমক্ষে

প্রচারের প্রয়োজন ছিল। বিবেকানন্দ সেই প্রচারক। দক্ষিণেশ্বরের সাধন পীঠে যে সিদ্ধি তাহার সহাফলকে বিবেকানন্দ ইউরোপ-আমেরিকায় সম্প্রসারিত করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা হিন্দু ধর্মের বৃহৎ ও ব্যাপক রূপের সাধনা। এই রূপ এত বিরাট যে তাহা হিন্দুসাধনার বিচিত্র পথ ত গ্রহণ করিয়াছিলই, তদপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে তিনি ইহার মর্ম উপলব্ধি করিয়া অন্যান্য ধর্মমতের মর্মেও সহজে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের গভীরতা, উদারতা ও সর্বস্বীকরণ-ক্ষমতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার তত্ত্বতাৎপর্য তাঁহার অন্য ধর্মমতের সারসত্যকে গ্রহণ করিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই, পরন্তু সেগুলি উদঘাটন করিতে সহায়তা করিয়াছে।

অতঃপর আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের হিন্দুসাধনার বিভিন্ন স্তর পরিক্রমা ও সে সমস্ত হইতে বিভিন্ন ধর্মমতের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং পরিশেষে তাঁহার সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষভাবে বৈদান্তিক ভাবধারার উত্তর সাধক। বাংলা দেশের শক্তিতত্ত্ব বহুলাংশে বেদান্ত নির্ভর। বেদান্তের ব্রহ্ম নির্বাণ বা ব্রহ্মলয়ের অনুরূপ বাংলার শাক্তগণও একটি অদ্বয়তত্ত্বে আত্মলীন হইতে চাহিয়াছেন। তন্ত্রমতে সাধনা করিয়া দেহমধ্যে শিবশক্তির অদ্বয় মিলন বহুলাংশে বেদান্তের জীব ও ব্রহ্মের একাত্মতার অনুরূপ, শাক্তগণ আরাধ্য বিগ্রহকে এইজন্য 'ব্রহ্মময়ী মা' বলিয়াছেন। শাক্ত সাধনতত্ত্বের এই নিশ্ছিদ্র জ্ঞানবাদে ভক্তির অবকাশ নিতান্তই অল্প। বেদান্ত তত্ত্ব পরবর্তীকালে যেমন দ্বৈতবাদী দার্শনিকদের দ্বারা ব্যাখ্যাত ও গৃহীত হইয়াছে এবং পরিশেষে ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধারা বেদান্তের জ্ঞান স্বরূপকে রসস্বরূপে প্রকাশিত করিয়া সাধারণ্যে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, সেই শাক্ততত্ত্বের অদ্বয় বোধও বিশেষ ভাবে দ্বৈতবাদী ভক্তি চেতনার দ্বারা নিষিক্ত হইয়াছে। আবার বাংলা দেশে ভক্তিবাদী চেতনার প্রবল বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা। সাধনার ক্ষেত্রে জ্ঞানবাদ যথেষ্ট নয় বিবেচনা করিয়া তাঁহার মধ্যে ভক্তিবাদের আশ্রয় অপরিহার্য হইতেছিল। ইতিহাসের ধারায় বাংলাদেশে ভক্তিবাদের প্রসার ঘটিতেছিল। বাংলা দেশ ও বাঙ্গালীর মানস প্রকৃতি নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে সর্বসার বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহে নাই। এইজন্যই শাক্ত সাধনতত্ত্বে ভক্তিবাদের বিরাট তরঙ্গ আসিয়া পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিবাদ এইরূপ বাংলা দেশ ও জীবনের স্বাভাবিক ভক্তিবাদ। মূল বৈদান্তিক চেতনা বাংলার শাক্তধারা ও তান্ত্রিক ধারায় রূপান্তরিত-

হইয়া ভক্তি আশ্রয়ী ব্রহ্মচিন্তায় পর্যবসিত হইয়াছে। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ উপাসনা। মাতৃ উপাসনার মধ্য দিয়া তিনি ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়াছেন, ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্য দিয়া সর্বধর্ম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরের মাতৃবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের জগন্মাতা। পৌরাণিক প্রতিমাপূজার এ এক অভিনব অর্থ ব্যঞ্জনা। তাঁহার কাছে ইহা কোনদিনই নিশ্চল বিগ্রহমূর্তি নয়, ইহা একেবারে জীবন্ত মাতৃমূর্তি। এই মায়ের আরাধনায় মধ্য দিয়া তিনি সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়াছেন।

তাঁহার সাধন জীবনের কাল পরিক্রমায় দেখা যায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকাল হইতে দ্বাদশ বর্ষ তাঁহার সাধন কাল, ইহার পর তীর্থ দর্শন ও পরিশেষে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন। প্রথম চারি বৎসরের সাধনকালে তিনি ঈশ্বর দর্শনের অপরূপ ব্যাকুলতা বোধ করিতেন। ইহাই যে ভাগবত অনুভূতির সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। লীলাচরিতকার এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "সকল সাধন প্রণালীর অন্তর্গত তীব্র আগ্রহরূপ সাধারণ বিধিই তখন তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৺জগদম্বার দর্শন লাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাহ্য কোন বিষয়ের সহায়তা না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে।"[৭৩]

বস্তুতঃ ঈশ্বরোপলব্ধির ক্ষেত্রে এই ঐকান্তিক বাসনাই সাধকের পরম পাথেয় এবং ইহার জন্য তাঁহাকে সকল প্রকার শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালন করিতে হয় না। সুগভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে এই সময় তিনি আব্রহ্মস্তম্ব বস্তু ও ব্যক্তি সকলকে জগন্মাতার প্রকাশ বলিয়া মনে করিতেন এবং ঘৃণা, আত্মাভিমান, অহংকার প্রভৃতি মানবিক বিকারগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করিতে পারিয়াছিলেন। বলিতে গেলে এই পর্যায়েই তাঁহার সাধনার সিদ্ধি ঘটিয়াছিল; ইহা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সমুন্নতি মানবিক কল্পনার অতীত। তবুও কেন তাঁহার পরবর্তী সাধন পরিক্রমা চলিয়াছিল, এসম্বন্ধে লীলা চরিতকার ইঙ্গিত দিয়াছেন:

> কেবল মাত্র অন্তরের ব্যাকুলতা সহায়ে যাহা তিনি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহাই আবার পূর্বোক্ত কারণে শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথ ও প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন, গুরুমুখে শ্রুত অনুভব ও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ পূর্ব পূর্ব যুগের সাধককুলের অনুভবের সহিত সাধক আপন ধর্মজীবনের দিব্য দর্শন ও অলৌকিক অনুভবসকল যতক্ষণ না মিলাইয়া সব সমান বলিয়া দেখিতে পায়, ততক্ষণ সে এককালে নিশ্চিন্ত

হইতে পারে না। ঐ তিনটি বিষয়কে মিলাইয়া এক বলিয়া দেখিতে পাইবামাত্র সে সর্বতোভাবে ছিন্ন সংশয় হইয়া পূর্ণ শান্তির অধিকারী হয়।[১৭]

সাধনার দ্বিতীয় স্তরে তাঁহার তন্ত্র সাধনা। ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী ঠাকুরাণী তাঁহাকে তন্ত্র সাধনা করিতে প্রবৃত্ত করেন এবং দুই বৎসর ধরিয়া তিনি তন্ত্রোক্ত সাধন রীতিগুলি যথাবিধি অনুষ্ঠান করেন। লীলাচরিতকার সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যে ব্রাহ্মণীর নির্দেশই তাঁহার তন্ত্রসাধনের একমাত্র কারণ নহে। সাধন প্রসূত যোগদৃষ্টি প্রভাবে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে শাস্ত্রীয় প্রণালী অবলম্বনে জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার সময় আসিয়াছে। ভক্তি প্রণোদিত চিত্তই ব্রাহ্মণী নির্দিষ্ট সাধন পথে পূর্ণাগ্রহে ধাবিত হইয়াছিল। পরবর্তী চারি বৎসর তাঁহার বৈষ্ণব সাধনা। অবশ্য ইহার পূর্বে তিনি দাস্যভক্তির সাধনা করিয়াছেন। যাহা হউক, এই পর্যায়ে তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত মুখ্যভাবদ্বয় সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সময় রামলীলা বিগ্রহ সেবক জটাধারীর নিকট হইতে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বাৎসল্যভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। মধুর ভাব সাধন কালে তিনি ছয় মাস কাল রমণী বেশ ধারণ করিয়াছিলেন এবং রাধারাণীর প্রকৃতি ও চরিত্রের গভীর অনুধ্যানে তিনি নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতেন।

এই সবগুলিই তাঁহার ভক্তি পথের বিচিত্র সাধনা। সব কিছু সাধনার সাক্ষীরূপে সম্মুখে তিনি তাঁহার মাতৃবিগ্রহ জগন্মাতাকে রাখিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার ভাবসাধনের চরম ক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার বেদান্ত সাধন বা ব্রহ্ম উপলব্ধি। মধুর ভাব সাধনের পর তাঁহার অদ্বৈত সাধনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে লীলাচরিতকার ইঙ্গিত দিয়াছেন।[১৮] অদ্বৈতরাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ রূপে ভাবরাজ্যের দর্শন স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত হয়। ইহা অব্যক্তেরই আনন্দঘন অভিব্যক্তি। মানবিক সম্পর্কের সীমায় গভীরতম হৃদয়োপলব্ধিতে অনন্তের আভাস ফুটিয়া উঠে। মধুর ভাবের সাধনায় ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে উপনীত হইলে ভাবাতীত অদ্বৈতভূমিকেই আশ্রয় করা এক মাত্র উপায় বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই অদ্বৈত ব্রহ্মসাধনাই হিন্দু সাধনার শেষ লক্ষ্য এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ইহার মধ্যে তাঁহার বিভিন্ন সাধন পরিক্রমার পরিণতি দেখিয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক মনোভূমি যখন সগুণ উপাসনায় সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, বাহ্য জগতের বস্তুনিচয় যখন নাস্ত্যর্থক রূপ পাইয়াছিল, বিবেক ও বৈরাগ্যে তিনি যখন পূর্ণ অনাসক্তি লাভ করিয়াছেন,

ঠিক সেই সময়ে নির্বিকল্প সমাধি সিদ্ধ পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ তোতাপুরী তীর্থপর্যটন-পথে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হন। তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জ্ঞানমার্গে নির্বিকল্প সমাধিলাভের ঐকান্তিক প্রয়াস সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। ইহা আর যাহাই হউক, ভক্তি পথের সহজ সাধনা নহে। দ্বৈতানুভূতির বিবিধ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগন্মাতার যে চিন্ময় মূর্তিরূপ ও তাঁহার যে নাম রূপের সহিত তিনি তদ্গত ছিলেন, এই অদ্বৈত চিন্তা সেখানে সহজে অনুপ্রবিষ্ট হইবার নহে। তিনি বলিয়াছেন, "ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডি ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ঐরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চির পরিচিত চিদ্ঘনোজ্জ্বল মূর্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এক কালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল।"[৭৯] কিন্তু দীক্ষাগুরু আচার্য তোতাপুরীর নির্দেশে মনকে কঠোর সংযত করিয়া তিনি ধ্যানে বসিলেন এবং সিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "পুনরায় দৃঢ় সংকল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং জগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐমূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না, একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নামরূপ-রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্ন হইলাম।"[৮০]

তবুও শেষ কথা এই যে অদ্বৈতভাবের ব্রহ্মলীনতায় তিনি সর্বক্ষণ আবিষ্ট থাকেন নাই। সময়ে সময়ে তিনি অদ্বৈত তত্ত্ব হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক হইয়া নিজেকে, নির্গুণ বিরাট ব্রহ্মের বা জগন্মাতার অংশ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষেত্রে ব্রহ্মোপলব্ধি ও ভাবোপলব্ধি বৈপরীত্য রচনা করে নাই। সাধন ক্ষেত্রের প্রচলিত ক্রম কেন তাঁহার মধ্যে দেখা যায় নাই, এ সম্বন্ধে লীলাচরিতকার ইঙ্গিত দিয়াছেন। সাধারণ ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভের পর সাধক তদবস্থাতেই অবস্থান করেন এবং চিত্ত সর্বপ্রকার বাসনাশূন্য হওয়ায় সে অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র আধিকারিক পুরুষেরাই সর্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিয়া বহুজনহিতায় ঐ শক্তি সকলের প্রয়োগ সময়ে সময়ে করিয়া থাকেন।[৮১] শ্রীরামকৃষ্ণ সেই লোকোত্তর আধিকারিক পুরুষ। সেইজন্য তাঁহার ক্ষেত্রে নির্বিকল্প সমাধি এবং ভাবদর্শন দুই-ই সম্ভব হইয়াছে। এইজন্য ব্রহ্মোপলব্ধির পরেও তিনি ইসলাম সাধনায় মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন এবং পরে খ্রীষ্টীয় সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম সমন্বয়ের উপলব্ধি এই অদ্বৈতচেতনারই ফল। অদ্বৈত সাধনা করিয়া তিনি দেখিলেন সর্ববিধ সাধন পদ্ধতির একটিই গম্যস্থান, তাহা হইল পরম সত্যের উপলব্ধি। হিন্দু মতের বিভিন্ন সাধনা—সাকার ও নিরাকার সাধনা, যোগ, তন্ত্র, বৈষ্ণব আবার মুসলমান মতের সাধনা ও খ্রীষ্টীয় সাধনা, আগে পরে তিনি যাহা করিয়াছেন, সব কিছুরই এক প্রতীতি ও প্রত্যয়। এই চরম উপলব্ধি হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম জগতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান দিয়াছেন—সর্বমত সহিষ্ণুতা ও সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যতা। ইহাই তাঁহার সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের কল্পনা। তিনি শিষ্যবর্গকে ইহার প্রসঙ্গে বলিতেন—"উহা শেষ কথা রে শেষ কথা ; ঈশ্বর প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধক জীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়, জানিবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।"[৮২]

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় ধর্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্মাশ্রিত কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' ধর্মমতের সমন্বয় সাধন প্রকৃতির একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যায়। আন্তর প্রকৃতির দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'নববিধান' ধর্ম একটি নিছক সারসংগ্রহ। ইহার মূলে একটি উদার ও সার্বভৌমিক ভাব বিদ্যমান থাকিলেও ইহা বস্তুতন্ত্রহীন একটি ভাবকল্পনা মাত্র। সামাজিক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে এইরূপ একটি ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা থাকিলে ধর্মনীতির সংঘর্ষ প্রবল থাকিবে না। ইহা বিশেষ ভাবে বুদ্ধি প্রসূত, কোন হৃদয়ানুভূতি জাত নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় সত্যবস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া নির্ণীত। ইহা ধর্মকলহের উপর বুদ্ধি প্রসূত সমাধান নহে, ইহা বোধি ও উপলব্ধির বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সাধনায় প্রত্যক্ষ ভাবে পরিণতির ঐক্য অনুভব করিয়া সমন্বয় ধর্মের কথা বলিয়াছেন। ব্রাহ্ম চেতনা, বৈষ্ণব চেতনা, খ্রীষ্টীয় চেতনা এবং মরমী চেতনার বহুরূপ প্রকাশ ঘটাইয়াও কেশবচন্দ্র শেষ পর্যন্ত কর্মী ছিলেন। কর্মীর সহিত বস্তুজগতের সম্পর্ক কোনদিন নিঃশেষ হইবার নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ সব কিছু চেতনার মধ্যে সমাধিস্থ যোগী হইয়া ছিলেন। আধ্যাত্মিকতার তুঙ্গশীর্ষে আরোহণ করিয়া তিনি সকল মত ও সকল পথকে একেবারে স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছেন। কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' ধর্ম শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত কি না এ সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। তবে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন যে শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রভাবের ফলে ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যে ভক্তির লীলাবিলাস ও মাতৃ ভাবের প্রকাশ দেখা দিয়াছিল। ইহার পরিণতি রূপেই হয়ত তিনি 'নববিধান' ধর্মের কল্পনা করিয়াছিলেন। তবে অন্তরদৃষ্টি-সম্ভূত ও বোধিজাগ্রত

প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভাবে কেশবচন্দ্রের ধর্ম সমন্বয় নৈর্ব্যক্তিক থাকিয়া গিয়াছে। সেদিক হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় ধর্ম সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

হিন্দু ধর্মের সুবিশাল পটভূমি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন পীঠ। ইহার কোন সংকীর্ণ রূপের উদ্ঘাটন করিয়া তিনি হিন্দুধর্মের গৌরব ঘোষণা করেন নাই। সুতরাং হিন্দু জাগৃতির ক্ষেত্রে তাঁহার মূল্য নিরূপণ স্বতন্ত্ররূপে গ্রাহ্য। বৈদান্তিক ব্রহ্ম তত্ত্বের সহিত তাঁহার পার্থক্য নাই, পৌরাণিক ভক্তিবাদের সহিত তাঁহার বিরোধ নাই, ধর্ম সংস্কৃতির বিভিন্নতার সহিত তাঁহার বৈপরীত্য নাই। অত্যুচ্চ উদার আধ্যাত্মিক সমুন্নতিতে তিনি সমুচ্চ লৌকিক চেতনার অতীত। হিন্দুধর্মের এই বৃহৎ ব্যাপকরূপ যাহা স্বীকরণ ক্ষমতায় ও সমদৃষ্টিপ্রভায় সকল মত, সকল ধর্মকে বক্ষে টানিয়া লইতে পারে, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জীবন ও সাধনা। স্বামী বিবেকানন্দ এই দিগন্ত প্রসারী গতিশীল হিন্দুধর্মেরই জয়ধ্বজা বহন করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তিরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতই তিনিও বৈদান্তিক সাধনার প্রবক্তা হইয়া জীবনে ও আচরণে ধর্মের উদার ও বৃহৎরূপকে প্রকাশিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ গুরুর সুমহান শক্তির উত্তরাধিকারীরূপে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব দরবারে বেদান্তধর্মের সত্যস্বরূপকে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গী এইখানে আলোচনা করা যায়। ইহার মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের উপর তাঁহার মনোভঙ্গী লক্ষ্য করিতে হইবে। বেদান্ত ধর্মের সার অন্বেষণ, হিন্দু ধর্মের ঔদার্য, স্বীকরণ ক্ষমতা ও পরমত সহিষ্ণুতা, মায়াবাদের ধারণা, পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদ, পাপবোধ, আচরণগত নিষ্ঠা ও শুচিতা ইত্যাদি দিকে তাঁহার চিন্তাধারার সহিত আমাদের পরিচিত হইতে হইবে।

অদ্বৈতবাদের ব্রহ্মোপলব্ধি একান্তই তাঁহার গুরুকৃপা। প্রথম জীবনে কুশাগ্র বুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় সংশয়ী ছিলেন। যুগচিন্তায় আন্দোলিত হইয়া ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি তিনি আকৃষ্টও হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্মের 'সগুণ নিরাকার এক ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণা' তিনি মনে মনে পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে বা তাঁহার সংশয় মোচন করিতে পারে নাই। এই আত্মিক সংকটে তিনি পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে আসেন। প্রথম হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সচেতন করিতে চাহিলে তিনি ইহাকে একরূপ

পাপাচরণ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিয়াছেন—'আমি ভগবান, একথা মনে করাও পাপ'। কিন্তু এ হেন সংশয়বাদী মনই শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন স্পর্শে অদ্বৈতবাদী হইয়া উঠিয়াছে।

বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ বেদান্তভাগকেই স্বামীজি হিন্দু ধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। ভারতের পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি পরবর্তীকালের রচিত শাস্ত্রগুলি এই বেদান্ত চিন্তাকেই প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু কালবশে লোকাচারনিষ্ঠ ভারতীয় সমাজ পুরাণাদি তন্ত্রের মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া পড়ে এবং সনাতন ধর্মকে বহুধা-বিভক্ত করিয়া পারস্পরিক ভেদবুদ্ধিকে প্রখর করিয়া তোলে। এইরূপ ক্ষেত্রে বেদান্তধর্মেরই প্রয়োজন সর্বাধিক। স্বামীজি বলেন, "জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্ত ভাগই—নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায়—মুক্তিপ্রদ এবং মায়াপার নেতৃত্ব পদে সর্বকাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং দেশ, কাল, পাত্রাদির দ্বারা সর্বথা অপ্রতিহত থাকা বিধায় উহাই সর্বলৌকিক, সার্বভৌমিক ও সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।"[৮৩]

ভারতবর্ষের মত বিশ্বক্ষেত্রেও তিনি এই ব্রহ্ম তত্ত্ব চরম অন্বিষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য দেশে তিনি অপূর্ব যুক্তি কৌশলে ইহাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

> The whole object of their (Hindu) system is by constant struggle to become perfect, to become divine to reach God and see God, and this reaching God, seeing God, becoming perfect 'even as the Father in Heaven is perfect,' constitutes the religion of the Hindus... But then the question comes, perfection is absolute, and the absolute cannot be two or three. It cannot have any qualities. It cannot be an individual. And so when a soul becomes perfect and absolute, it must become one with 'Brahman' and realise the Lord only as the reality and perfection, of its own nature and existence—Existence absolute, Knowledge absolute and Bliss absolute.[৮৪]

অতঃপর হিন্দুধর্মের বিশালতা ও উদারতার বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমেরিকার বক্তৃতাগুলিতে হিন্দুধর্মের এই সার্বজনীনত্ব বিশেষ

করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিষয়ে তিনি গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তাধারাকে বিশ্বের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্মীয় মতবিরোধের ক্ষেত্রে স্থায়ী মীমাংসা দিয়াছেন। তাঁহার ব্রুকলীন বক্তৃতায় ইহা স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে—

If one creed alone were to be true and all the others untrue, you should have again to say that, that religion is diseased. If one religion is true, all the others must be true.[85]

চিকাগো বক্তৃতাতে হিন্দু ধর্মের এই উদারতার প্রতিই তিনি বিশ্বের সুধী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন প্রত্যেক ধর্মেই প্রাকৃত মানব হইতে ঈশ্বরে উপনীত হইবার কথা আছে এবং একই ঈশ্বর প্রত্যেককেই প্রবুদ্ধ করিতেছেন। একই আলোকরশ্মি কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া বিচিত্র বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়, হয়ত বা পটভূমির সহিত সংগতিরক্ষার জন্য এইরূপ বর্ণালীর কিছু প্রয়োজনও আছে। অনুরূপ ভাবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একই সত্য আছে, যেটুকু বৈপরীত্য দেখা যায়, তাহা স্থান কাল পাত্রের সহিত সঙ্গতি বিধানের জন্য। হিন্দু ধর্মকে এইভাবে তিনি সর্ব সহিষ্ণুতার আধার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

It will be a religion which will have no place for persecution or intoleration in its polity, which will recognise divinity in every man and woman whose whole scope, whose whole force will be centred in aiding humanity to realise its own true and divine nature.[86]

স্বামীজির মায়াবাদ প্রচলিত অর্থজ্ঞাপক নহে। তাঁহার মায়াবাদ জড়বাদের প্রতিষেধক। ইহা দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে প্রত্যক্ষ বাস্তবই একমাত্র সত্য নহে। জড়বাদে পাশ্চাত্ত্য দেশ রাহুগ্রস্ত, বিজ্ঞান ও ধর্মকে পশ্চিমী মানুষ মিলাইতে পারে নাই। ইহাদের ইহকাল সর্বস্ব জড়বাদের বিরুদ্ধে তিনি মায়াবাদকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। মায়াবাদের দ্বারা জড়বাদকে অস্বীকার করা যায় এবং ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ত্যাগ। স্বামীজির জীবন ও সাধনায় ত্যাগের মাহাত্ম্য উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠিত। আবার ভারতীয়দের ক্ষেত্রে মায়াবাদ একটি নিশ্চল জীবনবিমুখতা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা সুস্থ জীবন বিকাশের পরিপন্থী। ইহার প্রতিষেধক রূপে তিনি সক্রিয় যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভক্তি যোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা রাজযোগে মানুষের তামস তপস্যা কাটিয়া যাইবে। তিনি পশ্চিমে

তমঃগুণের বিনাশ ও প্রাচ্যে রজঃগুণের অনুশীলনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। জীবনকে বলিষ্ঠ ও কর্মঠ করিতে হইবে, ধর্ম ও ধ্যান তখনই সার্থক হইবে।

পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদের উপর বেদান্তবাদী স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। অধ্যাত্মচিন্তায় বেদান্তকে সর্বসার রূপে গ্রহণ করিলেও পুরাণ বা পৌরাণিক নির্দেশকে তিনি নস্যাৎ করেন নাই। প্রতিমা পূজা ঈশ্বরোপাসনার একটি প্রাথমিক উপায় এবং অধ্যাত্মজীবনের ক্রমবিকাশে ইহা একটি প্রয়োজনীয় স্তররূপে গৃহীত হয় বলিয়া উহা নিন্দনীয় নহে। বৃদ্ধ মানুষ যেমন শিশুর পরিণতি, সে ক্ষেত্রে শৈশব ও যৌবন নিন্দনীয় নহে, সেইরূপ প্রবুদ্ধ আত্মার ক্ষেত্রে সাকার উপাসনাও নিন্দার বিষয় নহে। হিন্দুর আধ্যাত্মিক পরিক্রমাকে তিনি এক সত্য হইতে অন্য সত্যে পদক্ষেপের কথা বলিয়াছেন, ইহার প্রাথমিক স্তর অপরিণত হইতে পারে, কিন্তু তাহা ভ্রান্ত নহে—

> To the Hindu, man is not travelling from error to truth, but from truth to truth, from lower truth to higher truth. To him all religions, from the lowest fetichism to the highest absolutism, mean so many attempts of the human soul to grasp and realise the Infinite, each determined by the conditions of its birth and association.[৪৭]

অবতারবাদ সম্বন্ধে স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গী সর্বাংশে বৈদান্তিক নহে। বেদান্তবাদী জীবকে ব্রহ্মে উত্তরণ দেখিতে পান। ইহা জীবের ব্রহ্ম যাত্রা এবং পরিশেষে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতাবোধ। পৌরাণিক অবতারবাদ ইহা নহে। পৌরাণিক ধারণা বলে ব্রহ্ম জীবের উদ্ধারে মানবিকরূপ পরিগ্রহ করে। গীতার বিখ্যাত 'সম্ভবামি যুগে যুগে' তত্ত্ব এই পৌরাণিক অবতারবাদের কারণ ব্যাখ্যা করে। বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগে পরিষ্কার বলিয়াছেন,

> It is very good for children to think of God as an embodied man. It is pardonable in a child, but not in a grown-up man, thoughtful man or woman to think that God is a man or woman or so forth......, on the other hand the Impersonal God is a living God whom I see before me, a principle.[৪৮]

তবুও স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া স্পষ্টভাবে ঘোষণা

করিয়াছেন, "পরম কারুণিক শ্রীভগবান বর্ত্তমান যুগে সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাবসমন্বিত, সর্ববিদ্যাসহায়, পূর্বোক্ত যুগাবতার রূপ প্রকাশ করিলেন। · এই নবযুগধর্ম প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বগ যুগধর্মপ্রবর্ত্তক-দিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর।"[৮৯] এক্ষেত্রে স্বামীজি পৌরাণিক অবতারবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ বেদান্ত ও পুরাণের তত্ত্ব জিজ্ঞাসার দূরত্বকে তিনি সর্বদা বজায় রাখেন নাই। বেদান্তকে মূলে রাখিলেও পৌরাণিক ঐতিহ্যকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

পাপবোধ সম্বন্ধে সুচিরকাল পোষিত ধারণার উপর স্বামীজি নূতন আলোক-পাত করিয়াছেন। এখানে তিনি বেদান্তকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। খ্রীষ্টানের অনন্ত পাপ, অনন্ত নরক এই ধারণাটি আমাদের শিক্ষিত মানসে সঞ্চারিত হইতেছিল, আর সাধারণ মানসে পৌরাণিক চতুর্দশ নরকের কল্পনাও ভয়াবহ। স্বামীজি দেখাইলেন আত্মা যখন ব্রহ্ম সংলগ্ন, তখন তাহার পাপ নাই। তাই মানুষ ভুল করিতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য অনন্ত নরক, অনন্ত পাপ, এ সমস্তের কোন যৌক্তিকতাই নাই। আবার আপন হীনমন্যতা ও পাপবোধে সংকুচিত মনোবৃত্তিই সর্বাপেক্ষা বড় ভুল। আত্মিক বিশ্বাসের উপর এই সুগভীর আশ্বাস হিন্দুধর্মের জীর্ণতার উপর প্রবল প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। আবার ধর্মীয় ক্ষেত্রে আচার অনুষ্ঠানের অন্ধ আনুগত্যকেও তিনি সমর্থন করেন নাই। রীতি, নীতি, মতবাদ, সম্প্রদায়গত নির্দেশ—ধর্মাচরণের এই আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলি একান্তই গৌণ, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই হইল মুখ্য। ইহাদের প্রযুক্ততা ও অপরিহার্যতা লইয়া বিতর্ক বিরোধ করিয়া লাভ নাই, কারণ "ধর্ম কোন মতবাদ নহে, কতকগুলি নিয়মও নহে। ধর্ম একটি প্রক্রিয়া। মতবাদ ও নিয়মগুলি অনুশীলনের জন্যই আবশ্যক। সেই অনুশীলনের দ্বারা আমরা শক্তি সঞ্চয় করি এবং অবশেষে বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হই।"[৯০] এই মুখ্য আদর্শের প্রতি একাগ্র চিত্তে অগ্রসর হওয়াই মানুষের কর্তব্য।

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কীয় বিবিধ প্রসঙ্গে স্বামীজি এইরূপ মতামত দিয়াছেন। সব কিছু গ্রহণ ও স্বীকরণ করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়াছেন, তাহা ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁহার মৌলিক অবদানরূপে স্বীকার্য। ইহা বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বেরই এক নবভাষ্য। তিনি বলিতে-চাহিয়াছেন প্রতিটি আত্মা একান্তই ঐশী চেতনা সমৃদ্ধ, সেই অন্তর্নিহিত ঈশ্বরতাকে ফুটাইয়া তোলাই মানুষের সাধনা—'The goal is to manifest the divinity within'....ভবিষ্যতের ইতিহাসে মানুষের অন্তর্বিকাশের

জয়যাত্রা লিখিত হইবে, পশুত্বের আস্ফালনে যোগ্যের উদ্বর্তন এ মতবাদ যথার্থ নহে বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কেননা ঈশ্বরের প্রকৃতিই হইল মানবিক সীমায় প্রকাশিত হওয়া, সে ক্ষেত্রে এই সংঘাত নিতান্তই বহিরুপাদান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে হিন্দু জাগৃতির রেখাচিত্র। যুগ যুগান্তের হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা, আর সংস্কারের অক্টোপাশে বদ্ধ হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু ধর্মের কোন সত্যরূপ অন্বেষণ না করিয়া শুধু তাহার অভিধাকে গ্রহণ করিয়া শতাব্দীর সূচনা হইতে একটি ব্যর্থ রক্ষণ প্রয়াস দেখা দিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদের আলোকে ধর্মের বিচার ও অনুশীলন সুরু হইলে হিন্দু ধর্মের বহুরূপই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। কিন্তু কোন্ অন্তর্নিহিত মহা শক্তিতে ইহা বনস্পতির মত শতাব্দী ধরিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা অন্বেষণ করা হয় নাই। রামমোহন যুক্তি বুদ্ধির আলোকে ইহার খণ্ডাংশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। রামমোহনোত্তর ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারের তীব্রতায় সেই খণ্ডাংশকেও দেখিতে চাহেন নাই। তৎপরবর্তী কালে অনেকটা প্রতিক্রিয়াত্মক রূপেই হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান। ইহার মধ্যেও আবার আনুষ্ঠানিক আচার বিচার অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাইয়াছে, মতবাদের দ্বন্দ্বে ক্লান্ত হইয়াই যেন ইহাদের গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাও এক তর্কবুদ্ধির প্রত্যুত্তরে আর এক তর্কবুদ্ধির উদ্‌গীরণ। তবে জনজীবন সমর্থিত বলিয়া হিন্দু ধর্ম বিষয়ক নীতি নির্দেশগুলি সমাজ ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হইয়াছে এবং ইহাদের দ্বারা সমাজচিন্তার মোড় ফিরিয়াছে। সামাজিক গতি পরিবর্ত্তনের মুখে মনীষী চিন্তাবিদ ও সাধকগণ আপনাপন চিন্তা ও দর্শনের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং ইহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই শতাব্দী শেষের হিন্দু জাগরণের বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

আন্তর প্রকৃতির বিচারে সামগ্রিকভাবে এই হিন্দু জাগৃতিকে পৌরাণিক রূপাশ্রয়ী বলা চলে। বিভিন্ন মার্গের ধর্ম ও মতবাদের বিচারে ইহাই শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, অধ্যাত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে তর্ক বুদ্ধি ও যুক্তিই প্রধান উপকরণ নহে, বিশ্বাস, ভক্তি ও আত্মসমর্পণ—ইহাই এই পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। জ্ঞানমার্গীয় উপলব্ধি পরম সত্য হইলেও মানুষের ক্ষেত্রে তাহা সহজসাধ্য নহে, সেইজন্য দয়ানন্দ স্বামীর বেদ চর্চা কার্যকরী হয় নাই, রামমোহনের বেদান্ত অনুশীলনও দুরগ্রাহ্য হইয়াছে, বেদান্ত উপাসনা ব্রাহ্ম সমাজে দ্বৈতবাদী সাধনার রূপ পরিগ্রহ করিলেও তাহা জনজীবনে সঞ্চারিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব

পৌরাণিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তাঁহাদের সাধন ক্ষেত্রে পৌরাণিক ভক্তিবাদকে ত পাথেয়ই করিয়াছেন। সাধন ক্ষেত্রের এই তিন সিদ্ধ পুরুষ অদ্বৈত জ্ঞানকে পরমলক্ষ্য করিলেও সাকার উপাসনাকেই তাঁহারা সাধন তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মাতৃ বিগ্রহ আরাধনায় এই যে সিদ্ধিলাভ, ইহা শুধু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দেরই সিদ্ধি নয়, ইহা সংশয়াচ্ছন্ন জাতীয় মানসের পরাস্থান। সমগ্র দেশ জুড়িয়া এই যে বিশ্বাসের প্রবল আনুগত্য, ভক্তির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ প্রবাহ, মর্ত্যমানবের দিব্যানুভূতির বিদ্যুত চমক—ইহাই জাতিকে যোদ্ধরূপ হইতে যোগীরূপের মাহাত্ম্য জানাইয়া দিয়াছে। শতাব্দীর শেষপাদের সাহিত্য এই ভক্তি যোগের বিগলিত বাণীরূপ।

— পাদটীকা —

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। ২য় সং। শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ১১১
২। ঐ পৃঃ ১৭৩
৩। বাংলা সাময়িক পত্র। ১৮১৮—১৮৬৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৪৭
৪। হুতোম প্যাঁচার নক্সা—কালীপ্রসন্ন সিংহ পৃঃ ৭৮
৫। Report of the Director of Public Instruction, Bombay 1857-58
৬। Macaulay's Minute, 1835
৭। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ ২য় সং। শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ১৫৪
৮। Lord Hardinge's Resolution, 1844
৯। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ ২য় সং। শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ৩০৪
১০। ঐ পৃঃ ৩০৬
১১। Preamble—Special Marriage Act, 1872 (Act No. III of 1872)
১২। সত্যার্থ প্রকাশ—ভূমিকা পৃঃ ৩
১৩। ঐ ভূমিকা পৃঃ ৪
১৪। ঐ ত্রয়োদশ সমুল্লাস পৃঃ ৫৯২
১৫। ঐ চতুর্দশ সমুল্লাস পৃঃ ৬৬৮-৬৯
১৬। ঐ একাদশ সমুল্লাস পৃঃ ৩৪২
১৭। ঐ একাদশ সমুল্লাস পৃঃ ৩৪৪-৪৫

১৮। ঐ একাদশ সমুল্লাস পৃঃ ৩৬২
১৯। ঐ একাদশ সমুল্লাস পৃঃ ৩৫৩
২০। Memories of my life and times, Vol II—B. C Pal p 69
২১। Ibid p Liv
২২। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ—৩য় খণ্ড—বিনয় ঘোষ পৃঃ ২৯২
২৩। Prospectus of a society for the promotion of National feeling etc —Rajnarayan Bosu
২৪। জাতীয়তার নবমন্ত্র—যোগেশ চন্দ্র বাগল পৃঃ ৮-৯
২৫। ঐ পৃঃ ২০
২৬। ঐ পৃঃ ৪১
২৭। ঐ পৃঃ ৬০
২৮। ঐ পৃঃ ২১
২৯। ঐ পৃঃ ৪২
৩০। Memories of my life and times—Vol II—B C. Pal p ix
৩১। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা—রাজনারায়ণ বসু পৃঃ ১০
৩২। ঐ পৃঃ ৩২
৩৩। ঐ পৃঃ ৪০
৩৪। ঐ পৃঃ ৫৭
৩৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ২য় সং। শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ৩২২
৩৬। বৃদ্ধ হিন্দুর আশা, ভূমিকা—রাজনারায়ণ বসু
৩৭। ধর্মব্যাখ্যা—পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি পৃঃ ৫
৩৮। ঐ পৃঃ ১০
৩৯। ঐ পৃঃ ৫৭
৪০। ঐ পৃঃ ২৪১
৪১। বাংলার জাগরণ—কাজী আবদুল ওদুদ পৃঃ ১৪০
৪২। পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামীর বক্তৃতা সংগ্রহ—ভূদেব কবিরত্ন সংকলিত পৃঃ ২০৬
৪৩। ঐ পৃঃ ১১৯-৬০
৪৪। ঐ পৃঃ ১৪৪
৪৫। ঐ পৃঃ ২১০
৪৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সা সা চ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৬৮
৪৭। পত্রসূচনা—বঙ্গদর্শন, প্রথম সংখ্যা ১২৭৯
৪৮। বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন—ভবতোষ দত্ত, উত্তরসূরী, শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৬৯
৪৯। ঐ

৫০। বঙ্কিম জীবনী—শচীশ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৭৮৬-৮৭
৫১। ঐ পৃঃ ৭৮৮
৫২। ঐ পৃঃ ৭৯৫
৫৩। ঐ পৃঃ ৮০৬-০৭
৫৪। ঐ পৃঃ ৮০৭-০৮
৫৫। ঐ পৃঃ ৮১১
৫৬। ঐ পৃঃ ৭৯৫
৫৭। ঐ পৃঃ ৮১৫-১৬
৫৮। হিন্দু ধর্ম—বঙ্কিম রচনাবলী। ২য় খণ্ড। সংসদ সং। পৃঃ ৭৭৭
৫৯। ধর্মতত্ত্ব বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড। সংসদ সং। পৃঃ ৫৮৮
৬০। ঐ ঐ পৃঃ ৫৯৫ ৯৪
৬১। আদি ব্রাহ্ম সমাজ ঐ পৃঃ ৯১৭
৬২। ঐ ঐ পৃঃ ৯১৮
৬৩। শ্রীমদ্ভগবদগীতা, বঙ্কিমচন্দ্র—ভূমিকা
৬৪। ঐ বঙ্কিম রচনাবলী পৃঃ ৭৫২
৬৫। ধর্মতত্ত্ব ঐ পৃঃ ৫৯৬
৬৬। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত—বঙ্কবিহারী কর পৃঃ ১৪
৬৭। ঐ পৃঃ ১১
৬৮। ঐ পৃঃ ২৯
৬৯। ঐ পৃঃ ৩১
৭০। ঐ পৃঃ ৩১৬
৭১। আমাদের পরিচয়—ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত পৃঃ ১৮৫
৭২। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত—বঙ্কবিহারী কর পৃঃ ২৬৯
৭৩। ঐ পৃঃ ২৭০
৭৪। ঐ পৃঃ ২৭০
৭৫। প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী—জগবন্ধু মৈত্র পৃঃ ২০০
৭৬। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—১ম ভাগ—স্বামী সারদানন্দ পৃঃ ১৫৫
৭৭। ঐ পৃঃ ১৫০
৭৮। ঐ পৃঃ ৩১০
৭৯। ঐ পৃঃ ৩১৯
৮০। ঐ পৃঃ ৩২০
৮১। ঐ পৃঃ ৩৩০
৮২। ঐ পৃঃ ৩৩২
৮৩। হিন্দুধর্ম ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠখণ্ড পৃঃ ৪

৮৪। Chicago Address on Hinduism, September 19, 1893—Swami Vivekananda.

৮৫। Brooklyn address, December 30, 1894—Swami Vivekananda

৮৬। Chicago Address, *September 19, 1893*—Swami Vivekananda

৮৭। Ibid

৮৮। Jnana Yoga—Swami Vivekananda—p 220

৮৯। হিন্দুধর্ম ও শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—ষষ্ঠখণ্ড পৃঃ ৬

৯০। সানফ্রান্সিস্কো বক্তৃতা, ২৫ শে মার্চ, ১৯০০—স্বামী বিবেকানন্দ।

অষ্টম অধ্যায়

সাহিত্যসৃষ্টি : দ্বিতীয়ার্ধের শেষপাদ

শতাব্দীর শেষপাদের প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য

উনবিংশ শতকের প্রথম হইতে বাঙ্গালীর অন্তরজীবনে যে বহুতর ভাবদ্বন্দ্বের আলোড়ন শুরু হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া শতাব্দীর শেষার্ধে জাতীয় জীবনে একটি স্থির আত্মপ্রত্যয় আনিয়া দিয়াছে। সুদীর্ঘ কালের সমাজ সংস্কারের ভিন্নমুখী গতি প্রকৃতির মধ্যে জাতীয় মানস ধীরে ধীরে আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তরূপে দেখা গিয়াছে যে এই সংস্কার যতক্ষণ হিন্দু ধর্মের মৌল নীতিগুলিকে আশ্রয় করিয়াছে, ততক্ষণই তাহা ফলপ্রসূ হইয়াছে। হিন্দুধর্মের মূল নীতিগুলি সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে অনুসৃত হইয়াছে, নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব দিয়া এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন কার্যকরী হয় নাই। হিন্দু জাগৃতি ব্যাপক অর্থে ধর্ম ও সংস্কৃতির এই লোকশ্রেয় রূপটিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অতঃপর আপন ধর্ম ও বিশ্বাসে অবিচলিত থাকিতে কি পরিমাণে নবাগত বিশ্বাস ও অনুভূতিকে গ্রহণ করা যায়, তাহাই জাতির লক্ষ্য হইয়াছে। প্রথম যুগে সংরক্ষণের শুচিবায়ুতে কিংবা সংস্কারের উত্তেজনায় জাতীয় সংস্কৃতির কোন সুষ্ঠু অনুশীলন সম্ভব হয় নাই। মতামতের তর্কে ইহার ভিতরকার রূপটি প্রকাশিত হইতে পারে নাই। মনীষিবৃন্দ তাঁহাদের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও জাগ্রত চেতনাকে প্রধানতঃ জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণে এবং সংস্কৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সমাজ আন্দোলনের বহুবিধ কর্মপ্রচেষ্টায় জাতির অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির এইভাবে সুপ্রচুর অপব্যয় ঘটিয়াছে। এইবার লক্ষ্য স্থির হইলে এই অপচয়ের নিরসন ঘটিল। অতঃপর জাতির অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি ভূরি প্রমাণ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা এই শতাব্দীর শেষ পাদের গদ্য সাহিত্য, নাট্য সাহিত্য ও কাব্য সাহিত্যের মধ্যে জাতীয় জীবনের এই বিশ্বাস ও বোধের প্রতিফলন দেখিতে পাইব।

গদ্যের মধ্যে চিন্তাভাবনার সহজ ও ঋজু প্রকাশ সম্ভব বলিয়া এই অধ্যায়ের গদ্য সাহিত্যে জাতীয় চিন্তা সর্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মননশীল সৃষ্টি ও সমালোচনায় মনস্বী লেখকবৃন্দ সমাজের সম্মুখে একটি আদর্শ তুলিয়া

ধরিতে চাহিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের মহত্তর আদর্শ ও তাহার জন্য স্মৃতি পুরাণ ও শাস্ত্র সমর্থিত জীবনচর্যা এই যুগ ও জীবনে অভিনন্দিত হইবার যোগ্য, ইহাই তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। ভূদেবের প্রবন্ধাবলী, বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম গোষ্ঠীর সাহিত্য সম্ভার, সমসাময়িক পত্র পত্রিকার উৎসাহ উদ্যোগ এই হিন্দু সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে। শতাব্দী শেষে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ব পরিক্রমা ও বিজয়সাফল্য হিন্দু জাগৃতির সমূহ আয়োজনের পরিপূর্ণতা আনিয়াছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ।। হিন্দু কলেজ গোষ্ঠীর তিন প্রধানের অন্যতম ভূদেব মুখোপাধ্যায় আচার ধর্মে ও মনোভঙ্গীতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। তাঁহার ছাত্র জীবন হিন্দু কলেজের উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে ইহার উত্তাপকে কাটাইয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের মত তিনিও প্রথম দিকে মিশনারী প্রভাবের দ্বারা বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃদেব বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সজাগ প্রহরায় তিনি স্বধর্মে আস্থা ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। মধুসূদনের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যেমন তাঁহাকে দেশ ধর্ম হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে, ভূদেবের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা তেমনি তাঁহাকে দেশ ধর্মের গভীরতা উপলব্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। একই যুগাবহ তাঁহাদের ভিন্ন প্রকৃতির উপর ভিন্ন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

হিন্দু সংস্কৃতির অন্যতম রক্ষকরূপে ভূদেব তাঁহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তরুণ বিদ্যার্থী সমাজ তাঁহার শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তকগুলিতে জ্ঞান আহরণের বহু উপকরণ দেখিতে পাইয়াছে। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ও 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' তাঁহার সাহিত্যগুণও স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট। কিন্তু বাংলার সমাজ-জীবনে ও গার্হস্থ্য জীবনাদর্শে তাঁহার যে গ্রন্থগুলি আলোকবর্তিকার কাজ করিয়াছে, সেগুলি হইতেছে তাঁহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'আচার প্রবন্ধ'। বাংলার সমাজ জীবনে যে রক্ষণশীল চেতনা বরাবর কাজ করিতেছিল, ভূদেবের এই গ্রন্থগুলির মধ্যে তাহা সুসংস্কৃত ও মার্জিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

ধর্ম সম্বন্ধে ভূদেবের বিশিষ্ট দৃষ্টি তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধে' প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে তিনি বলিতেছেন, "যেমন দেহের শিরোভাগ, মধ্য ভাগ এবং হস্তপদাদি অঙ্গ আছে, তেমনি ধর্মের শিরোভাগ, তাহার মতবাদ লইয়া, মধ্যভাগ, নীতি ব্যবহার লইয়া, এবং হস্তপদাদি আচার প্রণালী লইয়া সংঘটিত মনে করা যাইতে

পারে। উহারা পরস্পর পৃথক হইয়াও সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয়।"[১] ধর্মকে এই ভাবে তিনি মতবাদ, নীতি ও আচারের দিক হইতে বিচার করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রধান তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থে ইহাদের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়াছেন।

ধর্মের মতবাদ সম্পর্কে তিনি কোনরূপ সংশয় রাখেন নাই। স্পষ্টতঃই তিনি বলিয়াছেন যে আর্যধর্মই সকল ধর্মের মধ্যে উদার। ইহাতে বিভিন্ন জাতি ধর্মের উদ্দেশ্য ও আকাংক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটিতে পারে। ভারতধর্মের সহিত ইউরোপীয় ধর্মের যে সংঘাত, তাহাতে ভারতধর্মের অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "অতীন্দ্রিয় ভাবের একান্ত বিরোধী যে সঙ্কীর্ণ জড়বাদ এক্ষণে ইউরোপে দেখা দিয়াছে তাহা ইউরোপের সর্বপ্রধান দার্শনিকেরা স্থায়ী বলিয়া মনে করেন না এবং ঐ ইউরোপীয় জড়বাদ এদেশে আসিলেও ভারতবর্ষের প্রশস্ত অদ্বৈতবাদ দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়াই যাইবে। অতএব ইউরোপীয় সংস্রবে এবং ইংরাজ আধিপত্যে আমাদের ধর্ম্ম মতবাদের কোন মৌলিক পরিবর্তন সংঘটন হইতে পারে না।"[২] অর্থাৎ তিনি ইউরোপীয় প্রভাবকে কোনরূপ ধ্বংসাত্মক শক্তিরূপে কল্পনা করেন নাই। এদেশের বিদ্বান হইতে সাধারণ অনেকেই যখন ইউরোপীয় ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি ভারতীয় ধর্মের অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থা পোষণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ হিন্দুধর্মের নীতিবাদ অত্যন্ত প্রখর। মনুকথিত ধর্মের দশলক্ষণকে তিনি ধর্মের অন্তর্নিহিত নৈতিক ভিত্তিভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ধৈর্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—এই নৈতিক আদর্শগুলি হিন্দুধর্মের সহিত সম্পৃক্ত। এই নীতিগুলির দ্বারা মানুষের মধ্যে শান্তি, দৃঢ়তা ও পবিত্রতা আসিবে। লোক ব্যবহারের প্রতি হিন্দুধর্মের নৈতিক নির্দেশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। হিন্দুধর্মে আত্মীয় অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলের প্রতি আপন ব্যবহার করিতে বলে। ভূদেবের মতে এই নৈতিক নির্দেশই যুগপৎ ইহার শক্তি ও দুর্বলতার কারণ হইয়াছে। সর্বভূতকে আত্মবৎ মনে করায় ইহার মত অসাম্প্রদায়িক মতবাদ আর কোথাও নাই। কিন্তু স্বল্পাধিকারীর নিকট ইহা একটি প্রবল ত্রুটি সৃষ্টি করিয়াছে। এই একটি রন্ধ্র পথেই ভারতে বহু ধর্মবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্মের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়া ইহার অসাম্প্রদায়িকতার সুযোগে আনুষঙ্গিক ধর্মগুলি বহুলাংশে সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু ধর্মের উদার নীতিবাদের এই ঐতিহাসিক পরিণতিকে ভূদেব সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

সর্বশেষে ইহার আচারের দিক। হিন্দু ধর্মের আচার অনুষ্ঠানগুলি একেবারে নিরর্থক নহে বলিয়া তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই আচার পালনের সাক্ষাৎ ফল ঐহিক। ইহা মানুষের ভূযোদর্শন বা বিজ্ঞানের সহিত অসম্পৃক্ত নহে, অর্থাৎ প্রকৃত অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান যাহা বলিবে, প্রকৃত সদাচারও তাহা হইতে ভিন্ন হইবে না। এই আচারগুলিকে ভূদেব কয়েকটি ভাগে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ধারণ, দশবিধ সংস্কার, ব্রতানুষ্ঠান, আশ্রমভেদ রক্ষা ও শ্রাদ্ধ পূজাদি ক্রিয়া এইগুলি মানুষের অবশ্য পালনীয়। ধর্মরক্ষার প্রধানতম উপায় হিসাবে আচারগুলিকে গ্রহণ করা যায়, এগুলির যথাযথ প্রতিপালনে জাতির স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, বিপরীত ভাবে ইহাদের লংঘনে মানুষ ক্ষীণায়ু হয় এবং ফলস্বরূপ সমগ্র দেশ ও জীবনকে ব্যাধিগ্রস্ত করে। ধর্মের শরীর হিসাবে আচারগুলি অপরিহার্য বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন: "বস্তুতঃ আচার ধর্মের শরীর। দশসংস্কার পবিত্রতার ব্যঞ্জক। ব্রতানুষ্ঠান ইন্দ্রিয়দমনের বিকাশ। আশ্রমভেদ অধিকারী ভেদ স্বীকৃতির পরিচায়ক এবং শ্রাদ্ধ পূজাদি পূর্বাগতদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। অতএব সমগ্র আচার লোপে নীতিলোপও অবশ্যম্ভাবী।"[৩]

ভূদেব হিন্দু ধর্মের মূল প্রকৃতি লইয়া পর্যালোচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইহা কতকগুলি স্থির বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিয়াছে। সমগ্র পৌরাণিক জীবনচর্যা এই বিশ্বাসগুলিকে সযত্নে লালন করিয়াছে। ইহাদের একটি হইল কর্মফলবাদ, অপরটি হইল বর্ণাশ্রম নীতি। এই দুই প্রধান সূত্র সমগ্র জাতিকে অদ্ভুত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। কর্মফলবাদ হিন্দু জীবনকে মহৎ সান্ত্বনা দিয়াছেন। ইহা তাহাকে ধর্মভীরু ও শান্তিশীল করিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন প্রকার আত্মিক ক্ষোভ বা অভিযোগের সৃষ্টি করে নাই। আচারে পবিত্রতা, ধর্ম ভীরুতা, আত্মসংযম, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য প্রভৃতির দ্বারা যে অন্তঃশাসন ও তাহাতে লব্ধ যে শান্তি ইহা হিন্দু জীবনকে একটি স্থির লক্ষ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ তাহার সুখ দুঃখের কেন্দ্রবিন্দুতে সে আপনার কৃতকর্মকে রাখিয়া দিতে চাহিয়াছে। "সেই শাস্ত্র শিখাইলেন যে, বর্তমানে প্রাক্তনের ফলভোগ এবং পরকালে বর্তমানের ফলভোগ হয়। এই শিক্ষা পল্লবিত হইয়া সমাজস্থিত জনসমূহকে একটি সান্ত্বনার এবং একটি উত্তেজনার বাক্য বলিল—প্রাক্তনের সুকৃত থাকে, বর্তমানে ভাল থাকিবে, দুষ্কৃত থাকে, ভাল থাকিতে পারিবে না, আর বর্তমানে সুকৃত করিতে পার, পরকালে ভাল থাকিবে, সুকৃত না করিতে পার, ভাল থাকিবে না।"[৪] আপন ইচ্ছাশক্তির উপর ইহকাল পরকাল সম্বন্ধীয় শুভাশুভের ধারণা

হিন্দু জীবনকে কার্যকারণ সংযুক্ত একটি ব্যবহারিক নীতি শাস্ত্রের সন্ধান দিয়াছে।

অতঃপর বর্ণাশ্রম ধর্ম তথা জাতিভেদ প্রথা। ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করিয়া ভূদেব দেখাইয়াছেন যে এই প্রথা সংরক্ষণের একটি সামাজিক উপযোগিতা আছে। বৈদিক ভারতে জাতিভেদ প্রথা তেমন প্রকট হয় নাই এই কারণে যে প্রথম দিকের আর্যবহুল সমাজে ভিন্ন বর্ণের লোকের তাদৃশ সমাবেশ হয় নাই। সুতরাং তখন বিভিন্ন বর্ণ মিশ্রণের বাস্তব সমস্যা উপস্থিত হয় নাই। পরে সর্বদিকে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটিলে বিভিন্ন বর্ণের অবাধ মিশ্রণে সমাজের আর্যরক্ত যাহাতে দূষিত না হয়, তাহার জন্য সমাজ ব্যবস্থাপকগণ জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তন করিলেন। সুতরাং জাতিভেদ প্রথার মূল কারণ শ্রমবিভাগ নহে, মূল কারণ বিবাহভেদ। এই বিবাহভেদকে রক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য ভেদের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতবর্ষের জাতিভেদ তত্ত্ব বিবাহ ভেদকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছে। বিবাহ যত সমান ক্ষেত্রে হয়, ততই জাতির মঙ্গল। কারণ, 'ক্ষেত্রে বীজের বৈষম্য হইতে পূর্ব পুরুষের দোষাদি সন্তানে প্রত্যাগত হইবার অধিক সম্ভাবনা—এইটি মৌলিক তথ্য।'[৫]

ভূদেবের এই মতামতগুলি নিছক তত্ত্বালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তাঁহার অভিমতগুলিকে ভিত্তি করিয়া তিনি পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন গঠন করিতে চাহিয়াছেন। গৃহাশ্রম ধর্ম মনুর কাল হইতে এদেশে পরম সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। কোনরূপ উচ্ছৃংখলতা ও নৈতিক ব্যভিচারিতা দ্বারা এই জীবনকে কলুষিত করা উচিত নহে। তাঁহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ' কল্যাণপ্রসূ আদর্শের ভিত্তিতে অপ্রমত্ত গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়াছে। ইহা সত্যই নবযুগের বাঙ্গালীর গৃহ্যসূত্র। ভূদেবের সমসাময়িক কালেই বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনে ফাটল ধরিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে আধুনিক কালের অভিশাপ। পারিবারিক বন্ধন ক্রমশই শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নীতি ধর্মের শিথিলতা সমাজদেহকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছিল। ভূদেব সেই ক্ষেত্রে বোধ করি স্মার্ত রঘুনন্দনের খরশাসনে উন্মার্গগামী সমাজনীতিকে আর একবার শৃংখলাবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। ইহা তাঁহার একান্ত সর্বস্ব রক্ষণশীলতা না বিকারগ্রস্ত সমাজ জীবনের নিরাময়-প্রতিষেধ তাহাই ভাবিবার বিষয়। 'আচার প্রবন্ধে' তিনি সদাচার পালনের সুদীর্ঘ নির্দেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিত্যাচার ও নৈমিত্তিকাচারের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়া এগুলিকে তিনি জীবনে নিষ্ঠা সহকারে বহন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। মানুষের পশুধর্ম বা জড়ধর্ম পরিহার

করিতে হইলে শাস্ত্রানুমোদিত কর্মধারার অনুসরণ করিতে হইবে। আচার ধর্ম পালনে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যে জীবনে 'অবিচারিত প্রবৃত্তির বশ হওয়া অপেক্ষা বিচারিত বিধির বশ হওয়াই শ্রেয়।'[৬]

ভূদেবের এই নীতি নির্দেশ, সদাচার ও অনুশাসনের এই আনুগত্য নিঃসন্দেহে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নব পুরোধা রূপে পরিগণিত করিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তিনি 'রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধারায় বাংলায় অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রেণীর শেষ আদর্শ?' একথা ঠিক, ভূদেবের পরে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গঠনের ক্ষেত্রে তাঁহার মত কুলগুরুর আবির্ভাব আর হয় নাই। তাঁহার আদর্শকে বহন করিবার যথার্থ উত্তরসাধক আসে নাই। এদিক দিয়া ভূদেবের আধুনিক আবেদন কিছুটা খর্ব হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে স্মৃতিবিধানের বাংলা দেশ সচেতন ভাবে তাঁহাকে স্মরণ না করিলেও অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে মনে করিবে। উনবিংশের যুগচিন্তায় ভূদেব যদি যথার্থ নিরাময় ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়া থাকেন, তবে আজিও তাহার উপযোগিতা নিঃশেষিত হয় নাই। সমস্ত সামাজিক বিধি ব্যবস্থার সৃষ্টি ও উৎপত্তি প্রাচীন যুগে। সেগুলির প্রভাব কোনদিন সম্পূর্ণভাবে শেষ হইতে পারে না। ভূদেব আধুনিক যুগের প্রাক্কালে যদি প্রাচীন দীপবর্তিকাকে একটু উজ্জ্বল করিয়া দেন, তাহা হইলে কি তাঁহাকে রক্ষণশীলের রুদ্ধকক্ষে অন্তরীণ রাখা সমীচীন হইবে?

ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থটি 'কতিপয় তীর্থ দর্শন উপলক্ষে ব্যাস-মার্কণ্ডেয় সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথন।' ইহাতে পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে ভারততত্ত্ব সন্ধানের চেষ্টা করা হইয়াছে এবং পরিণতিতে জাতীয়তাবোধ উদ্দীপনের দ্বারা দেশমাতৃকার বন্দনা করা হইয়াছে। ইহাতে চিত্রিত বেদব্যাস স্বজাতি-অনুরাগের, মার্কণ্ডেয় জ্ঞানরাশির এবং দেবী মাতৃভূমির প্রতিরূপ। দুই মহাপুরুষের তীর্থ পর্যটনের মধ্যে লেখক দুইটি ভিন্ন যুগের চিত্র আঁকিয়াছেন। কলিযুগোপযোগী বর্তমানের ব্রাহ্মণবেশী যাহা দর্শন করিয়াছেন, শাস্ত্র ও পুরাণবেত্তা প্রাচীন বেদব্যাস তাহার মধ্যে তত্ত্ব ও তাৎপর্যের সন্ধান পাইয়াছেন। এইভাবে বিভিন্ন তীর্থের মধ্যে পৌরাণিক ভারতের যে মর্মবাণী লুক্কায়িত আছে, তাহাই এই সংবাদ কথনে পরিস্ফুট হইয়াছে।

পুষ্পাঞ্জলিতে বর্ণিত কয়েকটি তত্ত্বদর্শনের উল্লেখ করা যায়। প্রভাস তীর্থে মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন, "যেমন ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়গণের অনুভূতিও বিভিন্নরূপে। কোন পদার্থের স্বাচ প্রত্যক্ষ,

কাহারও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, কাহারও শাব্দ প্রত্যক্ষ এবং কাহারও ঘ্রাণ প্রত্যক্ষ হয়। তেমনি বিষয় ভেদে কাহারও অনুভব যুক্তি দ্বারা, কাহারও স্মৃতি দ্বারা, কাহারও আশা দ্বারা হইয়া থাকে। ....বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হইলেই কোন ব্যাপার অলীক এবং অসত্য বলিয়া অবধারিত হইতে পারে না।"[৭] আলোচ্য ক্ষেত্রে পুরাণপ্রোক্ত প্রজ্ঞা ও তজ্জনিত আশাবৃত্তির কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

আবার কঙ্কন তীর্থে শিবভক্তের মুখে শোনা যায়: "কষ্টস্বীকার সর্বধর্মের মূল ধর্ম। সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধানা শক্তি। যে ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চির তপস্বী, এইজন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চিরসঙ্গিনী।"[৮] আলোচ্য ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার জয়গান করা হইয়াছে। সাধনার ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা অপরিহার্য্য। সহিষ্ণুতাই রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরকে বিজয়ী করিয়াছে।

অতঃপর কুমারিকা তীর্থের মৃত্যু তত্ত্বটি অপূর্ব। মৃত্যুদেবতা বেদব্যাসকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি আরোপিত প্রশ্নগুলিই জিজ্ঞাসা করিলেন: বার্তা কি? আশ্চর্য কি? পথ কি? সুখ কি? সৃষ্টি জগতে মহাকালের অমোঘ শাসনের কথা যুধিষ্ঠির বার্তারূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভূদেবের বেদব্যাস ইহার উত্তর দিয়াছেন: "সংসাররূপ বিচিত্র উদ্যানের প্রাণিবৃক্ষ সংরোপিত হইয়া আছে। মৃত্যুরূপধারী বিধাতা তাহাতে নিত্য নূতন সৃষ্টির বিধান করিতেছেন। জগতের প্রকৃত চিরন্তন বার্তা এই।"[৯] সৃষ্টি ও বিনাশের ধারা ব্রহ্মাণ্ডে অব্যাহত, ইহাই যুগ যুগান্তের বার্তা। আশ্চর্য বলিতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—নিত্য প্রাণীকুলের মৃত্যু দেখিয়াও মানুষ চিরজীবী হইতে চায়, ইহাই পরম আশ্চর্য। বেদব্যাস উত্তর দিয়াছেন, "পঞ্চভূত পরিপাকে জীবদেহের জন্ম হইতেছে এবং সেই জীব ক্রমশঃ পরিণত হইয়া ঈশ্বরত্বের অধিকারী হইতেছে। যে সাক্ষাৎ নারায়ণ মৃত্যুপতির পালন গুণে এতাদৃশ সমূহ মঙ্গল সাধন হইতেছে, লোকে তাঁহাকে ভয় করে এবং অমঙ্গল বলিয়া বোধ করে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য কি?"[১০] যুধিষ্ঠির যাহাকে অবধারিত বলিয়াছেন, বেদব্যাস তাঁহাকে মঙ্গলের নিদান বলিয়াছেন। মৃত্যু সম্বন্ধে এই চিরপোষিত শঙ্কা মানুষের সহজাত—একটি ধ্রুব পরিণতিকে অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি সত্যই আশ্চর্যের বিষয়।

গূঢ় ধর্মকে চিনিবার উপায় নাই, ভিন্ন দ্রষ্টার ভিন্ন মত। সে ক্ষেত্রে মহাজন নির্দিষ্ট পথই প্রকৃত পথ—ইহাই ছিল যুধিষ্ঠিরের উত্তর। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মহাবৃত্তকে বেদব্যাস পথ বলিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ধর্মমতের দিক হইতে প্রশ্নের উত্তর

দিয়াছেন, বেদব্যাস দিয়াছেন জাগতিক বিধানের দিক হইতে। তাঁহার পথ সৃষ্টি তত্ত্বানুগ।

অঋণী ও অপ্রবাসীকে যুধিষ্ঠির সুখী বলিয়াছেন। তাঁহার উত্তর সাংসারিক দিক হইতে। বেদব্যাস উত্তর দিয়াছেন দার্শনিক দিক হইতে। মানুষ জন্ম পারম্পর্যের সূত্রে আবদ্ধ। ইহা স্মরণ রাখিয়া নিরভিমানচিত্তে স্বীয় অংশধর্ম প্রতিপালন করিলেই সে সুখী।

হিন্দু সংস্কৃতির আচার ধর্মগুলি যেমন ভূদেবের প্রবন্ধগুলিতে ব্যক্ত, তেমনি তাঁহার পৌরাণিক প্রজ্ঞা ও ভারতবোধের পরিচয় তাঁহার পুষ্পাঞ্জলি। পৌরাণিক রূপক আখ্যান ও কিংবদন্তীর নব বিশ্লেষণে ভূদেব স্বজাতি অনুরাগীকে তাহার ধ্যানগম্য দেবীমূর্তি মাতৃ ভূমির সহিত সাক্ষাৎ ঘটাইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ আমরা ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রবক্তারূপে আলোচনা করিয়াছি। রস সাহিত্যের অনুপম সৃষ্টির সমান্তরালে তিনি শাস্ত্র ও স্বধর্মের মার্জিত অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি এসম্পর্কে গূঢ় পর্যালোচনা সুরু করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকাতেই বঙ্কিমের ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনাগুলি প্রকাশিত হইত। এইগুলি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বক্ষ্যমান অধ্যায়ে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা যাইতেছে।

হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধীয় বঙ্কিমের গ্রন্থগুলি হইল 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্ম'। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে ধর্মের তত্ত্বালোচনা, 'কৃষ্ণ চরিত্রে' তাহার বাস্তবায়িত আদর্শ, 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'তে কৃষ্ণ প্রবর্তিত ধর্ম ব্যাখ্যান এবং 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্ম' গ্রন্থে বৈদিক দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি ভূমির বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্ম' গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী পূর্বোক্ত ধর্মগ্রন্থগুলি হইতে বিষয়বস্তুর দিক দিয়া স্বতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে ইহা পুস্তকাকারে গ্রথিত হয় নাই। পৃথক পৃথক কয়েকটি শিরোনামে ইহার প্রবন্ধগুলি 'প্রচারে' প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁহার তিরোধানের পরে ইহা সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের উদ্যোগে জনসাধারণের গোচরীভূত হয়।[১১] বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বৈদিক দেবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনা রীতি সম্পর্কে কিছু কিছু পর্যালোচনা

করিয়াছেন। তিনি বৈদিক ধর্মের তিনটি স্তর লক্ষ্য করিয়াছেন :[১২]

১। "প্রথম, দেবোপাসনা—অর্থাৎ জড়ে চৈতন্য আরোপ এবং তাহার উপাসনা

২। ঈশ্বরোপাসনা এবং তৎসঙ্গে দেবোপাসনা

৩। ঈশ্বরোপাসনা এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়।"

অর্থাৎ বেদের ঈশ্বরতত্ত্ব একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম তেত্রিশ দেবতার উপাসনা নহে কিংবা তিন দেবতারও উপাসনা নহে। তাহা মূলতঃ এক ঈশ্বরেরই উপাসনা। এই ঈশ্বরোপাসনার ধারাই হিন্দুধর্মে গৃহীত হইয়াছে। বহু রূপ ও বিচিত্রতার মধ্যে ইহাই হিন্দুধর্মের স্থির চিন্তা। বেদ উপনিষদ হইতে পুরাণ সংহিতা ইত্যাদির মধ্যে এই এক ঈশ্বরের কথাই প্রবর্তিত হইয়াছে। গীতায় কৃষ্ণোক্ত ধর্মের মধ্যে ইহা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে : "ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।"[১৩]

বৈদিক ধর্মের তত্ত্ব ও তাৎপর্য লইয়া বঙ্কিম বিশেষ আলোচনা করেন নাই। এগুলি একান্তই প্রাসঙ্গিক আলোচনা। বঙ্কিম-চিন্তা ধীরে ধীরে একটি বিশিষ্ট বিষয় আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইতেছিল। ইহা হিন্দুধর্মের পৌরাণিক চেতনা। ইহা হইতে তিনি সুগভীর তত্ত্ব ও আদর্শ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' ইহারই ফল, গীতা ব্যাখ্যা এই অন্বিষ্ট তত্ত্বাদর্শের টীকা ভাষ্য। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের পুরাণ ধর্মকে অভিনব উপায়ে গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যাইবে।

এসম্বন্ধে মোহিতলালের সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি রূপ সৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম বলিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ নিরবয়ব ভাববস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া তোলাই কবির কাজ। ভারতীয় বেদান্তদর্শন সুকঠিন ভাববস্তুকে নিরবয়ব করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। ভারত ধর্মের ইতিহাস নানা শূন্যবাদ বা নাস্তিক্য-দর্শনের কোলাহলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর শঙ্করাচার্য এই নাস্তিক্যদর্শনের প্রতিবাদে যে দার্শনিক তত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাও একান্তরূপে তত্ত্বকেন্দ্রিক। ইহাতে জনসাধারণ সত্যিকারের মুক্তি প্রেরণা পায় নাই। জাতীয় জীবন এই সময়ে একটি জীবন্ত তত্ত্বদর্শন দেখিতে চাহিয়াছে। তাহার এই আত্মিক সংকট মোচনের দায়িত্ব লইয়াছে পৌরাণিক সাহিত্য। দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্ম-তত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বকে ইহা সহজ সরল করিয়া জনসমাজে পরিবেশন করিয়াছে। জাতীয় সংকট মুক্তির ইহা এক অভিনব উপায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই পৌরাণিক

কবিকর্মের ধারাই বহন করিয়াছেন। মোহিতলালের ভাষায়, "সেই পৌরাণিক কবি প্রতিভা এ কালের ভারতে আবার এক মহা যুগসঙ্কটের সন্ধিক্ষণে সহসা বাঙ্গালী জাতির হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল—বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রেরণাই অনুভব করিয়াছিলেন। সেই প্রেরণার বশেই তিনি আর এক যুগের মূর্তি, বা সাধন বিগ্রহ নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার একটা সাক্ষ্য প্রমাণও আছে—বঙ্কিমচন্দ্র ঐ পৌরাণিক ধর্মকেই হিন্দু ধর্মের পূর্ণ পরিণতরূপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি এই আরেক যুগের অভিনব বিপ্লবী প্রবৃত্তিকে ঐ য়ুরোপীয়, প্রকৃতি সর্বস্ব, অন্ধ জীবনাবেগের দুরন্ত দাবিকে স্বীকার করিয়া তাহারই ভবানীতে ভারতের সেই নিত্য সনাতন পুরুষ আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। তিনিও ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে মূর্তিতত্ত্বে নামিয়া আসিলেন।"[১৪] পাশ্চাত্যের যে প্রকৃতি ধর্ম আধুনিক যুগে সর্বজয়ী শক্তি ধারণ করিয়াছে, ইহাতে জীবনের যে বলিষ্ঠ বাস্তবতা প্রকাশ পাইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে স্বীকার করিয়া তাঁহার পৌরাণিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করিয়াছেন। সনাতনের নিরাকারকে যুগের আকারে সাকার করিয়া তিনি প্রাচীন তত্ত্বদর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র এই সাকার কল্পনা—ভারতীয় ধ্যান ধারণার পরম আশ্রয়কে তিনি যুগপটে রাখিয়া নূতন করিয়া বিচার করিয়াছেন।

বস্তুতঃ 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' সম্মিলিতভাবে তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও তাহার সাকার পরিপূরক রূপে গৃহীত হইতে পারে। আবার ধর্মতত্ত্বের তত্ত্বব্যাখ্যাও একান্তভাবে তত্ত্বালোচনা নহে। মহাভারতে পৌরাণিক জীবনচিত্র যেমন তত্ত্ব ও আদর্শের সঙ্গমকেন্দ্র, তেমনি তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব'ও তত্ত্ব ও আদর্শের মিলনকেন্দ্র। তথাপি 'ধর্মতত্ত্ব' একক ভাবে সঠিক আদর্শকে প্রতিফলিত নাও করিতে পারে, এইজন্য পৃথকভাবে 'কৃষ্ণচরিত্রের' রচনা। আবার 'কৃষ্ণচরিত্রে' যে আদর্শ অভিব্যক্ত ও আচরিত হইয়াছে, তাহার তত্ত্বব্যাখ্যা হিসাবে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে তত্ত্ব হইতে আদর্শে আবার আদর্শ হইতে সত্যে উপনীত হইয়াছেন। আমরা স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ধর্মতত্ত্ব ॥ 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' দুইটি পরিপূরক রচনা। ধর্মতত্ত্বের প্রবন্ধগুলি প্রথম সংখ্যা (১২৯১, শ্রাবণ) হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। কালানুক্রমিক বিচারে যদিও ইহা কৃষ্ণচরিত্রের পরবর্তী রচনা, তথাপি কৃষ্ণচরিত্রের তত্ত্বাংশ ইহাতে

সূত্ররূপে গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া ইহার স্থান 'কৃষ্ণচরিত্রের' পূর্বে হওয়াই সমীচীন। কৃষ্ণচরিত্রের বিজ্ঞাপনে ইহা উপলব্ধি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন: "আগে অনুশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেননা অনুশীলন ধর্মে যাহা তত্ত্ব মাত্র কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তারপর উদাহরণের দ্বারা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।"[১৫]

ধর্মতত্ত্বের প্রধান ভিত্তিভূমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বঙ্কিমের নিকট কোন পরোক্ষ প্রভাবরূপে স্বীকৃত হয় নাই, প্রত্যক্ষ প্রেরণারূপেই গৃহীত হইয়াছে। এইজন্যই বোধ হয় ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্রে গীতার ধর্ম সম্যক পর্যালোচনা করিয়াও তিনি অসম্পূর্ণতা বোধ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে তিনি গীতাভাষ্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

গীতাকেই মূল কেন্দ্রে রাখিয়া বঙ্কিম তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপনায় বিভিন্ন তত্ত্ব ও চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শেষ বক্তব্য হইল, হিন্দু ধর্মের সারাংশ এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভগবদ্গীতা যে অনুশীলন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। উহা মানুষকে মুক্তি অভিমুখী করে, 'যে মুক্তি সুখমাত্র নহে, একেবারে আত্যন্তিক সুখ।'

মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'ধর্মতত্ত্ব'কেই বঙ্কিমের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান বলিয়াছেন। এই অভিমত সর্বতোভাবে সমর্থন যোগ্য। কারণ ইহাই বঙ্কিমের ধর্মচিন্তা ও দার্শনিক প্রত্যয়ের ভিত্তিভূমি। ধর্মতত্ত্বের 'খ' ক্রোড়পত্রে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিবিধ ধর্ম ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া ভগবদ্গীতার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের ধর্মব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি অগুস্ত কোম্‌তের বক্তব্যকে সর্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া মনে করেন:[১৬]

> **Religion, in itself expresses the state of perfect Unity which is the distinctive work of man's existence, both as an individual and in society—when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose.**

কোম্‌তের চিন্তাধারার সামীপ্যে তিনি গীতার মধ্যে ধর্মের পূর্ণপ্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন:[১৭] "যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে

ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মনুষ্য-প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।"

ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম মানুষের অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যের কথা বলিয়াছেন। এই বৃত্তিগুলি চারিটি ভাগে বিভক্ত—শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। ইহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং ইহাদের যথোচিত অনুশীলন ও পরস্পরের সামঞ্জস্যের মধ্যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব—ইহাই ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমের মোটামুটি বক্তব্য। ইহার আনুষঙ্গিক বক্তব্য, বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যে চিত্তের ঈশ্বরমুখীনতা। "সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম, ইহাই স্থায়ী সুখ, ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ 'ভক্তি প্রীতি শান্তি,' ইহাই ধর্ম, ইহা ভিন্ন ধর্মান্তর নাই।"[১৮]

অনুশীলনের উদ্দেশ্য যে আত্যন্তিক সুখ, তাহা লাভ করিতে হইলে কোন বৃত্তিকে একেবারে তুচ্ছ এবং কোনটিকে বিশেষভাবে কল্যাণপ্রদ ভাবিলে চলিবে না। আমাদের কথিত নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলিও উচিত মাত্রায় ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম। এ সম্বন্ধে গীতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সেখানে কৃষ্ণের যে উপদেশ, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে।

অতঃপর বিভিন্ন বৃত্তির উপর বঙ্কিমের বক্তব্য আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমে শারীরিকী বৃত্তির কথা। প্রথমতঃ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে শারীরিক বৃত্তি-সকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। তারপর জ্ঞানার্জনী বৃত্তি প্রভৃতির সম্যক অনুশীলনের জন্য ও শারীরিকী বৃত্তি-সকলের অনুশীলন আবশ্যক, যেহেতু শারীরিক শক্তির হ্রাসবৃদ্ধিতে ইহাদের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তৃতীয়তঃ আত্মরক্ষার্থে শারীরিক বৃত্তির পরিচর্যা অত্যাবশ্যক। বলাভাবহেতু ধার্মিক ব্যক্তিও অনেক সময় অধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা ভাষণের পশ্চাতে এইরূপ বলাভাব লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি স্বদেশ রক্ষা। যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম। পরন্তু ইহা আরও গুরুতর ধর্ম, কারণ এখানে আপন ও পর উভয়কে রক্ষা করিতে হয়। শারীরিক বৃত্তিগুলি অনুশীলনের জন্য ব্যায়াম, শিক্ষা, আহার ও ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধে অবশ্য পালনীয় নীতিগুলি মানিয়া চলিতে হয়। এইরূপে তিনি দেখাইয়াছেন, "শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি

পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট, একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে সকল ধর্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত তাঁহাদের কথিত ধর্ম অসম্পূর্ণ।”[১৮]

জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমের বক্তব্য হইল, এ বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম-নির্দিষ্ট সুখ সম্ভব। তারপর জ্ঞানোপার্জন ব্যতীত অন্য বৃত্তিরও সম্যক অনুশীলন করা যায় না। সর্বোপরি জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না এবং ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করা যায় না। এই জ্ঞান পুস্তক পাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে হইতে পারে, ইহার অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে। আমাদের দেশের পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার নিহিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে একটি মারাত্মক ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্ফুরণ নহে। এইরূপ জ্ঞান কল্যাণপ্রদ নহে, পীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান মানুষের বিপদ ডাকিয়া আনে। জ্ঞানভারগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানে না। জ্ঞাত বস্তুগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাহাদের সমবায়ে ফল কি, তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। এইরূপ জ্ঞানার্জনই ধর্মের একটি প্রধান অংশ।

অতঃপর কার্যকারিণী বৃত্তির কথা। এই বৃত্তির কাজ কর্মে প্রবৃত্তি দেওয়া। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, কাম, ক্রোধ, লোভ—এই বৃত্তির অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে ভক্তি প্রীতি ও দয়াকে বঙ্কিমচন্দ্র উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। ভক্তিবৃত্তির প্রসঙ্গে ধর্মতত্ত্বের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় ‘ভক্তিতত্ত্ব’ আলোচিত হইয়াছে। ধর্মতত্ত্বের দশম হইতে বিংশতি অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তিতত্ত্বের সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। বঙ্কিমের ভক্তিতত্ত্ব বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিষয়কে আশ্রয় করিয়াছে। মনুষ্য মধ্যে পিতা-মাতা, রাজা, আচার্য-পুরোহিত, সমাজ শিক্ষক, ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ভক্তির পাত্র। ইঁহাদের কেন্দ্র করিয়া ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন করিতে হয়। পরিশেষে ভক্তি আশ্রয়ী চিত্তকে ঈশ্বরমুখীন করিতে হইবে। ঈশ্বরভক্তি সম্বন্ধে তাঁহার কথা—“ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরে ভক্তি।”[২০] বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেই সর্বপ্রধান ভক্তিতত্ত্বের গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তির সর্বপ্রধান কথা বৃত্তিনিচয়কে ঈশ্বরমুখীন করা। গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে চিত্তবৃত্তি এইরূপ ঈশ্বরাভিমুখী হয়, সেই জন্য ইহা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

অতঃপর বিষ্ণু পুরাণের প্রহ্লাদ চরিত্রের ঈশ্বর ভক্তির কথা তিনি আলোচনা

করিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণের ধ্রুব এবং প্রহ্লাদ দুইজন পরভক্ত থাকিলেও ধ্রুবের উপাসনা সকাম আর প্রহ্লাদের উপাসনা নিষ্কাম। সেইজন্য ধ্রুবের উপাসনা নিম্নশ্রেণীর, তাহা ভক্তি নহে। পক্ষান্তরে প্রহ্লাদের উপাসনা ভক্তি, এইজন্য তিনি লাভ করিলেন মুক্তি।

ভক্তির উৎকৃষ্ট সাধন পন্থা সম্বন্ধেও বঙ্কিম গীতাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। অন্য ভজনারহিত ভক্তিযোগ, তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও উপাসনা, নিবিষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ—তাহাই ভক্তি সাধনের শ্রেষ্ঠ পথ। ইহার বিকল্পে অভ্যাস যোগ, তদ্‌বিকল্পে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন ও তদ্‌বিকল্পে সর্বকর্মফলত্যাগ করিলেও ভক্তি সাধন করা যায়। কোন জীবই একেবারে কর্মশূন্য নহে। সেইজন্য কর্মকর্তার পক্ষে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলে ঈশ্বরোপলব্ধি সহজ হইবে।

ভাগবত পুরাণের কপিলোক্তি ব্যাখ্যা করিয়া তিনি গীতোক্ত ভক্তি চর্চাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেখানে ঈশ্বরাবতার কপিল বলিয়াছেন—"আমি সর্বভূতে ভূতাত্মা স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্য প্রতিমাপূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্বভূতে আত্মা স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।"[২১] এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বে ভক্তির উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

অপরাপর কার্যকারিণী বৃত্তির মধ্যে প্রীতি ও দয়ার সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্যে প্রীতি—ইহাকেই বঙ্কিম ধর্মের সার ও অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়াছেন। আর আর্তের প্রতি প্রীতিই দয়ার রূপ পরিগ্রহ করে। অন্যান্য নিকৃষ্ট বৃত্তি—কাম, ক্রোধ ও লোভের যথোচিত দমনই ইহাদের যথার্থ অনুশীলন।

শেষ চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, ইহার সম্যক অনুশীলনে এই সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্য বিশিষ্ট চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির যথার্থ অনুশীলনে এই অনন্ত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায়। আর এই সৌন্দর্যের অনুভূতিতেই তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেম বা ভক্তি জন্মান সম্ভব।

এই ভাবে ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম বৃত্তিনিচয়ের যথোচিত অনুশীলন ও ইহাদের সামঞ্জস্যের কথা বলিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বক্তব্যকে সংহত করিয়া চিত্তের ঈশ্বরমুখীনতার কথা বলিয়াছেন। চিত্তের এই অবস্থাই ভক্তি। সুতরাং বৃত্তি নিচয়ের সামঞ্জস্য ভক্তিসাধনের বিশিষ্ট উপায়রূপেই গ্রাহ্য। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম গীতোক্ত অনুশীলন ধর্মকে একইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কৃষ্ণ চরিত্র ।। কৃষ্ণচরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণপ্রসঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহাতে তিনি নবযুগের প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের অযুতযুগবরেণ্য কৃষ্ণ চরিত্রকে নূতন করিয়া পর্যালোচনা করিয়াছেন। মহাভারত-পুরাণের পৃষ্ঠা হইতে ইহা তাঁহার অভিনব আবিষ্কার।

কৃষ্ণচরিত্র রচনার একাধিক কারণ আছে।

প্রথমতঃ তাঁহার ধর্মতত্ত্বে ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্মের প্রত্যক্ষ আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে এমন একটি চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ। ভারতপুরাণের অগণিত চরিত্রে—রাজর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতির মধ্যে কিংবা ক্ষত্রিয় বীরকুলের মধ্যে—অনুশীলন তত্ত্বের আংশিক প্রকাশ হইয়াছে। খ্রীষ্ট ও শাক্য সিংহ নির্মল ধর্মবেত্তারূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন মাত্র। ইঁহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে আসীন থাকিয়া অনুশীলন ধর্মের অনেকখানি আয়ত্ত করিয়াছেন। সেইজন্য ইঁহারা নিঃসন্দেহে মহৎ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এমন মহতো মহীয়ান যে কেবল তাঁহার মধ্যেই অনুশীলন ধর্মের সম্যক স্ফুরণ হইয়াছে। এই তত্ত্ব প্রমাণের জন্য তিনি কৃষ্ণ চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সময়ে হিন্দুধর্মের পুনর্গঠন সুরু হইয়াছে। "ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয়। যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই, কেন না কৃষ্ণকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না।"[২২] ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের পর্যালোচনা।

তৃতীয়তঃ, দেশীয় ও বিদেশী লোকের সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে কৃষ্ণচরিত্র বহুলাংশে বিকৃত। এ দেশের লোক সংস্কৃত পুরাণের যাবতীয় বিবরণকে একেবারে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে। আবার পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অনেকেই প্রাচীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহেন। ইঁহাদের কাছে ভারতীয় ধর্ম, শাস্ত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সব কিছুই হয় মিথ্যা, নয় অনুকরণ। তাঁহাদের বিচারে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ চরিত্র নহে। এই দুই চরম পন্থীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপ তুলিয়া ধরার জন্যও তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের পরিকল্পনা।

সর্বশেষে, জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধনের জন্য কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা। "যেদিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেইদিন হইতে আমাদিগের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—

মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে।"[২৩]

কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম যুক্তি প্রমাণাদির সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন :

১। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা স্থাপন

২। শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা স্থাপন

৩। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ মানব

৪। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার

(১) মহাভারতের ঐতিহাসিকতা স্থাপন।—কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান উৎস হিসাবে বঙ্কিম মহাভারতকেই গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারত, হরিবংশ এবং পুরাণের মধ্যে কৃষ্ণ প্রসঙ্গের বিবিধ আলোচনা থাকিলেও মহাভারতই সর্বপূর্ববর্তী। সেইজন্য ইহার ঐতিহাসিকতার দিকে বঙ্কিম সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিয়াছেন।

মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব নাই। ইহাতে অনেক অনৈসর্গিক ঘটনা মিশিয়া গিয়াছে। প্রথমে জনশ্রুতিকে কেন্দ্র করিয়া কবির যে গ্রন্থন, তাহার মধ্যে অনেক মিথ্যার অবকাশ থাকে, দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী লেখকগণ মূল রচনার মধ্যে অনেক বস্তু প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। মহাভারতে এইরূপ সংযোজন খুব অল্প নহে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের অনেকে মহাভারতকে শুধুমাত্র মহাকাব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্যকে গৌন করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থে বা বিবরণীতে মহাভারতের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা তাঁহাদের নিকট ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। আবার লাসেন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছুটা স্বীকার করিলেও পাণ্ডবগণকে অনৈতিহাসিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ পুরাণ, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র এবং পাণিনি প্রভৃতি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে খ্রীষ্টের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরআদির বৃত্তান্ত সংযুক্ত মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। তবে এই মহাভারত আধুনিক কালের মহাভারত নহে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছেন ঐতিহাসিকতা যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আদিম মহাভারতের। এই সম্পর্কে তিনি মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি আলোচনা করিয়াছেন। ইহা নির্ধারণের জন্য তাঁহার ব্যবহৃত সূত্রগুলি এইরূপ :—

আদিপর্বের পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে অন্তর্ভুক্তসূচী ছাড়া অন্য কিছু মহাভারতে থাকিলে তাহা প্রক্ষিপ্ত। আশ্বমেধিক পর্বের অনুগীতা এবং ব্রাহ্মণ গীতা এইরূপ প্রক্ষিপ্ত।

অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে সার্ধশত শ্লোকে মহাভারতের সার সংকলন রহিয়াছে। ইহার মধ্যে যে সব প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই, সেগুলি প্রক্ষিপ্ত।

পরস্পর বিরোধী বিবৃতির একটি প্রক্ষিপ্ত হইতে বাধ্য।

মহাভারতের বিশিষ্ট অংশের রচনারীতির সহিত অন্য অংশের রচনারীতির অসংগতি থাকিলে তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

তেমনি মহাভারতের বিশিষ্ট-চরিত্র চিত্রণের সহিত উক্তচরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত পরিচয় থাকিলে তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করা যায়।

সর্বোপরি, মহাভারতের অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলি প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

প্রাকৃতজনের মনোরঞ্জনের জন্য পরবর্তীকালের কবিদের দ্বারা এই প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির সংযোজন হওয়া সম্ভব।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ইহার তিনটি স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম স্তরে মহাভারতের মূল কাঠামো—তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবন বৃত্তান্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণ কথা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই অংশই তাঁহার মতে—প্রামাণিক এবং ইতিহাস সম্মত। এই "স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিযা সচরাচর পরিচিত নহেন, নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না, এবং মানুষী ভিন্ন দৈবী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম সম্পন্ন করেন না।"[২৪] ইহাই চব্বিশ হাজার শ্লোক সমন্বিত ভারত সংহিতা।

দ্বিতীয় স্তরে মহাভারতে প্রচুর দার্শনিক তত্ত্বের সমাবেশ হইযাছে এবং ইহার মধ্যে বহু অপ্রাকৃত ব্যাপার সংযুক্ত হইয়াছে। এই স্তরে কৃষ্ণ "স্পষ্টতঃ বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিযা পরিচিত এবং অর্চিত, নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন, কবিও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্নশীল।"[২৫] এই স্তরের বিশিষ্ট রচনাগুলি উঠাইয়া লইলে মূল মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয না, ইহাতে পাণ্ডবদের জীবনকৃষ্ণ অখণ্ড থাকে। ইহা যে প্রক্ষিপ্ত রচনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতঃপর ইহার তৃতীয স্তর। এই স্তর বহু শতাব্দীর রচনা। বহু অকৃতী কবির অক্ষম রচনা ইহাতে স্থান পাইযাছে। আবার ইহার মধ্যে লোক শিক্ষার বহু উপকরণ আছে। ইহার সমস্ত রচনাই পুরাণগন্ধী। ইহার

রচনাকারগণ ভাবিয়াছিলেন যে স্ত্রীলোক ও শূদ্র বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও ইহার সাহায্যে বেদ সম্মত চিন্তা ও দর্শনের সহিত পরিচিত হইতে পারিবে। "শান্তিপর্ব ও অনুশাসনিক পর্বের অধিকাংশ, ভীষ্মপর্বের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায়, বনপর্বের মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্বাধ্যায়, উদ্যোগ পর্বের প্রজাগর পর্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর সঞ্চয়কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়।"[২৬]

মোটের উপর বঙ্কিমচন্দ্র বলেন এই তিন স্তরের প্রথম স্তরই প্রাচীন এবং মৌলিক, পরবর্তী দুই স্তর কবিকল্পিত অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া মহাভারত-বহির্ভূত ভাবা উচিত।

এখন বঙ্কিমের বক্তব্য এই যে, মহাভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের ভিত্তি করিতে হইলে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ইহার ব্যবহার করিতে হইবে। প্রচলিত মহাভারত উগ্রশ্রবা সৌতি বিরচিত। সৌতির মতে বেদব্যাস চব্বিশ হাজার শ্লোকে ভারত সংহিতা নামে এক আদি গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন ঐ ভারত সংহিতা সম্প্রসারণ করিয়া পাণ্ডব প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ সম্প্রসারিত গ্রন্থই মহাভারত। বৈশম্পায়নের মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ববিভাগ ছিল না, সমগ্র গ্রন্থ একশত পর্বাধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। পরে শৌনকের নৈমিষারণ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে সেই মহাভারত সৌতি কর্তৃক সমাগত ঋষি সভায় পঠিত হইয়াছিল। সৌতিই মহাভারতকে অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত করেন।[২৭] বর্তমানে এই সৌতির মহাভারত হইতেই কৃষ্ণচরিত্রের সন্ধান করিতে হইবে। ইহার সহস্র অতিরেকের মধ্য হইতে কৃষ্ণচরিত্রের সত্য পরিচয় আবিষ্কার করিতে হইবে। সেইজন্য ইহার প্রক্ষিপ্ত অংশের পরিহার, প্রাচীন রূপের উদ্‌ঘাটন এবং অতিপ্রাকৃতের অস্বীকারের দ্বারা বঙ্কিম মহাভারতের ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করিতে চাহিয়াছেন।

শুধু মহাভারতের মধ্যেই অতিপ্রাকৃত নাই, পুরাণকারগণও ইহাকে অতিমাত্রায় ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ পুরাণে কৃষ্ণ কথার প্রাচুর্য আছে। পুরাণ সম্বন্ধে তিনি সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত, প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ একক বেদব্যাসের রচনা নহে, আবার এক একটি পুরাণ এক এক জনের রচনাও নহে। বর্তমান পুরাণগুলি সংগ্রহমাত্র, যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা। এই সংগ্রহকর্তারা প্রত্যেকেই ব্যাস নামে কথিত হইতে পারেন। এইভাবে অনেক সংগ্রাহকই ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন। বিকল্প মতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে যদি প্রাথমিক পুরাণ সংকলন কর্তা ধরা যায়, তাহা হইলে

ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার রচনার উপর প্রলেপ দিয়া ক্রমে ক্রমে উত্তর কালের শিষ্য প্রশিষ্যবর্গ ইহাকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। মহাভারতের মত একই রীতিতে ইহাদের মধ্যেও প্রচুর প্রক্ষিপ্ত অংশের সংযোজনা হইয়াছে।

মহাভারত পুরাণের প্রামাণিকতা বিচার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের উৎসরূপে এই কয়টিকে আশ্রয় করিয়াছেন—মহাভারতের প্রথম স্তর, বিষ্ণু পুরাণের পঞ্চম অংশ, হরিবংশ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত। ইহা ব্যতীত রাধাবৃত্তান্তের জন্য ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও বিশেষ কয়েকটি কৃষ্ণ প্রসঙ্গের জন্য বিষ্ণু পুরাণের অন্যান্য অংশকেও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা স্থাপন॥ কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বহু মত প্রচলিত আছে। বঙ্কিম সবগুলিকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত প্রণেতা একজন কৃষ্ণ। এ কৃষ্ণ বাসুদেব কৃষ্ণ না হওয়াই সম্ভব। তবে ছান্দোগ্য উপনিষদে আঙ্গিরস ঘোর ঋষি যে কৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন তিনি দেবকী পুত্র কৃষ্ণ অর্থাৎ বাসুদেব কৃষ্ণ। প্রাচীনতর কৌষীতকি ব্রাহ্মণে আঙ্গিরস ঘোরের ও কৃষ্ণের নাম আছে। কৃষ্ণ সেখানে দেবকী পুত্র বলিয়া বর্ণিত হন নাই, শিষ্যার্থে আঙ্গিরস বলিয়া বর্ণিত। এই কৃষ্ণ ও ছান্দোগ্য উপনিষদের দেবকী পুত্র কৃষ্ণ অভিন্ন হইতে পারে। বঙ্কিম এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম কিছু আলোচনা করেন নাই। তবে তিনি দেখাইয়াছেন যে পাণিনির পূর্বেই বাসুদেব কৃষ্ণ সমাজে উপাস্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। এইভাবে বলা যায়, অবতার কৃষ্ণের পশ্চাতে ঐতিহাসিক কৃষ্ণ বর্তমান ছিলেন। এ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালের গবেষণা উল্লেখযোগ্য :

> **It may be seen that a doctrine of avatar was the necessary corollary to the identification of Kṛsna Vasudeva with the Supreme. Kṛṣṇa, in human form, was the Vṛṣṇi Prince of Dvaraka and the charioteer of Arjuna at Kuruksetra ; if he were, at the same time, the highest god, the paradox could only be explained by the theory of avatara.**[২৮]

বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি মহাভারত পুরাণ হইতে একটি সুসমঞ্জস কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐতিহাসিক কৃষ্ণই ইহাদের মধ্যে বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, যদিও দেখা যায় ঋগ্বেদের কৃষ্ণ, মহাভারতের কৃষ্ণ এবং পুরাণের কৃষ্ণের মধ্যে সুবিপুল অসংগতি রহিয়াছে।

রাধাপ্রসঙ্গের উপর বঙ্কিম আলোকপাত করিয়াছেন। কৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য শক্তি রাধা, মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হয় নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেই রাধাকে সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরাণে রাধা বৈধী রীতিতে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। কৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহ এবং পরে বিহার বর্ণনার মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ নূতন বৈষ্ণব ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে। অতঃপর রাধা এই বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রচলিত ধারণাকে বঙ্কিম সমর্থন করেন না। রাধা অর্থে তিনি মনে করেন কৃষ্ণ আরাধিকা। আদিম ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা তত্ত্ব এইরূপ মিলন বিরহাত্মক ছিল না নিশ্চয়। সেখানে রাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন বলিয়া তিনি মনে করেন।

কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের পথে ইহাই বঙ্কিমের পূর্বপ্রস্তুতি। অতঃপর তাঁহার চরিত্র সমালোচনা।

(ঙ) শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ মানব। কৃষ্ণচরিত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় কৃষ্ণের মানব চরিত্র উদঘাটন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উক্তি, "কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এগ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানব চরিত্র সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।"[২৯] তবে সংগে সংগে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী। একটি পূর্ণ আদর্শের মানব চরিত্র কিরূপে ঈশ্বরাবতার হইতে পারেন, তাহাই কৃষ্ণ চরিত্রে বিবৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণের মানবদিক সপ্রমাণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জন্মেতিহাস হইতে অন্তিমকাল পর্যন্ত সময়ের মুখ্য ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি-ভঙ্গী হইল, সমস্ত পর্যায়ের ঘটনাবলীতে কৃষ্ণ তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ দেখান নাই, মানবসীমায় সম্ভবপর ঘটনাই তাঁহার দ্বারা ঘটিয়াছে। বঙ্কিম সযত্নে অনৈসর্গিক ঘটনাগুলি পরিহার করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দ্বারা তথাকথিত অলৌকিকতার উপর বাস্তবতার আলোক ক্ষেপণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়া তাঁহার জন্মকুল আছে। তিনি মথুরার যদুবংশের সন্তান। সেখানকার অত্যাচারী রাজা কংসের ভয়ে অনেক যাদব মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্র বাস করিত। বসুদেব পূর্বে বলরাম এবং পরে কৃষ্ণকে এইভাবে গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। শৈশব ও কৈশোরের বহু অলৌকিক ঘটনার বাস্তব ভিত্তিভূমি আছে। পূতনা নিধন, তৃণাবর্তের দ্বারা শূন্যে উৎক্ষেপণ, যমলার্জুনভঙ্গ প্রভৃতি ঘটনা ভাগবতীয় উপন্যাস

ছাড়া আর কিছু নহে। কৃষ্ণের কালিয়দমনের মধ্যে একটি রূপক আছে। ঘোর নাদিনী কাল স্রোতস্বতী কৃষ্ণ সলিলা কালিন্দী। মনুষ্যজীবনের ভয়ংকর দুঃসময় ইহার কুটিল আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্য শত্রু ভুজঙ্গ সদৃশ। আমরা ঘোর বিপদাবর্তে এই ভুজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত উদ্ধার লাভ করিতে পারি না। কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের পিছনেও একটি তাৎপর্য আছে। তিনি ইন্দ্রযজ্ঞ রহিত করিয়া গিরিযজ্ঞ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। যদি মেঘের বা আকাশের পূজা করিলে সর্বভূতাশ্রয়ী জগদীশ্বরের পূজা করা হয়, তবে পর্বত বা গোগণের পূজা করিলেও তাঁহারই পূজা করা হইবে। বরং গিরিযজ্ঞের বিধানে দরিদ্র ও গোবৎসগণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান অধিকতর ধর্মসংগত মনে করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের গোপীবিহার ও রাসলীলার মধ্যে যে পরকীয়া প্রীতি আছে, তাহা কৃষ্ণচরিত্রের একটি প্রবল প্রহেলিকা। ইহাতে তাঁহার চরিত্রে প্রাকৃত কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে, বঙ্কিম ইহার মধ্যে কৃষ্ণের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন ঘটিযাছে মনে করেন। "যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত বা স্ফূর্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই।- এই রাসলীলা কৃষ্ণ এবং গোপীগণ-কৃত সেই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ।"[৩০] ইহা একদিকে অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য বিকাশ আর একদিকে অনন্ত সুন্দরের উপাসনা।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র মথুরা-দ্বারকা, ইন্দ্রপ্রস্থ, উদ্যোগ পর্ব, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস অধ্যায়ের কৃষ্ণজীবনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সর্বত্রই তিনি কিংবদন্তীর কুহেলিকা হইতে কৃষ্ণচরিত্রকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঘোরতর অত্যাচারী কংসকে বধ করিলে সমস্ত যাদবকুলের হিতসাধন হয়, সেইজন্য তিনি কংস বধ করিয়াছিলেন। কংসের পর জরাসন্ধ মথুরাপুরী আক্রমণ করিলে কৃষ্ণ তাহা প্রতিহত করিযাছেন এবং পুনরাক্রমণকে রোধ করিবার জন্য কৃষ্ণ রাজধানী তুলিযা রৈবতক শৈলে পুনঃস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে যুদ্ধ বিশারদ ও রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণের পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণের বহু বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। রুক্মিণী কৃষ্ণের একমাত্র পত্নী, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণের পত্নী তালিকায় যাঁহাদের নাম পাওয়া যায়, একমাত্র সত্যভামা ব্যতীত তাঁহাদের ভূমিকা বিশেষ নাই বলিলেই হয়। আবার সত্যভামার পরিচয়ও প্রধানতঃ মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতে পাওয়া যায়। স্যমন্তক মণির প্রভাবে

তাঁহার দুই ভার্যার উল্লেখ পাওয়া যায় জাম্ববতী ও সত্যভামা। এতদ্ব্যতীত তিনি নরক রাজার ষোল হাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ পুরাণে উক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এইগুলিকে সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তবে কৃষ্ণ যে একাধিক দারা গ্রহণ করেন নাই, একথা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। মহাভারত যুগের সমাজরীতিতে ইহা প্রচলিত ছিল বলিয়া কৃষ্ণের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল না।

সুভদ্রাহরণের মধ্যে কৃষ্ণের সমর্থনের কারণটি বঙ্কিম উপস্থাপিত করিয়াছেন। এ বিবাহ রাক্ষস বিবাহ। ইহা নিন্দনীয় বটে, কিন্তু সেকালের ক্ষত্রিয় সমাজে ইহা প্রশংসিত ছিল। কৃষ্ণ অর্জুনকে এই বিবাহের পরামর্শ দিয়া মন্দ কিছু করেন নাই। ইহাতে "তাঁহার পরম শাস্ত্রজ্ঞতা, নীতিজ্ঞতা, অভ্রান্তবুদ্ধি এবং সর্বপক্ষের মানসম্ভ্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা যায়।"[৩১]

এইরূপ জরাসন্ধ-বধ ও শিশুপাল-বধের মধ্যেও কিছু যৌক্তিকতা আছে। কংসের মত জরাসন্ধও অত্যাচারী ছিল। জরাসন্ধ-বধের মধ্যে কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। শিশুপাল যজ্ঞের জীবন্ত বিঘ্ন ছিল, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে দেখা যায়, যাহারা আসুরী শক্তি লইয়া সমাজে, বিশেষতঃ সমাজের অধ্যাত্ম চিন্তায় বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া প্রবল উৎপীড়ন করিয়াছে তাহারাই শ্রীকৃষ্ণ নির্ধারিত ন্যায় ও ধর্মের যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্তের মধ্যে কৃষ্ণের অলৌকিকতা কিছুই নাই, বাহুবল, নীতিবল ও আদর্শবলে তাঁহার জয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

উদ্যোগপর্বে আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণের ভূমিকা ব্যক্ত হইয়াছে। লোকবিশ্বাস কৃষ্ণকে পাণ্ডব সহায়, কুচক্রী ও যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ করিয়াছে। বঙ্কিম দেখাইয়াছেন উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ সর্বদোষশূন্য। তিনি যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিরোধী, ক্ষমার জীবন্ত বিগ্রহ এবং সর্বত্র সমদর্শী। নিরস্ত্রভাবে অর্জুনের সারথ্যগ্রহণে তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তা ও ত্যাগ প্রকাশ পাইয়াছে।

কৌরব সভায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনকে বঙ্কিম 'কুকবির প্রণীত অলীক উপন্যাস' বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতে যে বিশ্বরূপ দর্শনের কথা আছে, তাহা মহৎ কবির মহৎ কাব্য। কিন্তু কৌরব সভায় এইরূপ ভীতি প্রদর্শনের কোনরূপ সার্থকতা নাই। মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ম করেন, কৌরব সভাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই অলৌকিক চিত্র অশক্ত কবির প্রক্ষিপ্ত রচনা মাত্র।

মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরে কবি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উদ্দার কৃষ্ণচরিত্র এই স্তরে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ও কৌশলময় হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিম সিদ্ধান্ত করেন এই স্তরে কৃষ্ণ চরিত্র যথেষ্ট বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে। কৌরবরথীদের নিধন ব্যপদেশে মহাভারতের কবি সর্বত্র এই ঈশ্বর প্রেরণা অনুভব করিয়াছেন। প্রত্যেকটির পিছনে স্বাভাবিক ঘটনা ঐশিক বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কবি "জয়দ্রথবধে দেখাইতেছেন ভ্রান্তি ঈশ্বর প্রেরিত, ঘটোৎকচ বধে দেখাইবেন, দুর্বুদ্ধিও তাঁহার প্রেরিত, দ্রোণবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে, দুর্যোধন-বধে দেখাইবেন, অন্যায়ও তাঁহা হইতে।"[৩২]

এই ঐশিক বিধানের প্রাধান্যের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবতার অনুসন্ধান করিয়াছেন। *এই যে কৌরবপক্ষের শোচনীয় পরাজয়, ইহার জন্য পাণ্ডবদের বাহুবলই* সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ। রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য, সেই বাহুবলেই পাণ্ডবগণের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় স্তরের কবি ঈশ্বর-বিধানের প্রতি আনুগত্য জানাইলেও বাস্তবকে পরিহার করেন নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাহুবলের মূল্য স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য এই স্তরে মৌষল পর্বের সূচনা।

যুদ্ধশেষে শান্তিপর্বে মহাভারতের তিন স্তরই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বঙ্কিম মনে করেন। শান্তিপর্বে কৃষ্ণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানব কৃষ্ণের লক্ষ্য ছিল ধর্মরাজ্য সংস্থাপন। রণজয়ের দ্বারা ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন হইয়াছে মাত্র। এই রাজ্য রক্ষার জন্য ধর্মানুমত ব্যবস্থাদির প্রয়োজন। "তাহার শাসন জন্য বিধি ব্যবস্থাই প্রধান কার্য। কৃষ্ণ সেই কার্যে ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন।"[৩৩] আদর্শ নীতিজ্ঞরূপে ভীষ্মই কৃষ্ণের উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ। এইজন্য কৃষ্ণ তাঁহাকে ধর্মোপদেষ্টার ভূমিকায় স্থাপন করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে কৃষ্ণ পুনর্বার হস্তিনায় আগমন করিলে অভিমন্যু-পত্নী উত্তরার সদ্যপ্রসূত মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ঐশী শক্তির পরিচয় আছে, এমন বলা যায় না। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, এজন্য সর্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। এইরূপ কোন বিদ্যার সাহায্যেই তিনি মৃত সন্তানকে বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন।

যদুবংশ ধ্বংস সম্বন্ধে কৃষ্ণের নিস্পৃহতাকে বঙ্কিম সমর্থন করিয়াছেন। যদুবংশীয়েরা আত্মকলহে জর্জরিত ছিল এবং ভয়ানক অধার্মিক হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং ইহাদের ধ্বংসকে রোধ করা ন্যায়নিষ্ঠ কৃষ্ণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে বলা যায়, জরাব্যাধের আঘাত তাঁহার জরাব্যাধি। তবে

এই ঈশ্বরাবতার পুরুষ স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাই বঙ্কিমের অভিমত।

কৃষ্ণকেন্দ্রিক ঘটনাবলীর বাস্তব তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া উপসংহারে বঙ্কিম বলিয়াছেন যে, আদর্শ মানব বলিয়া তাঁহার মধ্যে বৃত্তিসমূহের সম্যক্ স্ফুরণ হইয়াছিল।

প্রথমতঃ শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনে কৃষ্ণ অমিত বলবান ছিলেন। তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে এই বলের ক্রমাগত পরীক্ষা হইয়াছে। ইহার সহিত মিলিয়াছে তাঁহার সৈনাপত্যগুণ বা দূরদর্শিতা। রণজয়ী কৃষ্ণের সাফল্যের পশ্চাতে এই বাস্তবসম্মত কারণগুলি আছে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মধ্যে জ্ঞানার্জনী বৃত্তির চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রচারিত ধর্মই এই বৃত্তির চরম প্রকাশ। "কৃষ্ণ কথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্বলোক হিতকর, সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই।"[৩৪] এই ধর্মের মধ্যে তিনি অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন। গীতোক্ত সার্বজনীন ধর্ম ছাড়াও রাজনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা ইত্যাদিতে কৃষ্ণের জ্ঞানসাধনা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

কৃষ্ণচরিত্রে কার্যকারিণী বৃত্তিরও সম্যক্ অনুশীলন ঘটিয়াছে। তাঁহার সমগ্র জীবন কর্ম সম্পাদনের এক বিচিত্র ইতিহাস। সত্য, ধর্ম, দয়া, প্রীতিতে তাঁহার চরিত্র সমুজ্জল। তাঁহার ক্ষমা অপরিসীম আবার দণ্ডবিধান অকুণ্ঠিত; তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লোক হিতার্থে স্বজন বিনাশেও কুণ্ঠিত নহেন।

আবার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিকেও তিনি অবহেলা করেন নাই। শৈশব কৈশোরে বৃন্দাবনে ব্রজলীলা, পরিণত বয়সে সমুদ্র বিহার, যমুনাবিহার, রৈবতক বিহার ইত্যাদির মধ্যে তিনি এই বৃত্তির অনুশীলন করিয়াছেন।

ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম এই অনুশীলিত চিত্তকে ঈশ্বরমুখীন করিয়াছেন। সেখানে ভক্তিই প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। কৃষ্ণের চিত্তেও তাই এই ভক্তির বিকাশ হইয়াছে; তবে তাহা নিজের প্রতি, যেহেতু তিনি নিজেই ঈশ্বরাবতার।

(৪) **শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার।।** কৃষ্ণ চরিত্রের শেষ বক্তব্য তিনি পূর্ণ মানব হইয়াই ঈশ্বরাবতার। কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বঙ্কিম যেমন নিঃসংশয়, তেমনি তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত যে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে এই দুইটি চিন্তা সমান্তরালে চলিয়াছে। তাঁহার সমস্ত কার্য মানবিক শক্তি দ্বারা সংঘটিত, আবার তাঁহার ভগবত্তাও সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃত। এই বৈপরীত্য নিরসনের জন্য বঙ্কিম যে যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা এই: "যে কর্মের দ্বারা সকল

বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা যাহা, তাহা দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তি শূন্য; আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্মের প্রধান বিঘ্ন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন।”[৫৫] বঙ্কিম এই কথাই বিশেষ ভাবে বলিতে চাহিয়াছেন যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরিচয় মানুষের স্বভাবধর্মে হইতে পারে না। এইজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু অনন্ত প্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারে না। এক্ষেত্রে ঈশ্বরশক্তি বিশিষ্ট মনুষ্যকে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। পৃথিবীতে বহু মহাপুরুষ মানব যাঁহারা এক এক দিকের অনুশীলনে এই ঈশ্বর শক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে কৃষ্ণই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মধ্যে সমস্ত বৃত্তির যথার্থ অনুশীলন হইয়াছে। তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মানব ভাবিয়া ঈশ্বর শক্তির অবতার বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীকৃষ্ণের এই অবতারত্বের সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ আদর্শের মূর্তি বিশিষ্ট বলিয়াই কি শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার? বঙ্কিমচন্দ্র গীতার সেই 'মমসাধর্ম্যমাগতাঃ' ব্যক্তিদের লক্ষ্য করেন নাই বোধ হয়, যাঁহারা প্রয়োজন বশে ঊর্ধ্বলোক হইতে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। ইঁহারা ঈশ্বর না হইলেও আদর্শ পুরুষ। সে ক্ষেত্রে বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ বলিয়াই কি তিনি ঈশ্বর হইবেন? তিনিও ত ঐরূপ সারূপ্য প্রাপ্ত মুক্তাত্মা হইতে পারেন। বঙ্কিম এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু আলোচনা করেন নাই। তিনি কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতারই বলিয়াছেন।[৫৬] তবে মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় তিনি কোথাও গ্রহণ করেন নাই। এই মানুষ ভাগবত যাঁহার পূর্ণ মানব, ইহা অপর কোন মুক্তাত্মার অবতরণ নহে এবং পূর্ণ মানব বলিয়াই তিনি ঈশ্বরতা যুক্ত, প্রাকৃত মানব নহেন।

ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র। ইহা একাধারে তাঁহার ভারতকথা, পুরাণ-কথা ও তত্ত্বকথা। কিন্তু যে জন্য তত্ত্বটিকে তিনি এখানে উদাহরণ দিয়া উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে সর্বাংশে সফল হইয়াছেন কি না

ভাবিয়া দেখিতে হয়। আমাদের মনে হয়, বঙ্কিম এক প্রকার দ্বৈতবোধের টানাপোড়েনের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণের মানবত্ব প্রতিষ্ঠায় তিনি মানবিকতার সীমা অসম্ভব রকম বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং ঐশী শক্তিকে খর্ব করিয়াছেন। আবার তাঁহার ভগবত্তা প্রতিষ্ঠায় তাঁহার উপর ঈশ্বরত্ব আরোপণে কোন সংশয় রাখেন নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মানবসত্তা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র মানবতা ও ভগবত্তার একটি অসংগতিপূর্ণ সমন্বয় হইয়াছে। মহাভারতের আদি স্তরের মানব শ্রীকৃষ্ণ যখন বঙ্কিমের দৃষ্টান্ত, তখন তাহাই ঐতিহাসিক ও প্রামাণিক, আবার শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের সমস্ত পরিচয় পরবর্তী দুই স্তরে প্রকট। অথচ সেই স্তরগুলিকে গ্রহণ করা যাইতেছে না। এমত অবস্থায় মহাভারতের প্রথম স্তরেই বঙ্কিম পরবর্তী কালের শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরতা (অবশ্য নিজস্বরূপে) আরোপ করিয়াছেন। কবিদের যুগ যুগান্তের প্রলেপ এবং কল্পনায় যে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরতা ঘটিয়াছে, তাহাকে বঙ্কিম একেবারে অবতার তত্ত্ব বলিয়া আগেই চাপাইয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমের আলোচনায় এই ঐতিহাসিক ক্রমের অভাব লক্ষিত হয়। একটি ভক্তি অর্চনার দেব বিগ্রহকে বঙ্কিম যুক্তি গ্রাহ্য দেববিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কার্যই মানবিক শক্তিতে হইয়াছে। অন্তর্নিহিত শক্তির সুষ্ঠু পরিচর্যায় সেগুলি সার্থকভাবে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি অবতার এই সিদ্ধান্তেই বঙ্কিমের মৌলিকত্ব। কিন্তু ইহা মহাভারতের সহিত সংগতি রক্ষা করে নাই। বঙ্কিম মহাভারতী শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, নিজের অভিষ্ট আদর্শ পুরুষকে মহাভারতের উৎসদেশ হইতে আহরণ করিয়া সযত্নে মনের মাধুরী দিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ॥ অনুশীলন তত্ত্ব ও কৃষ্ণ চরিত্রের চিন্তাধারায় বঙ্কিমের শেষ রচনা তাঁহার গীতাভাষ্য। 'প্রচার' পত্রিকায় তাঁহার গীতাভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর চতুর্থ অধ্যায়ের কিছুটা অংশ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি অবস্থায় ছিল। বঙ্কিমের তিরোধানের পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের অবশিষ্টাংশ অনুবাদের দ্বারা সমস্ত গীতাভাষ্য প্রকাশিত হয়।

আমাদের দেশে প্রাচীন টীকাভাষ্যের অভাব নাই। কিন্তু নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার রস আস্বাদন করিতে সব সময় সক্ষম নহে বলিয়া বঙ্কিম আধুনিক পদ্ধতিতে যুক্তি চিন্তার আলোকে গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গীতা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক সমস্যা এবং গীতাতত্ত্ব—দুই দিক হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইহার আলোচনা করিয়াছেন। গীতা প্রসঙ্গে যে সমস্যাগুলি বিশেষভাবে উঠে, সেগুলি

হইল গীতা মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ কি না এবং গীতোক্ত ধর্ম সবই কৃষ্ণ কথিত ধর্ম কি না। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদের সম্পর্কে আপন মতামত দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণচরিত্রে তিনি বলিয়াছেন: "যাহা আমরা ভগবদ্‌গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ প্রণীত নহে। উহা ব্যাস প্রণীত বলিয়া খ্যাত ও 'বৈয়াসিকী সংহিতা' নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সংকলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্ম মতের সংকলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক উহা এই আকারে সংকলিত এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।"[৩৭] অর্থাৎ গীতোক্ত ধর্ম প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইলেও ইহা যে কৃষ্ণ কথিত ধর্ম তাহাতে সন্দেহ নাই। গীতার কৃষ্ণোক্তি যে যুদ্ধ প্রাক্কালে কথিত হইয়াছিল, ইহা সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্কিম এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যে গীতায় ভগবৎ প্রচারিত ধর্ম সংকলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গীতা গ্রন্থখানি ভগবৎ প্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা। এই অন্য ব্যক্তি আদি মহাভারতকার কিংবা পরবর্তীকালের কোন ব্যক্তি, সে বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে গীতাকে মহাভারতের সহিত সুন্দরভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গীতার ধর্ম একটি সার্বজনীন মনুষ্য ধর্ম। ইহাই কৃষ্ণকথিত ধর্ম। সংযোগকারী কবি কৃষ্ণোক্ত সার্বজনীন ধর্মকে কৌশলে যুদ্ধ সংক্রান্ত কথার অবতারণা করিয়া মহাভারতের সহিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছেন।

এই সমস্যা সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত বঙ্কিমের আলোচনা হইয়াছিল। সেখানে বঙ্কিম বলিয়াছেন যে তাঁহার ধারণা গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্তী কালের যোজনা, উহারা মৌলিক গীতার অন্তর্গত নহে। শেষ ছয় অধ্যায়ের ভাষার ভঙ্গীতে ইহা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়। এই জন্য তিনি মনে করেন বিশ্বরূপ দর্শনেই গীতার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত।[৩৮]

এখন প্রশ্ন হইল, দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত ভক্তিযোগকে গীতা বহির্ভূত করিলে গীতার সমস্ত মাহাত্ম্য নষ্ট হইয়া যায়। বঙ্কিমের অভিমত চিত্তবৃত্তির পূর্ণ অনুশীলনে মানুষ ঈশ্বরমুখী হইবে। সুতরাং ভক্তিই অনুশীলনের শেষ লক্ষ্য। আর শুধু দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিযোগের শ্লোকগুলিই নহে, শেষ ছয়টি অধ্যায়ের অনেকগুলি শ্লোকেই গীতার মূল বক্তব্যের সহিত পূর্ণ সংগতি রহিয়াছে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন: "এ সমস্যার পূরণ এই যে, মূল ভগবদ্গীতা

তাহার অধ্যায় ও শ্লোক সংস্থান অনুরূপ ছিল। গীতার বর্তমান আকারে পুনঃ সংস্থানের সময় কতকগুলি শ্লোক বিপর্যস্ত হইয়া দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্থানে স্থানে নিবদ্ধ হইয়াছে।"[৩৩]

গীতার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা অনেকখানি অনুমান প্রসূত বলিয়া মনে হয়। বিশ্বরূপ দর্শনে যদি অর্জুনের মোহমুক্তি না হয়, তাহা হইলে পরবর্তী অধ্যায়ের উপযোগিতা থাকে না, ইহাও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। গীতোক্ত ধর্ম যে একাদশ অধ্যায়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে, এমত বলা যায় না। অর্জুনকে বিভিন্ন দিক হইতে আত্মসচেতন করা যেমন কৃষ্ণের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, তেমনি এই প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া একটি 'সম্পূর্ণ ধর্ম' উপস্থাপিত করাও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। বিশ্বরূপ দর্শনের পরবর্তী যোজনা এই ধর্মের সম্পূর্ণতার জন্যই প্রয়োজন। বিশেষতঃ ইহার মধ্যে ভক্তি যোগ, গুণত্রয় বিভাগ যোগ, শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ বা মোক্ষ যোগের মত সারগর্ভ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইহাদের সব কিছুই পূর্বে কথিত হইয়াছে এবং পরে পুনর্বিন্যস্ত হইয়া অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা একান্তই অনুমান সাপেক্ষ।

অতঃপর গীতার ধর্মব্যাখ্যা। গীতার ধর্ম সার্বজনীন মনুষ্যধর্ম (তিলক)। ইহাতে যেমন তৎকালীন সমাজ বিধান ও ধর্ম-কর্তব্যের নির্দেশ আছে, তেমনি ইহা সর্বকালের ধর্ম ও কর্তব্যের নির্দেশিকা। গীতোক্ত অনুশীলন তত্ত্বই বঙ্কিমের যাবতীয় ধর্ম জিজ্ঞাসার মীমাংসা। তবে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহাতে তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্যক্ উপস্থাপিত হয় নাই।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্মতত্ত্বের আলোচনা নাই, তবে সাহিত্য নিদর্শন হিসাবে ইহা অপূর্ব। বস্তুতঃ আসন্ন সমরকালে বীরনায়কের যে চিত্তবৈকল্য, হৃদয়ে যে করুণ ও প্রশান্ত ভাব, তাহা এই অধ্যায়কে অপরূপ কাব্য সৌন্দর্য দান করিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায়ের আংশিক আলোচনার মধ্যে বঙ্কিম জ্ঞান ও কর্মযোগ ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তবে বঙ্কিমের নিকট গীতা সুন্দরতম ভক্তিগ্রন্থ। অনুশীলন ধর্মের চিত্ত ঈশ্বরমুখী হইলে যে ভক্তি জাগ্রত হয়, সেই ভক্তিতেই ঈশ্বর ভজনা, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। ইহা বঙ্কিম আলোচ্য গীতাভাষ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই।

বৃত্তির সঞ্চালনে জ্ঞান ও কর্ম মানুষের আবশ্যিক আশ্রয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ ব্যাখ্যায় বঙ্কিম জ্ঞান ও কর্ম বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। মনুষ্য মাত্রে জ্ঞান বা কর্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক, শিল্পী, কৃষক বা পরিচারক

ধর্মী। এই ষড়বিধ কর্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্য হউক অথবা যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় ধর্ম। গীতা ইহাকেই স্বধর্ম পালন বলিয়া নির্দেশ দিয়াছে। বঙ্কিম যুক্তি ও চিন্তা দ্বারা গীতোক্ত ধর্মের দর্শনাত্মক দিকগুলিও আলোচনা করিয়াছেন। আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তরবাদ, সুখদুঃখের অনিত্যতা, সাকার নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি নিষ্কাম কর্মতত্ত্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ গীতার দুইটি দিকে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য দিয়াছেন—একটি নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব ও অপরটি ভক্তিবাদ। তাঁহার প্রথম চিন্তাটি আলোচ্য টীকাভাষ্যে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই কর্ম কোনরূপ বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম নহে, যে কর্ম জীবনের নিয়ম, প্রকৃতিজ গুণে যাহা আমরা করিয়াই থাকি, ইহা তাহাই। কর্ম সদসৎ থাকিতে পারে, তবে কর্ম বলিতে বুঝিতে হইবে অনুষ্ঠেয় কর্ম। অনুষ্ঠেয় কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্বজ্ঞান, ইহা এক প্রকার যোগ। গীতা এই কর্মযোগের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছে। তবে সাংখ্যযোগে জ্ঞানের কথাই প্রধান। ইন্দ্রিয় সংযম ও কামনা পরিত্যাগের মধ্যে জ্ঞানমার্গের সার্থকতা দেখা যায়। চিত্তের এই অবস্থা ব্রহ্মনিষ্ঠা, ইহার সহিত নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান নিকট সম্বন্ধ যুক্ত। বস্তুতঃ ইহাই গীতার মূলতত্ত্ব তথা হিন্দুধর্মের সারভাগ।

অসম্পূর্ণ এই টীকাভাষ্যে জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধেই আলোচনা আছে। ভক্তি সম্বন্ধে এখানে কিছুই নাই। কিন্তু ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম গীতার ভক্তিবাদ আলোচনা করিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তি যোগের কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি ব্যাখ্যা দিয়াছেন: "ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই। এরূপ উদার এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই।"[৪০] বঙ্কিমের গীতাভাষ্যের অনুক্ত সিদ্ধান্ত যে ইহাই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্রৌপদী॥ মহাভারতী চরিত্র দ্রৌপদীর উপর বঙ্কিম নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। দুইটি প্রস্তাবে ও দশ বৎসরের ব্যবধানে আলোচনাটি রচিত। প্রথমটিতে দ্রৌপদীর চরিত্র এবং দ্বিতীয়টিতে দ্রৌপদী চরিত্রের তত্ত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে আর্য সাহিত্যে নারীচরিত্র একটি বিশেষ আদর্শে গঠিত হইয়াছে। সেই আদর্শের প্রতিমূর্তি সীতাচরিত্র। এমন মৃদু ও কোমল, ত্যাগ স্বভাবা মধুর চরিত্র আর নাই। রামায়ণোত্তর শ্রেষ্ঠ কাব্য কাহিনীতে সীতার অনুরূপ চরিত্রই অঙ্কন করা হইয়াছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী প্রভৃতি চরিত্র সীতারই অনুকরণ। কিন্তু দ্রৌপদীর চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমন দীপ্যময়ী নারীচরিত্র আর নাই। সতীধর্মে উভয়েরই গৌরব প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তেজধর্মে দ্রৌপদী মহাভারত তথা প্রাচীন সাহিত্যে অনন্যা।

ধর্ম ও গর্বের সুসামঞ্জস্যই দ্রৌপদী চরিত্রের রমণীয়তার প্রধান কারণ। এই গর্ব বা দর্প দ্রৌপদীর কোনরূপ ক্ষতি করে নাই, পরন্তু তাঁহার ধর্মবুদ্ধির কারণ। স্বয়ম্বর সভায় কর্ণের প্রত্যাখান হইতে দ্রৌপদীর এই ওজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর কুরুসভায় দ্যূতক্রীড়া বিজিতা দ্রৌপদীর মূর্তি আরও ভয়ঙ্কর। কিন্তু এই তেজস্বিনী রমণী চরম অপমানের সময় সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার চরিত্রের আর একটি দিক স্বচ্ছ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তেজস্বিতা ও ধর্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্যে দ্রৌপদী ভারতকথায় স্বতন্ত্র আসন অধিকার করিয়াছেন। এই দুইটি গুণ তাঁহার জয়দ্রথের প্রতি আচরণের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। কাম্যকবনে জয়দ্রথ একাকিনী দ্রৌপদীর নিকট আসিলে প্রথমে তিনি সৌজন্য সূচক আতিথেয়তা জানাইয়াছেন। আবার পরক্ষণেই জয়দ্রথের দুরভিসন্ধি জানিয়া তাঁহাকে নির্মমভাবে নিগৃহীত করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র যে তাঁহাকে সকল পুত্রবধূর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতেন, তাহা অযৌক্তিক নহে।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রস্তাবে দ্রৌপদী চরিত্রের তত্ত্ব ও তাৎপর্য আলোচনার প্রারম্ভে বঙ্কিম মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তিকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মহাভারতের সব কথাই যে প্রামাণিক বা ইতিহাস সম্মত, ইহা বুঝিতে নিষেধ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন ইহা যদি বা স্বীকার করা যায়, তিনি যে পঞ্চপাণ্ডব-এর মহিষী ছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। প্রাচীন জীবনচর্যায় এই প্রথা কোথাও সমর্থিত নয় বলিয়া ইহা ইতিহাস সম্মত নয়, নেহাৎই কবি কল্পনা। মহাভারতকার একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী কল্পনা করিয়াছেন।

বঙ্কিম মহাভারতকারের দৃষ্টি আলোচনা করিয়াছেন। গীতায় ব্যক্ত হইয়াছে আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল উপভোগের মধ্যে সংযতাত্মা পুরুষ শান্তিপ্রাপ্ত হন। অর্থাৎ যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম

সম্পাদনার্থ ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ করেন, তিনিই নির্লিপ্ত পুরুষ, তিনি ভোগ্যবস্তুর সংশ্লিষ্ট নহেন। বস্তুতঃ ইহা একটি দুঃসাধ্য সাধনা। পরিপূর্ণ ভোগায়োজনের মধ্যে আসক্তি শূন্য হইয়া জীবন অতিবাহিত করার অপেক্ষা দুঃসাধ্য সাধনা আর নাই। অসংখ্য বরাঙ্গনা বেষ্টিত আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই নির্লিপ্ততা আছে, তান্ত্রিকদিগের সাধনারও এইরূপ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর আধিক্য। অনুরূপভাবে দ্রৌপদী চরিত্রও সম্পূর্ণ ভোগায়োজনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আসক্তিশূন্য। "যেমন প্রকৃত ধর্মাত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বরমাত্র—ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট একমাত্র অভিন্ন উপাস্য, তেমনি পঞ্চস্বামী অনাসঙ্গযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট একমাত্র ধর্মাচরণের স্থল। তাঁহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই, তিনি গৃহধর্মে নিষ্কাম, নিশ্চল, নির্লিপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্মে প্রবৃত্ত। ইহাই দ্রৌপদী চরিত্রে অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য।"[৪১] অনুষ্ঠেয় ধর্ম হিসাবে স্বামীদের একক পুত্র-দানের মধ্যে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পরে নির্লেপবশতঃ অন্য সন্তান গর্ভে ধারণ করেন নাই।

মহাভারতী কথা লইয়া বঙ্কিম যাহা কিছু লিখিযাছেন, তাহাতে একটি দিকেই তাঁহার অবিচল দৃষ্টিপাত হইযাছে। তাহা কৃষ্ণচরিত্র। এইজন্য চরিত্র হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ, তত্ত্ব হিসাবে অনুশীলন তত্ত্ব ও ধর্ম হিসাবে গীতোক্ত কৃষ্ণ ধর্মই তাঁহার আদর্শ ও প্রতিপাদ্য বিষয়। মহাভারত-গীতা-ভাগবতের জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বঙ্কিমের নিকট পুরুষোত্তম, তিনিই ত্রিভুবনে মহত্তম আদর্শের প্রতিমূর্তি। তাঁহার আদর্শান্বিত স্বভাব প্রাপ্তিই মানুষের কামনা, তাহাতেই তাহার মোক্ষলাভ। বঙ্কিমের ধর্মৈষণা জাতিকে সেই মোক্ষের সন্ধান দিয়াছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত ॥ বঙ্কিম প্রভাবিত গোষ্ঠীর সংস্কৃতি চর্চার প্রসঙ্গে রমেশ-চন্দ্রের নাম প্রথমে উল্লেখ করিতে হয়। অনন্যসাধারণ প্রতিভা লইয়া রমেশচন্দ্র রাজকার্য, দেশসেবা ও সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি তিনি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। রাজকার্যের প্রয়োজনে তাঁহাকে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারার সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল, আবার দেশের সামগ্রিক পরিচয়লাভের জন্য তিনি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যচর্চাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে দেশ জাতির মধ্যে ঐতিহ্যানুরাগ সৃষ্টি করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

ইংরাজী এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রথম দিকে তিনি ইংরাজীতে লিখিতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণাতেই তিনি বাংলা লিখিতে

সুরু করেন। এইজন্য বঙ্কিমের সাহিত্যচিন্তা ও সংস্কৃতিচর্চা রমেশচন্দ্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

আমাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের কীর্তি ঠিক প্রচলিত ধারার নহে। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মানুসন্ধান করিয়া দেশে বিদেশে তাহার সম্যক্-প্রচার ও প্রসারের জন্যই তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার ইংরাজী রচনাও এই ক্ষেত্রে আলোচনার যোগ্য। প্রাচীন আর্য শাস্ত্র ও সাহিত্যকে বাংলা ও ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া তিনি স্বদেশ ও বিদেশের সুধীজন দরবারে পরিবেশন করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের অনুবাদ, হিন্দু শাস্ত্রের সংকলন ও দুইটি মহাকাব্যের অনুবাদ (ইংরাজী)—এই কয়টি অতুলনীয় সৃষ্টির মধ্যে রমেশচন্দ্রের ঐতিহ্যানুরাগের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রহিয়াছে।

ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের অনুবাদ তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। এই অনুবাদ কার্যে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তখন অনুবাদের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ এ বিষয়ে পথিকৃৎ। রমেশচন্দ্রের মধ্যে তাহারই একটি পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে তিনি প্রাচীন আর্য সাহিত্যের অপরূপ নিদর্শনকে লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন ও অন্যদিকে সাবলীল অনুবাদ ক্রিয়ায় ভাষা সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করিলেন।

ইহার পর তাঁহার হিন্দু শাস্ত্রের সংকলন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে হিন্দু শাস্ত্র নয়টি ভাগে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা সংকলিত ও অনূদিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর যেমন তাঁহাকে ঋগ্বেদ অনুবাদের অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন, হিন্দু শাস্ত্র সংকলনে তেমনি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই অনুবাদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে ইহা সম্ভব হয় নাই।

হিন্দু শাস্ত্র দুইটি ভাগে সংকলিত হইয়াছে। প্রথমভাগে সমগ্র ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের ও দ্বিতীয় ভাগে সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। দ্বিতীয় ভাগের পৌরাণিক সংকলনগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

হিন্দু শাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগে মোট চারিটি বিষয়ের অনুবাদ আছে—রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও অষ্টাদশ পুরাণ। প্রত্যেকটি শাখায় কৃতবিদ্য মনীষিগণ অনুবাদ করিয়াছেন এবং রমেশচন্দ্র এইগুলি একত্র গ্রথিত করিয়াছেন।

রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনি স্বয়ং ইতিপূর্বে মূল সংস্কৃত রামায়ণ এবং তাহার একখানি সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে তিনি ইহার একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ মূলানুগ অথচ প্রাঞ্জল। মূল শ্লোকের কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়া তিনি অনুবাদকে উপভোগ্য করিয়াছেন।

মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছেন দামোদর বিদ্যানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই অংশের অনুবাদ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার তিরোধানে ইহা হইয়া উঠে নাই। বিদ্যানন্দ মহাশয় প্রতিটি পর্ব সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। আদি পর্ব হইতে সৌপ্তিক পর্ব পর্যন্ত দশটি পর্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণের শেষে পর্বস্থিত উল্লেখযোগ্য ঘটনার মূল সংস্কৃত অংশ সংযোজন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা অনুবাদক মূল মহাভারতের চিত্তাকর্ষক ঘটনাগুলির সহিত পাঠকের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটাইতে পারিয়াছেন।

সংকলনস্থিত ভগবদ্গীতা অংশেরও অনুবাদ করিয়াছেন বিদ্যানন্দ মহাশয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বতন্ত্র ভাবে গীতার অনুবাদ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় অনুবাদের পর তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্র তাঁহার সংকলনে এই দুইটি অধ্যায় গ্রহণের অনুমতি পাইয়াছিলেন। ইহার সহিত বিদ্যানন্দের বাকী অধ্যায়গুলি সংযুক্ত করিয়া গীতা অংশের পূর্ণ অনুবাদ সংগৃহীত হইয়াছে।

অষ্টাদশ পুরাণ সংকলন করিয়াছেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক আশুতোষ শাস্ত্রী ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী। অনুবাদকদ্বয় পুরাণ প্রসঙ্গে একটি প্রারম্ভিক আলোচনা করিয়াছেন। পুরাণের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে প্রথমে ইতিহাসরূপে হয়ত ইহার অংকুর ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহা দেবদেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক কাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে, সেখানে ইতিহাস একান্ত গৌণ। আলোচ্য অনুবাদে গ্রন্থকারদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ হইতে সারগর্ভ দুই একটি স্থল মাত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের অনুবাদ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি পুরাণ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র পরিচায়িকাও প্রথমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লোকপ্রিয় কাহিনী ও উপাখ্যান নির্বাচন করায় এই অনুবাদ লোকরঞ্জনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিয়াছে।

রমেশচন্দ্র মহাভারত ও রামায়ণের ইংরেজী কাব্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি যদিও ইংরাজীতে রচিত, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভারতীয় জীবনে মহাকাব্যের সুবিপুল প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

উভয় গ্রন্থের অনুবাদ শেষে তিনি যে মন্তব্য সংযোজন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ধারণাটি স্পষ্ট হইয়াছে।

রামায়ণ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা হইল ছয়টি কাণ্ডের মূল রচনার সহিত পরবর্তীকালে সংযুক্ত সপ্তম সর্গ লইয়া ইহাতে মোট পাঁচশত সর্গ এবং চব্বিশহাজার শ্লোক আছে। রামসীতার অপরূপ চরিত্র কথনে এবং প্রকৃতি পরিবেশের সৌন্দর্য অঙ্কনে ক্লান্তিহীন কবিবৃন্দ যুগে যুগে ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই মহাকাব্যের একটি অপূর্ব আকর্ষণ রহিয়াছে। সংঘর্ষ বা সংগ্রামের উগ্রতায় নহে, গৃহধর্মের প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতার পরিচয় দিয়া ইহা লক্ষ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে আসন পাতিয়াছে। সর্বোপরি ইহাতে আছে রামচরিত্রের মহৎ নীতি নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা এবং সীতাচরিত্রের পাতিব্রত্য এবং সহনশীলতা। ইহাই ভারতীয় জীবনাদর্শের পূর্ণতাকে প্রকাশ করিয়াছে :

> **Rama and Sita are the Hindu ideals of a Perfect Man and a Perfect Woman, their truth under trials and temptation, their endurance under privations and their dovotion to duty under all vicissitudes of fortune, from the Hindu ideal of a perfect life.**[৪২]

এই অনুবাদের প্রকরণ হইল একটি সংক্ষিপ্ত রামকাহিনী বিবৃত করা যাহা মূলের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংযুক্ত অথচ যাহা অতিব্যাপ্তি দুষ্ট নহে। এইজন্য তিনি দুই হাজার শ্লোকের মধ্যে অনুবাদকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

পরিশেষে তিনি ভারতীয় জীবনে রামায়ণের অতুলনীয় প্রভাবের কথা বলিয়াছেন। এ দেশের নীতি শিক্ষার ভিত্তিভূমি এই রামায়ণ এবং কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনের সহিত ইহা অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত। যুগ যুগ ধরিয়া ইহার অজস্র অনুবাদ ভারতবাসী বংশ পরম্পরায় আস্বাদ করিয়া চলিয়াছে।

মহাভারতের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে সংযোজন ও পরিবর্ধন চলিয়াছে। ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের ভারত যুদ্ধের কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল। পরে হয়ত কোন উৎসাহী নরপতির আনুকূল্যে ইহা একটি সম্পূর্ণ কাব্য রূপে গড়িয়া উঠে।

অতঃপর উপকথা, পুরাকথা, পৌরাণিক কথা, নীতিকথা—এক কথায় প্রাচীন ভারতবর্ষের লৌকিক, পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার দ্বারা ইহার কলেবর পুষ্ট হয়। পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়ের পর কৃষ্ণোপাসনার প্রাধান্য

প্রতিষ্ঠিত হইলে মহাভারতেও যুগের চিহ্ন স্পষ্ট হয় এবং কৃষ্ণচেতনা ইহার অন্তর্নিহিত ধ্বনিরূপে পরিস্ফুট হয়।

মূল সংস্কৃত মহাকাব্যে চরিত্র ও ঘটনাকে অবিকৃত রাখিয়া রমেশচন্দ্র ইহার শ্লোকগুলি নির্বাচিত করিয়াছেন। এই নির্বাচনের মধ্যে তাঁহার সংকলন ক্ষমতার সার্থক প্রকাশ ঘটিযাছে। নব্বই হাজার শ্লোককে তিনি দুই হাজার শ্লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র মহাভারতের চরিত্র, ঘটনা, প্রকাশ রীতি ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। ইহার চরিত্রগুলি একেবারে জীবন্ত ও স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইযাছে। ইহারা কোনরূপ এক পর্যায়ভুক্ত চরিত্র নহে, স্ব স্ব চিন্তাধারা ও জীবন দর্শনে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। ইহার ঘটনাগুলিও বিশেষ চিত্তা-কর্ষক; ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে সংঘটিত দৃশ্যাবলী নিঃসন্দেহে হৃদয়গ্রাহী।

রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া রমেশচন্দ্র ভারত ধর্মের একটি বিশেষ সত্যের সন্ধান পাইযাছেন। ভারতবর্ষ বহুদেববাদের দেশ। তবুও এই বিচিত্র দেবসাধনার মধ্যে ভারতবাসী এক অদ্বয ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা করিযাছে। মহাকাব্যের বীর নাযকবৃন্দ তাঁহারই প্রতিরূপ; রমেশচন্দ্রের ভাষায়,

> **that popular monotheism generally recognises the heroes of the two ancient Epics—Krishna and Rama, as the earthly incarnations of the Great God who pervades and rules the Universe.**[৪৩]

রমেশচন্দ্রের তিনটি অনুবাদই বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ ও হিন্দু শাস্ত্রের দ্বারা তিনি দেশের জনসাধারণের সমক্ষে আপন সনাতন ধর্মের একটি সুন্দর পরিচয় উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং মহাকাব্যদ্বযের ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে তিনি ইউরোপীয় সমাজে আর্যভারতের একটি বিশ্বস্ত পরিচয দাখিল করিযাছেন। বঙ্কিম গোষ্ঠীর মধ্যে রমেশচন্দ্রই বোধ করি একক এবং অনন্য যিনি দেশের ঐতিহ্য ও স্বদেশ ধর্মের যথার্থ পরিচয়কে দেশ সীমার বাহিরে বৃহৎ সারস্বত সমাজে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ।। বঙ্কিম পরিমণ্ডলের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অক্ষয়-চন্দ্র সরকার বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিযাছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বড কৃতিত্ব এই যে তিনি সাহিত্য চর্চার সমান্তরালে একটি

শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ইঁহারা আপনাপন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আবার ইঁহাদের অনেকেই স্বতন্ত্রভাবে গুরুর আশীর্বাদ বহন করিয়া সাহিত্যের হাল ধরিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহাদেরই একজন। সাহিত্য সাধক চরিতকার তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ ও স্বদেশ প্রীতি, বাঙ্গালীর যাহা কিছু সম্পদ বলিয়া তিনি জ্ঞান করিতেন, তাহাকেই তিনি সকল আক্রমণ হইতে পক্ষীমাতার মত রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, ইহা শেষ পর্যন্ত অনেকটা জেদে দাঁড়াইয়াছিল এবং প্রগতিশীল নূতনদের কাছে অক্ষয়চন্দ্র গোঁড়া বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন।"[৪৪] সেই যুগে শিক্ষিত মনীষীদের অনেকেই স্বদেশের চিন্তা ও ধর্মকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অমিত প্রতিভাবলে জাতিকে সত্য সন্দর্শনের পথ দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে ভাবে যুক্তি ও চিন্তাভিত্তিক উপায়ে জাতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা অন্যান্যদের মধ্যে দুর্লভ ছিল। পাশ্চাত্যের যুক্তি বিজ্ঞান ও প্রাচ্যের ধর্ম ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি অদ্ভুতভাবে সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অনুবর্তীদের মধ্যে এই দুরূহ কাজটি করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহারা উগ্র দেশাত্ম-বোধ ও জাতীয়তাবোধের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া দেশধর্মের যাবতীয় উপকরণকে মহৎ ও অভাবনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র যে স্বদেশ চিন্তা ও স্বধর্মানু-রাগকে একান্ত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই কারণটিই লক্ষ্য করা যায়। সর্ববিধ আলোচনার মধ্যে দেশ জাতির সম্বন্ধে তাহার আপন পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যকে তুলিয়া ধরাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

অক্ষয়চন্দ্র সনাতন ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্মের মধ্যে অপরিবর্তনীয় যে গুণ তাহা সনাতন। ইতিহাস ও সমাজের বহু পরিবর্তনের মধ্যে এই সনাতন শক্তিটি অব্যাহত থাকিয়া যায়। সেইজন্য সমাজের আশ্রয় এবং অবলম্বন এই সনাতনী শক্তি। তাঁহার মতে সমাজকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়াই ধর্মের ধর্মত্ব। আত্মরক্ষার জন্য, সমাজ রক্ষার জন্য এই ধর্মের বাজনা করা সকলেরই সাধ্যমত কর্তব্য।

হিন্দু ধর্মের সংরক্ষণে তিনি এক প্রকার উগ্র চিন্তাধারার (aggressive thought) পরিচয় দিয়াছেন। যেমন দেশকালের গণ্ডীতে এই সনাতন ধর্মের বিশিষ্ট রূপকে তিনি খণ্ড ধর্ম বলিয়াছেন এবং মানুষের উপকার চেতনাকে আশ্রয় করিয়া যাহার অবস্থিতি তাহাকে ধর্ম বলিয়াছেন। এই ধর্মের একটা প্রসারণ-

শীলতা আছে, তাহা সর্বক্ষেত্রে সমাজ সংসারকে গ্রাহ্য করে না। সে ক্ষেত্রে খণ্ড ধর্মের অনুশীলন আবশ্যক। ধর্ম ও স্বধর্মের সামঞ্জস্যের দ্বারা সমাজ রক্ষা হয়। হিন্দু ধর্মকে এইরূপ খণ্ড ধর্মরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের সমাজ ও দেশের পক্ষে মঙ্গল হইবে।[৪৫]

হিন্দু ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাদের ধর্মোক্ত কর্মবাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। স্মৃতি পুরাণে ভারতবর্ষকে কর্মভূমি বলা হইয়াছে, অন্যান্য দেশ যেখানে ভোগকেই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য করিয়াছে, সেখানে ভারতবর্ষ ইহাকে কেবল মাত্র আনুষঙ্গিক রূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভোগ এখানে কোন ক্ষেত্রেই প্রধান নহে। অতঃপর হিন্দু ধর্মের যম নিয়মের অনুষ্ঠানও লক্ষণীয়। নিত্যধর্মের কতকগুলি লক্ষণ যমের অন্তর্ভুক্ত আর আচার ধর্মের কতকগুলি লক্ষণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। যমানুষ্ঠান না করিয়া কেবল নিয়ম ভজন করিলে মানুষের পতন হয়। তবে কেবল সদাচারেরও একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। প্রাচীন ঋষি-মনীষীগণ যে সদাচার পালনের ফলে দীর্ঘজীবি হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের প্রধান গ্রন্থ 'সনাতনী'। ধর্মের বহিরঙ্গ কিছু কিছু পরিবর্তিত হইলেও ইহার সনাতন প্রকৃতি কিভাবে অটুট রহিয়াছে, হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে আচার ধর্মের গুরুত্ব কতখানি বা নিত্যধর্মের অনুশীলন কেন আবশ্যক ইত্যাদি বিষয়ই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। সমাজে বর্ণধর্মের যদি অধঃপতনই ঘটিয়া থাকে, শাস্ত্রোক্ত পুরুষাকারের সাধনায় তাহা পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। সনাতন ধর্মচিন্তায় মনোনিবেশ করিলে জড় জগতে শৃঙ্খলা, ভাব জগতে সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিক জগতে মঙ্গল বর্ধিত হইবে। বঙ্কিম-অনুরাগী অক্ষয়চন্দ্র, হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব ও আচরণ—উভয়দিকের একটি ব্যবহার যোগ্য নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের 'উদ্দীপনা' প্রবন্ধটী এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি পরে তাঁহার 'সমাজ সমালোচন' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহাতে তিনি ভারত ইতিহাসের একটি বিশেষ অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইল উদ্দীপনার অভাব। উদ্দীপনা বলিতে তিনি বুঝাইয়াছেন—"যদ্দ্বারা পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্মপ্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন করা বা অন্যকে কার্যে লওয়ান যায় তাহাকে উদ্দীপনা শক্তি বলে।"[৪৬] ইহা কাব্যের উদ্দীপনা হইতে পৃথক। অক্ষয়চন্দ্র ভারতবর্ষের সমাজ বিভাগ ও জীবন ধারা পর্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই ভূগোলের ভাগের মত

সমাজের সহজ বিভাগীকরণে—ভারতীয় জীবন নদীস্রোতের মত স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হইয়াছে। সেখানে কোনরূপ অভাব বোধ ছিল না, সেইজন্য কোনরূপ উদ্দীপনার অবকাশ ছিল না। ভারত-পুরাবৃত্তে তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে উদ্দীপনা-প্রবল কাল তিন বার মাত্র আসিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত রচনার মূলে এই উদ্দীপনার সঞ্চার ছিল, পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের ব্রাহ্মণ্য বিরোধী ধর্মান্দোলনের মধ্যেও অনুরূপ উদ্দীপনা ছিল।

প্রাচীন ভারতের নিস্তরঙ্গ জীবন যাত্রার মধ্যে রামচন্দ্রের মানবিক কর্মশক্তির স্ফুরণ প্রবল উদ্দীপনা-সঞ্জাত। রামচন্দ্রের কার্যাবলীর মধ্যে, তাঁহার দক্ষিণ বিজয় চরে, রাবণ বধ চরে, রাক্ষস ধ্বংস চরে, প্রয়োজন, বিপদুদ্ধার, মহৎ কার্যসাধন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে উদ্দীপনা অত্যাবশ্যক ছিল। উদ্দীপনা তাড়িত মহৎ মানবের কার্যকথা এই রামায়ণ।

অনুরূপভাবে ভারতযুদ্ধের কার্যাবলীও উদ্দীপনা অনুপ্রাণিত। এই মহাগ্রন্থে সে কালের উদ্দীপনা শক্তির প্রাচুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতযুদ্ধ ও পরবর্তীকালের অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্যে খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক সূত্রে বাঁধিবার আয়োজন হইয়াছিল। এই মহতী প্রচেষ্টার কুশীলববৃন্দ যে শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহাই উদ্দীপনা। শুধু মহৎ ও বৃহৎ চরিত্রপুঞ্জেই নহে, বহু অখ্যাত ও সাধারণ চরিত্রে মহাকবি বেদব্যাস এই উদ্দীপনার জলন্ত স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। শকুন্তলোপাখ্যানে, নলোপাখ্যানে, ভীষ্ম বচনে, ভীমের ভৎ‍র্সনে, খাণ্ডবদাহনে, দ্রৌপদীর রোদনে এই উদ্দীপনার পরিচয় আছে। কবিতার রস ও উদ্দীপনার রস মিলিয়া মহাভারতকে অপূর্ব গ্রন্থ করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধ নিবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির মর্ম সন্ধান করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার এই মানসভঙ্গীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়াছে তাঁহার সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা। আমরা প্রসঙ্গান্তরে তাহা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিব।

চন্দ্রনাথ বসু ॥ বঙ্কিম সমসাময়িক চন্দ্রনাথ বসু সমাজ ও শাস্ত্র সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করিয়া সুধী সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের রক্ষণ ও পোষণে তিনি এমন ধৃতাস্ত্র হইয়া সংগ্রামে নামিয়াছিলেন যে সকল সময়ে তিনি যুক্তি বুদ্ধিকে মানিয়া চলিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে তিনি হিন্দু ধর্মের মূল প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ইহার তত্ত্ব ও আচার, নীতি ও নিষ্ঠা, ইহার

সাধনা ও লক্ষ্য বা উপাসনা রীতি—সব কিছুর মধ্যে এক অসাধারণ মৌলিকতা রহিয়াছে, তাহাই হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়াছে। আবার যুগজীবনের সংঘাতে আমাদের সমাজে ও আচরণে যে দারুণ বিপর্যয়ের সূচনা হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তিলাভের একটি মাত্র পন্থা আছে বলিয়া তিনি মনে করেন। তাহা হইল ভারতীয় জীবন সাধনার পথ, মহাজনদের আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশ। অতঃপর তিনি ভারত-পুরাণের দুইটি অবিস্মরণীয় চরিত্র সমালোচনা করিয়া তাঁহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে তিনি তত্ত্ব ও দৃষ্টান্ত উভয় দিকেই লক্ষ্য দিয়াছেন।

'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে তিনি হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। হিন্দুধর্মের মৌল নীতিগুলি ইহাতে শাস্ত্র ও পুরাণের দৃষ্টান্ত দিয়া আলোচিত হইয়াছে। এই নীতি বা লক্ষণগুলিই হিন্দুধর্মের প্রাণ, এইগুলি অনুসৃত হয় বলিয়া হিন্দুধর্ম এত বিরাট ও ব্যাপক। এই লক্ষণগুলিকে চন্দ্রনাথ বসু সোঽহং, লয়, নিষ্কাম ধর্ম, ধ্রুব, তুষানল, কড়াক্রান্তি, পুত্র, আহার, ব্রহ্মচর্য, বিবাহ ও মৈত্রী এই কয়টি প্রবন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হিন্দুর দেবতা ও মূর্তি পূজা প্রসঙ্গেও ইহাতে দুইটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সোঽহংবাদ হিন্দু ধর্মের একটি বড কথা। এই মতবাদের মধ্যে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকৃত। এই চেতনার দ্বারা মানুষ জাগতিক স্থূলতা অতিক্রম করিয়া একটি পরম সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে। জগতের কোন লোভ বা প্রলোভন তাহার এই নির্মল সত্তাকে কলুষিত করিতে পারে না। ইহাই জীব তথা মানুষের ব্রহ্মে উত্তরণ বা সোঽহংবাদ—"ব্রহ্মাণ্ডে স্থূলত্ব থাকিলেও ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম এক—একথা বলিলে কোন দোষই হয় না। ফলতঃ ব্রহ্মাণ্ড যদি ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলে সোঽহং, তবে সকল কথার সার কথাই বলে।"[৪৭] এই সোঽহং ধারণাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান, ইহাতে জগতের সমস্ত অসামঞ্জস্য এবং অসংগতি বিদূরিত হয়। হিন্দু জীবন যে জাগতিক বৈষম্যকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছে, তাহার পশ্চাতে এই তত্ত্বই ক্রিয়াশীল।

মানুষী সত্তা অতিক্রম করিয়া যে ব্রহ্ম সত্তায় পরিণতি, তাহাই সাধনার চূড়ান্ত পরিণতি। একনিষ্ঠ সাধক ব্যতিরেকে অন্যের এই পরিণতি বা লয় আসিতে পারে না। বিষ্ণু পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত ও আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের জীবনে এই পরিণতি আসিয়াছিল। জড়ত্বের স্তূপ হইতে মুক্তি, ভোগাসক্তির দাসত্ব হইতে পরিত্রাণই জীবের ব্রহ্মলীনতা আনিতে পারে।

হিন্দু ধর্মের এই গূঢ় তত্ত্ব পুরাণ চরিত্রের মধ্যে সার্থকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জয় বহু সাধনা সাপেক্ষ, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এই পরিণতিতে পৌঁছান যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলনের দ্বারা, শুদ্ধ নৈষ্ঠিক জীবন যাপনের দ্বারা এই সিদ্ধিলাভ করিতে হয়।

অতঃপর নিষ্কাম ধর্মবাদ। ইহা হিন্দুধর্মের জয়বাদের অপরিহার্য ও ন্যায়ানুগত সিদ্ধান্ত। সকাম ধর্মও যে এক প্রকার ধর্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম যাহা গীতাতে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কারণ "কেবল সকাম ধর্মে মানুষের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, কারণ মানুষের সম্বন্ধ কেবল সংসারের সহিত নয়, ভগবানের সহিতও বটে। কিন্তু ভগবানকে লাভ করিতে হইলে মানুষকে নিষ্কাম হইতে হয়, কারণ ভগবান নিষ্কাম। অতএব নিষ্কাম ধর্ম ব্যতীত হিন্দুর চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নয়।"[৪৮] আমাদের স্বভাব জীবন এই সকাম ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা হইতে নিষ্কাম ধর্মে উন্নীত হইবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। তাঁহার মতে বর্তমান কালে ধর্মসংস্কারে এই লক্ষ্যটি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

হিন্দু ধর্মের আর একটি লক্ষণকে চন্দ্রনাথ বসু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন ধ্রুব কথা—পুরাণোক্ত ধ্রুবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা এবং সিদ্ধির কথা। ইহা হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত পুরুষকারের সাধনা, ইহার দ্বারা অমিত আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যায়। "মানুষ কর্মফল ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াও নিজের চেষ্টা বা পুরুষকার দ্বারা সে কর্মফল অতিক্রম করিতে পারে, এ কথার কিছুমাত্র অসঙ্গতি বা অযৌক্তিকতা নাই"।[৪৯] বিষ্ণু পুরাণে ধ্রুব সমস্ত কর্মফল তুচ্ছ করিয়া দেবদুর্লভ পদলাভ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে সহস্র বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূলতা জয় করিয়া তাহা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত কথা দুইটি সত্যের সন্ধান দেয়—একটি এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার কথা, যাহা নিয়তি নির্ধারিত জীবনের নির্দিষ্ট ভাগ্যকে ব্যাহত করিতে পারে, অপরটি ইহা অনুসরণকারীকে অমিত তপোবলের অধিকারী করিতে পারে, যাহাতে সাধনার চরম লক্ষ্য সেই ব্রহ্ম সংযোগ সম্ভব হইতে পারে।

অনুরূপভাবে কষ্টসহিষ্ণুতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নীতিনিয়ম বা অদূরগামিতা, আচারানুবর্তিতা প্রভৃতি হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ। তিনি স্বীকার করেন ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিতেই শাসন সংস্কারের বাড়াবাড়ি আছে, তবে সেগুলি শাস্ত্রবিদদের বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। পাপ ব্যভিচারিতার কারণ-

গুলিকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলে মানুষ সাবধান হইতে পারিবে। এইরূপ একটি সামাজিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে একটু বেশী করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে তিনি সুচিন্তিত মতামত দিয়াছেন। আলোচনার প্রমাণ সূত্র হিসাবে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন মনুসংহিতা, মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। এই "বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্মচর্য্যা এবং সে বিবাহ প্রক্রিয়ার ফল পতি পত্নীর সম্পূর্ণ একীকরণ। কিন্তু বিবাহ সামাজিক জীবনের ভিত্তি। অতএব ধর্মার্থ সামাজিকতা একমাত্র হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দু ধর্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ।"[৫০] হিন্দু বিবাহে আত্মসুখের স্থান নাই। ইহার মধ্যে একটি সামাজিক মঙ্গলের নির্দেশ আছে বলিয়া ইহা এত মহৎ। আবার বিবাহের রীতি নীতি ও নিয়ম নির্দেশের মধ্যে ইহার পবিত্র উদ্দেশ্য বার বার স্মরণ করা হয়। একবার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে নরনারীর পৃথক সত্তা আর থাকে না। স্বামী স্ত্রীর এই একীকরণ হিন্দু বিবাহের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ইহা তাঁহাদের ইহলোক এবং পরলোকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। এই পারস্পরিক নির্ভরতার জন্য হিন্দু বিবাহ একটি চিরস্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করে, পাশ্চাত্য দেশের মত ইহা কোনরূপ সাময়িক চুক্তিমাত্র নয়।

সর্বভূতে অনুরাগ ও বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা হিন্দুধর্মের একটি মহৎগুণ। গীতা ও বিষ্ণু পুরাণ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি প্রাচীন হিন্দুর এই উদার দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিয়াছেন। এক ব্রহ্মপদার্থে নির্মিত বলিয়া সকল লোক সকল লোকের প্রিয়—ইহাই সমদর্শিতার পশ্চাৎ প্রেরণা। এই সমত্ববাদেরই আনুষঙ্গিক প্রীতিবাদ। হিন্দুশাস্ত্রে চেতন মানুষ হইতে অচেতন বৃক্ষলতা, মৃত্তিকা প্রস্তর সকল পদার্থকেই ভালবাসিবার নির্দেশ আছে। এই প্রীতিবাদ বা মৈত্রীবাদ হেতু হিন্দুধর্মের বর্ণবিন্যাস সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নাই। এই একটি মৌল নীতি হিন্দুধর্মের বৈশ্বিক আবেদন ও সামাজিক শৃঙ্খলার কারণ হইয়াছে।

পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বহুদেববাদ এবং মূর্তি পূজার উপর চন্দ্রনাথ বসু মৌলিক এবং সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরের নির্গুণত্ব এবং নিরাকারত্ব বলিতে তাঁহার গুণহীনতা বা রূপহীনতা বুঝায় না। তিনি অশেষ গুণের আধার এবং সর্বরূপ সম্পন্ন। রূপগুণের কোন প্রচলিত মানদণ্ডে তাঁহার রূপগুণ চিন্তনীয় নহে। এইজন্যই তিনি নির্গুণ এবং নিরাকার। হিন্দুর কল্পনায় ঈশ্বরের এই অনন্ত গুণ ও অনন্ত রূপ প্রতিভাত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে বহুরূপ দিয়া চিন্তা করা

হইয়াছে। একই ঈশ্বরের বহুরূপ কল্পিত হইলেও একে অনন্ত—এ ধারণা কিছু কষ্টকর, একান্ত জ্ঞানসাপেক্ষ, কিন্তু অনেকে অনন্ত অথবা অনন্তে অনন্ত এ ধারণা কিছু সহজ, মানুষের পক্ষে আয়ত্ত। "সেই অনেকে অনন্তের, সেই অনন্তে অনন্তের নামই তেত্রিশ কোটি দেবতা। তাই হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা।"[৫১] এই বহুরূপের মধ্যে সুন্দর ও ভয়ংকর উভয়েরই স্থান আছে। জগতের অযুত-রূপের মধ্যে যে সৌন্দর্য, ভীষণতা, মাধুর্য ও পুরুষতা বিমিশ্র হইয়া রহিয়াছে, তাহাই তাঁহার বিচিত্র রূপের আধার।

ঈশ্বরের এই বহুরূপ কল্পনা হইতেই মূর্তিপূজা। "যিনি জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক মনে করেন না, জগৎ তাঁহার কাছে নীচ বা অধম জিনিষ নয়, অতএব জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মূর্তি নির্মাণ করা তিনি অপকর্ম মনে করেন না। তাই হিন্দুর কাছে মূর্তিপূজা দোষশূন্য।"[৫২] বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় জড় মূর্তিতে ঐশীশক্তি অর্চনা করাই মূর্তি পূজা। মূর্তিপূজক আপন মানসিক ক্ষমতায় এই শক্তি উপলব্ধি করেন। এইরূপ উপলব্ধির নাম **idealisation** বা ভাবাভিনয়ন। প্রতিমা বা মূর্তিনির্মাণের মধ্যে পূজকের চিত্তে **artistic idealisation** বা শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়ন ঘটিয়া থাকে। ইহা হৃদয়ের অপরাপর ভাব ও অনুভূতিকে পরিপোষণ করে। সে ক্ষেত্রে হৃদয়স্থিত ধর্মভাবও যে ইহার দ্বারা জাগ্রত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতঃপর সাধারণ্যে মূর্তি পূজার উপযোগিতা। অন্তর্মুখী ভাবকল্পনায় যাহা ধারণায় আসে, বহির্মুখী প্রকাশে তাহা স্পষ্ট হয়। সাধারণের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ রূপায়ণ আবশ্যক। চন্দ্রনাথ ইহার সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। একটি বালিকার সুন্দর কমনীয় মুখ আর অনির্বচনীয় কান্তি দেখিয়া আমরা বলিয়া থাকি—মেয়েটি যেন লক্ষ্মী। এই বালিকার মূর্তিটিকে ভাবুকতার ভঙ্গীতে ভরাইয়া তুলিলে জগদীশ্বরের সৌভাগ্য মূর্তি ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু তাহা অন্তর্দৃষ্টি ও তন্ময়তা সাপেক্ষ। এই ক্ষেত্রেই শাস্ত্রকারেরা রূপের বহর বাড়াইয়াছেন। পুরাণকার অযুত সহায-কেয়ূর, কটক, মেখলার আভরণে, গণ্ড, ওষ্ঠ, ভ্রূ, শিরোদেশের নিখুঁত আকৃতিতে, পদ্মময় আধার ও আসনের ব্যবস্থায়—সেই নারী মূর্তিতেই : শ্রীভাব ফুটাইয়া তুলিলেন। ইহাই হিন্দুর প্রতিমা, রূপকল্পনায় হৃদয়ের একটি ভাবাভিনয়ন ও তদ্দ্বারা জগদীশ্বরের সুন্দর রূপের উপলব্ধি। হিন্দু কল্পনায় প্রতিমা পূজা এক অপূর্ব ঈশ্বর আরাধনা, ইহাতে জগৎ ও জগদীশ্বরকে একত্রে পাওয়া যায়।

ইউরোপীয় জীবন প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসিয়া আমাদের জীবনে যে সংঘর্ষের

সূচনা হইয়াছিল, তাহা লইয়া অন্যান্য চিন্তানায়কদের মত চন্দ্রনাথ বসুও আলোচনা করিয়াছেন। ভারত ও ইউরোপের কোন্ পথটি ঠিক, এই জটিল প্রশ্ন তাঁহার 'কঃ পন্থাঃ' গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা একান্তই ধর্মভিত্তিক এবং ইহাতে চন্দ্রনাথের স্বভাব সুলভ নীতিনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতের ও ইউরোপের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। ভারতের ইহলোকের ব্যাপারটিতে পরলোকের চিন্তা জুড়িয়া দেওয়া হয়, আমাদের কর্মক্ষেত্রে ইহলোক পরলোকের সম্পূর্ণ অধীন। আর ইউরোপের কর্মক্ষেত্রে পরলোকই ইহলোকের অধীন। এইরূপ পার্থক্য হেতু উভয় দেশের জীবনাদর্শে এতখানি বিরোধ।

উভয় দেশের জীবন প্রকৃতি পর্যালোচনায় তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা হইল এই যে ভারতের সাধকশ্রেণী অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী ঈশ্বরোপলব্ধির পথে বৈরাগ্যবাদকে স্বীকার করিয়াছে। অদ্বৈতবাদীর নিকট ইহা ত একান্ত স্পষ্ট, দ্বৈতবাদীর ক্ষেত্রেও জড় ধর্ম অতিক্রম করিবার কথা। সাধনার পথে মোহভঙ্গ যখন একান্তই আবশ্যক তখন তাহার প্রভাব ইহ জীবনেও গভীরভাবে পড়িল। এইজন্য পার্থিব উন্নতির ভূরিপ্রমাণ ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে স্বীকৃত হইলেও কোন ক্ষেত্রেই তাহা এই স্থির লক্ষ্যকে ভুলাইয়া দেয় নাই। ইউরোপের পথ ইহার বিপরীত। ইউরোপীয় ধর্মে নিষ্পাপ হওয়ার কথা আছে, কিন্তু এইরূপ ত্যাগ করিবার কথা নাই। পরন্তু রাজ্যলালসা, অর্থলালসা, বাণিজ্য প্রবৃত্তি, ভোগলালসার অন্ত নাই সেখানে। পৃথিবীতে অতিমাত্রায় ভোগ করার লালসায় তাহার অতৃপ্তি ও অস্থিরতা। ইহাই একদিন তাহার মৃত্যুদূত হইবে সন্দেহ নাই। কিছু বস্তুর সাধনা এবং ভোগের পরিচর্যা হয়ত প্রয়োজন; ভারতবর্ষ যে সেদিকে একেবারে উদাসীন ছিল, তাহাও নহে। কিন্তু ভারতবর্ষ এই পথের সীমা সম্বন্ধে অবহিত ছিল বলিয়া তাহার আত্মিক মৃত্যু হয় নাই। এইজন্য ভারতবর্ষের পথই যথার্থ সংকট মুক্তির পথ।

চন্দ্রনাথ বসু ভারতীয় মহাকাব্যের দুইটি অবিস্মরণীয় চরিত্রের সমালোচনা করিয়াছেন। মহাভারতীয় চরিত্র সাবিত্রী ও শকুন্তলার মধ্যে তিনি হিন্দুধর্মের মহৎ ও কল্যাণকর আদর্শের রূপায়ণ দেখিয়াছেন। বস্তুতঃ সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তিনি চরিত্র দুইটি আলোচনা করেন নাই। কঠিন ও কঠোর ধর্মনীতিতে তাঁহাদের জীবন যাচাই করা হইয়াছে। ধর্মাচরণের শৈথিল্য বা নিষ্ঠার জন্য শকুন্তলা ও সাবিত্রীকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

সাবিত্রীর মধ্যে ভারতীয় নারীর পাতিব্রত্য, ধর্মনিষ্ঠা ও কর্তব্য পরায়ণতার অপূর্ব অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। কন্যারূপে, বধূরূপে, পত্নীরূপে তিনি যে আনুগত্য, কর্তব্য-পরায়ণতা এবং পাতিব্রত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। আর প্রতিটি ভূমিকায় তিনি যে সফল হইয়াছেন, তাহার মূলে তাঁহার ধর্মবল ও আধ্যাত্মিক শক্তি। কন্যাকালে পিতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া তিনি পতি-নির্বাচনে বাহির হইয়াছেন, উদ্দেশ্য ধার্মিক, গুণবান, সদ্বংশজাত স্বামীলাভ এবং তিনি অনুরূপ স্বামীই মনোনীত করিয়াছিলেন। বধূধর্মকে তিনি সুন্দর ভাবে পালন করিয়াছেন। পিতার ঐশ্বর্য ভুলিয়া তিনি শ্বশুর গৃহে দরিদ্রের ন্যায় বাস করিয়াছেন, সেবা পরিচর্যা দ্বারা সর্বজনের মনস্তুষ্টি করিয়াছেন।

যে বধূ কেবল পতিতে আবদ্ধ, সংসারজনের সহিত যাহার কোন সংযোগ নাই, তাহা সর্বথা নিন্দার্হ। সাবিত্রীর বধূধর্ম ভারতবর্ষের আদর্শ। ইহার সহিত মিশিয়াছে তাঁহার পাতিব্রত্য। স্বামীর প্রতি গভীর প্রেমে তিনি প্রশান্ত ও গম্ভীর, চাপল্য ও চঞ্চলতা দেখাইয়া এই প্রেমকে তিনি লঘু করিয়া ফেলেন নাই। অতঃপর সাবিত্রীর সেই অসম্ভবের সাধনা, যাহা বাস্তবতার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অলৌকিক। যমের সহিত কথোপকথন এবং একে একে কয়েকটি বরলাভ ও পরিশেষে মৃতপতির পুনর্জীবিত করার মধ্যে যতই অলৌকিকতা থাকুক, ইহার ব্যাখ্যা আদৌ দুরূহ নহে। চন্দ্রনাথ বসু আলোচনা করিয়াছেন যে পুরাণকারগণ এবিষয়ে একটি স্থিত প্রত্যয় রাখিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর জড়ের ক্রিয়া আছে, যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, আবার চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শক্তিরও ক্রিয়া আছে যাহা সূক্ষ্ম অথচ শক্তিশালী। সেই চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী না হইলে তাহার ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। পুরাণকারগণ সেই চেতনার অধিকারী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা জড় জগতের নিয়মাবলীর উপর আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়াকে জয়ী করাইয়াছেন। "সাবিত্রীর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিই সাবিত্রী কথার প্রকৃত অলৌকিকতা।"[৫৩] তাঁহার চরিত্রে ঐশী শক্তিও মানবীয় রূপের অপরূপ মিশ্রণ ঘটিয়াছে। অসাধারণ ধর্মবলে তাঁহার মধ্যে ঐশীশক্তির বিকাশ এবং গভীর মমত্ববোধে তিনি নিখিলের বৈধব্যপীড়িত নারীর মহৎ সান্ত্বনা। যুগ যুগান্তের ভারতললনা সাবিত্রীর নিকট অমোঘ নিয়তি বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে।

শকুন্তলা তত্ত্বের রহস্য উদঘাটনেও তিনি ভারতীয় নারীধর্মের আদর্শ—তাহার স্বামীসংসার ও সমাজ উভয়দিকের প্রতি কর্তব্যের অপরিহার্যতা উল্লেখ

করিয়াছেন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম পবিত্র হইলেও তাহা তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ প্রেমে কাহারও মঙ্গল নাই। গভীর আত্মচিন্তায় নিমগ্ন শকুন্তলা অতিথিকে উপেক্ষা করিয়া সামাজিক কর্তব্যে ত্রুটি দেখাইয়াছিলেন। নৈতিক নিয়মভঙ্গেই তাঁহাকে শাপগ্রস্তা হইতে হইয়াছে। আবার তাঁহাদের বিবাহ রীতির মধ্যেও একটু ফাঁক ছিল। ভারতবর্ষ যে বিবাহ রীতিকে গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে সমাজ একটি বড উপাদান। দুষ্মন্ত এই সামাজিক অনুজ্ঞা পালন না করিয়া অপরাধ ঘটাইয়াছেন।

অতঃপর অভিজ্ঞান শকুন্তলায় সমগ্র মানবজাতির একটি আধ্যাত্মিক সংকট আলোচিত হইয়াছে। রিপুর তাডনায় বাহ্যশক্তি অতিক্রম করার মধ্যে একটি দুঃসাহসিকতা আছে। সেখানে রিপু প্রবল হইয়া দেখা দেয়। তবে ইহা কেবল মাত্র দুইটি নরনারীর হৃদয়কেই বিপর্যস্ত করিতে পারে, তাহার অধিক ক্ষমতা এইরূপ রিপুর নাই। কিন্তু রিপু যখন আধ্যাত্মিক শক্তিকে অতিক্রম করে, তখন তাহার বিপর্যয়কারী ক্ষমতা অসীম। দুষ্মন্তের বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রিপু প্রবল হইযাছিল। ইহা ব্যক্তি মানুষের পতন নহে, এখানে আমরা সমগ্র মানবজাতির সম্বন্ধে ভাবিত হই। দুষ্মন্তের বিবেক সমৃদ্ধ চরিত্রের স্খলন সমগ্র মানবজাতির একটি আধ্যাত্মিক সংকটের সূচনা করিয়াছে।

শকুন্তলা নাটকে একটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তাহা হইল ঐন্দ্রিয়ক শক্তির দমনে মানসিক শক্তি এবং সমাজ শক্তি উভয়েরই প্রয়োজন। মানসিক শক্তির দ্বারা ব্যক্তিকে অবস্থার উর্ধ্বে উঠিতে হইবে এবং সমাজের গঠন প্রণালী এবং সামাজিক নিয়ম এমন হইবে, যাহার ফলে সংযম প্রতিপালন সহজসাধ্য হইবে।

শকুন্তলা নাটকে প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে, পুরুষকে তাহার প্রভাব স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভারতীয় সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব যেন এখানে কাব্যাকারে আলোচিত হইয়াছে। এইভাবে এক শকুন্তলা নাটকে সমাজতত্ত্ব হইতে দার্শনিক সত্য পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলিতে চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুধর্মের সার্বভৌমতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তবে তাঁহার দৃষ্টিভংগী রাজনারায়ণ বসু বা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভংগী নহে। রাজনারায়ণের আলোচনা মূলতঃ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাকে ভিত্তি করিয়া হইযাছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি ঔপনিষদিক জ্ঞানবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। চন্দ্রনাথের আলোচনার ভিত্তি সনাতন হিন্দু ধর্ম, ইহার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, আচার আচরণগত সূক্ষ্ম নিয়ম নির্দেশ। তাঁহার আলোচনাতেও

ব্রহ্মবাদ স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব হিসাবে নহে, তাহা হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ প্রকৃতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। হিন্দু ধর্ম যে এতখানি উদার, সমদর্শী, ইহার মূলে এই ব্রহ্ম চেতনাই কার্যকরী হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার ঝোঁক পৌরাণিক ভক্তিবাদের প্রতি। জড়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া জড়কে অস্বীকার করিবার স্পর্ধা আমাদের থাকিতে পারে না। সুতরাং জড় বা জগৎ অবশ্যই স্বীকার্য। ইহাকে লইয়াই ঈশ্বর অনুসন্ধান করিতে হইবে। এ জগৎ মায়া প্রপঞ্চ নয়, মাধুর্য-সুষমা-ভয়ংকরতা লইয়া ইহার বিচিত্র রূপ। বহুরূপে প্রকাশিত ঈশ্বরকে এই রূপের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। এই জন্য প্রকাশিত রূপকে ধ্যানের রূপ দিতে হইবে। তাহার জন্য প্রতিমা পূজা বা বহু দেবতার অর্চনা আদৌ নিন্দনীয় নহে।

অপর দিকে বঙ্কিমের সহিতও তাঁহার মৌল পার্থক্য রহিয়াছে। বঙ্কিমের আলোচনায় পাশ্চাত্ত্য যুক্তি ও প্রাচ্য অনুভূতির অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। যুক্তি চিন্তার আলোকে আধুনিক সংশয়ী মানুষের কাছে তিনি ভারতধর্মের পূর্ণতার আদর্শকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার বহু ক্ষেত্রে পশ্চিমের প্রতি নিন্দাভাষণ এবং কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার আলোচনার ধারাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের বিতর্ক বহুল চিন্তাগুলি স্বীকৃত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বসু এ ক্ষেত্রে আপোষহীন। ভারতধর্মের সমস্ত কিছুই গ্রাহ্য, আর পাশ্চাত্ত্যের সব কিছুই নিন্দনীয়, এইরূপ একটি পূর্বধারণা লইয়া তিনি বরাবর আলোচনা করিয়াছেন। বিবাহ, জাতিভেদ, অনুশাসন প্রভৃতি প্রসঙ্গে তিনি এমন অনেক উক্তি করিয়াছেন, যেগুলি যুক্তি সহকারে সর্বত্র গ্রহণ করা যায় না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বকনিষ্ঠ সাহিত্য-শিষ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য সৃষ্টি ও গবেষণা দ্বারা বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে পাণ্ডিত্য ও রসবোধের অদ্ভুত সমন্বয় হইয়াছিল। বঙ্গ সংস্কৃতিকে যাঁহারা বহু উপাদান সংযোজনে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, হরপ্রসাদ তাঁহাদেরই একজন। তাঁহার সম্বন্ধে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি একান্ত সমীচীন: "সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃত বাঙ্ময়, বাঙ্গালা সাহিত্য—ইহারই মাধ্যমে তিনি বাঙ্গালা দেশের চিন্তাধারায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন এবং এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব। তিনি ছিলেন অন্যতম যুগনেতা, আধুনিক বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর মানসিক সংস্কৃতির তিনি ছিলেন একজন পরিচালক। প্রাচীনকে বুঝিয়া আধুনিককে সৎ ও যুক্তিযুক্ত চিন্তার পথে যাঁহারা পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী।"[৫৪]

ভারত সংস্কৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল নিবিড়। সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া তিনি যেমন সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের ধর্ম ইতিহাস লইয়াও তেমনি তিনি সুগভীর গবেষণা করিয়াছেন। বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, নারায়ণ, বিভা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মানসী ও মর্মবাণী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী ইত্যাদি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই রচনাগুলির বহুলাংশ পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহার কয়েকটি রচনা আছে। বাল্মীকি রামায়ণের তিনি একটি অনুবাদও করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ভারতমহিলা' ও 'বাল্মীকির জয়' রচনা দুইটি পুরাণ চেতনাকে আশ্রয় করিয়া রচিত।

'ভারত মহিলা'॥ ইহা হরপ্রসাদের প্রথম রচনা এবং স্মৃতি-পুরণা-কাব্য আহৃত একটি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ। সংস্কৃত কলেজে পাঠকালীন মহারাজ হোলকার পুরস্কারের জন্য ভারতীয় নারীর আদর্শ প্রসঙ্গে তিনি এই নিবন্ধটি রচনা করেন। বলা বাহুল্য, তিনি ইহাতে সফলও হইয়াছিলেন। পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাটিতে বিরোধী 'ভিউ' আছে বিবেচনা করিয়া আর্যদর্শন সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পত্রিকায় ইহা প্রকাশ করিতে চাহেন নাই; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সানন্দে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভারতমহিলার বিষয়বস্তু—**"On the highest ideal of woman's character as set forth in ancient Sanskrit writers."**, প্রবন্ধটির প্রথম দুই অধ্যায়ে হরপ্রসাদ স্মৃতি শাস্ত্র সমর্থিত নারীধর্মের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তিনি প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা এবং তাঁহাদের আচরণীয় গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু স্মৃতিতে যাহা আদর্শরূপে নির্দিষ্ট ও পালনীয়, তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। এইজন্য লেখক পরবর্তী অধ্যায়ে স্মৃতি-বিহিত আদর্শগুলির উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। দুইটি অধ্যায়ে তিনি কাব্য ও পুরাণ হইতে এবং শেষ অধ্যায়টিতে অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কাব্য ও পুরাণ আহৃত নারীচরিত্রগুলি তিনি কিভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব।

লেখক প্রাচীন আর্যনারীদিগকে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। কোনরূপ প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইয়া যাঁহারা সার্থকভাবে আপনাদের কর্তব্য কর্ম সমাধা

করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন ; আর প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও যাঁহারা কর্তব্যকর্মে কোনরূপ বিচলিত হন নাই, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। চারিত্রধর্মের সমুজ্জ্বল প্রতিষ্ঠায় শেষোক্ত সম্প্রদায়ই যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই।

রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকাল স্মৃতি যুগে। সুতরাং স্মৃতিসম্মত বিধি নির্দেশ এই মহাকাব্যদ্বয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহার পরবর্তীকালে পুরাণগুলি রচিত হইয়াছে। পুরাণে স্মৃতিবিধানগুলি আরও বিস্তৃত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং মহাকাব্যদ্বয়ে নারী চরিত্রগুলির আদর্শ বহুলাংশে স্মৃতির বিধান অনুযায়ী গঠিত হইয়াছে। পুরাণগুলিতে এই আদর্শের বহুলতা লক্ষ্য করা যায়। লেখক ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অর্থসত আদর্শ নারীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাহাতে সকল নারীর পরিচয় পরিস্ফুট হয় নাই। এইজন্য পৃথকভাবে তিনি আরও কয়েকজন নারীর চরিত্র পরিচয় দিয়াছেন। লেখক প্রথমে প্রথম পর্যায়ভুক্ত কয়েকজন নারীর বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

এইরূপ একজন নারী হইতেছেন অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা। তাঁহার চরিত্রে সতীধর্মের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে। ঋষিগণ তাঁহার চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি স্বামীর অঙ্গচ্ছায়া তুল্যা। অশনে বসনে, ভূষণে আচরণে তিনি স্বামী অগস্ত্যের অনুগতা। পতিনির্দেশে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার কাছে স্বামী—দেবতা, গুরু, তীর্থ, ধর্ম ও ক্রিয়া। সেইজন্য স্বামীর সেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা। কায়মনোবাক্যে পতির সেবা করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করিয়া তিনি সীমন্তিনীকুলে 'ধর্মজ্ঞিনী' আখ্যা লাভ করিয়াছেন।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যানের শকুন্তলা চরিত্রে পাতিব্রত্যের সহিত সাহসিকতার দুরূহ সমন্বয় হইয়াছে। রাজা দুষ্মন্তের সহিত গান্ধর্ব মতে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, ইহা তাঁহার জীবনের মহৎ সত্য। কিন্তু লোকাপবাদ হেতু রাজসভায় রাজা তাহা অস্বীকার করিয়া শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। শকুন্তলার সত্যকে রাজা মিথ্যা বলিয়া তাঁহার চরিত্রে দুষণের কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। ইহাতে শকুন্তলা তাঁহার চরিত্র ধর্মের যে দার্ঢ্য এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তিনি সাহসের সহিত রাজার সঙ্গ সমুখ প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছেন এবং রাজার মিথ্যা ভাষণকে ধিক্কার দিয়াছেন। স্বামীর নিকট চরম আঘাত পাইয়াও তিনি বিমূঢ় হইয়া পড়েন নাই, অশেষ সাহসে

রাজার সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া আপন সতীধর্মের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। পরিশেষে রাজার ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া তাঁহার ধর্মপত্নী বলিয়া নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারতের অনেক নারী চরিত্রে এইরূপ দুর্লভ সাহসের পরিচয় আছে। তাঁহারা অপাপবিদ্ধা বলিয়াই জীবনের পরম সংকট কালেও এইরূপ ওজোময় সাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

অনুপম চারিত্রধর্মের আর একটি উদাহরণ সাবিত্রী। তাঁহার চরিত্রে পাতিব্রত্য, কর্তব্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি অনেকগুলি গুণের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। পিতৃ অনুমোদনে অভিলষিত পতিলাভের অন্বেষণে তিনি সত্যবানকেই বরণ করিতে চাহিয়াছেন। 'কন্যা বরয়তে রূপম্'—এই প্রচলিত রীতিতে তিনি সত্যবানকে আত্মনিবেদন করেন নাই। সত্যবানের নিষ্ঠা, পিতৃভক্তি ও স্থিত-প্রজ্ঞতাই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি যাঁহাকে পতিরূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, তিনি সর্বগুণ সম্পন্ন। ইহাতে যে তিনি লোকবৃত্তান্ত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন, তাহাই প্রমাণিত হয়। অতঃপর নারদের ভবিষ্যৎবাণী—সত্যবানের আয়ুষ্কাল বর্ষব্যাপী মাত্র—ইহাতেও তিনি বিচলিত হন নাই। পিতার সহস্র উপদেশেও তিনি দ্বিচারিণী হইতে চাহেন নাই, পরন্তু এই দ্বিচারিণীত্ব যে মহাপাপ তাহাই তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন। তারপর সত্যবানের মৃত্যুতে তাঁহার যে নির্ভীকতা, ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দেখা যায়, তাহা অতুলনীয়। তিনি যদি শুধুমাত্র পতিব্রতা হইতেন, তাহা হইলে তিনি স্বামীর সহিত সহমৃতাই হইতেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে অনন্যসাধারণ নারীর অনেকগুণ ছিল বলিয়া তিনি ধৈর্য হারান নাই এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মরাজের নিকট হইতে স্বামীর পুনর্জীবন বরলাভ করিয়াছেন। আবার এই দারুণ দুঃসময়েও তিনি কর্তব্যজ্ঞানকেও অটুট রাখিয়াছিলেন। তিনি ধর্মরাজের নিকট হইতে পিতা ও শ্বশুরের শুভ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

লেখক প্রথম পর্যায়ের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে সাবিত্রীকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। তাঁহার জীবনে সীতা বা দ্রৌপদীর মত নিষ্ঠাবিরোধী প্রলোভন আসে নাই সত্য, তথাপি তিনি যেরূপ দৃঢ় মনোবলের অধিকারিণী ছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ঐরূপ প্রলোভন আসিলেও তিনি তাহা সহজেই অতিক্রম করিতে পারিতেন। তাঁহার মত উন্নতচরিত্রা নারীর পক্ষে কোন প্রলোভন জয় করাই অসম্ভব নহে।

অতঃপর লেখক দ্বিতীয় শ্রেণীর নারী চরিত্রগুলি অঙ্কন করিয়াছেন। ইহাদের

মধ্যে দ্রৌপদী, দময়ন্তী ও সীতা প্রধান, শ্রীবৎসমহিষী চিন্তা ও ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারীও এই পর্যায়ভুক্ত। ইঁহারা সকলেই সহিষ্ণুতা ও সংযমের দ্বারা অশেষ চরিত্রবলের পরিচয় দিয়াছেন।

দময়ন্তী দেবতাদিগেরও পরিহার করিয়া মানুষ নলকে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাহার ফল স্বরূপ নানারূপ দুঃখভোগ করিয়াছেন। অহল্যা বিবাহিতা ও পুত্রবতী হইয়া যে প্রলোভন জয় করিতে পারেন নাই, কুমারী দময়ন্তী তাহা অনায়াসে জয় করিয়াছেন।

পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীও অপার সহিষ্ণুতাগুণে বড় হইয়াছেন। রাজ্যচ্যুত পাণ্ডবদের সহিত তিনি হাসিমুখে বনবাস যন্ত্রণা এবং দাসত্ব সহ্য করিয়াছেন। বনবাসে জয়দ্রথ এবং অজ্ঞাতবাসে কীচকের হস্ত হইতে তিনি আপন সতীত্বকে অপূর্ব কৌশলে ভীমসেনের সহায়তায় রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী মহাভারতে দুর্লভ। ভারত যুদ্ধের তিনি অন্যতম উদ্যোগী, অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে নিয়ত উত্তেজনা দিয়া তিনি পাণ্ডব পক্ষকে ধর্মযুদ্ধ সম্বন্ধে সজাগ রাখিয়াছেন। তাঁহার গৃহধর্মও অপূর্ব। তিনি পঞ্চ স্বামীরই মনোরমা হইয়া সতীলক্ষ্মী; তিনি ধর্মপরায়ণা ও দয়াশীলা। দুর্লভ গুণরাজির অধিকারিণী বলিয়াই তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে।

তবে এই শ্রেণীর নারীদের মধ্যে দুঃখে ও বেদনায়, সহিষ্ণুতা ও সংযমে সীতা চরিত্রই অদ্বিতীয়। শ্রীরামসান্নিধ্যে তিনি দুঃখকে নিত্যসঙ্গী করিয়াছেন, স্বেচ্ছায় বনবাস গ্রহণ করিয়াছেন ও অযোধ্যার রাজসুখকে তুচ্ছ করিয়াছেন। রাবণ সান্নিধ্যে তাঁহার চরিত্রের অপর দিক সমুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ত্রিভুবন জয়ী দশাননের প্রলোভন ও শাসন তাঁহার সতীধর্মকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। আবার লঙ্কা বিজয়ের পর স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া তিনি দারুণ মনঃকষ্ট পাইয়াছেন। অগ্নি পরীক্ষার সময় তিনি লোকসাক্ষী পাবকের নিকট আপন নিষ্কলুষতাকে যেভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। পরিশেষে বনবাস ও যজ্ঞ সভায় রামকর্তৃক আহ্বান, সীতা চরিত্রের মহত্ত্বকে আরও উজ্জ্বল করিয়াছে। অপ্রত্যাশিত বনবাসে বিমূঢ় হইয়া তিনি আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াছেন, কিন্তু স্বামী রামচন্দ্রের উপর কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই। যজ্ঞ সভায় পুনর্বার পরীক্ষাদানের আহ্বানে তাঁহার সতীত্ব ও নারীত্ব অভিমানাহত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে তাঁহার চরিত্রে সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে।

দুঃখের হোমানলে জীবনাহুতি দিয়া যাঁহারা পবিত্র ও ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সীতা ও সাবিত্রী অগ্রগণ্যা। কাব্য পুরাণের অনেক চরিত্রে নারী ধর্মের দুর্লভ গুণরাজি প্রকাশ পাইযাছে কিন্তু প্রতিকূলতার মধ্যে প্রতিষ্ঠা, প্রলোভনের মধ্যে সংযম, দুঃখবেদনার মধ্যে স্থৈর্য সকলের মধ্যে নাই। প্রতিকূল পরিবেশে সীতা ও সাবিত্রীর মধ্যে মানসিক বৃত্তি সমূহের যুগপৎ সমুন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা বরনারী রূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন।

বাল্মীকির জয় ।। ইহা একটি পৌরাণিক রূপক আখ্যায়িকা। কাব্যধর্মী প্রকাশ কলার জন্য ইহাকে গদ্যকাব্যের লক্ষণাত্মক বলা হইয়াছে—"বাল্মীকির জয় বাঙ্গালা তথা ভারতীয় সাহিত্যে এক নূতন ধরণের গদ্যকাব্যের প্রবর্তন করে। ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও এইরূপ গদ্যকাব্যের রীতি ক্রমশঃ দেখা দেয়। প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যানকে এইরূপ কল্পনোজ্জ্বল অথচ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা ভারতীয় সাহিত্যের পক্ষে একটি অভিনব ব্যাপার হইয়াছিল।"[৫৫] সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের এই রচনাটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকির জীবনচর্যায় এক আদর্শমণ্ডিত মহাপৃথিবীর কল্পনা ইহার ভাববস্তু। ঋভুগণের উদাত্ত সংগীতের 'ভাই ভাই' ধ্বনি সমগ্র পৃথিবী পরিমণ্ডলকে আপ্লুত করিয়াছিল। দিগ্বিজয়ী রাজা বিশ্বামিত্র, বিদ্যাবলে বলবান ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ও নরহত্যাকারী বাল্মীকি এই তিনজন সঙ্গীতের মর্মার্থ বুঝিয়া আত্মচিন্তায় আবিষ্ট হইলেন। বিশ্বামিত্রের স্বপ্ন বাহুবলে পৃথিবীজয়, তারপর সেখানে ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। বশিষ্ঠ বুদ্ধি ও শাস্ত্রের মাধ্যমে সর্বজাতির মিলন বাসনা করেন। শাস্ত্রধর্মে তিনি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে মিলন ঘটাইয়াছেন, এখন অন্যান্য জাতির মধ্যে কি মিলন করিতে পারিবেন না? আর বাল্মীকির অন্তর্দাহ। সহস্র মানুষের শোণিতপাতে যে মহাপাপের সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে কি এই মহামানবের কোন মিলন কল্পনা সম্ভব?

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিরোধে বিশ্বামিত্রের পরাজয়ের মধ্যে লেখক বাহুবলের ঊর্ধে বিদ্যাবলকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার মধ্য দিয়া ধর্মবলের প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিয়াছে। ক্ষুব্ধ বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে ব্রহ্মত্বের অধিকারী হইয়া নূতন পৃথিবী সৃজন করিলেন। এ এক স্বপ্নের মহাপৃথিবী—আশা, তৃষ্ণা ও আধিপত্য বিমুক্ত সুন্দর বাসস্থান। এই বিশ্বামিত্র এখন বশিষ্ঠ, তপোবল সিদ্ধ। তবুও বোধ হয়, তপোবলের একটি অহমিকা আছে। তাহাতেই তিনি আপন সৃষ্টির পরিপূর্ণতা রচনায় ব্যস্ত। 'সব হইল, কিন্তু সুখ কই?'—ইহাই বিশ্বামিত্রের

অপূর্ণতাজনিত বেদনা। সংবেদনশীল মানুষের জন্য তিনি কাতর হইলেন। পুরাতন পৃথিবীকে আবর্জন করিয়া তিনি আপনসৃষ্ট নূতন পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু নিঃশেষিত তপোবনে তাহা সম্ভব হইল না। মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার নূতন পৃথিবী মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। অবসন্ন বিশ্বামিত্রের মূর্ছিত দেহ পৃথিবীবক্ষে কৌশাম্বীর যজ্ঞ সভায় পতিত হইল। দস্যু ক্ষেত্রে বাল্মীকি অলৌকিক শক্তি বলে বিশ্বামিত্রকে চিনিতে পারিলেন। একটি বিরাট পুরুষের পতনে তাঁহার বীণায় করুণ মূর্ছনা জাগিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে সম্বিত ফিরিয়া পাইলেন। ব্রহ্ম, বশিষ্ঠ সাদরে বিশ্বামিত্রকে বরণ করিলেন। বিশ্বামিত্রের জন্মান্তর ঘটিয়াছে। অহংদীপ্ত এই মানবটি এতদিনে ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মত্বকে যথা-যোগ্য মর্যাদা দান করিলেন। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকির মিলনে রাজবল, তপোবল ও ধর্মবলের মিলন সংঘটিত হইল। বাল্মীকির সকরুণ বীণায় এই মহৎ মিলন সম্ভব হইল, তাই বাল্মীকির জয়।

এই বিরোধ ও মিলনের পশ্চাৎপটে রামকথা। রাম রাক্ষসদের ধ্বংস করিবেন, অধর্মকে উৎপাত করিবেন, অত্যাচারীকে নির্মূল করিয়া ধার্মিককে রক্ষা করিবেন। কিন্তু তাঁহাকেও হৃদয় হারাইলে চলিবে না। বাল্মীকির বীণা ক্ষত্রিয়ের তরবারিকে অতিক্রম করিবে। সেই জন্য রামের নিকট আবেদন।

বশিষ্ঠের ইচ্ছা রাম পরম ধার্মিক হইবেন, বিশ্বামিত্রের ইচ্ছা তিনি বীর ও রাজনীতিজ্ঞ হউন। বাল্মীকি তাহা শিরোধার্য করিয়া বলিলেন :

> আমি রামকে ধার্মিকও করিব না, বীরও করিব না, রাজনীতিজ্ঞও করিব না। স্বয়ং নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আদর্শ মানব হইবেন। তাঁহার চরিত্র বর্ণনাচ্ছলে আমি আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ দম্পতি, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ রাজা, আদর্শ শাসন প্রণালী, আদর্শ ভৃত্য ও আদর্শ শত্রু দেখাইব। আপনারা আশীর্বাদ করিলে, আমি এই উপলক্ষে এমন একটি মহৎ চরিত্র চিত্রিত করিব যাহাতে মনুষ্যজাতি, সর্বকালীন ও সর্বদেশীয় মানবগণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।[৫৯]

ইহাই রামচরিত—সর্বকালের মনুষ্যের আদর্শ মানব, ধরণী অবতীর্ণ নারায়ণ, ভালোমন্দ-মানবের ঊর্ধ্বে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত সর্বকালের উপাস্য।

শাস্ত্রী মহাশয় আরও একটু অগ্রসর হইয়াছেন; কবিই কাব্যের কল্পবৃক্ষ। রামের কাহিনীও কি মহৎ![৫] "একজন মানুষের জীবনের কথা।

এখনও আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, বলিয়া অভিমান আছে। ইহাতে মানুষ সুখী হইল কই? যখন এই অভিমান যাইবে, তখন সমস্ত পৃথিবীশুদ্ধ স্বর্গে যাইবে।"[৫৭] ইহাই বাল্মীকির প্রশ্ন। ব্রহ্মা প্রসাদে তিনি সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী হিরণ্ময়বপুঃ এক বিরাট পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। দেবদানব যক্ষ রক্ষ ব্রহ্মাদি সকলে তাঁহার মুখবিবরে নিরন্তর প্রবেশ করিতেছে, তাঁহার প্রতি রোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিলীন রহিয়াছে। ইহাতেই বাল্মীকির সত্যদর্শন পূর্ণ হইল। কাহারও মধ্যে কোন ভেদ নাই, কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, কোন 'অহং' নাই। বাল্মীকির বীণায় এই মহাঐক্যের সুর বাজিয়া চলিল, নিখিল বিশ্বে তাঁহার জয় ঘোষিত হইল।

এই রচনাটি শুধু শাস্ত্রী মহাশয়েরই নহে; সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। কল্পনার অভিনবত্ব, উপস্থাপনার কৌশল এবং কাব্যধর্মী প্রকাশ ভঙ্গীতে ইহার মৌলিকত্ব সূচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, "কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমাময়ী। ঋভুদিগের আগমন, বিশ্বামিত্রের অধঃপাত, কৌশাম্বীর যজ্ঞ, অন্তে বিরাট দর্শন —সকলই মহিমাময়ী কল্পনায় সমুজ্জ্বল। সর্বাপেক্ষা এই বিশ্বামিত্রই ভয়ানক মূর্তি। .... পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংরেজীতে সুশিক্ষিত হইয়াও প্রাচীন আর্য শাস্ত্রে অতিশয় সুপণ্ডিত, তাঁহার মানসিক শক্তির পরিপোষণে পাশ্চাত্য ও আর্য উভয়বিধ সাহিত্যই তুল্যরূপে প্রবেশ করিয়াছে।"[৫৮] বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকির আদর্শবোধের মধ্যে এক পূর্ণতম জীবন দর্শনের প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি বাল্মীকিকে জয়ী করাইয়াছেন। তিনি মূল রামায়ণের আদর্শ মানবত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, কিন্তু ইহার সহিত বিশ্বমৈত্রী ও মহাভ্রাতৃত্বের কল্পনা যোগ করিয়া মানবতার আদর্শকে মহৎ ব্যাপ্তি দিয়াছেন। তিনি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকির স্বতন্ত্র জীবনচর্যা অঙ্কন করিয়া বাল্মীকির আদর্শকে অপরূপ ভঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। স্বভাবনম্র ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের মধ্যে শাস্ত্র ধর্মের একটু অহমিকা আছে। তবে ইহা বাহুবলের আস্ফালন হইতে উৎকৃষ্ট। বশিষ্ঠের জয়লাভ রাজসিক নহে, সাত্ত্বিক। সেইজন্য ইহার কোন ঘনঘটা নাই। অপর পক্ষে বিশ্বামিত্রের জিগীষা পূর্ণ অহংদীপ্ত। তাঁহার প্রতিটি পদক্ষেপ ক্ষাত্রধর্মোচিত, প্রতিটি আয়োজন রাজসিক, প্রতিটি তপশ্চর্যা অভ্রংলিহ অহংকে তুলিয়া ধরার সাধনা। হরপ্রসাদ অঙ্কিত বিশ্বামিত্র চরিত্রের তুলনা নাই। একমাত্র মাইকেলের রাবণ ভিন্ন বাংলা সাহিত্যে বোধ করি তাঁহার সমকক্ষ চরিত্র আর নাই। ব্রহ্মজ্ঞ বশিষ্ঠের তিনি যোগ্য

প্রতিদ্বন্দ্বী, স্রষ্টা বিধাতার দুঃসাহসিক প্রতিযোগী, নূতন সৌরজগৎ ও নূতন পৃথিবীর স্রষ্টা। বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিযজ্ঞকে লেখক অপূর্ব সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যোগবলে নীহারিকাপুঞ্জকে একত্র করিয়া তিনি তাহাতে গতি সঞ্চারিত করিলেন। তাহাতে ইহার পরমাণুরাশি জ্বলিয়া উঠিল :

"কিয়ৎক্ষণ জ্বলিতে থাকিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'বুধ হউক', অমনি সেই ঘূর্ণ্যমান জ্বলন্ত পদার্থ হইতে একখণ্ড বাহির হইয়া গিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহারই চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল এবং ক্রমে শীতল হইয়া বুধগ্রহ রূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, বুধ উত্তম হইয়াছে। অনন্তর কহিলেন, 'শুক্র হউক', অমনি সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর একখণ্ড ছুটিয়া গিয়া দূরে উহারই চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, শুক্র উত্তম হইয়াছে। আবার বলিলেন, 'পৃথিবী হউক'। অমনি আবার সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর একখণ্ড ছুটিয়া গিয়া পাহাড় পর্বত নদ নদী দ্বীপ সাগরবর্তী পৃথিবীরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না।"[৫৯] এই বিশ্বামিত্রের অভ্যুদয় ও পতনের মধ্যে এক বৈশ্বিক বিধানই বলবৎ হইয়াছে। ইহাই সৃষ্টির শাশ্বত নিয়ম। বাহুবলে মহাশক্তির অধিকারী হওয়া যায় না, তপোবলও অসিদ্ধ যখন তাহা অহংমুখী হয়। একমাত্র হৃদয় বলই সৃষ্টিকে সুন্দর করিতে পারে। তপোবল-সিদ্ধ দ্বিতীয় বিধাতা বিশ্বামিত্র সৃষ্টি বিধানে এক ভাগ্যাহত প্রকাণ্ড পুরুষ।

তিন মহর্ষির মিলনে রামায়ণ কাব্যের পরিকল্পনার মধ্যে লেখক রামায়ণের তাৎপর্যটি ব্যক্ত করিয়াছেন। রামায়ণ যে নবচন্দ্রমার কাব্য, রামচন্দ্র যে শুধু বীর্য বা ক্ষমার অবতার নহেন বাল্মীকির কথায় তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

অতঃপর রামায়ণের হৃদয়ধর্ম ও মানবতাকে চিরকালের অভিষ্ট বলিয়া তিনি ইঙ্গিত দিয়াছেন। বাল্মীকির বীণা চিরদিনের মানুষকে পূর্ণতম সত্যোপলব্ধির দিকে আকৃষ্ট করিবে। অনাগত পৃথিবীর যেখানে মহামৈত্রী ও মহাভ্রাতৃত্ব সেই দিকে মানুষ অতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে।

সর্বোপরি ইহার কাব্যময় প্রকাশ। অভিনব কল্পনার উপযোগী প্রকাশ কলায় ইহার শব্দ ও ব্যঞ্জনা অপূর্ব সহিতত্ব লাভ করিয়াছে। ইহার ছত্রে ছত্রে কাব্যসুষমা পরিস্ফুট। খণ্ডান্তর্গত সংখ্যা চিহ্নিত অংশগুলি স্বতন্ত্রভাবেই গীতিকাব্যের মূর্ছনা সমৃদ্ধ। গদ্য যে কিরূপ কাব্যধর্মী হইতে পারে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বহুপূর্বেই তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃতি পরিচর্যায় সাময়িক পত্র

বঙ্গদর্শন ॥ প্রতি যুগের সমাজচিন্তা সমকালীন পত্র পত্রিকাতেই বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের উত্তপ্ত সমাজচিন্তাগুলি এই যুগের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সমাজতত্ত্ব, ধর্ম ও নীতির পর্যালোচনা, নানা পথ ও মতের বিশ্বাস কলহ এই পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে। মৌলিক কিছু আলোচনা করা অপেক্ষা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহের মুখপত্র হিসাবে এইগুলির ব্যবহার হইয়াছে বেশী। মিশনারীরা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিয়াছিল, রামমোহন ও ভবানীচরণ তাহার উত্তর দিয়াছেন 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায়। ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র সংবাদ পরিবেশনা ও কৌতুক রসাত্মক সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরালে প্রাচীন রক্ষণশীলতাই সমর্থিত হইয়াছে। আর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় উচ্চকোটির প্রবন্ধ ও রচনা প্রকাশিত হইলেও তাহা ত পুরোপুরিই ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বলিতে গেলে 'বঙ্গদর্শন' হইতেই বাংলা সাময়িক পত্রিকার গতি পরিবর্তিত হয়। ধর্ম, সমাজ বা অন্যান্য সাময়িক চিন্তাধারার পরিচয় দিতে গিয়া ইহা সমস্ত পরিবেশনকে একটি সৃজনধর্মী রচনায় পরিণত করিয়াছে। ইহাই বঙ্গদর্শনের অনবদ্য কৃতিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রধানতঃ তাঁহার উপন্যাস ও রম্য প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইলেও ইহার লেখক-বৃন্দকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনায় উৎসাহিত করিয়াছেন এবং তাঁহারাও নানা দিক হইতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উদ্দীপনা (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯) প্রবন্ধে ভারতীয় মহাকাব্য রচনার পশ্চাৎ প্রেরণার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। একটি প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল বলিয়াই নিস্তরঙ্গ ভারতীয় জীবনে মহাকবি এক শক্তি ও বীর্যের অন্বিত ক্রিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দেবতত্ত্ব (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮১। বৈশাখ ১২৮২) প্রবন্ধে বৈদিক যুগ হইতে পৌরাণিক যুগের দেব বিবর্তনবাদ আলোচিত হইয়াছে। ইহার সহিত পৌরাণিক আখ্যানগুলির তাৎপর্যও বিশ্লেষিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া শিবের উপাসনা কিভাবে সমাজে গৃহীত হইয়াছে, লেখক তাহার সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। বিবিধ প্রমাণ সাহায্যে তিনি উপস্থাপিত করিয়াছেন যে শৈব উপাসনা অনার্য ভাবাপন্ন। বিজিত অনার্য

সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য থাকিলে শিবের সমাদর বাড়িয়া চলে। বৈদিক রুদ্র ভয়ঙ্কর প্রতাপে আর্য সমাজে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্য সম্প্রদায়ের শিব কল্পনা সংযুক্ত হইল। জড় জগতের নিয়ামক হিসাবে দেবোপাসনা এবং জীবজগতের উৎপত্তি ব্যপদেশে লিঙ্গোপাসনা পৃথিবীর দুইটি প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতি। আর্যের রুদ্র কল্পনায় দেবোপাসনার সহিত অনার্যের শিবকল্পনায় লিঙ্গোপাসনা মিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষে শৈব উপাসনার ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। 'মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব কিসে হয়' (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯) প্রবন্ধটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। ইহাতে তিনি গ্রীস, রোম ও আরবের উন্নতি লাভের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন মহত্ত্বের হেতু নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ সমাজের নিরতিশয় জ্ঞানতৃষ্ণাই প্রাচীন ভারতবাসীদিগের মহত্ত্বের একমাত্র কারণ এবং কলিধর্মে ব্রাহ্মণেরা মতিচ্ছন্ন হইবার পর এদেশের অধঃপতন শুরু হইয়াছে। হেমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত হইল প্রতিটি দেশের একটি জাতীয় প্রবৃত্তি বা প্রবণতা আছে, উহাই তাহার উন্নতির কারণ। ব্রাহ্মণের জ্ঞান তৃষ্ণা ভারতবাসীর জাতীয় প্রবৃত্তি ছিল, ইহাতেই তাহাদের উন্নতি হইয়াছিল। বর্তমান কালে ভারতবর্ষে বহুজাতি, বহুভাষা ও বহুধর্মের মধ্যেও যদি সম্যক্ উপযোগী একটি প্রবৃত্তির সূচনা হয়, তাহাতে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' একটি উল্লেখযোগ্য পুরাতত্ত্ব বিষয়ক রচনা। ইহা বঙ্গদর্শনে (১২৮০, ৮১, ৮২) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ রচনাটিতে লেখক রামায়ণের 'প্রথম দুই কাণ্ড অবলম্বন করিয়া, প্রথমতঃ তৎসময়ে ভারতের কোন কোন ভূভাগ আর্যগণের পরিচিত ছিল, কাল পরিবর্তনে তাহাদের কিরূপ অবস্থান ও নাম পরিবর্তন হইয়াছে এবং অতি পুরাতন সময়ে উহারা কোন বিশেষ নামধারী ও কিরূপ ছিল', তাহার বিবরণ দিয়াছেন। অতঃপর ইহাতে তৎকালীন জ্ঞানোন্নতি, রাজধর্ম, রাজন্যবর্গ, ব্রাহ্মণবর্গ, বৈশ্যবর্গ ও সামরিক ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। রচনাটির মধ্যে প্রাচীন ভারতের বহু ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক তথ্য নিহিত আছে। লালমোহন শর্মার 'ভারতবর্ষীয়দিগের আদিম অবস্থা' (বঙ্গদর্শন, ১২৮০, ৮১) শীর্ষক ধারাবাহিক রচনাটি প্রাচীন ভারতের আর্য জাতির পরিচয় জ্ঞাপক একটি যুক্তিপূর্ণ আলোচনা। 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮০) প্রবন্ধে তিনি বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে রামদাস সেনের রচনাগুলিও বঙ্গদর্শনকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা

দিযাছে। প্রাচীন ভারতের বিবরণ বিশেষতঃ বেদ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক রহস্যের অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রথমে বঙ্গদর্শনেই প্রকাশিত হইযাছে। বস্তুতঃ পুরাতত্ত্ব বিষয়ক রচনাতে বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ইহা ছাড়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'ভারত মহিলা'র বিষয় আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রত্যাখ্যাত রচনাটি বঙ্কিমই সাদরে বঙ্গদর্শনে (মাঘ—চৈত্র, ১২৮২) স্থান দিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় আরও অনেকগুলি রচনা পাওয়া যায়, যেগুলির লেখক পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এইরূপে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত লেখকবৃন্দের বহুতর সৃষ্টিতে বঙ্গদর্শন সংস্কৃতি পরিচর্যার ইতিহাসে পথিকৃতের কাজ করিয়াছে।

ত্রয়ী পত্রিকা ॥ সাধারণী—নবজীবন—প্রচার

সাধারণী ॥ রাজনীতি ও সংবাদ পরিবেশনার দায়িত্ব লইয়া অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া হইতে 'সাধারণী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছিল—"ইহা সাধারণের পাঠ্য পত্র, সাধারণের লেখনী, সাধারণের জিহ্বা—তাহাতেই ইহা সাধারণী।"[৩০] তবে সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট হইলেও ইহাতে কোন লঘু রচনা প্রকাশিত হইত না। ইহা তৎকালীন যুগের ঘটনা ও চিন্তাকে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত করিয়াছে। রাজনীতি ও সাহিত্য—উভয়দিকেই সাধারণীর লক্ষ্য ছিল। তবে ইহাতে কোন ধর্মীয় চিন্তাধারা প্রাধান্য পায় নাই। সামাজিক সংস্কার, আইন ঘটিত পর্যালোচনা, স্থানীয় সমস্যা ও তাহার দূরীকরণের প্রস্তাব ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ইহাতে আলোচিত হইত। এইজন্য অক্ষয়চন্দ্র ধর্মচিন্তা ও নীতি ধর্ম সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই 'নবজীবন'। অক্ষয়চন্দ্রের চিন্তাচেতনার বহুলাংশ এই নবজীবন পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

নবজীবন ॥ ১২৯১ সালের শ্রাবণ হইতে অক্ষয়চন্দ্র নবজীবন পত্রিকাখানি প্রকাশ করিতে সুরু করেন। ইহার প্রথম সংখ্যায় সূচনার মধ্যে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। সেখানে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে পুরাণে ইতিহাসে দেবতত্ত্বে বা সমাজতত্ত্বে সর্বত্রই বাহ্যরূপের গভীরদেশে একটি অন্তরস্তরের অবস্থিতি আছে; সেখানেই সমস্ত বিষয়ের যথার্থ তাৎপর্য নিহিত আছে। সেই অন্তরস্তরের আভাস না পাইলে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। "সেই মূলীভূত

সারস্তরের কথা উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সেই বিশাল মহান আশ্রয় স্তরের নাম ধর্ম :...... নিয়মিত রূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চর্চা করিয়া আমরা আপনারাও বুঝিব এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে।"[৬১] যে বিচার-প্রবণ দৃষ্টিভংগীতে বিষয়বস্তুর অন্তস্তলে পৌঁছাইতে হয় তাহা অক্ষয়চন্দ্রের মতে বঙ্গদর্শনেই সূচিত হইয়াছে। তাঁহার নবজীবন এই দৃষ্টিভংগীর সহিত একটি ধর্মচেতনাকে আবশ্যিক আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে।

বঙ্গদর্শনের মত নবজীবনেরও লেখকগোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। অক্ষয়চন্দ্র সেই যুগের প্রবীণ ও নবীন শ্রেষ্ঠ লেখকবৃন্দের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর পাঁড়ে, রামগতি মুখোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব শর্মা প্রভৃতি কৃতী লেখকবৃন্দ ইহাতে নিয়মিত লিখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম জিজ্ঞাসা, মনুষ্যত্ব, অনুশীলন, সুখ, ভক্তি প্রভৃতি ধর্মতত্ত্বের প্রবন্ধগুলি ইহাতে প্রকাশিত হয়। চন্দ্রনাথ বসুর হিন্দুধর্ম সম্পর্কীয় বহু আলোচনা ইহাতে নিয়মিত প্রকাশিত হইত। ইহার প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নাম না থাকায় গ্রন্থভুক্ত রচনা ছাড়া অন্যগুলির রচয়িতা নির্ধারণ করা বিশেষ আয়াসসাধ্য। তবে বিভিন্ন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটি ঐক্য ছিল। রচনাগুলি বঙ্কিম গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের স্বধর্মানুরাগ ও ঐতিহ্যপ্রীতিকে প্রকাশ করিতেছে। নবজীবনের বিভিন্ন সংখ্যার প্রবন্ধসূচী দেখিলেই এবিষয়ের যথার্থতা প্রতিপন্ন হইবে।

'প্রচার'। নবজীবনের পনের দিন ব্যবধানে 'প্রচার' পত্রিকার আবির্ভাব হয় (শ্রাবণ ১২৯১)। প্রচারের প্রথম সংখ্যার সূচনাতে লিখিত হইয়াছে, "সাময়িক পত্রই প্রাচীন জ্ঞান এবং নূতন ভাব প্রচার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এইজন্যই আমরা সর্ব সাধারণ সুলভ সাময়িক পত্রের প্রচারের ব্রতী হইয়াছি। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সময়ে 'নবজীবন' নামে অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চদরের সাময়িক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সেই মহদৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া এই ব্রত পালন করিতে যত্ন করিব। সত্যধর্ম এবং আনন্দের প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম এবং সেইজন্যই ইহার ইহার নাম দিলাম 'প্রচার'।"[৬২] প্রচারের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইলেও ইহার নেপথ্য নায়ক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র শেষজীবনে হিন্দু ধর্মের গভীরে আত্মনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং

বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত সর্বাত্মক ধর্মের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নবচিন্তার মাধ্যম হইল 'প্রচার' এবং 'নবজীবন'। নবজীবনের পৃষ্ঠায় তিনি অনুশীলন ধর্ম তথা ধর্মতত্ত্বের সূত্রগুলি আলোচনা করিতেছিলেন এবং প্রচারের মধ্যে তাঁহার যুগান্তকারী রচনা 'কৃষ্ণ চরিত্র' প্রকাশিত হইতেছিল। তাঁহার শেষ উপন্যাস 'সীতারাম'ও প্রচারে প্রকাশিত হইয়াছে। গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের ভিত্তিতে তিনি ইহার কায়াগঠন করিয়াছেন। প্রচারের তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রকাশিত হয়। বলিতে গেলে এই পত্রিকাটিই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিন্তাকে স্পষ্টরূপ দিতে চাহিয়াছে। বঙ্গদর্শন ও নবজীবনের মত ইহার লেখককুলের অধিকাংশই অনুল্লেখিত রহিয়া গিয়াছেন। তবে কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কয়েকজন লেখকের নামাঙ্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ ইহাতে আছে। নবজীবনের মত ইহার সাহিত্যিক গোষ্ঠী প্রবল নহে এবং একা বঙ্কিমের ত্রিপাদবিস্তারে অন্য সকলেই আচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ চরিত্র ছাড়া ঈশ্বরোপাসনা, ঈশ্বরতত্ত্ব, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কীয় আলোচনা, প্রবৃত্তিধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ইহাতে বর্ষানুক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। তবে প্রথম বৎসরের অতিরিক্ত ধর্মৈষণা পরবর্তী বৎসর হইতে কিছুটা হ্রাস পায়। ইহার জন্য সম্পাদকের কৈফিয়ৎ ছিল : "যখন প্রচার প্রথম প্রকাশ হয়, তখন আমাদের এমন অভিপ্রায় ছিল না যে প্রচার কেবল ধর্ম বিষয়ক পত্র হইবে। কিন্তু প্রচারের লেখকদিগের রুচির গতিকে, বিশেষতঃ প্রধান লেখকের অভিপ্রায় অনুসারে, ইহাতে এক্ষণে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভিন্ন আর কিছু থাকে না। ইহাতে প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ....অতএব আগামী বৎসরে যাহাতে প্রচার বিচিত্র ও বহু বিষয়ক হয়, আমরা তাহা করিবার উদ্যোগী হইয়াছি।"[৬৩] তবে প্রচারে বিষয় বৈচিত্র্যের আয়োজন থাকিলেও তাহা ধর্ম বিষয়ক মূল কেন্দ্রভূমি হইতে কোনদিনই বিচ্যুত হয় নাই।

হিন্দু সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ধারক : বঙ্গবাসী ও অন্যান্য সাময়িকী ॥

বঙ্কিম প্রভাব বহির্ভূত হিন্দু সংস্কৃতি পোষক সংবাদ পত্রগুলির কথা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। ইহাদের প্রতিনিধি স্থানীয় হইল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা (১৮৮১ খ্রীঃ)। ইহার প্রথম সম্পাদক হইলেন জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, কিন্তু প্রকৃত কর্ণধার ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। বাংলা দেশে যে কয়েকটি পত্র পত্রিকা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে, বঙ্গবাসী তাহাদের অন্যতম। বলিতে গেলে বঙ্গবাসী একটি নূতন

চিন্তাধারারই সূচনা করিয়াছিল। হিন্দুধর্মের রক্ষণার ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া ইহা অপ্রতিহতভাবে সমাজকে নীতিশিক্ষা দিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি শক্তিশালী রক্ষণশীল চেতনার প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং বঙ্কিম তিরোধানের পরও তাহা একান্ত সক্রিয় থাকিয়া বাংলার নৈতিক গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। আমাদের প্রাচীন ধর্ম ও নীতি, আচার ও সংস্কার সব কিছু নির্বিবাদে তুলিয়া ধরাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য বঙ্গবাসী মুদ্রাযন্ত্রও সুবিপুল কাজ করিয়াছে। প্রাচীন পুরাণ শাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ও স্মৃতি তন্ত্রাদির বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র তথা বঙ্গবাসী কার্যালয় বঙ্গবাসীর যথার্থ হিতসাধন করিয়াছে। হিন্দু সংস্কৃতি পোষণে 'বঙ্গবাসী'র আক্রমণাত্মক নীতির কথা আলোচনা করিয়া নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবনে' উল্লেখ করিয়াছেন: "পূজার্হ রামমোহন রায়ের মত 'বঙ্গবাসী'ও আর একবার দেশরক্ষা করিয়াছে। আমরা যেরূপ ইংরেজী সভ্যতার স্রোতে বিজাতীয় পথে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, বঙ্গবাসী চাবুক পিটাইয়া তাহার গতি কথঞ্চিৎ প্রতিরোধ করিয়াছে। সমাজ সংস্কারের যেমন প্রয়োজন, যাহাতে সংস্কারের শ্রাদ্ধটা গড়াইতে না পারে, তাহার জন্য একটা চাবুক প্রয়োজন। বঙ্গবাসী সে চাবুকের কাজ করিতেছে।"[৬৪] অবশ্য নবীনচন্দ্র বঙ্গবাসীর গোঁড়ামীকে নিন্দাই করিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীর অন্ধ বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়া ইহা দেশের ক্ষতি করিতেছিল, ইহাই তাঁহার অভিমত ছিল, তথাপি ইহা যে জাতীয় জীবনে একটি প্রবল প্রতিরোধের কাজ করিয়াছে, তাহা নবীনচন্দ্র ঠিকই অনুধাবন করিয়াছিলেন।

হিন্দু সংস্কৃতিকে পোষণ করিয়া এই যুগে আরও অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় আর্য দর্শন (১৮৭৪), দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় হিন্দুরঞ্জন (১৮৭৪), বিধুভূষণ মিত্রের সম্পাদনায় হিন্দু দর্শন (১৮৮০), শশীভূষণ বসুর সম্পাদনায় ধর্মবন্ধু (১৮৮১) প্রভৃতি পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। ইহারা সমাজের মধ্যে বিশেষ যুগান্তকারী আলোড়নের সৃষ্টি না করিলেও স্বল্প শক্তি লইয়া বহুদিন ব্যাপী দেশের মধ্যে সনাতন ধর্মাদর্শের ধারাটি তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছে।

বঙ্কিম প্রভাবিত সাময়িক পত্রগুলির সহিত ইহাদের একটি তুলনা করা যায়। হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব প্রচার করা ইহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বা অনুবর্তী লেখকগণ এই সার সন্ধান করিতে গিয়া কিছুটা সংস্কার মার্জনার আশ্রয় লইয়াছিলেন। বঙ্কিমের নিজস্ব আলোচনাগুলিতে হিন্দুধর্মের সংস্কার ও বিশুদ্ধি-

করণের নির্দেশ পাওয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্র বা চন্দ্রনাথের মধ্যে অতখানি নিরপেক্ষতা দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া তাঁহাদের আলোচনাগুলি কথঞ্চিৎ মাত্রায় উগ্র। তবে তাঁহারাও সংস্কারপন্থী ছিলেন। সংস্কারের মধ্যে সংরক্ষণ—ইহাই ছিল বঙ্কিম গোষ্ঠীর মুখপত্রগুলির উদ্দেশ্য। কিন্তু বঙ্গবাসী গোষ্ঠী বা সমশ্রেণীর পত্রিকাগুলির কর্ণধারগণ সংস্কারকে কোনরূপ প্রাধান্য দিতে চাহেন নাই। হিন্দু ধর্ম চিহ্নিত যাহা কিছু তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহাকেই তাঁহারা শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। লোকাচার ও লোক বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়া তাঁহারা নবযুগের উপযোগী কোনরূপ উদার ধর্ম জিজ্ঞাসার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্ম পত্রিকা ও হিন্দু ধর্ম : সঞ্জীবনী ও নব্য ভারত ॥

এই যুগের কয়েকটি ব্রাহ্ম পত্রিকা তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে আক্রমণ করিয়াছে। প্রতিবাদের প্রয়োজনে ইহাদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে সঞ্জীবনী (১৮৮৩) এবং নব্যভারতের (১৮৮৩) ভূমিকা প্রবল। সঞ্জীবনী পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ইহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, গগনচন্দ্র হোম ও পরেশনাথ সেন। সঞ্জীবনীর ভূমিকা ছিল আক্রমণাত্মক। সনাতন হিন্দু সংস্কারকে নানাদিক হইতে আক্রমণ করাই ছিল ইহার লক্ষ্য।

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে নব্যভারতের গুরুত্ব বড কম নহে। ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। বঙ্গদর্শনের পর ইহার মত সর্বাত্মক প্রভাবশালী পত্রিকা আর ছিল না। সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইহা দেশের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম নীতি ও সাহিত্য পরিবেশন করিয়াছে।

নব্য ভারতের প্রথম সংখ্যার (জ্যৈষ্ঠ ১২৯০) সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে : "নব্য ভারত নববেশে দেশে নবযুদ্ধ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সময়ে যদি কেহ অগ্রসর হইয়া 'নব্য ভারতের গুপ্ত অস্ত্র কি' একথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমরা তাহাকে নির্ভয়চিত্তে বলিব—নব্যভারতের এক হস্তে পবিত্রতা, অন্য হস্তে উদারতা—মস্তিষ্কে জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তা, হৃদয়ে প্রেম—আর সমস্ত শরীরে ওতঃপ্রোতভাবে মানবের রাজা স্বয়ং ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। নব্যভারতের শক্তির পরিমাণ কে করিতে অগ্রসর হইবে? ভারতের পূর্বস্মৃতি ভারতকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে—ঈশ্বর বিশ্বাসই সকল শক্তির মূল।"[৬৫]

সুতরাং দেখা যায়, নব্যভারত একটি সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নূতন যুগের জ্ঞান ও চিন্তা পরিবেশনের সহিত যে একটি স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, নব্যভারত তাহাই দেখাইয়াছে। বঙ্গদর্শন যেমন একদিন বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে ভাবের আলোড়ন তুলিয়াছিল, নব্য ভারতও তেমনি বিকল্প রূপে স্বাধীন চিন্তা উদ্বোধনে বাঙ্গালী সমাজকে চমকিত করিয়াছে। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ সেন, আনন্দচন্দ্র মিত্র, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব শর্মা, শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি মনীষী লেখক-বৃন্দ ইহার লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহার বহুমুখী বিষয়সূচীর মধ্যে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন ও ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নব্য ভারতের মতামত সমালোচনাপূর্ণ ছিল। আমরা কয়েকটি প্রবন্ধ হইতে ইহার নিদর্শন দেখাইতেছি।

হিন্দু ধর্মের বহু প্রচলিত পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে নব্য ভারত আলোচনা করিয়াছে। এই বিষয়টির উপর শতাব্দী ধরিয়া তুমুল তর্ক চলিয়াছে। নব্য ভারত 'ভারতে পৌত্তলিকতা' প্রবন্ধে সেই বিতর্কে নিজস্ব ভঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত এইরূপ :

> ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারেন না, ঐরূপ কল্পনাই অসম্ভব। জ্ঞান তাঁহাকে পাইবার পথ পরিষ্কার করে, প্রেম তাঁহাকে নিকটবর্তী করে, বিশ্বাসে তাঁহাকে দেখা যায়, এবং বিবেকে তাঁহার আদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবান অতীন্দ্রিয়, তৃণ কাষ্ঠ মৃত্তিকা বা প্রস্তরে তাঁহার আকৃতি নির্মাণ করিয়া তাহাতে মানুষী ধর্ম আরোপ করা ধর্মের ঘোর ব্যভিচারিতা বই কিছুই নহে।[৬৬]

নব্য ভারতে 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনার উপর কটাক্ষ বর্ষিত হইয়াছে। ইহার লেখক 'মীমাংসা প্রার্থী' নামে অবতীর্ণ হইয়াও প্রবল প্রতিবাদীরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শশধর তর্কচূড়ামণি বা বঙ্কিমচন্দ্র কাহারও ধর্মব্যাখ্যাকে লেখক সমর্থন করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমের আলোচনায় তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও লেখক বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসা (নব জীবনে প্রকাশিত) প্রবন্ধটিকে যুক্তিহীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

একথা ঠিক, সঞ্জীবনী বা নব্য ভারত একটি আক্রমণাত্মক ভূমিকা লইয়াছিল। ব্রাহ্ম আন্দোলনের শেষ ধারায় এই পত্রিকাগুলি পুরাতন কর্মসূচীকেই স্বশক্তিতে বহন করিতেছিল। সেইজন্য সময় ও সুযোগ পাইলেই ইহারা হিন্দুধর্মের আচার সংস্কারকে রূঢ় সমালোচনা করিয়াছে। তবে ইহাও সত্য যে, এই আক্রমণাত্মক

কর্মধারার সহিত প্রচুর সৃষ্টিধর্মী কাজও চলিয়াছে। দেশজীবনের সংস্কার বন্ধনের নিকট ইহারা এক উদার প্রতিশ্রুতির আহ্বান জানাইয়াছিল বলিয়া ইহাদের প্রভাব এতখানি গভীর হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া 'নব্যভারত' সাহিত্যে ও সমালোচনায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে বহু সারগর্ভ সৃষ্টি উপহার দিয়াছে। নব্যভারত তর্ক বিতর্কের অবকাশে ধর্ম ও সংস্কারের স্থায়ী মীমাংসা দিয়াছে :

> এক ধর্মের দ্বারাই সকলের বিচার করিতে হইবে। কারণ ধর্মই মানব জীবনের লক্ষ্য। মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্যই জনসমাজের সৃষ্টি। যদি সমাজ মানবাত্মার উন্নতির অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হয়, যদি সামাজিক প্রথাসকল এরূপ হয় যে, তন্মধ্যে বাস করিয়া ধর্ম ও ন্যায় রক্ষা করা দুষ্কর, তাহা হইলে সে সমাজ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী সমাজ, তাহা মানবাত্মার বাসযোগ্য নহে।[৬৭]

কিংবা উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর বিশ্বাসে শিথিলতার সম্বন্ধে ইহার কোন প্রবন্ধে যথার্থ আলোচিত হইয়াছে :

> ঈশ্বর দর্শনের স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় আছে। সেই ইন্দ্রিয় বা বৃত্তি বা ভাব যতক্ষণ পর্যন্ত লোকের হৃদয়ে অবস্থাক্রমে ফুটিয়া না উঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে সে কিছুতেই পারিবে না। সহস্র দার্শনিক যুক্তি দেও, তোমার যুক্তি তাহার অলীক বোধ হইবে।[৬৮]

ইহাই নব্যভারতের পথ নির্দেশ। সংশয় ও সংস্কারের মধ্যে একটি ঈশ্বর অনুজ্ঞা অনুভব করিলে সমূহ বাহ্য কোলাহলকে সহজে অতিক্রম করা যায়, এই বিশ্বাসটি অন্ততঃ নব্যভারত অনুসরণ করিয়াছে এবং হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও তাহা উপেক্ষণীয় নহে।

উনবিংশ শতাব্দীর গদ্য সাহিত্য বাঙ্গালীর মননশীলতার অপূর্ব নিদর্শন। শতাব্দীর প্রথম হইতে যে তত্ত্বদর্শনের ব্যাখ্যা শুরু হয়, তাহা শেষের দিকে আরও গভীর ও সূক্ষ্ম হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম দিকে বেদান্তের অনুশীলনই অধিক হইয়াছে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবক্তাবৃন্দ বিভিন্নভাবে বেদান্ত ও উপনিষদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব হ্রাসের পর হিন্দু সংস্কৃতির যে নবজাগৃতি সুরু হয়, তাহার সমান্তরালে সনাতন হিন্দু ধর্ম তথা ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম মনীষী ও নেতৃবৃন্দের দ্বারা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী হইল যুক্তি নিষ্ঠা, উপাদান হইল ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, উদ্দেশ্য হইল পরিবর্তমান দেশকালে ধর্ম ও

সংস্কৃতির যথাযথ মূল্যায়ন। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই যুগের সার্থক প্রতিনিধি বলা যায়। পৌরাণিক প্রজ্ঞার অধিকারী হইয়া এবং ভারত ধর্মের উপর সুগভীর আস্থা রাখিয়া তিনি নবযুগের জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একটি শক্তিশালী লেখক গোষ্ঠী গ্রহপতি বঙ্কিমকে ঘিরিয়া আপন আপন কক্ষপথে আবর্তন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। তবে বঙ্কিমের যে সুতীক্ষ্ণ মননশীলতা, তাহা অনেকের মধ্যেই অভাব ছিল। অক্ষয়চন্দ্র ও চন্দ্রনাথের মধ্যে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শনরূপে প্রতিভাত হইয়াছে এবং তাঁহাদের যুক্তি তর্কও সকল সময় সংস্কারমুক্ত ছিল না। বঙ্কিম গোষ্ঠীর বাহিরে ধর্মবেত্তা ও চিন্তানায়করূপে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ভারতীয় ধর্মের আসল রূপটি সুন্দর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি হিন্দুধর্মের সুবিপুল ক্ষেত্র বাহু বিস্তার করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার নিকট বৈদান্তিক চিন্তা ও পৌরাণিক চিন্তার কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। পরিশেষে, সমকালীন সাময়িক পত্রের আলোচনাগুলিও লক্ষ্যণীয়। চলমান সমাজ জীবন যাহা গ্রহণ বা বর্জন করিতে চাহিয়াছে, তাহারই বিবরণ রহিয়াছে এই সাময়িকীগুলিতে। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কীয় নানা আলোচনা, দর্শন ইতিহাস পুরাতত্ত্বের প্রচুর গবেষণা ও একটি মনন ও চিন্তন সমৃদ্ধ মনোভঙ্গী সৃষ্টি করাই ইহাদের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং বিভিন্ন দিক হইতে এই পর্যায়ের গদ্য সাহিত্য দেশ ধর্ম ও সমাজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে এবং অবশ্য অনুসরণীয় রূপে জাতিকে একটি ঐতিহ্যানুগ পথের নির্দেশনা দিয়াছে॥

—পাদটীকা—

১। সামাজিক প্রবন্ধ—ভূদেব রচনা সম্ভার। প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত। পৃঃ ১৩৯—৫০
২। ঐ পৃঃ ১৫২—৫৫
৩। ঐ পৃঃ ১৫৪
৪। ঐ পৃঃ ৫৫
৫। ঐ পৃঃ ১১২
৬। আচার প্রবন্ধ, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৮

৭। পুষ্পাঞ্জলি—ভূদেব রচনা সম্ভার পৃঃ ৩১২
৮। ঐ পৃঃ ৪১৪
৯। ঐ পৃঃ ৪২৪
১০। ঐ পৃঃ ৪২৪
১১। সাহিত্য প্রসঙ্গ—যোগেশ চন্দ্র বাগল—বঙ্কিম রচনাবলী। ২য় খণ্ড, সংসদ সং। পৃঃ ১।/
১২। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি স্থূল কথা ঐ পৃঃ ৮১৬
১৩। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই ঐ পৃঃ ৮২২
১৪। বঙ্কিম বরণ—মোহিতলাল মজুমদার পৃঃ ১৮৮—৮৯
১৫। কৃষ্ণ চরিত্র, প্রথমবারের বিজ্ঞাপন—বঙ্কিমচন্দ্র
১৬। ধর্মতত্ত্ব, ক্রোড়পত্র খ—বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড। সংসদ সং। পৃঃ ৬৭৬
১৭। ঐ পৃঃ ৬৭৬
১৮। ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরে ভক্তি—বঙ্কিম রচনাবলী। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৬২১
১৯। ধর্মতত্ত্ব, শারীরিকী বৃত্তি—ঐ পৃঃ ৬১২
২০। ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরে ভক্তি— ঐ পৃঃ ৬২১
২১। ধর্মতত্ত্ব, ভক্তির সাধন— ঐ পৃঃ ৬৪৬
২২। কৃষ্ণ চরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র। পরিষৎ সং। পৃঃ ২
২৩। ঐ পৃঃ ১৭৭
২৪। ঐ পৃঃ ২৫
২৫। ঐ পৃঃ ৬৫
২৬। ঐ পৃঃ ৬৫
২৭। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পৃঃ ১১২
২৮। Studies in the Epics and Puranas—Dr. A D. Pusalkar pp 65—66
২৯। কৃষ্ণ চরিত্র, দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন—বঙ্কিমচন্দ্র
৩০। কৃষ্ণ চরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র। পরিষৎ সং। পৃঃ ৮৩
৩১। ঐ পৃঃ ১২৪
৩২। ঐ পৃঃ ২৩৬
৩৩। কৃষ্ণ চরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র। পরিষৎ সং। পৃঃ ২৭২
৩৪। ঐ পৃঃ ২৮৬
৩৫। ঐ পৃঃ ৪২
৩৬। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পৃঃ ১৭৯
৩৭। কৃষ্ণ চরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র। পরিষৎ সং। পৃঃ ১৮৭
৩৮। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পৃঃ ২১২
৩৯। ঐ পৃঃ ২১৫
৪০। ধর্মতত্ত্ব—বঙ্কিম রচনাবলী। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৬২৬

৪১। দ্রৌপদী— ঐ পৃঃ ১৯৯
৪২। The Great Epics of India—R. C. Datt p 186
৪৩। Ibid p 191
৪৪। অক্ষয়চন্দ্র সরকার। সা সা. চ।—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২১—২২
৪৫। সনাতনী—অক্ষয় চন্দ্র সরকার, ধর্ম ও খণ্ড ধর্ম
৪৬। বঙ্গদর্শন, ২য় সংখ্যা, ১২৭৯
৪৭। হিন্দুত্ব। সোঽহং।—চন্দ্রনাথ বসু পৃঃ ৯
৪৮। ঐ । নিষ্কাম ধর্ম। পৃঃ ৫৮
৪৯। ঐ । ধ্রুব। পৃঃ ৬৭
৫০। ঐ । বিবাহ। পৃঃ ১৯৩
৫১। ঐ । তেত্রিশ কোটি দেবতা। পৃঃ ২০৯
৫২। ঐ । তেত্রিশ কোটি দেবতা। পৃঃ ১৯৭
৫৩। সাবিত্রী তত্ত্ব—চন্দ্রনাথ বসু। পৃঃ ১৫৯
৫৪। ভূমিকা—হরপ্রসাদ রচনাবলী, সং ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পৃঃ জ
৫৫। ভূমিকা—বাল্মীকির জয়। হরপ্রসাদ রচনাবলী। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৩১৬
৫৬। বাল্মীকির জয়—হরপ্রসাদ রচনাবলী পৃঃ ৩৬৫
৫৭। ঐ পৃঃ ৩৬৮
৫৮। বাল্মীকির জয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ
৫৯। বাল্মীকির জয়—হরপ্রসাদ রচনাবলী পৃঃ ৩৪৮
৬০। সাধারণী—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। কার্তিক, ১২৮০। উপক্রমণিকা
৬১। নবজীবন—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। শ্রাবণ, ১২৯১ ; সূচনা
৬২। প্রচার—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। শ্রাবণ, ১২৯১। সূচনা
৬৩। প্রচার—১ম বর্ষ, শেষ সংখ্যা।। আষাঢ়, ১২৯২।
৬৪। আমার জীবন, ৫ম ভাগ। পরিষদ সং। নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড পৃ. ২৪৩—৪৪০
৬৫। নব্য ভারত—জ্যৈষ্ঠ ১২৯০, সম্পাদকীয়
৬৬। ভারতে পৌত্তলিকতা—আনন্দচন্দ্র মিত্র—নব্যভারত, অগ্রহায়ণ, ১২৯০
৬৭। শাস্ত্র দেশাচার ও ধর্ম—শিবনাথ শাস্ত্রী—নব্যভারত, ভাদ্র, ১২৯১
৬৮। ঊনবিংশ শতাব্দী ও ঈশ্বর বিশ্বাস—বিজয়চন্দ্র মজুমদার—নব্যভারত, আশ্বিন, ১২৯২

—

নবম অধ্যায়

॥ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ॥

বাংলা গদ্য রচনায় পৌরাণিক প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেল যে এ দেশের মনন ও চিন্তনের ক্ষেত্রে পৌরাণিক চেতনা একটি বিশেষ তত্ত্ব ও দর্শনের সূচনা করিয়াছে। বিভিন্ন লেখক তাঁহাদের রচনা ও আলোচনার মধ্যে ভারতধর্মের একটি সত্য ও সাররূপকে অন্বেষণ করিতে চাহিয়াছেন। শতাব্দীর শেষ পাদের কাব্য সাহিত্যে পৌরাণিক চেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তত্ত্ব দর্শন প্রতিষ্ঠার কোনরূপ সচেতন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। এগুলি প্রধানতঃ বস্তুধর্মী কাব্য—, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ হইতে আহৃত বিচ্ছিন্ন কাহিনী ও ঘটনার কাব্যিক রূপায়ণ। ইহাদের মধ্যে যে তত্ত্ব দর্শন কিছু নাই এমন নহে, কিন্তু তাহা প্রবন্ধ সাহিত্যগুলির মত কোনরূপ আরোপিত নহে, একান্তই অন্তর্নিহিত। কৃষ্ণ চরিত্র বা গীতাভাষ্যে বঙ্কিম ব্যাখ্যা করিয়া যাহা আরোপণ বা উদঘাটন করিয়াছেন, কাব্যগুলির মধ্যে তাহা চরিত্রপুঞ্জের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে চরিত্রগুলিই তত্ত্ব ও দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা, লেখকগণ নহেন। সুতরাং এই কাব্যগুলির মধ্যে প্রবন্ধকারের ব্যাখ্যা কবির অনুভূতি সাপেক্ষ হইয়াছে এবং প্রবন্ধকারের দৃষ্টান্ত কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ কিছু কিছু কাব্যের ক্ষেত্রে সনাতন তত্ত্বের প্রতিফলন অপেক্ষা বর্ত্তমান যুগ জিজ্ঞাসার প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। গদ্যরচনাগুলির মধ্যে নবযুগের বাণী ধ্বনিত হইলেও সংস্কার পরিমার্জনার উদ্দেশ্য প্রকৃতিতে তাহাদের মধ্যে প্রাচীন জীবনাদর্শেরই প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। নব যুগের সংশয়ী মানুষের কাছে ইহাদের আবেদন গ্রাহ্য করাইবার জন্য লেখককুল ইহাদের যে আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা অধিকাংশই যুক্তি ও বুদ্ধি সাপেক্ষ। কাব্যের মধ্যে নব যুগের চেতনা সে তুলনায় অনেক স্পষ্ট। অনেকগুলি লেখায় পৌরাণিক কাঠামোটিই মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, বক্তব্য ও উপজীব্য আধুনিক কালের। পৌরাণিক বিশ্বাসকে এইভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক করা হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক কাব্যগুলি মানবরস সমৃদ্ধ হইয়া এক প্রকার মানব সংহিতায় পরিণত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ অনেকগুলি কাব্য একান্তভাবে বাঙ্গালী জীবনের নিজস্ব চিন্তা ও অনুভূতিকে বহন করিয়াছে। সুপ্রাচীনকাল হইতেই দেবতার কথা লিখিতে

গিয়া বাঙ্গালী কবিগণ নিজেদের সংসার জীবন ও গৃহধর্মের কথা তাহার সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন। বাংলার মঙ্গল কাব্যগুলি ইহার জলন্ত উদাহরণ। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদেও তাহাই। নবযুগের কাব্যেও কাহিনী ও চরিত্র বহু ক্ষেত্রে পৌরাণিক উৎস সম্ভূত হইলেও সেগুলিতে পৌরাণিক মাহাত্ম্য অবিকৃত ভাবে রক্ষিত হয় নাই, বাঙ্গালীর গৃহ জীবন ও পরিবার প্রকৃতির সহিত মিশিয়া তাহা বাঙ্গালীর জীবন কাব্যে পর্যবসিত হইয়াছে।

মোটের উপর এই যুগে কাব্যের ট্রাডিশন পরিবর্তিত হইতেছিল। বৈপ্লবিক ধারাকে সম্বর্ধনা জানাইয়া যাঁহারা ইহার নূতন রূপ নির্মাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নবযুগের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে। এইজন্য কাব্যের বস্তু উপাদান প্রাচীন হইলেও তাহাতে নূতন চিন্তাবোধ আরোপণের ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু অনেকেই আবার সমাজ চিন্তা বা সাহিত্য চিন্তায় গতানুগতিক ধারাটিই পছন্দ করিয়াছেন। বিশেষতঃ হিন্দু জাগৃতির এই যুগ পুরাতন বিশ্বাসকেই তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছে বলিয়া সকলের মধ্যে ট্র্যাডিশন ভাঙ্গিবার উৎসাহ দেখা যায় নাই। ইহাদের কাব্য কাহিনী প্রচলিত ধারা অতিক্রম করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ কাব্য ধারায় নবযুগচিন্তার পথিকৃৎ মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই কিছুটা যুগোপযোগী চিন্তাধারার পরিচয় দিয়াছেন। অন্যান্য কবিদের অধিকাংশই পৌরাণিক বস্তু উপাদানকে এদিক ওদিক করিয়া পুনর্বিন্যাস করিয়াছেন মাত্র। সেইজন্য এই যুগের কাব্যধারায় যুগান্তকারী সৃষ্টি বিশেষ কিছু নাই।

আমরা এখনে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কেন্দ্রিক কাব্য কাহিনী পৃথকভাবে আলোচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনার অভিক্ষেপ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

রামায়ণী কথা ॥

বালি বধ কাব্য। ১৮৭৬। ॥—রামায়ণের বালি বধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র বসু এই কাব্যটি রচনা করেন। বাংলা আখ্যায়িকা কাব্যের গ্রন্থকর্ত্রী অনুমান করেন কবি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি ইলিয়াডের পদ্যানুবাদ ও Paradise Lost-এর ভাবাবলম্বনে স্বর্গভ্রষ্ট কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।[১] সুতরাং কবির যে একটি ক্ল্যাসিক বিষয়বস্তুর প্রতি ঝোঁক ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবের সহিত রামের সখ্যতা স্থাপন এবং বালিবধের দ্বারা সুগ্রীবের রাজ্য লাভের প্রতিশ্রুতি দানের মধ্যে কাব্যটি আরম্ভ হইয়াছে। সাতটি সর্গের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতির কার্যাবলী বিবৃত হইয়াছে, তবে তৃতীয় সর্গে বালি পরাজিত ও আহত হইলে পর কাব্যের ঘটনা আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। তাহার পর কবি বালি ও রামের কথোপকথন, ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে পরস্পরের অভিযোগ অনুযোগ, বালির আত্মসমর্পণ, সুগ্রীবের বিলাপ, তারার বিলাপ ও রামের প্রবোধ বচনের বিস্তৃত অনুক্রমণিকা টানিয়াছেন। ঘটনাকেন্দ্রিক কাব্য ভাবকেন্দ্রিক হইযাছে এবং কাব্যের প্রারম্ভিক বীর রস পরিশেষে করুণ ও শান্তরসের মধ্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কাব্যটি আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, তবে কোথাও ইহা অমিত্রাক্ষরের গাম্ভীর্য লাভ করে নাই।

রামায়ণের বিচিত্র কার্যাবলীর মধ্যে রামের বালিবধ একটি বিতর্ক বহুল ঘটনা। ইহা রামচরিত্রের মহিমা বৃদ্ধি করে নাই বলিয়া আধুনিক যুগের অভিমত। বিশেষতঃ রামচন্দ্রের মত পরম ধার্মিকের ছলনার আশ্রয়ে এইরূপ নিন্দিত কর্ম সম্পাদন, নিতান্তই সমালোচনার বিষয়। রামের আচরণকে বালি সমর্থন করিতে পারে নাই। বাল্মীকির কাব্যে বালি রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন, "তোমাকে দেখবার পূর্বে ভেবেছিলাম, আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিরত আছি, এই অসতর্ক অবস্থায় রাম আমাকে মারবেন না। এখন জানলাম, তুমি দুরাত্মা ধর্মধ্বজী অধার্মিক, তৃণাবৃত কূপ ও প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় সাধুবেশী পাপাচারী। তোমার ধর্মের কপট আবরণ আমি বুঝতে পারিনি। কাকুৎস্থ, বিনা অপরাধে আমাকে শরাঘাতে বধ করেছ, এই গর্হিত কর্ম করে সাধু সমাজে তুমি কি বলবে?"[২] বালিবধের কবি বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন। আহত বালি রামচন্দ্রকে বলিতেছে:

"দেখি ধর্মচিহ্ন
তব—অঙ্গে সুবিখ্যাত—সুদর্শন ক্ষত্র
ক্ষ্মাপতিকুমার তুমি বল কোন জ্ঞানী
জন্মি ক্ষত্র কুলে করে ক্রূর আচরণ—
অসংশয়ে হেন—ধরি ধর্মমূল চিহ্ন।
শুনেছি ধার্মিক, ধীর, সদ্বংশীয় তুমি,
জানিলাম কিন্তু এবে অসাধু বিশেষ
অদ্বিতীয় ক্ষিতিতলে।"[৩]

বাল্মীকির রামচন্দ্র বালিকে উত্তর দিয়াছেন, "কেন তোমাকে বধ করছি তার কারণ শোন। তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ভ্রাতৃজায়াকে গ্রহণ করছ। তুমি পাপাচারী, মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, তাঁহার পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূ-স্থানীয়া, কামবশে তুমি তাঁকে অধিকার করেছ। বানর, তুমি ধর্মহীন, কামাসক্ত, ভ্রাতৃবধূকে ধর্ষণ করেছ, এজন্য এই বধদণ্ড তোমার পক্ষে বিহিত।"[৪]

গিরিশচন্দ্র এই কথাগুলির হুবহু অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার রামচন্দ্র উত্তর দিয়াছেন—

> "হরেছ সবলে তুমি ভ্রাতৃজায়া রুমা
> পুত্রবধূ তব শাস্ত্রমতে, এঁর ভার্যা,
> জীবিত এ ভ্রাতা তব মহাত্মা সুগ্রীব।
> দিলাম তোমায় তাই দণ্ড, স্বেচ্ছাচারী
> তুমি—দুষ্ট—ধর্মভ্রষ্ট।"[৫]

বাল্মীকি রামকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অধর্মাশ্রিত বালির উক্তাকে কোন যৌক্তিকতার দ্বারা শেষ পর্যন্ত প্রশ্রয় দেন নাই। বালির মার্জনা ভিক্ষা ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া তিনি বালিপ্রসঙ্গের সমাপ্তি টানিয়াছেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে শ্রীরামমাহাত্ম্য আরও উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত। কৃত্তিবাসের বালি শ্রীরামকে দাতা, কর্তা ও বিধাতারূপে গ্রহণ করিয়া আপনার রূঢ় আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। আলোচ্য কাব্যে বালির আত্মসমর্পণের সুরটি বড়ই কোমল ও করুণ:

> "তুচ্ছ রাজ্য অধিকার, তোমার প্রসাদে
> লভে সে স্বর্গ সম্পদ—যে তব অধীন।
> কি আর অধিক রাম, অঙ্গনা যতনে
> রত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমি সুগ্রীবের সহ
> তারার কারণে—তুচ্ছ করি প্রাণপণে
> বাঞ্ছি মৃত্যু তব করে—অনায়াসে মোক্ষ।"[৬]

রামচন্দ্র তাঁহার প্রবোধ বচনের মধ্যে একটি গূঢ় সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন যে সৃষ্টি ক্ষেত্রে কালের প্রভাব অমোঘ। সর্বত্রই কাল তাহার কার্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। সর্বকালকর্তা স্বয়ং ঈশ্বরও এই কালের অনুজ্ঞা অস্বীকার করিতে পারেন না। বালি ভোগ সুখে জীবনাতিবাহিত করিয়াছে, সামদানাদি শ্রেষ্ঠ রাজগুণে জীবনকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছে। স্বীয় প্রকৃতির পরম পরিণতি

ঘটিয়াছে। ইহা কালেরই অমোঘ নির্দেশ, সুতরাং এই বিয়োগ জনিত বিলাপ আদৌ সংগত নহে। ভারতীয় জীবনচর্যায় ইহাই পরিণামবাদ তথা অদৃষ্টবাদ। মর্ত্যমানব হইতে দেবতা পর্যন্ত সকলেরই তাহাতে দ্বিধাহীন আনুগত্য জীবনকে নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ করিয়া তোলে। বালির অন্তিম মুহূর্তে রামের প্রবোধ বচনে এই পরম শান্তি ও স্থৈর্যের বাণী উদ্গীত হইয়াছে।

ভার্গব বিজয় কাব্য (১৮৭৭) ॥ গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তীর 'ভার্গব বিজয় কাব্য' মহাকাব্য শ্রেণীর রচনা। মিথিলায় হরধনুভঙ্গে জানকীর পাণি গ্রহণের পর রামচন্দ্রের সহিত পরশুরামের সাক্ষাৎ এবং রামের নিকট পরশুরামের পরাভব —রামায়ণ কাহিনীর এই অংশটুকু অবলম্বন করিয়া আলোচ্য কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। উপস্থাপনার দিক দিয়া কবি ইহাতে কিছু নূতনত্ব আনিয়াছেন। হিমালয় সানুদেশে তপোমগ্ন পরশুরাম মিথিলায় রামের হরধনুভঙ্গে চমকিত হইলেন। দ্বাবিংশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে পিতৃতর্পণের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় নূতন করিয়া এক ক্ষত্রিয়ের অভ্যুদয়ে তিনি বিচলিত হইলেন। শিষ্যকে তাঁহার অস্ত্ররাজি আনিতে আদেশ দিয়া তিনি মিথিলা যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। অযোধ্যার পথে রামের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। ভার্গবের আগমন এবং হরধনুভঙ্গে তাঁহার ক্রোধোৎপত্তি বিশ্লেষণে কবি মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে ক্ষাত্রবীর্য ধ্বংস করাই পরশুরামের জীবন ব্রত ছিল। বিষ্ণু এবং মহাদেব দুইটি পৃথক ধনুর অধিকারী ছিলেন। বিষ্ণুর ধনু হস্তপরম্পরায় ভার্গব জনক জমদগ্নির নিকট আসে। কোন এক সময়ে জমদগ্নির হাতে সেই ধনু না থাকাতে কার্তবীর্যার্জুন তাঁহাকে বধ করেন। সেই কারণে পরশুরাম ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এখন এক ক্ষত্রিয় কর্তৃক হরধনুভঙ্গে তাঁহার নিঃক্ষত্রিয় করণের সাধনা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে, সেই জন্য এই উদীয়মান ক্ষত্রিয়কে নিরোধ করিবার জন্যই তাঁহার আগমন।

কৃত্তিবাস দেখাইয়াছেন মহাদেব ভার্গবের গুরু। তাঁহার নিজের ধনু রাম ভঙ্গ করিলে শিষ্য ভার্গব গুরুর অস্ত্রের অবমাননা হইয়াছে দেখিয়া রামকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

আলোচ্য কাব্যে কবির বিবরণ অন্যরূপ। যে কোদণ্ড রাম ভঙ্গ করিয়াছেন, সেই ধনু হর প্রদত্ত, তাহা স্বয়ং পরশুরামই জনক সন্নিধানে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। এই ধনুর্ভঙ্গে সীতার বিবাহ হইবে, শঙ্কর এইরূপ বিধান দিয়াছিলেন। ভার্গবের

ইচ্ছা ছিল তিনিই সীতাকে বিবাহ করিবেন। এই ধনুর্ভঙ্গের ক্ষমতা শুধু তাঁহারই আছে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। তাই তিনি সদম্ভে জনককে জানাইয়াছিলেন যে, সীতা বয়ঃস্থা হইলে যদি কেহ এই হরধনু ভাঙ্গিতে পারে, তাহাকেই যেন কন্যা দান করা হয়। পরিশেষে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিলে পরশুরাম আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

কাব্যের অন্যান্য অংশে ভার্গবের ক্রুদ্ধমূর্তিতে দশরথের দুশ্চিন্তা, রাঘবের বিক্রম পরীক্ষার্থ ধনুঃপ্রদান, রাঘবের ভার্গব সমীপে শরপ্রার্থনা ও গ্রহণ, ভার্গবের পরাজয় স্বীকার ইত্যাদি ঘটনাবলীর মধ্যে রাম-পরশুরাম সংঘর্ষের কাহিনী বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। শিবদূতী পদ্মার ভার্গব সমীপে আগমন এবং রামের সহিত সংগ্রাম নিবারণ করিতে মহেশের আদেশ জ্ঞাপনের মধ্যে কবির মৌলিক সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় সর্গে বিদেহ দেশের প্রভাত বর্ণনা ও চতুর্দশ সর্গে কোশল দেশের সন্ধ্যা বর্ণনা কাব্যের মূল ঘটনা ধারার সহিত আদৌ সংযুক্ত নহে। তবে ইহাদের মধ্যে দুইটি দেশের প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানব পরিচয় উদঘাটন করিয়া কবি এক মহাকাব্যিক ব্যাপ্তির সূচনা করিয়াছেন।

কবি ভার্গব চরিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে ক্রোধ ও উষ্মা, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়কারী ব্রহ্মশক্তি ও সংকল্প সাধনে দৃঢ়তা সম্পূর্ণ বীরোচিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিই কাব্যটির ঘটনাসূত্র নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন বলিয়া নায়ক পদবাচ্য। পরিশেষে পরাভবের পর সমূহ ক্রোধ নিঃশেষিত হওয়ায় তাঁহার যে শান্ত ও সুন্দর পরিণতি ঘটিয়াছে তাহা অনবদ্য। ইহাই ভার্গব বিজয়। শুধুমাত্র তাঁহার দর্পচূর্ণ করার মধ্যে কোন জয় নাই। ভার্গবের নিঃক্ষত্রিয় করার সংকল্পকে ক্ষত্রবধ বিরতির সংকল্পে পরিণত করিতে হইয়াছে। ত্রিভুবন সাক্ষী করিয়া তিনি ক্ষত্রবধ বিরতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপন শত্রুবধ তেজ রাঘবকে প্রদান করিয়াছেন। ইহা মহত্তম প্রতিদ্বন্দ্বীকে মহত্তম সমর্পণ। পরিশেষে রাম-লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি প্রস্থান করিয়াছেন। ক্রোধ উষ্মা এবং নির্বেদ প্রশান্তির সমবায়ে ভার্গব চরিত্র কবির এক অভিনব সৃষ্টি।

অন্যান্য চরিত্রেও কবি মহাকাব্যের ধারণার ব্যত্যয় ঘটান নাই। রামের বীরত্ব ও নম্রতা, ভার্গবের প্রতি সম্ভ্রমাত্মক উক্তি রামের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। রাম পরশুরামকে প্রসন্ন করিবার জন্য বহু অনুনয় বিনয় করিয়াছেন। ঠিক সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ ভার্গবকে রোষ কষায়িত তিরস্কার বাক্য বলিয়াছেন। দশরথের

অসহায়তা' বশিষ্ঠের সান্ত্বনা দান ইত্যাদির মধ্যে তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইযাছে। তবে কবি বিশ্বামিত্রকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িযাছেন। বিশ্বামিত্রই এক্ষেত্রে রাম বাহিনীর পরিচালক। কিন্তু পরশুরাম তাঁহার ভাগিনেয় হওযায় তিনি এ সংঘর্ষে কোনরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। কবি কৌশলে তাঁহার অন্তর্ধান ঘটাইয়াছেন।

সমকালীন সমালোচনায 'ভার্গব বিজয়' রচনাটি মহাকাব্য বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যাদর্শ উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপক চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয ইহাকে একটি সর্বগুণোপেত মহাকাব্য বলিয়া নির্দেশ করিযাছেন।[৭] সে যুগের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীও কাব্যটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মত বিচক্ষণ সমালোচকও বলিয়াছেন, "এই কাব্যখানি মহাকাব্য শ্রেণীভুক্ত। মহাকাব্যের নিয়মানুসারে ইহাতে কৌশল সহকারে নানা বিষয়ের বর্ণনা ও নানা রসের অবতারণা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার অনেকস্থলে বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি ও লিপি-নৈপুণ্যের প্রকৃত পরিচয দিযাছেন।"[৮] এমনকি, কাব্যটি সম্বন্ধে এরূপও উক্ত হইয়াছে যে,"শব্দাডম্বর ও রচনা সম্বন্ধে ইহা মাইকেল অপেক্ষাও গাঢতর এবং কঠিনতর।"[৯] আমাদের মনে হয় কাব্যটি এতখানি উচ্চস্তরের নহে। মধুসূদনের বিরাট কীর্তিকে শুধুমাত্র শব্দচয়ন আর তথাকথিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ দিয়া অনুসরণ করা যায় না। কবি স্পষ্টভাবে মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়াছেন বলা যায, কিন্তু তিনি তাঁহার মত বাক্‌সিদ্ধ কবি নহেন, তাই তাঁহার কাব্যে ছন্দ অলংকার ও ভাষা শব্দের যথার্থ প্রয়োগ হয় নাই। লেখাটিকে অযথা্‌ দুর্বোধ্য করার একটি ঝোঁক আছে। মাইকেলের শব্দ প্রয়োগে কাঠিন্যের মধ্যে একটি ধ্বনি আছে, এখানে ধ্বনি নাই কিন্তু কাঠিন্য আছে।

সর্বোপরি, প্রাচীন কাব্যাদর্শ যে কথাই বলুক, কোন মহাকাব্যই শুধুমাত্র বহির্লক্ষণেরর দ্বারা সার্থক হয নাই। প্রাচীন মহাকাব্যে প্রচুর আন্তরধর্ম ছিল বলিয়াই বোধ করি আলংকারিকগণ সেদিকে পৃথকভাবে দৃষ্টি দেন নাই। আর পাশ্চাত্য মতেও ইহাকে পরবর্তী কালের অনুকৃত মহাকাব্যও বলা যায় না, কেননা তাহাতেও একটি যুগ বিশ্বাস থাকে। ভার্গব বিজযের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীর সরস বর্ণনা আছে মাত্র। সেকালের মহাকাব্যিক বিশ্বাস ও বিশালতা বা একালের মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্য ও আবেদন ইহাতে কিছুই নাই। সেইজন্য ইহাতে স্বর্গ বিন্যাস, প্রারম্ভিক বন্দনা, নমস্কার, যুদ্ধ সংঘটন, শৈল-নগর-চন্দ্র-সূর্য বর্ণনা ইত্যাদি বস্তু উপাদান ও শিল্পরীতির সমাবেশ থাকিলেও ইহাকে মহাকাব্যপর্যায়ভুক্ত করা যায় না।

মুকুটোদ্ধার কাব্য (১৮৮১) ।। রামায়ণের সীতাহরণকে কেন্দ্র করিয়া হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে, তবে কাব্যের পরিকল্পনাতে কিছু অভিনবত্ব আছে। লেখক এখানে প্রচলিত রামায়ণ কাহিনী গ্রহণ করেন নাই। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে তিনি বলিয়াছেন, "রামায়ণের সীতাহরণ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ঘটনা 'মুকুট-উদ্ধার' কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণের ঘটনাবলীর সহিত এ গ্রন্থের ঘটনাবলীর বিস্তর প্রভেদ। ইচ্ছা-পূর্বক আমি অনেকস্থলে রামায়ণের যথাযথ অনুসরণ করিতে বিরত হইয়াছি। ইহাতে কাব্যাংশে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, এই আমার বিশ্বাস। সীতা আর্য রাজলক্ষ্মী—রামচন্দ্রের বনিতা নহেন—এইরূপ কল্পনা করিয়াছি। সেই আর্য রাজলক্ষ্মী সীতার উদ্ধারের জন্য অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথ লঙ্কাধিপতি দশাননের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শতবার্ষিক যুদ্ধের পর পরাস্ত ও রক্ষোকারাগারে নিবদ্ধ হয়েন। রক্ষোরাজ আন্যান্য হিন্দু নরপতিদিগকে দূরীকৃত করিয়া ভারতবর্ষে আপনার একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। তৎপরে রাক্ষস ঈশ্বরী মন্দোদরী কৌশল্যা রাণীকে দূরীকৃত করিয়া আপনি সেই পদে অভিষিক্ত হইবার বাসনা করেন। এই কাব্যে সেই সময় হইতে রাবণ বধ পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।"[১০] অর্থাৎ এখানেও সীতাহরণ কেন্দ্রীয় বিষয়, তবে সীতা রঘুকুলবধূ নহেন, তিনি ভারত লক্ষ্মী। আর্য সন্তানদের পরাধীনতাজনিত দুরবস্থা ও ভারতলক্ষ্মীর অন্তর্ধানে অযোধ্যাঈশ্বরী কৌশল্যার দুঃখের সীমা নাই। ইহার উপরে মন্দোদরীর অভিপ্রায় তাঁহার আসনটি গ্রহণ করেন। রক্ষোরাজ রাবণ তাহার জন্য আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। ত্রিভুবন জয়ী রাবণের কামনা বাসনার উদ্রেক ও তাহার সমাধি কাব্য মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

রামায়ণে রাবণ সীতাহরণ করিয়া গর্হিততম অপরাধ করিয়াছেন। এইজন্য দৈব সর্বদা তাঁহার প্রতিকূলে গিয়াছে। এই বিশ্ববিধান লঙ্ঘন জনিত অপরাধে তিনি নিয়তির ক্রূর নির্দেশের বলি হইয়াছেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে এইরূপ কোন নিয়তি বিধান নাই। এখানে মন্দোদরীর অযোধ্যাঈশ্বরী হওয়ার সম্পর্কে দেবকুল প্রতিকূলতা করিয়াছে। মন্দোদরীকে ভারত সম্রাজ্ঞীর পদে প্রতিষ্ঠিত করাই মদগর্বী রাবণের লক্ষ্য হইয়াছে এবং সীতা জয়ের ব্যাপারটি একান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আর্যকল্পনা হইতে বহুদূরবর্তী এক কল্পনা।

রাবণ এবং মন্দোদরী চরিত্র কল্পনা রামায়ণ বিরোধী। কাহিনী পরিবর্তন করিতে গিয়া কবি অনিবার্য রূপে তাঁহাদের চরিত্রধর্ম পরিবর্তন করিয়াছেন।

পরাভূত লঙ্কেশ্বর মেঘনাদাদি পুত্রকে হারাইয়া বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন। সংসার তাঁহার কাছে শূন্য হইয়া গিয়াছে। সব কিছু নশ্বর জানিয়া তিনি সস্ত্রীক বনবাসী হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। ইহা রামায়ণ কাহিনীর রাবণ চরিত্রের পরিণতির সহিত শুধু স্বতন্ত্রই নহে, বহুলাংশে তাৎপর্য বিহীন। আবার মন্দোদরীর স্বপ্ন ব্যর্থ হওয়ায় তিনি এই সময় রাবণকে বলিতেছেন :[১১]

"জানিলাম আজ আমি
ভালবাসা তব। কহ, কি করে, বীরেশ
ভুলিলা সংকল্প পণ প্রতিজ্ঞা তোমার?
ভুবনঈশ্বরী হয়ে রত্নাসনে বসি
কোথায় শোভিব আজ বিপুল প্রতাপে
হল কি না বনবাস!

... .

হই যদি দৈত্যবালা, দৈত্যতেজ যদি
থাকে এ শরীরে, করিয়াছি যে প্রতিজ্ঞা
পালিব যতনে, বিদারিয়া এই বক্ষ
প্রক্ষালিব, লঙ্কানাথ, লঙ্কার কলঙ্ক
শোণিতের স্রোতে।"

ইহা কখনই রামায়ণের মন্দোদরীর মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে না। ট্র্যাডিশন বিরোধী কল্পনার মধ্যে তাঁহার চরিত্র অসম্ভব রকম হীন হইয়া পড়িয়াছে।

রামায়ণের সব উল্লেখযোগ্য চরিত্রই এখানে রহিয়াছে, তবে ভূমিকা প্রত্যেকেরই কিছু পরিবর্তিত। পুত্রস্নেহাতুরা কৌশল্যা এখানে বিমর্ষ ম্লান ভারতেশ্বরী, সীতা ভারতরাজলক্ষ্মী, তিনি রক্ষঃ কারাগারে অবরুদ্ধা, মহারাজ দশরথও রক্ষঃ গৃহে বন্দী, রাজ্যহীনতার জন্যই রাজপুত্রদের বনবাস, রাবণ চরিত্রে রাজকীয় দম্ভ আছে বটে, তবে মন্দোদরীর মধ্যেই তাহার প্রকাশ বেশী। মেঘনাদের ভূমিকা আশ্চর্য পরিমাণে অল্প।

আমাদের মনে হয়, রামায়ণের কাহিনীর এই প্রকার রূপান্তরিত উপস্থাপনা রামায়ণের মাহাত্ম্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। রামায়ণে রাম ও রাবণ দুইটি বিরাট চরিত্র একটি জীবনের সত্য লইয়া সংঘর্ষে নামিয়াছে। রাম-লক্ষ্মণের বীর্যবত্তা যেমন সেই সত্যকে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছে, তেমনি রাবণ সেই সত্যকে ভূলুণ্ঠিত

করিয়াছে। আলোচ্য কাব্যে সীতাকে ভারতলক্ষ্মী হিসাবে বর্ণনা করায় একটি Idea বা ভাবই সম্প্রসারিত হইয়াছে, ইহা কোন জীবনে সত্যের ইঙ্গিত দিতে পারে নাই। মনে হয় ভারতের পরাধীনতার পটভূমিকায় বিদেশী শক্তির প্রাধান্য বিস্তারই হয়ত লেখকের এই রূপক কল্পনার পশ্চাদ্‌প্রেরণা। আধুনিক কালের একটি বিশেষ চেতনা তিনি পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, তবে কাহিনী বিন্যাস বা চরিত্র চিত্রণের মধ্যে তিনি জাতীয় ভাবোদ্দীপক চিন্তা-প্রবাহকে স্বাভাবিকভাবে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই।

রামবিলাপ কাব্য (১২৮৭)।। নগেন্দ্র নারায়ণ অধিকারীর রামবিলাপ কাব্যটি Dramatic monologue শ্রেণীর রচনা। সীতাহরণের পর রামচন্দ্রের যে গভীর অন্তর্বেদনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এখানে তাঁহার বিলাপের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। সমস্ত বিলাপের মধ্য দিয়া রামচন্দ্র সীতার অপরূপ সৌন্দর্য ও অনুপম মাধুর্যের কথা স্মরণ করিতেছেন। ইহা এক প্রকার স্মৃতিচারণা। বর্তমানের নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে অতীতের সুখ দুঃখ মিশ্রিত জীবনানুভূতি একটি বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রামচন্দ্র অশ্রুভারাক্রান্ত লোচনে সর্বজীব, প্রকৃতি ও দেবতার নিকট তাঁহার দারুণ মর্মব্যথা নিবেদন করিয়াছেন।

বিধাতার নিকট তিনি অনুযোগ করিতেছেন যে তিনি ইতিপূর্বে তাঁহাকে অনেক দুঃখই দিয়াছেন। সূর্যবংশীয় রাজকুমার হইয়া তিনি বনবাস, পিতৃশোক ইত্যাদি আঘাত অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন, বৈদেহীর মধুর সান্নিধ্যে সেই সব দুঃখ শোক তাঁহার কাছে সহনীয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন দুর্ভর দুঃখের দিনে সেরূপ সান্ত্বনার আশ্রয় কোথাও নাই।

গোদাবরী তটে, অরণ্য তরুরাজিতে, রম্য কুসুমদামে, কলকণ্ঠ বিহগ কুলে রামচন্দ্র সীতাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। ঋতুচক্রের আবর্তনে বর্ষণ মুখর বর্ষাদিনে মত্ত দাদুরীর কলরবে তিনিও মর্মপীড়িত। দশরথ অল্প বিরহে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজ হইয়া পিতৃধর্মরূপে তিনি গভীর বিরহতাপ পাইতেছেন। প্রদোষ নিশীথ উষায় প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণ সমারোহে মানবমনে যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, রামচন্দ্রের মনে তাহার উদ্রেক ঘটিয়াছে। একান্তের এই মুহূর্তগুলিতে তাঁহার মনে প্রিয়জনের কথা বিশেষ ভাবে উদিত হইতেছে। বিলাপরত অবস্থায় তিনি সকল দিকে সীতাকে খুঁজিতেছেন, এমন সময় তাঁহার সহিত জটায়ুর সাক্ষাৎ হইল। কবি এখানে রামায়ণ কাহিনীকেই গ্রহণ করিয়াছেন। রাম জটায়ুকে সীতা হননকারী বলিয়া তাহাকে বধ করিতে

উত্থিত হইলেন। মুমূর্ষু জটায়ু রাবণের হরণ কাহিনী বিবৃত করিয়া ও রামের চরণ স্পর্শ করিয়া অন্তিমলোকে চলিয়া গেল।

আলোচ্য কাব্যে কোন কাহিনী বিষয়ক বিবরণ নাই। রামায়ণ কাব্য অনেকগুলি করুণ মুহূর্তকে ধরিয়া আছে। রামের বনবাস যেমন একটি গভীর করুণ বিষয় তেমনি সীতাহরণও নিঃসন্দেহে আর একটি করুণ মুহূর্ত। এখানে নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের করুণ কোমল মানবিক দিকের সম্যক প্রস্ফুরণ ঘটিয়াছে। জড় ও চেতনের মধ্যে তরুলতা গিরি প্রান্তর সকল ক্ষেত্রে একটি মহাশূন্যতা রামচন্দ্রের ঐশ্বরিক মহিমাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া বুভুক্ষু মানবরূপকে প্রকাশ করিয়াছে। রামায়ণ যদি জয়ের কাহিনী হয়, তবে ইহা জীবনের কাহিনীও বটে। আলোচ্য কাব্যে সেই জীবনেরই উদ্বেগ আকুল কয়েকটি মুহূর্ত প্রকাশ পাইয়াছে।

ঊর্মিলা কাব্য (১২৮৭)॥ ইহা দেবেন্দ্রনাথ সেনের রচিত একটি পত্র কাব্য। বনবাসিনী সীতার নিকট পুরবাসিনী ঊর্মিলার এক দুঃখ করুণ পত্র ভাষণ। গীতিকবি হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ সেনের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল। আলোচ্য পত্রকাব্যে ঊর্মিলা জীবনের অন্তর্বেদনা গীতিকাব্যের ভাবতন্ময়তার মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

রামায়ণে ঊর্মিলা এক উপেক্ষিত চরিত্র। এতখানি নীরব বেদনার উৎস বোধ করি আর কোন চরিত্রে নাই। কর্তব্যপরায়ণ ভ্রাতৃবৎসল স্বামী যখন সুখে দুঃখে শ্রীরামচন্দ্রকে ছায়ার মত অনুসরণ করিয়াছেন, তখন অযোধ্যার বিজন পুরীতে ঊর্মিলার অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে। সে অশ্রু মুছাইবার বা সে দুঃখের সান্ত্বনা দিবার কেহই ছিল না।

আলোচ্য ঊর্মিলা কাব্য সেই দুঃখবেদনার এক স্বগত ভাষণ। ইহাতে বধূ ঊর্মিলা নহে, এক নারী ঊর্মিলার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বনবাসের প্রতিরূপ চিন্তা লইয়া তিনি প্রত্যহ রাজপুরীর উদ্যান-কাননে আসিয়া উপস্থিত হন। গভীর আত্মচিন্তায় তিনিও বনবাসিনী হইয়া যান। তাঁহার তাপস প্রদোষ সন্ধ্যায় কুটিরে ফিরিতেছেন, এই চিন্তায় যখন তিনি বিভোর, তখন কৌশল্যার আহ্বানে তাঁহার স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়। এই উদ্যান কাননই তাঁহার দণ্ডক অরণ্য, পুরনারীর কৌতুক আর তাঁহার অনুভূতির ক্রীড়াক্ষেত্র। কোনদিন এই উদ্যানে তিনি নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলে বনবাসের স্বপ্ন দেখেন। তাঁহার হৃদয়কান্ত বাহুপাশে ধরা দিয়াছেন, তাঁহার নিরুদ্ধ অভিমান, সুপ্ত অন্তর ব্যথা সবই দূর হইয়া গিয়াছে, প্রেমের স্পর্শে তিনি ধন্যা হইয়াছেন, অকস্মাৎ সীতার বিপদাভাস তাঁহার

প্রাণেশকে টানিয়া লইয়া যায়। স্বপ্নভঙ্গে তিনি শূন্য তরুতলে অশ্রুপাত করিতে থাকেন।

উর্মিলার অনুচিন্তন এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করে। মৈথিলী সীতাই ত সব সর্বনাশের মূল। তিনিই ত অদ্ভুত শক্তিতে তাঁহার প্রিয়তমকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছেন। কাতর অনুনয় ফুটিয়া উঠে তাঁহার কণ্ঠে—মায়াবিনী সীতা তাঁহার রত্নকে ফিরাইয়া দিন।

আবার তিনি স্থিতধী হইয়া যান। সীতা অনিন্দিতা, স্বামী সংসার সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার জয়, এ জয়ের তুলনা নাই। হিংস্র পশু হইতে চেতন মানুষ সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার উদার হৃদয় ও মহৎ প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। দোষ ত সীতার নয়, দোষ তাঁহার অদৃষ্টের; ভগিনী ভাবিয়া সীতা যেন তাঁহার সমস্ত প্রগল্‌ভতাকে ক্ষমা করেন।

পত্রশেষে তাঁহার নিবেদন, এই লিপিখানি যেন সীতা তাঁহার নিদ্রিত প্রাণেশের বক্ষোদেশে রাখিয়া আসেন। তাঁহার বড় সাধ, কৌস্তভ মণির মত ইহা লক্ষ্মণের আদরের সামগ্রী হইবে। পত্রশেষে তিনি সীতা ও শ্রীরাম উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন আর সীতাকে তাঁহার প্রিয় দেবর সমীপে শুধু জানাইতে বলিয়াছেন:

> "অযোধ্যার রাজপুরে, কি নিশি দিবসে
> উর্ধ্ব মুখে, কখন বা অবনত মুখে,
> বিগলিত কেশপাশ, পাণ্ডুর অধরা
> একটি রমণী মূর্তি ঘোরে অবিরত।"[১২]

মহাকাব্যিক কথা উর্মিলার বেদনার আঘাতে টুকরা হইয়া এইরূপ গীতিকাব্যের ভাবানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কাব্য হিসাবে ইহা একটি সুন্দর সৃষ্টি।

রাবণবধ কাব্য (১৩০০) ॥ ময়মনসিংহের জমিদার হরগোবিন্দ লস্করের 'রাবণবধ কাব্য' মেঘনাদ বধ কাব্যের পরবর্তী ঘটনাবলম্বনে লিখিত। কাব্যের উপক্রমণিকায় কবি বলিয়াছেন, "মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদ বধ কাব্যের পরে একখানি রাবণবধ কাব্য থাকিলে বঙ্গভাষা সমধিক সমুজ্জ্বলিত হইবে বিবেচনায় আমি একখানি রাবণবধ কাব্য প্রণয়ন করিয়া সমাজ সমক্ষে উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ...বঙ্গভাষায় এ পর্যন্ত যে সকল প্রণালীতে পদ্য বিরচিত হইতেছে আমি সে সকল প্রণালী অবলম্বন না করিয়া বহুবিধ সংস্কৃত ছন্দে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি...।"[১৩] অর্থাৎ কাব্যটির প্রধান বৈশিষ্ট্য

ইহার ছন্দ প্রকরণ। কবি প্রত্যেকটি চরিত্রকে এক একটি পৃথক ছন্দে কথা বলাইয়াছেন। প্রত্যেক ছন্দের আরম্ভের সময় কবি ইহার নাম দিয়াছেন। কবির নিজের উক্তিও স্বতন্ত্র ছন্দে—গীতি ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্যটিতে এই ছন্দ বৈচিত্র্য ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। চরিত্র চিত্রণ বা কাহিনী বিন্যাসে ইহা কোন ক্রমেই মেঘনাদ বধের অনুক্রমণিকা হিসাবে গণ্য হইতে পারে না। কবি ইহার প্রথম খণ্ডটি মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই যুগে রামায়ণ কাহিনী লইয়া আরও কয়েকটি কাব্য রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শশিভূষণ মজুমদারের 'দশাস্যসংহার কাব্য' (১৮৮৩) এবং কৃষ্ণেন্দ্র রায়ের 'সীতাচরিত (১২৯১) কাব্য' উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে শূর্পণখার নাসিকা ছেদন হইতে রাবণবধ পর্যন্ত রামায়ণের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। কাব্যটি চতুর্দশ সর্গে বিভক্ত এবং গদ্য ও পদ্যের মিশ্রিত রীতিতে রচিত। সীতাচরিতের মধ্যে কবি সুকোমল মতি বালিকার হৃদয় ক্ষেত্রে সুপবিত্র সীতা- বৃক্ষের বীজবপন মানসে বক্তা ও শ্রোতা উভয়কেই নারী সাজাইয়াছেন। সীতার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ইহাতে বিভিন্ন ছন্দের মধ্য দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণের সুষ্ঠু অনুসরণ[১৪] অপেক্ষা নারীধর্মের পবিত্র সুন্দর আদর্শ উপস্থাপন করাই কবির লক্ষ্য।

মহাভারতী কথা॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে মহাভারতী কথার শ্রেষ্ঠ কবি হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র। বলিতে গেলে, ইঁহারাই এ যুগের কবি প্রতিনিধি। পৌরাণিক ভাববস্তুকে আত্মস্থ করিয়া ইঁহারা নবযুগের কাব্য রচনা করিয়াছেন। মধুসূদনের মধ্যে এই যুগচেতনার কাব্য রচনার যে ব্রতের সূচনা হয়, ইঁহারা তাঁহার সার্থক উদযাপন করিয়াছেন। সীমিত শক্তি ও প্রতিভার অধিকারী হইয়া ইঁহারা মহাভারত-পুরাণের মর্মে প্রবেশ করিয়া তাহাদের কাহিনী ও চরিত্রের এক ধ্রুব তাৎপর্য আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন। ইঁহাদের ব্যতীত এই যুগে আরও কয়েকজন কবির কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্য হিসাবে এগুলি উৎকৃষ্ট না হইলেও সমকালীন সৃষ্টি হিসাবে ইহাদের কিছুটা মূল্য আছে। আমরা প্রথমে এই অপ্রধান কাব্যগুলির বিষয় আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

আর্য সঙ্গীত (১২৮৬)॥ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুইখণ্ডে সমাপ্ত 'আর্য সঙ্গীত কাব্য' মহাভারতের সভাপর্বের দ্রৌপদী নিগ্রহ বিষয় লইয়া রচিত। কাব্যের উপস্থাপনা পদ্ধতিতে কবির মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়। আর্যজাতির দুরবস্থার কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে গিরিবর হিমাদ্রি ভারত সন্তানকে কুরুপাণ্ডবের মহারণের

কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিতেছেন যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের ঘটনা সূত্রে কৌরবকুল যে পাপাচরণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলস্বরূপ কুরুক্ষেত্র মহাসমর সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধের মহারক্তপাতে কুরু কুল ধ্বংস হইয়া গেল। ভারতবর্ষে আর্য জাতি সেদিন যে মহাবিনষ্টির সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা হইতে যুগান্তের ভারত জীবন মুক্ত হয় নাই। অতঃপর হিমাদ্রি ভারতসন্তানকে সবিস্তারে দ্রৌপদী নিগ্রহের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রতিক্রিয়ায় দুর্যোধনের অসূয়া বৃদ্ধি, সৌবল শকুনির প্রয়োচনায় অক্ষক্রীড়ার আয়োজন, দুর্বল চিত্ত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট স্নেহাভিমানে দুর্যোধনের দ্যূতক্রীড়ার সম্মতি প্রার্থনা, পাণ্ডবদের হস্তিনায় আগমন ও পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়ার বিশদ বিবরণ কবি একের পর এক বর্ণনা করিয়াছেন। কবি বস্তুগত বর্ণনার সহিত আত্মগত ভাবনার সংমিশ্রণ করিয়াছেন। কৌরবদের নারকীয় বীভৎসতায় আগামীকালে যে মহা অনর্থ সংঘটিত হইবে, কাব্যের সর্বত্র তাহা আভাসিত হইয়াছে। কাহিনীর মূল চরিত্র দ্রৌপদী। কবি তাঁহার মধ্যে মহাভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বিশেষভাবে দ্যূত সভায় দ্রৌপদীর যে কূট প্রশ্ন তিনি বিজিত কি না, অগ্রে বিজিত ধর্মরাজ তাঁহাকে পণ রাখিতে আদৌ সক্ষম কি না এবং ভীষ্মাদি কৌরব গুরুবর্গের সম্মুখে এই পাশব নিগ্রহ সম্ভব কিরূপে—তাহার অবতারণা যথাস্থানে সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহাভারতের দ্রৌপদী এস্থলে যে তেজস্বিতা ও প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, আলোচ্য কাব্যে তাহার যথার্থতা রক্ষিত হইয়াছে। গুহান্বিত ধর্মতত্ত্বের রহস্যভেদে ভীষ্মের অক্ষমতা, বিদুরের ধর্মোপদেশ ও সহস্র সৎ পরামর্শ, বিকর্ণের অনন্যসাধারণ সৎসাহস প্রভৃতি মহাভারতের নীতির দিকটি কবি যেমন উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তেমনি অপর দিকে ক্রূর দুর্যোধনের প্রতিহিংসাপরায়ণতা, দুঃশাসনের ঘৃণ্য আচরণ, কর্ণের দুষ্ট মন্ত্রণা, শকুনির শাঠ্য ষড়যন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে মহাভারতের অনৃতস্বরূপটিও কবি সার্থকতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। গান্ধারী, কুন্তী ও ধৃতরাষ্ট্র বিরাট শক্তির অধিকারী হইয়াও অনিবার্য ভবিতব্যের নিকট অসহায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়ার ফলস্বরূপ পাণ্ডবদের যে বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের বিধান নির্ধারিত হয়, তাহার পরিসমাপ্তিতে অনিবার্য সংগ্রামের আভাস দিয়া কবি কাহিনীর ছেদ টানিয়াছেন। পরিশেষে কবি হিমাদ্রিকে দিয়া ভারত সন্তানকে স্বাজাত্যধর্মে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন। এইভাবে আলোচ্য কাব্যটি ঠিক ভারতকাহিনীর বস্তুগত বিবরণ হয় নাই, ইহার মধ্যে কবি 'জাতীয় গৌরবে উজ্জ্বল আর্য জীবন'কে

দেখিতে চাহিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর জীবন চেতনায় পৌরাণিক কথার মধ্যে কবি এই আধুনিকতার আলোকপাত করিয়াছেন।

যাদব নন্দিনী কাব্য (১৮৮০) ॥—কাব্যটির রচয়িতার নাম জানা যায় নাই। সুভদ্রাহরণের কাহিনী ইহাতে সাতটি সর্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। কবি সর্বত্র চিত্রাত্মক বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। রৈবতক অচলে কৃষ্ণ রামের অবসর বিনোদন হইতে দ্বারকায় সুভদ্রাপরিণয় পর্যন্ত ঘটনা কবি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সভা সর্গে সুভদ্রার বিবাহ সম্পর্কে বলরামের প্রস্তাব ও যাদব কুলের মতামত প্রার্থনা অনেকখানি বিস্তৃত বলিয়া মনে হয়। তবে ইহার মধ্যে দুর্যোধন চরিত্রের বিরাটত্বকে কবি কৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বলরাম ভারত রাজন্যবর্গের মধ্যে দুর্যোধনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন—

নিজবলে বলী যেই জন,
সেই ত প্রকৃত বলী, তার পুরুষতা।
কি গুণে ফাল্গুনী রথী দুর্যোধন সম ?
তুলনা হয় কি কভু রাখালে ভূপালে ?[১৫]

বলরাম চরিত্রের দৃঢ়তাও যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। সভাতলে গদাক্ষেপণ করিয়া তিনি দুর্যোধনের সহিত ভগিনীর বিবাহের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণ-কৌশলে তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি হতমান হইয়া খেদ করিয়াছেন—

অভাগা সে নর,
অমৃত গরল তার এ ভব মণ্ডলে
আত্মজন বৈরী যার।[১৬]

সুভদ্রার প্রেম সম্মোহিত রূপ, সত্যভামার সখী সুলভ প্রীতি আচরণ ও কৌশলে ভদ্রার্জুন মিলনের ব্যবস্থাপনা, যুদ্ধ স্থলে অর্জুনের বীর্য প্রদর্শন ও সুভদ্রার সারথ্য, অর্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রত্যাবর্তনে দ্রৌপদীর অভিমান ও সর্বোপরি কূটকৌশলী কৃষ্ণের 'নিপুণ ছলনা জাল', অঙ্কনে কবি কাশীরামের নির্দেশকে যথাযোগ্য কাজে লাগাইয়াছেন।

অভিমন্যু সম্ভব কাব্য (১৮৮১) ॥—প্রসাদ দাস গোস্বামীর 'অভিমন্যু সম্ভব কাব্যটিও ভদ্রার্জুন পরিণয় অবলম্বন করিয়া রচিত। তবে ইহার কাহিনী আরও কিছুটা বিস্তৃত। ভদ্রার্জুন মিলনে অভিমন্যুর আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিয়া কাব্যের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। কাব্যের ঘটনাক্রমের মধ্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই। তবে অভিমন্যুর জন্মের পূর্ব সূত্র প্রসঙ্গে কবি কিছুটা মৌলিকতা দেখাইয়াছেন।

ফাল্গুনীর পরিণয়ে ইন্দ্রের সহিত সমগ্র দেবকুল আনন্দিত হইয়াছেন, কেবলমাত্র শশধরের চিত্ত আনন্দহীন, কারণ কুরুপতি দুর্যোধন অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে এখনি সংগ্রাম শুরু করিবেন। কুরু পাণ্ডবের এই যুদ্ধে বিরাট চন্দ্র বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আপন বংশ লোপ আশঙ্কায় চন্দ্রদেব বিমর্ষ। ইন্দ্র তখন তাঁহাকে জানাইলেন যে সুভদ্রাগর্ভে চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং ষোড়শ বর্ষ পৃথিবী ভোগ করিয়া মর্ত্যধামে বংশ রক্ষা করিয়া আবার তিনি অন্তর্হিত হইবেন। সুভদ্রাও স্বপ্নে এই আনন্দ ও বিষাদময় পরিণতির আভাস পাইয়াছেন। ইহারই ফলস্বরূপ সুভদ্রাগর্ভে অভিমন্যুর আবির্ভাব ঘটে।

কাব্যের প্রধান চরিত্র সুভদ্রা। কবি তাঁহার মহাভারতী চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। সুভদ্রার নারী সত্তায় বীর কন্যা ও বীর জায়া রূপের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে। যাদব রমণীকুলে তাঁহার অস্ত্র ক্রীড়া উপভোগ্য ছিল। পতিগৃহ যাত্রাকালে রুক্মিণী তাঁহার উদ্দেশে বলিয়াছেন—'কে দেখাবে অস্ত্রক্রীড়া রমণী মণ্ডলে'? ইহার চূড়ান্ত পরিচয় তিনি কুরু বীরদের সমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। বীর জায়ারূপে হতচেতন অর্জুনের স্থলে তিনি নিজেই অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। প্রতিযোদ্ধা কর্ণ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন—

অপূর্ব রমণী মূর্তি
ধরিয়া কার্মুক করে, পদে অশ্বরশ্মি,
খেলিছে সমরাঙ্গনে ভৈরবী সমান,[১১]

সুভদ্রার বীর জননী রূপের পরিচয় প্রদানের অবকাশ আলোচ্য কাহিনীতে নাই। মহাভারতী আখ্যানের অনেক পরবর্তী অধ্যায়ে সুভদ্রার এই উজ্জল মাতৃত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। আলোচ্য কাহিনীতে সুভদ্রার মধ্যে অনাগত নবজাতকের জন্য উৎকণ্ঠা জাগিয়াছে। ইহা ঠিক সুভদ্রার বীর রূপের উপযোগী না হইলেও কঠোরতার সহিত কোমলতার মিশ্রণে ইহা তাঁহার চরিত্রকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। যে নারী পিতৃকুল ও স্বামী সান্নিধ্যে বীরাঙ্গনা, সন্তানের স্নেহে ভীরু কোমলতা তাঁহাকে শ্রীহীন করে না। সুভদ্রার দৃপ্ত নারীত্ব মাতৃত্বের কোমলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুভদ্রা বলিয়া অন্যান্য চরিত্রের প্রতি কবি বিশেষ লক্ষ্য দেন নাই। তবে ভীমের ভ্রাতৃবৎসলতা, কৃষ্ণের বন্ধু প্রীতি, কৃষ্ণার কৌতুকপ্রিয়তা ও সপত্নী-প্রীতি প্রভৃতি চরিত্র ধর্মগুলিকে কবি স্বল্প ভাষণে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। আকৃতি অবয়বে কাব্যটি দীর্ঘ—দ্বাদশ সর্গে রচিত। তবে ইহার

মধ্যে কোথাও মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য নাই। মহাভারতের শূর নায়কের জীবন পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীকে কবি মনোজ্ঞ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র।

দুর্যোধন বধ কাব্য (১৮৮৬)॥ জীবনকৃষ্ণ ঘোষের সপ্ত সর্গে রচিত 'দুর্যোধন বধ কাব্য' স্পষ্টতঃ মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের অনুসরণ। মহাভারতের শল্য পর্ব ও সৌপ্তিক পর্বের কিছু কিছু ঘটনা ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সহদেব কর্তৃক গান্ধাররাজ শকুনির নিধনের পর নিঃসঙ্গ দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে মায়ার দ্বারা জলস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মগোপন করেন। সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ সেখানে আগমন করেন। তাঁহাদের ভর্ৎসনা বাক্যে দুর্যোধন আত্মপ্রকাশ করেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে অন্যায়ভাবে ভীমসেন কর্তৃক মৃত্যু আঘাত প্রাপ্ত হন। মুমূর্ষু কুরুপতির নিকট দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আসিয়া পাণ্ডব নিধনের প্রতিজ্ঞা করেন এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষায় পাণ্ডবগণের পরিবর্তে পঞ্চ দ্রৌপদী-তনয়ের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া দুর্যোধন সমীপে উপস্থিত হন। এই দারুণ অহিত কার্যে মৃত্যু পথ যাত্রী দুর্যোধনও বিচলিত হইলেন এবং পূর্বাপর গর্হিত কার্যগুলি স্মরণ করিয়া দারুণ অনুশোচনায় প্রাণত্যাগ করিলেন। কাহিনী অবতারণায় কবি মহাভারতের মূল ঘটনাকেই অনুসরণ করিয়াছেন, তবে কাব্যের ঘটনাবৃত্ত দুর্যোধনকেন্দ্রিক হওয়ায় কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দুর্যোধনের পাপ ও প্রতিহিংসা, তাঁহার পূর্বাপর আচরণের বিবৃতিও কবি প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, গান্ধারী ও কৃষ্ণ চরিত্র, সমগ্র কুরুক্ষেত্র মহাসমরের নীতি ধর্ম ও ন্যায়-অন্যায় আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গান্ধারী চরিত্রের প্রতি কবি সমধিক লক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহার গান্ধারী চরিত্র মহাভারত-অনুগ। তিনি মহাভারতে যে উজ্জ্বল সত্য ধর্মের পরিচয় দিয়াছেন কবি তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার গান্ধারী বলিতেছেন :

"কর্মক্ষেত্র এ সংসার, আপন আযত্তা-
ধীন কর্ম মানবের। ইচ্ছামত কর্ম
করি সদা ক্লেশ পায়। ভুলিযা তাহারা
ধর্মের সতত জয়, ভাবে না অন্তরে
যেবা ধর্ম সেই কৃষ্ণ।"[১৮]

মহাভারতে গান্ধারীর এই সত্যনিষ্ঠার পরিচয় সর্বত্র। তবে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের শেষে তিনি কৃষ্ণকে যাদব কুল ধ্বংসের অভিশাপ দিয়াছেন। আলোচ্য কাব্যে গান্ধারীর এই দুই পরিচয়কে কবি একত্রে দেখাইয়াছেন এবং এই

অভিশাপের কথা ব্যক্ত হইয়াছে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট। কবি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিণতি লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া মহাভারতের পূর্বাপর বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলির এইরূপ একত্র সমাবেশ দেখাইয়াছেন। কবির প্রধান লক্ষ্য দুর্যোধন চরিত্র। এই চরিত্র অঙ্কনে তিনি হয়ত মধুসূদনের রাবণ চরিত্রের কথা ভাবিয়াছিলেন। রাবণের মত দুর্যোধনও মহাভারতের এক দৈবাহত পুরুষ। কিন্তু কবি তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পৌরুষের সঞ্চার করিতে পারেন নাই। দীর্ঘ স্মৃতিচারণা ও স্বগতোক্তির মধ্যে তাঁহার কর্তব্যকর্মের দৃঢ়তা ও সংকল্প বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। স্বকার্যের অনুতাপে তিনি আত্ম দগ্ধ। তিনিই নানা কারণে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অগ্নি প্রজ্জ্বলন করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার অনুচিন্তা। মাইকেলের চিত্রাঙ্গদা রাবণকে যেভাবে রক্ষ বংশ ধ্বংসের জন্য দায়ী করিয়াছেন, দুর্যোধন সেই ভাবে নিজেকেই কুরু কুল ক্ষয়ের জন্য দায়ী করিয়াছেন :

> "রাজার উচিত কার্য
> এই কি করেছ নিজ পাপ ফলে
> মজিলে আপনি হায়, সবারে মজালে।"[১৯]

আত্মানুশোচনার এই আধিক্যের জন্য দুর্যোধন চরিত্র তেমন পৌরুষদৃপ্ত হয় নাই। মহাভারতে দুর্যোধন যে বলিয়াছিলেন—'আজ আমি নিজেকে ইন্দ্রের সমান মনে করছি'—এতখানি অন্তিম প্রশান্তি ও কীর্তি গৌরব কবির দুর্যোধনের নাই। বোধ করি তিনি কাশীরামকে বিশেষ ভাবে অনুসরণ করিতে গিয়া দুর্যোধনকে করুণার সাগরে সলিল সমাধি ঘটাইয়াছেন।

মহাপ্রস্থান কাব্য (১৮৮৭) ॥ দীনেশচন্দ্র বসুর 'মহাপ্রস্থান কাব্য' এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। একবিংশ সর্গে বিভক্ত এই কাব্যটিতে মহাভারতের উপসংহার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কবি পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান কাহিনী বলিতে গিয়া বহু পূর্ব হইতে ঘটনা নির্বাচন করিয়াছেন। অভিমন্যুর সৈনাপত্য হইতে পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত কাহিনী ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তবে শুধুমাত্র কাহিনী বর্ণনাই কাব্যটির উদ্দেশ্য নহে। কবি ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন চিন্তা হিসাবে দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন এবং প্রাচীন কথা কাহিনীর প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে নবযুগের চিন্তা আরোপ করার যুগরীতিটি ইহাতে বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছে।

পাণ্ডব বিলাপ কাব্য (১৮৮৮) ॥ মহাভারতের মুষল পর্ব ও মহাপ্রস্থানিক পর্বের ঘটনাবলী লইয়া হরিপদ কোঁয়ার এই কাব্যটি রচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ

অপ্রকট হইলে পাণ্ডবগণের মধ্যে যে দুঃখের পশরা নামিয়া আসে তাহা কাব্যের প্রথম সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা মহাপ্রস্থান করিলে পথিমধ্যে হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু ও তজ্জনিত পাণ্ডবদের গভীর শোক ইহার দ্বিতীয় সর্গে বিবৃত হইয়াছে। কাশীরামের বর্ণনাকেই কবি সংক্ষেপ করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। পাণ্ডব জীবনে শ্রীকৃষ্ণের অমেয় প্রভাব এবং কৃষ্ণ বিহনে তাঁহাদের নিঃসীম শূন্যতা কাব্যের মূল স্বর। যুধিষ্ঠির হইতে আরম্ভ করিয়া অনুজ ভ্রাতৃবর্গ এবং দ্রৌপদী সকলেই কৃষ্ণ বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন এবং যেখানে কৃষ্ণ বিরাজ করেন সেই আনন্দধামে গমন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাতেই তাঁহাদের মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ। মূল মহাভারতে কালের নির্দেশ উপলব্ধি করিয়া যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের সংকল্প করিয়াছেন। কাশীরামের দৃষ্টান্তে এখানে কবি মহাপ্রস্থানকে কৃষ্ণান্বেষণের উপায় রূপে নির্ধারিত করিয়াছেন। এই কৃষ্ণভক্তির ঐকান্তিকতার পথিমধ্যে দ্রৌপদী দেহ রাখিয়াছেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার পতনের কারণ মহাভারতের অনুরূপ ব্যক্ত করিলেও এখানে দ্রৌপদীর বড় পরিচয় হইয়াছে তাঁহার অপূর্ব কৃষ্ণ-ভক্তি। অর্জুন তাঁহার ভক্তিলব্ধ মুক্তির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন :

> ধন্যা তুমি ধন্যা সতি ধন্য কৃষ্ণভক্তি
> ভক্তি বিনা মুক্তি নাই দেখালে জগতে[২০]

মহাপ্রস্থান ঘটনার মধ্যে যে বিস্তৃতি আছে কবি স্পষ্ট কারণেই তাহা গ্রহণ করেন নাই। জীবন পর্বের শেষ অঙ্কে অস্তায়মান পাণ্ডবকুলের শেষ কৃষ্ণ প্রণামকেই কবি উপজীব্য করিয়াছেন। কৃষ্ণা শুদ্ধা ভক্তিতে আপনার দেহপাত করিয়া বিরহকাতর ভ্রাতৃবর্গের নিকট কৃষ্ণলাভের যথার্থ উপায় নির্ধারিত করিয়াছেন।

নৈশ কামিনী কাব্য (১৮৯৩) ॥ বিপিনবিহারী দে'র 'নৈশ কামিনী কাব্য' দণ্ডী রাজার কাহিনী লইয়া রচিত। দুর্বাসার অভিশাপে উর্বশীর ঘোটকীরূপ প্রাপ্তি ও দণ্ডীরাজা ও ঘোটকীরূপী উর্বশীর প্রণয় কাহিনী ইহাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীর দুইটি অংশ—দণ্ডীরাজা ও উর্বশীর প্রণয় এবং পাণ্ডবদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রণ। এই সংঘর্ষের অন্তর্নিহিত কারণটি কবি কৃষ্ণের মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে বলিতেছেন :

> চিরভক্ত মম পাণ্ডব সকল
> বাড়াতে তাদের মান।
> জ্বেলেছি ভীষণ সমর অনল
> করিব বিজয় দান[২১]

আশ্রিত বৎসল পাণ্ডবগণ কেবলমাত্র ধর্মের অনুজ্ঞায় অভিপ্রায়ে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে নামিয়াছেন। ধর্ম প্রণোদিত কৃষ্ণ-বৈরিতার মূলে রহিয়াছেন ভীম। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠাকে কবি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। পাণ্ডবগণ যেমন সত্যনিষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি ভক্ত বৎসল। মহাভারতী কৃষ্ণের রাজসিক রূপ ইহাতে কিছুটা প্রকাশ পাইলেও তাহাকে বহুলাংশে ছদ্মবেশ বলিয়া মনে করা যায়। আসলে ভক্তবিনোদ শ্রীকৃষ্ণ এই মহা পরীক্ষায় ত্রিলোকে পরমভক্ত পাণ্ডবকুলের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাণ্ডব কৃষ্ণের সংগ্রামে কবি যে দেবকুলের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে পৌরাণিক দেব কল্পনার বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে। তাঁহারাও ধর্মের গভীরে প্রবেশ করেন নাই। কৃষ্ণের নির্দেশে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারাও মানবিক অসূয়া ও প্রতিহিংসা পোষণ করিয়াছেন। বিশেষ ভাবে ভীমের প্রতি বলদেবের উক্তিতে মানবিক ক্রোধ ও বিদ্বেষের পরিচয় একান্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অনুরূপ ভাবে মহামায়ার চরিত্রও মানবিক সীমায় আসিয়া পড়িয়াছে। মহাদেবের প্রতি তাঁহার তিরস্কার দেবসুলভ হয় নাই। এই অসম সংগ্রামে দেবকুলের আত্মবিস্মৃতি পরোক্ষভাবে পাণ্ডবদেরই মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এইভাবে কাহিনীর অন্তর্নিহিত ভাবটিকে কবি সকল দিক দিয়াই পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন।

হেমচন্দ্র ।। হেমচন্দ্রের কীর্তিধ্বজা 'বৃত্রসংহার কাব্য' পৌরাণিক কথাবস্তু লইয়া রচিত। ইন্দ্র বৃত্রের সংঘর্ষ বেদের যুগ হইতেই পাওয়া যায়। এই বৈদিক সূত্র মহাভারত ও পুরাণে বৃত্রাসুর ইন্দ্র কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে। ইন্দ্রের বৃত্রবধ কার্যে সহায়তা করিয়াছেন ঋষি দধীচি। তিনি দেবগণের হিতার্থে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেই দেহাস্থি হইতে বজ্রের উৎপত্তি, তাহাতেই বৃত্রের বিনাশ ঘটিয়াছে। মহাভারতের বনপর্বে এই বৃত্রাসুর কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। যুধিষ্ঠিরের তীর্থ যাত্রাকালে লোমশ মুনি তাঁহাকে বৃত্রাসুরের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। কাশীরাম দাসের এই কাহিনী অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে। বলরাম ব্রহ্ম বধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তীর্থ পরিক্রমণ কালে এক সময় দধীচি তীর্থে উপনীত হন। গদাপর্বে দধীচি তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন প্রসঙ্গে বৃত্রাসুর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় বৃত্রাসুর সংহারের কাহিনী ঠিক মহাভারতী মূল ঘটনার কোন অংশ নহে, পুরাণ ও মহাভারতের বৃত্র, ইন্দ্র ও দধীচি লইয়া সংঘটিত একটি পৌরাণিক কাহিনীকেই কবি কাব্যরূপ দিতে চাহিয়াছেন। তবে ইহার সর্বত্র পৌরাণিক কাহিনীর যথার্থতা রক্ষিত হয় নাই, কবির নিজের উক্তিতে

"সকল বিষয়ে কিংবা সকল স্থানে পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করি নাই।"[২২] পৌরাণিক কাহিনীর সহিত কবির স্বাধীন কল্পনার সংযোগে ইহা রচিত হইয়াছে।

বৃত্রসংহারে কবির আখ্যানবস্তু নির্বাচন ও পরিকল্পনার বিশালতা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবী রাখে। আখ্যানবস্তুর মধ্যেই একটি মহিমা আছে যাহাকে রবীন্দ্রনাথও এককালে বলিয়াছিলেন, স্বর্গ "উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের বিনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের বিষয়।" আর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কবির তৃতীয় নয়ন দেবকুলর দানবকুল ও মানবকুলের অন্তর প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করিতে চাহিয়াছে। কবি যেভাবে স্বর্গ মর্ত্য পাতালে পাদচারণা করিয়াছেন, সাধনা সংগ্রাম ও সিদ্ধির রাজসিক আয়োজন করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি ও বিশালতার দ্যোতক। কিন্তু এই বিরাট পরিকল্পনা অনেক ক্ষেত্রে কবিকে সংকুচিত করিয়াছে; তাঁহাকে 'ভাবের স্বাধীন লোকে' উড়িয়া যাইবার অনুমতি দেয় নাই। কবি পৌরাণিক ধর্মচেতনার অমৃত হ্রদে আট্‌কা পড়িয়াছিলেন, যাহা কিছু আয়োজন সমস্তই সেই দেবলোকের মহিমা বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হইয়াছে। দেবকুলের ভাগ্য বিপর্যয়ের আলোচনা, ইন্দ্রের তপস্যা, ব্রহ্ম ও শিবলোকে অধ্যাত্ম পরিবেশ, দধীচির মহান আত্মত্যাগ, এমন কি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার বিচিত্র কর্মশালার যে গম্ভীর ও সমুন্নত চিত্র কবি আঁকিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিষয়ানুগ রূপায়ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার সমান্তরালে কবি তাঁহার দুরন্ত দানব সন্তানকে কোন বৈভবই দান করেন নাই। বৃত্রসংহারে বৃত্র কবির উপেক্ষিত চরিত্র, একমাত্র উপাস্য দেবাদিদেবের অনুগ্রহই তাহার সম্পদ। দেবকুলের শৌর্য বীর্যের পূর্ণ আয়োজন করিয়া এবং দানবকুলকে মহিমা ও বীর্য হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া কবি এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করিয়াছেন। ইহা ঠিক মহৎ পরিকল্পনার মহৎ রূপায়ণ নহে। এ দিক দিয়া মধুসূদনের কাব্য-কৌশলকে সার্থকতর বলা যায়। তিনি স্পষ্টভাবে মেঘনাদকে তাঁহার মানসপুত্র বলিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মণকে মেঘনাদের সমকক্ষ প্রতিনায়ক রূপে গড়িয়া তুলিতে তাঁহার কার্পণ্য নাই। অসম প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট মৃত্যু বেদনাদায়ক, মধুসূদন এ মৃত্যু হইতে মেঘনাদকে মুক্তি দিয়াছেন। বৃত্রের মৃত্যু বেদনাময়, একটি ক্ষুদ্র শক্তিকে বিনষ্ট করিবার জন্য বৃহৎ কর্মোদ্যোগ। আবার মধুসূদনের নবরূপায়ণের যাহা মাল মশলা, হেমচন্দ্রের তাহা নহে। প্রতিভার তারতম্য একটা ছিলই, তাহা লইয়া পরস্পরের তুলনা নিষ্ফল। একজন যাহা পারেন, অন্যে তাহা না পারিলে তাহার

ব্যর্থতাকে পদে পদে ধিক্কার দেওয়া সমীচীন নয়। তবে এইটুকু বলা যায়, মধুসূদন তাঁহার চরিত্রকে ঢালিয়া সাজাইবার জন্য কবি মানসের বিচিত্র সঞ্চয় ছাড়া দেশকালের নিকট হইতেও যে উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন, হেমচন্দ্রের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। সংস্কার মুক্তির প্রেরণা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, মানবতাবাদ, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি দেশকালের জ্বলন্ত জাগ্রত চিন্তাধারা লইয়া মধুসূদন চরিত্রের পুরাতন রূপের উপর প্রলেপ দিয়াছেন। তাঁহার এই প্রেরণা ও চেতনাগুলি সবই প্রযুক্ত হইয়াছে রক্ষকুলের প্রতি। সেইজন্যই রাবণ-মেঘনাদ মহত্তর রূপ লইয়া পূর্ব সংস্কারকে ছিন্ন করিতে পারিয়াছে। পক্ষান্তরে হেমচন্দ্র ধরিয়াছেন একটি চেতনাকে, তাহা হইল স্বদেশ প্রেমের চিন্তা, উনবিংশের জাতীয়তাবোধ, কিন্তু তাহাও প্রযুক্ত হইয়াছে নির্যাতিত দেবকুলে। আবার ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এক দেব কল্প চরিত্রের আত্মদান। হেমচন্দ্রের সমস্ত উপকরণ বিপরীত শিবিরে সন্নিবিষ্ট হইয়া দেবারিকুলের সমূহ সম্ভাবনা বিনষ্ট করিয়াছে, পৌরুষহীন পরপীড়ক বৃত্রাসুরের পক্ষে এইরূপ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্ব সংস্কার মুছিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। এইভাবে দেখা যায় বৃত্রসংহার কাব্যে দুইটি চিন্তার বিশেষ সমাবেশ ঘটিয়াছে—দেশের বহির্জীবনের উত্তপ্ত জাতীয়তাবোধ এবং দেশের অন্তর্জীবনের পৌরাণিক সংস্কার। পৌরাণিক সংস্কার রক্ষার জন্য জাতীয়তাবোধ যথেষ্ট হওয়ায় তিনি এইখানেই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। স্বর্গচ্যুত দেবকুলের মর্যাদা রক্ষিত হইবে, বলদর্পী অসুরকুলের বিনষ্টি ঘটিবে তাহাতে জাতীয়তাবোধের সার্থকতা আসিবে। এইজন্য জাতীয়তাবোধ বৃত্রসংহারের একটি অন্তর্নিহিত সুর। হেমচন্দ্রের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে ইহাকেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার জাতি বৈর আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে বৃত্রসংহার কাব্য মূলতঃ জাতি বৈরেরই কাব্য—"দেবারাধনা বা পরহিতব্রত বৃত্রসংহারের আসল কথা হইলেও ঐ দুটি কথা লুকান ছাপান আছে। কিন্তু জাতি বৈর কাব্যে ওতপ্রোত।"[২৩] প্রথিতযশা সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও বৃত্রসংহারের কাব্যমূল্য নির্ধারণ করিতে গিয়া অনুরূপ কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন "জাতি বৈরের কাব্যের হিসাবে বৃত্রসংহার বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ভাবে, রসে ও ধাঁচে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।"[২৪] তবে অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যে কিছুটা স্ববিরোধ আছে। তিনি শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন—"স্বজাতি প্রেমে হেমবাবু পৌঁছিতে পারেন নাই, বিজাতি বৈর পর্যন্ত তাঁহার কবিত্বের সীমা।"[২৫] কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে সেদিনের দেশমানসে যে বিজাতি বৈরের উগ্রতা দেখা দিয়াছিল,

তাহা স্বজাতি প্রেম বা জাতীয়তাবোধেরই অপর দিক। হেমচন্দ্র নিঃসন্দেহে এই দেশপ্রীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৃত্রসংহার কাব্যে দেশপ্রীতির প্রেরণা দেবগণের স্বর্গরাজ্য উদ্ধার ও স্বাধীনতা লাভের মধ্যে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে আর ইহার জন্য যে অন্তর্জ্বালা তাহা দেব চরিত্রগণের মধ্যে শত্রুদ্বেষের বহ্নি অনির্বাণ রাখিয়া দিয়াছে। এই জাতি বৈর রক্ষা করিতে গিয়া হেমচন্দ্র আমাদের সংস্কারকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, ইহার পুনর্বিচারের আবশ্যকতা বোধ করেন নাই।

হেমচন্দ্রের কাব্যে সংস্কার রক্ষার কারণ নির্ণীত হইল। এইবার দেখিতে হইবে তিনি ইহা কতখানি রক্ষা করিয়াছেন এবং কাব্যোৎকর্ষে ইহার উপযোগিতা কতখানি।

ভারতের মহাকাব্য বা পুরাণ কথা কতকগুলি সাধারণ সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছে। সেখানে দেখা যায় দেবতাদের মধ্যে সাত্ত্বিকতার সাধনা বড আর দৈত্যদের মধ্যে তামসিকতা প্রবল। এইজন্য উভয়ের ভাগ্য ভিন্ন প্রকৃতির। দৈত্যকুল বারে বারে দেবতাদের উৎপীড়িত করিয়াছে, কিন্তু সাধনায় তাহারাও বড কম নহে। তপস্যার কঠোরতা, ধৈর্য ও স্বজন প্রীতিতে তাহারা দেবকুলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। পুরাণ নীতি তপস্যার পথে কাহাকেও বাধা দেয় না। কিন্তু তপস্যার ফল যখন সত্যকে পদদলিত করে, তখন অদৃষ্ট আসিয়া তাহা ধ্বংস করে। এই অদৃষ্টের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। দেব দৈত্য সকলেই এই অদৃষ্টের কুক্ষিগত। পুরাণ চেতনার এই তিন স্তরই বৃত্রসংহার কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। বৃত্রের সাধনা কঠোর, তাহার ফলে সে অপরাজেয় শক্তির অধিকারী হইয়াছে—

> "মুণ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল,
> গঙ্গাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিনু।
> সিদ্ধ হইনু শিববরে খ্যাতি ত্রিভুবনে।"[২৬]

কিন্তু বৃত্র এই তপস্যাব ফল রাখিতে পারে নাই, স্বর্গরাজ্য বিজয় পর্যন্ত তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহতভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এখনও তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই, ইহা শক্তি ও সাধনার ফল, যাহা মহাদেবের বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু এই শক্তি যখন নীতিকে লংঘন করে, উদ্ধত হইয়া বিশ্ববিধানকে অস্বীকার করে, তখনই তারা নিয়তিকে ডাকিয়া আনে। শচীর লাঞ্ছনা ও অপমানে দানবকুলে নিয়তি নামিয়া আসিয়াছে। ঐন্দ্রিলার অবাঞ্ছিত ও উদ্ধত অভিলাষ,

বৃত্রাসুরের দ্বারা সেই অভিলাষ পূরণের আয়োজন, রুদ্রপীড় কর্তৃক সেই গর্হিত কার্য সম্পাদন—সব মিলিয়া দৈত্যকুলের অনিবার্য ধ্বংস টানিয়া আনিয়াছে। বৃত্রাসুরও এই পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন—

> "বৃত্রের সম্বল—চন্দ্রশেখরের দয়া,
> চিরদীপ্ত চিরন্তন প্রাক্তন বিভাস
> সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হইতে বাম!—
> দানবি, দৈত্যের কুল উন্মূল তো হতে।"[২৭]

শচীর অপমানকে কেন্দ্র করিয়া অধর্মের এই পরাজয় ঘটিয়াছে। ইহাতেই মহাদেবের বর শিথিল হইয়াছে, নিয়তি তৎপর হইয়াছে। হেমচন্দ্র ভারতীয় জীবনধারার এই নীতি নির্দেশকে সার্থক ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণ কথায় এই নীতিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাবণের প্রতাপ বন্দিনী সীতার অভিশাপে বিনষ্ট হইয়াছে, মহাভারতে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনার অধিপতি কুরুরাজকে সতীলাঞ্ছনার আত্মাহুতি দান করিতে হইয়াছে। শচীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে বৃত্রাসুরও যে বিনষ্ট হইবে কিংবা ঐন্দ্রিলা যে উন্মাদিনী হইবে, তাহাতে আশ্চর্য নাই।

নিয়তি বিধানকে ভারতীয় জীবনচর্যা একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। ইহা গ্রীক নিয়তিবাদ নহে। সেখানে নিয়তি একটি অন্ধ শক্তি মাত্র, মানুষ তাহার কোন ইঙ্গিত বুঝিতে পারে না। বিরাট বনস্পতি যেমন আকস্মিক ঝড়ে ভাঙিয়া পড়ে, তেমনি সেই নিয়তি আচম্বিতে জীবনকে গ্রাস করিয়া ফেলে। সেখানে 'নিয়তির সঙ্কট চক্রান্ত' নীতি লংঘন বা অপরাধ হইতে গড়িয়া উঠিলেও তাহার ইশারা ও আবির্ভাব বহুলাংশে অদৃশ্য থাকে। কিন্তু ভারতীয় প্রকৃতিতে এই শক্তির ক্রিয়া অন্যরূপ। ইহার আভাস অনেকটা স্পষ্ট। বৃত্র সংহারের নিয়তিবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: "পৌরাণিক দেবতাগণ সকলকেই ঐশী শক্তির অতীত আর একটি শক্তির অধীন দেখা যায়। যাঁহারা পুরাণাদিতে জগদীশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তাঁহারাও সর্বশক্তিমান বা ইচ্ছাময় নহেন। তাঁহাকেও উদ্যোগ করিয়া কার্য সিদ্ধ করিতে হয় এবং সময়ে সময়ে বিফল যত্ন হইতে হয়। দশবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে পৃথিবীর ভার মোচন বা ভক্তের উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। মহাদেব সমুদ্র মন্থন করাইয়াও বিষ ভিন্ন কিছু পাইলেন না। অন্য দেবতাদিগের ত কথাই নাই। যত্ন এবং তাহার বিফলতা থাকিলেই সুখ দুঃখ আছে। অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণ্বাদির এই সুখ

দুঃখ কোন শক্তিতে? পুরাণাদিতে সে শক্তির নাম নাই। হেমবাবু তাহার নিয়তি নাম দিয়া তাহাকে দেহবিশিষ্ট করিয়াছেন।"[২৮] কুমেরু শিখরে সুরপতি ইন্দ্রকে নিয়তি তাহার অমোঘতার কথা ব্যক্ত করিয়াছে:

"অন্যথা সূচ্যগ্রে যদি হয় লিপি এর,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণ তিলেক না রবে,
খণ্ড খণ্ড হবে ধরা, শূন্য জলনিধি
বিশাল শৈলেন্দ্র পূর্ণ হবে অচিরাৎ।"[২৯]

দৈত্যকুলে তামসিকতার সাধনা ও নীতি লংঘনের দুরন্ত সাহস দেখাইয়া কবি তাহাদের যেমন বিনষ্টি ঘটাইয়াছেন, তেমনি দেবকুলে সাত্ত্বিকতার প্রকাশ দেখাইয়া, তাঁহাদের উপর মহিমান্বিত বীর্যের আরোপন করিয়া ও সর্বোপরি দেবোপম চরিত্র দধীচির মহৎ আত্মদান ঘটাইয়া তিনি ভারতীয় আদর্শের ইতিবাচক রূপটিরও উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

বৃত্রতাড়িত দেবকুল পাতালপুরে আপনাদের ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা আলোচনা করিতেছেন; ওদিকে কুমেরু শিখরে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রের নিধন উপায় জানিতে নিয়তির পূজায় আত্মনিবিষ্ট। নিয়তির নিকট বৃত্র নিধনের আভাস পাইয়া তিনি মহাদেবের নিকট ইহার উপায় জানিতে চাহিলেন। সমগ্র ক্ষেত্রেই ইন্দ্রের কঠোর ধৈর্য পরীক্ষা। নিয়তির ধ্যান হইতে সংগৃহীত দধীচি অস্থিতে বজ্র নির্মাণ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি অপূর্ব সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। এই 'সাধনা ও আরাধনা'ই শত্রু বিনাশে ইন্দ্রের পাথেয়। ইন্দ্র চরিত্র বৃত্র সংহারে অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। বহু সাধনার শেষে তিনি শত্রু সংহারে নামিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশ্য নিষ্ক্রিয়তাকে কবি তাঁহার নেপথ্য সাধনার দ্বারা পূরণ করিয়া দিয়াছেন।

আবার দৈত্যকুলের বীর্যবত্তার কম পরিচয় বৃত্র সংহারে নাই। স্বয়ং বৃত্র মহা পরাক্রমশালী, বীরপুত্র রুদ্রপীড়ও তাহার যোগ্য সন্তান। কিন্তু এই প্রমত্ত বীর্যবত্তার কোন গৌরব নাই। দেবকুলের বীর্য মহত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া যায় না। রুদ্রপীড় নিহত হইলে সারথির প্রার্থনায় ইন্দ্র বলিয়াছেন:

"এহেন বীরের শব পবিত্র জগতে,
চিন্তা নাহি কর চিতে, আমি সে দিব বহিতে
এ বীরেন্দ্র মৃতদেহ, নিজ পুষ্পরথ—
ইথে লয়ে পূর্ণ কর বীর মনোরথ।"[৩০]

অনুরূপভাবে শচীর মাতৃস্নেহ জয়ন্তের সহিত ইন্দুবালাকেও অভিষিক্ত করিয়াছে। মাতৃত্বের কোন সীমা নাই। ঐন্দ্রিলার দম্ভ বা পীড়ন ইন্দুবালার প্রতি তাঁহার অপ্রীতি সঞ্চার করিতে পারে নাই।

সর্বোপরি দধীচির আত্মদান কাব্য মধ্যে কল্যাণাদর্শের উজ্জ্বলতম উদাহরণ। দধীচি শিষ্যকুল তথা মানবকুলকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিয়াছেন—

"... .. জগত কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্মপালনে,
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"[৩১]

সর্বশেষে, হেমচন্দ্রের এই নৈতিক আদর্শ বৃত্রসংহারের কাব্যোৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে কিনা একটু ভাবিয়া দেখিতে হয়। একটি সহজ সরল নীতিধর্মের প্রকাশ ঘটিয়াছে বলিয়াই কি কাব্যটি রসোত্তীর্ণ নহে? আমাদের মহাকাব্যে ত নীতি ধর্ম একেবারে স্পষ্ট এবং তাহাদের মত আবেদন আর কোন কাব্যের আছে? বস্তুতঃ বৃত্রসংহারে রসোস্ফূর্তির ব্যাঘাত এজন্য ঘটে নাই। আমাদের মনে হয়, তিনি কাব্য ও জীবনের প্রতি দুইটি স্বতন্ত্র জিজ্ঞাসা রাখিয়াছিলেন। তিনি জীবনের দিক হইতে চাহিয়াছিলেন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা আর কাব্য বা সাহিত্যের দিক হইতে করিয়াছিলেন এক tragic hero-র কল্পনা। প্রাচীন জীবন চর্যায় কাব্য ও জীবন পৃথক ছিল না, উচ্চ নৈতিক আদর্শ জীবন ও সাহিত্যে পাশাপাশি প্রতিফলিত হইয়াছে, জীবন নীতিভ্রষ্ট হইলে সাহিত্য তাহাকে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে। নীতির অতিরেক সেখানে সাহিত্যের শ্রীভ্রষ্ট করে নাই। আধুনিক কালে সেই বহিষ্কৃত চরিত্রকে tragic hero বলিয়া কল্পনা করিতে হইলে, তাহার মানবিক সম্ভাবনাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হয়। এই আবশ্যিক কবি-কর্মটুকু না করিতে পারিলে সেই চরিত্রের জন্মান্তর সম্ভব নহে। মধুসূদনের কবিকর্ম এইজন্য সফলতা লাভ করিয়াছিল। তিনি রাবণ চরিত্রের অপচিত সম্ভাবনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রে চরিত্রের মুখ চাহিয়া পুরাতন বিশ্বাস সংস্কারকে কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করা দোষাবহ নহে। হেমচন্দ্র কাব্যের প্রয়োজনে এই আবশ্যিক ত্যাগটুকু করিতে পারেন নাই। কাব্যের প্রয়োজনে বৃত্রকে শিবের মত তিনিও অভয় বর দান করিয়াছেন, কিন্তু জীবনাদর্শের জন্য তাহা আবার প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। বৃত্র চরিত্র এবং সামগ্রিকভাবে বৃত্র সংহার কাব্য এইজন্য আদর্শের আহুতি হইয়া গিয়াছে, কাব্য হিসাবে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

নবীনচন্দ্র ।। গীতা অনুবাদ ও ত্রয়ীকাব্য রচনায় নবীনচন্দ্র মহাভারতী উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রয়ীকাব্যের প্রথম কাব্য 'রৈবতক' রচনার পরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। রৈবতকের কৃষ্ণ চরিত্র প্রধানতঃ ভাগবত ও মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে। অতঃপর তিনি ফেণীতে পণ্ডিত অভযানন্দ তর্করত্নের সাহায্যে মূল সংস্কৃত গীতা পাঠ করেন। শাঙ্কর ভাষ্য কিংবা অন্যান্য টীকার সাহায্য অপেক্ষা মূল গীতা পাঠ করিয়াই তিনি তৃপ্তি পাইতেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"গীতা যতই পড়িতে লাগিলাম, আমি ততই যেন কি এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম এবং কৃষ্ণভক্তিতে আমার হৃদয় ততই পূর্ণ হইতে লাগিল। গীতা শেষ করিয়া আমি বহুদিন পর্যন্ত আত্মহারাবৎ ছিলাম।"[৩২] সুতরাং বলা যাইতে পারে গীতা অনুবাদের পিছনে তাঁহার একটি আন্তরিক প্রেরণা ছিল। গীতার নিষ্কাম ধর্ম সেই যুগের বহু মনীষীর মত তাঁহাকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল, আবার তিনি ইহার মধ্যে বৌদ্ধের নির্বাণতত্ত্বেরও সামীপ্য অনুভব করিয়াছিলেন। গীতার 'বক্তব্য' আলোচনায় তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের এই যোগাযোগ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে তাঁহার এই অনুবাদটি প্রাঞ্জল হয় নাই। নবীনচন্দ্রের নিজস্ব কল্পনা ইহাতে আরোপিত হইতে পারে নাই বলিয়া বোধ হয় ইহার ভঙ্গীটি তেমন স্বাভাবিক হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবাদ আক্ষরিক হওয়ায় কবিতার যে স্বতঃস্ফূর্তি তাহা ইহাতে পাওয়া যায় না।

ত্রয়ীকাব্য ।। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস বা একত্রে ত্রয়ীকাব্য নিঃসন্দেহে নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। তাঁহার কবি মনের কল্পনা ও ব্যক্তি মনের ঐকান্তিক বুভুক্ষা ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ এই ত্রয়ী কাব্যে তিনি ব্যক্তি মনের একটি প্রবল বাসনাকে কবি কল্পনায় রূপ দিয়াছেন। এই কবিকল্পনা অতিরিক্ত আবেগে সময়ে সময়ে বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া কবিকৃতিতে তিনি নিরঙ্কুশ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার নিজের যে একটি 'মিশন' ছিল, যাহা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার আলোকে বর্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছে, তাহা তিনি এই কাব্য কয়টিতে ক্রম পরম্পরায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিকল্পনার ব্যাপকতা এবং কবিকৃতির সাফল্য ও দৈন্য একে একে আলোচনা করিব।

পরিকল্পনা : ব্যক্তি মনের একটি বিশিষ্ট উপলব্ধিতে কবি তাঁহার ত্রয়ী-কাব্যের পরিকল্পনা করেন। এই উপলব্ধি হইল মহাভারতের মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের

জীবনচিন্তা ও তাহা জাতীয় জীবনে অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা। যুগ ও জীবনের প্রেক্ষাপটে নবীনচন্দ্র মহাভারতীয় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা নূতন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। এই মহিমার কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি ভক্তিতত্ত্ব ও আদর্শের প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন।

প্রথমতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকে ভক্তিপ্লুত চিত্তে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। এই অনুভূতির ক্ষেত্র তাঁহার নিজের হৃদয়। এ ক্ষেত্রে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উপাস্য হইয়াছে। যে কৃষ্ণ হিন্দু শাস্ত্রে অলৌকিক ঐশী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান রূপে কল্পনা করা হয়, তাঁহাকে তিনি অন্তরের প্রণাম নিবেদন করিতে চাহিয়াছেন। যুগ-জীবন ও যুক্তি সংশয়ের ঊর্ধ্বে ইহা কবির এক নিঃশ্রেয়স আত্মনিবেদন। ইহা ভারত-ধর্মের চিরকালীন ভক্তিবাদ। নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্য রচনার পশ্চাতে এই প্রবল ভক্তিবাদের দ্বারা আন্দোলিত হইয়াছিলেন। রৈবতক রচনার প্রারম্ভে কবির এই ভক্তি চেতনাকে লক্ষ্য করা যায়:

> সেখানে (শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরে) বসিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হইল। উৎসবে উৎসবে অসংখ্য যাত্রীর ভক্তির প্রবাহে আমার পাষাণ হৃদয়ও কৃষ্ণভক্তিতে আর্দ্র হইল। সেই সময় আমি ভাগবতের একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিতাম এবং উদ্বেলিত হৃদয়ে একাকী নির্জন সমুদ্র সৈকতে বসিয়া সমুদ্রের লহরী লীলা দেখিতে দেখিতে আমি কৃষ্ণলীলার লহরী ধ্যান করিতাম।[৩৩]

আবার কুরুক্ষেত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন:

> রৈবতক, কুরুক্ষেত্র আমি কেন লিখিয়াছি, তাহাদের চরিত্রাবলী কেন এরূপ-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছি, জরৎকারুর চরিত্রই বা কেন এরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছি, তাহা আমি কিছুই জানি না। কোনও এক অজ্ঞাত শক্তি যেরূপ ভাবে লেখাইয়াছেন, আমি সেরূপ লিখিয়াছি।[৩৪]

প্রভাস কাব্য সম্বন্ধেও কবির উক্তি উদ্ধৃত করা যায়:

> প্রভাসের 'বীণাপূর্ণতান' সর্গ লিখিয়া যেখানে জরৎকারু ভগবানের শ্রী অঙ্গে অস্ত্রত্যাগ করিতেছে, সে স্থানে আসিয়াছি। অনন্ত ভক্ত সেবিত কুসুমকোমল শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রপাতের কথা আমি পাষাণ হৃদয়ে কেমন করিয়া বলিব। আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, আমার চক্ষু ফাটিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতেছে।[৩৫]

সুতরাং দেখা যায়, এই কাব্য কয়টি লিখিবার সময় কবির একটি 'আবেশ' উপস্থিত হইত। কবির নিজের ভাষায় "এই তিনখানি কাব্য লিখিবার সময়ে প্রায়ই কখন বা ভাবে, কখন বা ভক্তিতে, কখন বা করুণ রসের উচ্ছ্বাসে কপোল বহিয়া অশ্রুধারা বহিত।"[৩৬] যে পরিমিত আবেগ কাব্য সৃষ্টির সহায়ক, ইহা হয়ত তাহা অপেক্ষা অধিক, সেই জন্য কাব্যের রূপ নির্মিতিতে কবির অভিনিবেশ ছিল না, ভক্তিরসের বন্যায় তিনি কাব্য রীতিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ভক্তির দ্বারা এইভাবে ভগবানকে গ্রহণ এবং তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ কাল ও যুগ নিরপেক্ষ তাঁহার প্রথম প্রেরণা।

অতঃপর তত্ত্বের প্রেরণা। এই চেতনাটির ক্ষেত্র প্রাচীন ভারতবর্ষ। এক্ষেত্রে মহাভারত-এর কৃষ্ণ তাঁহার লক্ষ্য হইয়াছে। মহাভারতী শ্রীকৃষ্ণের অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যে একদিন খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতভূমিতে মহা ঐক্যের সূচনা করিয়াছিল, মানবিক শক্তির সার্থকতম প্রকাশের দ্বারা তিনি যে রাষ্ট্রীয় সংহতি রচনা করিয়াছিলেন, সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কবি আধুনিক যুগ ও জীবন হইতে পর্যালোচনা করিতেছেন। সে যুগের সামাজিক বিভেদ, রাষ্ট্রীয় অনৈক্য কিরূপে একটি ঐশী শক্তি সম্পন্ন মানুষের দ্বারা বিদূরিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়া তিনি এ যুগের সংকট-সঙ্গীন জীবনযাত্রার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। রৈবতকের সপ্তদশ সর্গে—মহাভারত পরিকল্পনায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন:

> "এক ধর্ম, এক জাতি
> একমাত্র রাজনীতি
> একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত
> জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত।
> ততদিন হিংসানল
> হায়! এই হলাহল
> নিভিবে না, আত্মঘাতী হইবে ভারত
> আর্য জাতি, আর্য নাম, হবে স্বপ্নবৎ।"[৩৭]

শ্রীকৃষ্ণের এই মহাভারত গঠনের পরিকল্পনাকে নবীনচন্দ্র অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে বিভেদ বিচ্ছিন্ন দেশের মধ্যে অনুরূপ জাতীয়তা-বোধের উদ্বোধনের দ্বারা একটি ঐকময় মহাভারত রচনা করা যায়—এই মৌল তত্ত্বের উপর কবির কাব্যত্রয়ীর প্রতিষ্ঠা।

সর্বশেষে এইরূপ সুবিশাল পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য এক মহান ও উদার

আদর্শের প্রেরণা। এই চেতনাটি কবির সমকালীন যুগচিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সমকালীন জাতীয় চিন্তা একটি সমন্বয় আদর্শের দিকে ঝুঁকিতেছিল। এই সময় জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে যাঁহারাই আসিয়াছিলেন, গঠনাত্মক কর্মসূচী হিসাবে তাঁহাদের মধ্যে একটি মিলন প্রয়াসের আকাঙ্খা মূর্ত হইয়াছিল। নবীনচন্দ্রের মধ্যেও এই সমন্বয় ধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও শ্রীকৃষ্ণের মুখে তিনি বলাইয়াছেন 'অধর্মের শেষ ধ্বংস নিয়তি ভীষণ' এবং কৌরবের অধর্মাচরণে তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—

"আমার জীবন ব্রত চলিল ভাসিয়া,
জীবনের শ্রম মম হইল বিফল।"[৩৮]

তথাপি তিনি যে মহান নিষ্কাম ধর্মের প্রবর্তনা দিয়াছেন, তাহাই অধর্মের ঊর্ধ্বে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয়—

"সাম্রাজ্যে সমাজে ধর্মে করিয়া সঞ্চার
নিষ্কামত্ব দেখাইয়া সর্বভূতময়
নারায়ণ কি নিষ্কাম, করিব সংসার
প্রীতিময়, শান্তিময়, সর্ব সুখালয়।"[৩৯]

আবার অভিমন্যু নিধন শেষে সুভদ্রা বলিতেছেন:

"সুলোচনা মাতৃপ্রেম, অভিমন্যু আত্মদান
নব ধর্মরাজ্য ভিত্তি, চূড়া তার কৃষ্ণনাম
সাঙ্গ বীরব্রত, লও ধর্মব্রত শ্রেষ্ঠতর
মাখি পুত্র ভস্ম বুকে হও কর্মে অগ্রসর।"[৪০]

এই নিষ্কাম ধর্মের অত্যুচ্চ আদর্শ, যাহার দ্বারা অধর্মকে জয় করা যায়, পুত্রশোককে তুচ্ছ করা যায়, তাহাই কাব্য মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণোক্ত এই মহাবাণীতে দীক্ষিত হইলে জাগতিক কোন ক্ষতিতে বিমর্ষ হইতে হইবে না। যুগের সংশয় ও সংকটে এইরূপ উদার চরিত্র নীতিই একমাত্র সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে পারে। নবীনচন্দ্রের সমন্বয় আদর্শের মূল চিন্তাটি এইখানে।

কাহিনী বিন্যাসে মূল কথা ও মৌলিকতা: ত্রয়ী কাব্যে নবীনচন্দ্র মহাভারতের কয়েকটি ঘটনাকে স্থূলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। রৈবতকের মধ্যে অর্জুনের বনবাস ও সুভদ্রা হরণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের প্রধান উপজীব্য অভিমন্যু বধ এবং প্রভাসের কাহিনী কৃষ্ণ জীবনের অন্তিম পরিচ্ছেদ-

লইয়া রচিত। প্রথম দুইটিতে কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা যেমন মুখ্য বিষয়, প্রভাসে তেমনি যদুবংশ ধ্বংস এবং কৃষ্ণের তনুত্যাগই প্রধান কথা। কাব্যত্রয়ীতে নবীনচন্দ্র মহাভারতী কথার কোন আনুপূর্বিক বিবরণ না দিয়া ভারত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী মহিমা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। এইজন্য দেখা যায়, কাহিনী বিন্যাসে তিনি মহাভারতকে যথাযথ অনুসরণ করেন নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি পুরাণ হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

'রৈবতক' এর কাহিনী মহাভারতের আদি পর্বের সুভদ্রাহরণ কাহিনী লইয়া রচিত। বনবাসকালীন অর্জুন প্রভাস তীর্থে সমাগত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া রৈবতক পর্বতে লইয়া গেলেন। সেখানে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়দের মহোৎসবে অর্জুন কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগ্নী সুভদ্রাকে দর্শন করিয়া আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন "ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বয়ংবর বিহিত, কিন্তু স্ত্রী স্বভাব অনিশ্চিত, কাকে বরণ করবে কে জানে। তুমি আমার ভগ্নীকে সবলে হরণ কর, ধর্মজ্ঞগণ বলেন এরূপ বিবাহ বীরগণের পক্ষে প্রশস্ত।"[৪১] তাঁহার কথামত অর্জুন পূজা প্রত্যাগতা সুভদ্রাকে সবলে রথে তুলিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে অগ্রসর হইলে বলরাম ও অন্যান্য ক্রুদ্ধ যাদব নায়কগণ অর্জুনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন অর্জুনকে সমর্থন জানাইযা কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জুন যা করেছেন তাতে আমাদের বংশের অপমান হয় নি, বরং মান বৃদ্ধি হয়েছে। আমরা ধনের লোভে কন্যা বিক্রয় করব এমন কথা তিনি ভাবেন নি, স্বয়ংবরেও তিনি সম্মত নন, এই কারণেই তিনি ক্ষত্রধর্ম অনুসারে কন্যা হরণ করেছেন। অর্জুন ভরত-শান্তনুর বংশে কুন্তীর গর্ভে জন্মেছেন, তিনি যুদ্ধে অজেয়, এমন সুপাত্র কে না চায়? আপনারা শীঘ্র মিষ্ট বাক্যে তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, এই আমার মত।"[৪২] সুতরাং দেখা যায়, এ বিবাহ অর্জুনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও ইহার পিছনে কৃষ্ণের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। কাশীরাম দাস এই বিষয়টিকে আরও সরস করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি সত্যভামা এবং সুভদ্রাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া বিবাহ ব্যাপারে বাঙ্গালী অন্তঃপুরিকাদের কিরূপ ভূমিকা তাহা কাব্য মধ্যে সরস ভঙ্গীতে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার সত্যভামা একেবারে সক্রিয় ভাবে এই বিবাহ সংঘটনে উদ্যোগী হইযাছেন। নিশাকালে অর্জুন কক্ষে সমুপস্থিত হইয়া তিনি বলিযাছেন:

> "এক ভার্যা পঞ্চভাই কিরূপে নিবাস।
> যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস॥

সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
বিভা দিব আর এক পরমা সুন্দরী ॥"৪৩

নবীন চন্দ্র মূল মহাভারত ও কাশীরাম দাস, উভয় হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তবে কাহিনীর রোমান্টিক কল্পনায় কাশীরামের প্রভাব অধিক। কিন্তু তিনি উভয় হইতে সুভদ্রা পরিণয়ের উদ্দেশ্যকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিয়াছেন। ভদ্রার্জুন মিলনের মধ্যে তিনি কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা দেখাইয়াছেন। এ বিবাহে যদুবংশের মান সম্মান বৃদ্ধি বড কথা নহে, ইহার মধ্যে তাঁহার কল্পিত ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হইবে, ইহাই কৃষ্ণের একমাত্র চিন্তা। মহাভারতে বলরাম এই ক্ষেত্রে কৃষ্ণের বিরোধিতা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দুর্বাসা কর্তৃক বলরামকে প্ররোচনা দান ও দুর্যোধনকে পাত্র হিসাবে নির্বাচন করিতে তাঁহার নির্দেশ—ইহা নবীনচন্দ্রের নিজস্ব কল্পনা। অর্থাৎ নবীনচন্দ্র মহাভারতী কথার মূল ঘটনা সুভদ্রাহরণকে গ্রহণ করিতে গিয়া তাহার মধ্যে অনার্য ব্রাহ্মণের সংহতি ও ক্ষত্রিয় বিরোধিতা, পার্শ্ব কাহিনী হিসাবে জরৎকারুর প্রেম ও প্রত্যাখ্যানের কাহিনী, ব্যর্থ প্রণয়ী বাসুকির অন্তর্জালা ও কৃষ্ণের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শৈলজাকে নিয়োগ প্রভৃতি ঘটনাগুলি মৌলিক কল্পনারূপে সংযোজন করিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায় নবীনচন্দ্রের রৈবতক মূল মহাভারতী কাহিনীকে বহু পিছনে রাখিয়া দিয়াছে। ভাবগম্ভীর চিন্তায় আলোচ্য কাব্যটি তাঁহার মহাভারত গঠনের উপক্রমণিকা রূপে রচিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য অনুকূল ও প্রতিকূল চরিত্রগুলির মধ্যে তিনি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ সমূহের যথোচিত বিকাশ দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাই নবীনচন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এই মৌলচিন্তার অনুক্রমে অপর দুইটি কাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ত্রয়ী কাব্য কল্পনায় রৈবতক-এর গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু 'সুভদ্রাহরণ' বিষয়বস্তুটিই মূলতঃ রোমান্টিক বলিয়া কবি ইহার মধ্যে সর্বত্র আপন গম্ভীর উদ্দেশ্যটি তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই; রুক্মিণী, সত্যভামা ও সুলোচনার স্নেহ পরিহাসের মধ্যে কোমল গার্হস্থ্য ধর্মের পরিচয় দিয়া তিনি কাহিনীর 'মুখরক্ষা' করিয়াছেন।

'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে কবি মহাভারতের দ্রোণপর্বের অভিমন্যুবধ পর্বাধ্যায়ের কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতী কথায় অভিমন্যুবধ কাহিনীর মধ্যে আদৌ জটিলতা নাই। চক্রব্যূহ ভেদ কৌশল পাণ্ডব পক্ষে যাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন, অভিমন্যু তাঁহাদের অন্যতম। কুরুক্ষেত্র মহারণের ত্রয়োদশ দিবসে যুধিষ্ঠির এই ব্যূহভেদের ভার অভিমন্যুর উপর অর্পণ করিলে অভিমন্যু অমিত-

বিক্রমে তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন। অভিমন্যুর যুদ্ধ এবং কৌরব রথীবৃন্দের সম্মিলিত আক্রমণে অন্যায়ভাবে তাঁহার নিধন সমগ্র মহাভারতের মধ্যে একটি বিষাদ করুণ কাহিনী। নবীনচন্দ্র মহাভারতের এই অংশটি এবং পরবর্তী অংশ প্রতিজ্ঞাপর্বাধ্যায়ের অর্জুনের প্রতিজ্ঞা অংশটি পর পর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে অভিমন্যুবধের পর মহাভারতে বহু নিধনযজ্ঞ যেমন একের পর এক স্বতন্ত্রভাবে ঘটিয়া গিয়াছে, নবীনচন্দ্র আলোচ্য কাহিনীর মধ্যে সেগুলির স্থান দেন নাই। তিনি অভিমন্যুর মৃত্যুকেই কেন্দ্রীয় ঘটনারূপে উপস্থাপিত করিয়া অন্যান্য ঘটনাকে অন্তরালে রাখিয়া দিয়াছেন। কাব্যের শেষ সর্গে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সমাপ্তি সূচিত হইয়াছে। শৈলজা উত্তরাকে যুদ্ধের শেষ পরিণতি জানাইয়াছে—ভারত শ্মশান করিয়া কুরুক্ষেত্র মহারণ সমাপ্ত হইয়াছে, কৌরব পক্ষে কৃপ, কৃতবর্মা আর অশ্বত্থামা ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই, পাণ্ডব পক্ষে জীবিত আছেন পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি আর কৃষ্ণ। অভিমন্যুবধের সঙ্গে সমগ্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনাবলীর শেষ মীমাংসা টানিয়া কবি কুরুক্ষেত্র নামকরণের যাথার্থ্য রক্ষা করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র কাব্যে অভিমন্যুবধের মুখ্য কাহিনীর সহিত পার্শ্বকাহিনী জরৎকারু দুর্বাসার ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের কথা অনুক্রমণিকারূপে চলিয়া আসিয়াছে। কারুর জীবন পিপাসা আলোচ্য খণ্ডে গভীরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বাসুকি ও শৈলজা আপনাপন ভূমিকায় যথাক্রমে দুর্বাসা ও কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে সাহায্য করিয়াছে। কাহিনীর এই কাল্পনিক অংশের গুরুত্ব বর্ধনের জন্য কবি দুর্বাসাকে দিয়া অভিমন্যুবধের কথা সর্বপ্রথমে ব্যক্ত করাইয়াছেন। মহাভারতে আছে যে দুর্বাসার মন্ত্রে কুন্তী সূর্য আরাধনা করিয়া কুমারী অবস্থায় কর্ণকে লাভ করেন। কুরুক্ষেত্র কাব্যে এই সূত্র হইতে দুর্বাসাকে দিয়া মন্ত্রপুত্র কর্ণকে অভিমন্যুবধের প্ররোচনা দান করা হইয়াছে। কৃষ্ণের আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রতিকূল চরিত্র হিসাবে দুর্বাসার ভূমিকাকে বলবৎ করিবার জন্য কবি দুর্বাসাকে এতখানি সক্রিয় করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায়, এই খণ্ডের মূল উপজীব্য অভিমন্যুবধ কাহিনীতে মহাভারতী কথার মোটামুটি অনুসরণ থাকিলেও সেই কাহিনীর অন্তরালবর্তী উদ্দেশ্য ও উপায়গুলি বহুলাংশে কবির স্বকপোলকল্পিত। অভিমন্যুবধকে কেন্দ্রীয় ঘটনারূপে রাখিয়া কবি অপৌরাণিক ক্ষেত্রে কল্পনার বন্যা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

প্রভাসের কাহিনী গৃহীত হইয়াছে প্রধানতঃ মহাভারতের মৌষল পর্ব হইতে। মৌষল পর্বে যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। নারীবেশে সজ্জিত শাম্বকে ঋষিগণ মুষল প্রসবের অভিশাপ দান করিলে তাহার পরিণতি সমগ্র যদুকুলের

বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। কৃষ্ণ যাদবদিগকে প্রভাসতীর্থে আনিলেও তাহাদের পতন রোধ করিতে পারিলেন না, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও উচ্ছৃঙ্খলতায় তাহারা দুর্বল হইয়া পড়িতে-ছিল। কৃষ্ণের সক্রিয়তায় অধর্মাচারী যাদবগণ নিঃশেষ হইতে থাকে এবং পরিশেষে কৃষ্ণও স্বয়ং জরাব্যাধের দ্বারা নিহত হন। গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী সংবাদ পাইয়া দ্বারকাপুরীতে আগমন করেন এবং অবশিষ্ট যাদব নরনারীদের লইয়া হস্তিনাপুর যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি আভীর দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হন। কৃষ্ণ বিহীন অর্জুন শক্তিহীন হইয়া যাদব নারীদিগকে আভীর দস্যুদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। এই পরিণতি ভবিতব্যের ইঙ্গিত বলিয়া ব্যাসদেব অর্জুনকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের এই কাহিনী বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবতে আরও বিস্তৃত ও অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কাশীরামও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে ইহাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র আপনার উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে ও কাহিনীত্রয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে ইহার মধ্যে বহু কাল্পনিকতার আরোপ করিয়াছেন। যদুবংশ ধ্বংসের কারণরূপে কবি ঋষি অভিশাপকে প্রধান করিয়া তুলেন নাই। দুর্বাসার শিষ্যকুল অভিসম্পাত দিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে মূল কাহিনীর অভিশাপের তীব্রতা নাই। দুর্বাসার বিদ্বেষ ও তাহার পরিণতি এই অধ্যায়ে কবির এক বিশেষ নূতনত্ব। এই চরিত্রটিকে কবি প্রথম হইতেই সক্রিয় রাখিয়াছেন। একটি উগ্র ও মহ্যমান চরিত্রকে শান্তিময় পরিণতি দান করিয়া কবি প্রভাসতীর্থের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন। কাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর পরিবর্তন জরৎকারু হস্তে কৃষ্ণের নিধন। একটি প্রণয়াসক্ত হৃদয় কতখানি প্রতিশোধপ্রবণ হইতে পারে, জরৎকারু তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। 'প্রভাস খণ্ডে সেই প্রতিশোধ স্পৃহার দারুণতম পরিণতি হিসাবে যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছেন—

> যথার্থ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে জরৎকারুর প্রতিহিংসাই যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণ হত্যার মূল কারণ। জরৎকারুর কৃষ্ণের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ এবং ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা তাহাকে ভয়ঙ্করী ডাকিনী শক্তিতে পরিণত করিয়াছে। কৃষ্ণকে দয়িতভাবে না পাইয়া সে নিজ ঈপ্সিত জন ও তাঁহার সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া ধর্ষকামী আনন্দ পাইতে চাহিয়াছে। দুর্বাসা তাহাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। সে-ই দ্বারকাপুরীতে অনার্য রমণী ও উত্তেজক সুরা আমদানী করিয়া যদুবংশের মর্মমূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।[৪৪]

এইরূপে দেখা যায় প্রভাস কাব্যে কবি আপন কল্পনাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়াছেন। সামগ্রিক বিচারে লক্ষ্য করা যায় তিনটি কাহিনীতে যথাক্রমে সুভদ্রাহরণ, অভিমন্যুবধ এবং যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলেও ইহাদের মধ্যে কবি একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। তাহা হইল কৃষ্ণ জীবনের ভাগবতী মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটন, যাহাতে তাঁহার কীর্তি ও মহিমা অত্যুজ্জল হইয়া প্রকাশ পাইবে, তাঁহার মহত্তর জীবনাদর্শ মহাভারত গঠনে কার্যকরী হইবে। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে ব্যক্তিস্বার্থ (বাসুকি), সামাজিক ভেদ (দুর্বাসা), স্বার্থান্ধ ভালবাসা (জরৎকারু), আত্মদ্রোহ উচ্ছৃংখলতা (যাদবকুল) এবং নিষ্কাম প্রেম—উদার মানবতা (সুভদ্রা), শুদ্ধা ভক্তি (শৈলজা) প্রভৃতি চেতনার ধারক ও বাহকরূপে যাহারা প্রতিকূলতা ও অনুকূলতা প্রকাশ করিয়াছে, নবীনচন্দ্র তাহাদের ভূমিকাকে পূর্ণ মূল্য দিয়া আসল কাহিনীর গুরুত্ব ও তীব্রতাকে ন্যূন করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। কাহিনীর দিক দিয়া সেইজন্য কাব্যগুলি মূলের যথার্থ অনুসরণ নহে, কবির স্বকপোলকল্পনা ইহাদের অনেকখানি উৎসভূমি।

চরিত্র চিত্রণ ঃ ত্রয়ী কাব্যের প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে কবির যুগপৎ সাফল্য ও ব্যর্থতা সূচিত হইয়াছে। যদিও সর্বত্র তিনি সচল সক্রিয়তা লইয়া প্রকাশিত হন নাই, তাহা হইলেও তিনিই এই কাব্যের নায়ক। ঘটনাবলীর নেপথ্য নায়ক হইয়া তিনি তিনটি পৃথক কাহিনীর সূত্রধাররূপে কাজ করিয়াছেন। কৃষ্ণ চরিত্রের নেপথ্য অবস্থিতিকে আধুনিক সমালোচক ত্রুটির চক্ষে দেখিয়াছেন। "নবীনচন্দ্র যে কৃষ্ণকে কাব্যের নায়ক রূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার কাব্যের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং সে ক্ষেত্রে এই প্রধান চরিত্রটিকে সর্ব প্রকার বিরোধী ঘটনার সম্মুখীন না করিয়া তাহাকে নেপথ্যে দাঁড় করাইয়া রাখিলে কাব্যের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।"[৪৫] কিন্তু এই অভিমত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মানবিক চরিত্ররূপে কৃষ্ণ চরিত্রের ক্রমিক বিকাশ কবির লক্ষ্য নহে। তাঁহার যে ভগবত্তা ও মহৎ মানবিকতা যুগ যুগান্তের প্রণম্য ও আরাধ্য, তাহা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যরূপেই কবি চিত্তে গৃহীত হইয়াছে। পৌরাণিক চরিত্র সম্বন্ধে এইরূপ পূর্ব ধারণা একান্ত স্বাভাবিক। কাব্যের স্তরে স্তরে কবি সেই মাহাত্ম্যকে উদ্‌ঘাটন করিয়া চলিয়াছেন। ইহা কৃষ্ণ চরিত্রের অভিব্যক্তি না হইলেও কৃষ্ণভাবের অভিব্যক্তি। কৃষ্ণ চরিত্রের প্রকাশ্য ও নেপথ্য ভূমিকার মধ্যে কবি পাঠক চিত্তে তাঁহার মহিমার নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা ঘটাইয়াছেন এবং এই মহতী শক্তির নিকট পরিশেষে

সমস্ত বিরোধী চেতনাই মন্ত্রাহত ভুজঙ্গের মত শান্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণ চরিত্রে সক্রিয়তার অভাব মারাত্মক ত্রুটি নহে।

তবে কৃষ্ণ চরিত্র পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে কিনা বিচার করা প্রয়োজন। মহাভারতী কৃষ্ণ যে মানবিকতার সমুজ্জ্বল প্রকাশ, কবি তাহার পূর্ণ মর্যাদা দিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের এই দিক ইতিহাসের ছায়ায় অঙ্কিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণ বৈদিক অনুশাসনের নিরুত্তাপ জীবন চর্যার বিরোধী, মুক্ত মানব মহিমার উদ্গাতা, সামাজিক ভেদ বৈষম্যের মিলন প্রয়াসী। তাঁহার মানব সাম্রাজ্যের অবলম্বন শ্রদ্ধা ভক্তি, সক্ষম শৌর্য ও অনন্ত জ্ঞান। সুভদ্রা অর্জুন ও ব্যাস ইহাদের প্রতীক। তবে জ্ঞান ও কর্ম যেমন পরিশেষে ভক্তির নিকট নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তেমনই কবি চিত্ত জ্ঞান ও কর্মের সমস্ত-আয়োজন গৌণ করিয়া ভক্তিকেই বড় করিয়া তুলিয়াছে। অনিবার্য ভাবে তাঁহার কৃষ্ণ চরিত্র সচেতন মানবসত্তা পরিহার করিয়া তত্বসত্ব দেববিগ্রহে পরিণত হইয়াছে। কাব্যের দিক দিয়া ইহা সঙ্গতিহীন। রৈবতক কুরুক্ষেত্রের পরিণতি প্রভাস নহে, ইহা কবিচিত্তেরই গৈরিক প্রব্রজ্যা। ভাগবতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসের মধ্যে মূর্ত হইয়াছে। স্বয়ং মহাভারত কাব্যের নির্দেশও বোধ করি ইহাই। কুরুক্ষেত্রের মহাসমর নির্বাপিত করিয়া মহাকবির শ্রীকৃষ্ণ লীলা সংবরণের আয়োজন করিয়াছেন। সংস্কৃত ভারতচিত্ত মহানায়কের মহাপরিনির্বাণে বিচলিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রও মহাভারত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ভুলিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণের দেবলীলার অবসান দেখাইয়াছেন। একটি বিরাট সাম্রাজ্য মহাভিক্ষুর ত্যাগব্রতে যেমন ব্যর্থ হইয়া যায়, নবীনচন্দ্রের মহাভারত প্রতিষ্ঠা তেমনি ব্যর্থ হইয়াছে। সেইজন্য এই কৃষ্ণ চরিত্র শেষ পর্যন্ত কাব্যের পরিণতি নহে, কবিচিত্তের পরিণতি।

আধুনিক সমালোচক কৃষ্ণ চরিত্রের আরও একটি ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন— "যাহার উপর ধর্ম জাতি সমন্বয়ের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় তিনি কাহাকেও দূরে ঠেলিতে পারেন না, তাঁহাকে সকলকেই নিকটে টানিতে হয়। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের দূরে সরাইয়া দিয়াছেন, নিকটে টানেন নাই, তাই তাঁহার ধর্মকে আর সার্বভৌম বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।"[১৬] অনার্যদের সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ মনোভঙ্গী বলিয়া সমালোচক মনে করিয়াছেন—"কৃষ্ণের মহাভারত রাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনা আর কিছুই নয়, অনার্য্য জাতি মাথা উঁচু করিয়া আর্যদের বিতাড়িত করিতে না পারে তাহার জন্য প্রস্তুতি।"[১৭] এখন দেখিতে হইবে এক সার্বভৌম আদর্শের ভিত্তিতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ব্রাহ্মণ বা অনার্যের প্রতি

কৃষ্ণের এই বিরূপতা সঙ্গত কিনা। একথা ঠিক, কৃষ্ণ বহুস্থানে বিশেষতঃ রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র কাব্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ ও অনার্যদলনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার সমন্বয়ের আদর্শ বা সার্বভৌম নীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়াছে, একথা বলা যায় না। প্রভাসে কৃষ্ণ চরিত্রের একটি উক্তি হইতে তাঁহার জীবনাচরণের এই অসঙ্গতি নিরসন করা যায়। যদুবংশীয়দের অধর্মাচরণে ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন :

"সে অধর্ম যাদবের অস্থিমাংসগত,
বহিতেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত।
এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল
কেমনে নিবারি,—কেন নিবারিব আমি ?
নহে যাদবের, আমি মানবের স্বামী।"[৪৮]

বস্তুতঃ ইহাই কৃষ্ণ চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয়। মানবের স্বামীরূপেই তিনি ন্যায়-অন্যায় ও ধর্ম-অধর্মকে নিরপেক্ষরূপে বিচার করিবেন। যাদবরা যেমন উচ্ছৃংখলতা ব্যভিচারে তাঁহার অপ্রীতিভাজন হইয়াছে, তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অপব্যবহারে দুর্বাসাও তাঁহার বিদ্বেষভাজন হইয়াছে। আবার বাসুকির ব্যক্তিগত আসক্তি ও দাহই তাহার কৃষ্ণ প্রেমের অন্তরায় হইয়াছে। গীতোক্ত ধর্মকে কৃষ্ণ রৈবতকের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন :

"সমর সর্বত্র পাপ নহে ধনঞ্জয়।
রক্ষিতে দশের ধর্ম,
নহে পার্থ। পাপ কর্ম
একের বিনাশ। পার্থ। নিষ্কাম সমর,
নাহি ততোধিক আর পুণ্য শ্রেষ্ঠতর।"[৪৯]

সুতরাং ব্রাহ্মণ, অনার্য যখনই ধর্মে ব্যভিচারী হইয়াছে, সে ব্যক্তি বা সমাজ যাহাই হউক, কৃষ্ণ বৃহত্তর জীবনাদর্শে, সর্ব মানবকল্যাণের নির্দেশে তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন। খণ্ড কাহিনীতে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁহার বিরোধিতা গ্রাহ্য নহে, সামগ্রিকভাবে তাহা মূল উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করিয়াছে বলিয়া কৃষ্ণ চরিত্রের এই আচরণে কোন স্ববিরোধ নাই।

তবে নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্রের সর্বাপেক্ষা ত্রুটি বোধ করি এই যে তাঁহার মধ্যে তত্ত্ব ও দর্শনের অতিরেক ঘটিয়াছে। মহাভারত কল্পনা, অদৃষ্টবাদ, কর্মবাদ, সোঽহংবাদ, সুখতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর তত্ত্বালোচনা কৃষ্ণকে এক দার্শনিক

প্রবক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সমগ্র কাব্যের সাধারণ ত্রুটি এই যে কাব্যটি অযথা তত্ত্বকুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়াছে। ইহার প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ সম্বন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। ক্ষেত্র পাত্র নির্বিচারে নিরাসক্ত ঋষি হইতে আসক্ত গৃহী পর্যন্ত সর্বত্র এক অত্যুচ্চ আদর্শবাদের প্রচারে কৃষ্ণ চরিত্র রক্ত মাংসের মূর্তি পরিগ্রহ করিতে পারে নাই।

কৃষ্ণ চরিত্রের কল্পনায় নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র ঃ আমরা এক্ষণে নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্র কল্পনার স্বরূপ আলোচনা করিতে এবং উভয়ের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ আছে কিনা তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। এ বিষয়ে 'নব্যভারত' প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিল। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল, "কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনায় নবীনবাবু সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমবাবুর নিকট ঋণী।"[৫০] এ বিষয়ে নবীনচন্দ্র নিজেই উত্তর দিয়াছেন যে প্রকাশ কালের বিচারে এবং কৃষ্ণ চরিত্রের নূতন ব্যাখ্যায় তাঁহার কৃষ্ণ চরিত্র বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র। কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে তাঁহার কৃষ্ণ চরিত্র বিষয়ক কাব্য রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রেও কল্পিত ও সূচিত হইয়াছে ১৮৮২ সালে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্র প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এ বিষয়ে আরো প্রমাণ এই যে বঙ্কিমের ক্রমশঃ প্রকাশিত কৃষ্ণ চরিত্র বাহির হইবার পূর্বে তিনি স্বয়ং কবির পরিকল্পিত কৃষ্ণ চরিত্রের কল্পনা ও ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কবিকে প্রতিবাদ পত্র লিখিয়াছিলেন। আবার কৃষ্ণ চরিত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কবির উক্তি হইল যে কৃষ্ণ চরিত্রের কৃষ্ণ এবং রৈবতক কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ এক নহে। কৃষ্ণ চরিত্রের প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র ভাগবতকে স্বীকার করেন নাই, আর দ্বিতীয় সংস্করণে যদিও ব্রজলীলার ব্যাখ্যা আছে, তাহাও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কথা হইতে অন্যরূপ। তাঁহার শেষ কথা, তাঁহার কৃষ্ণ চরিত্রের কল্পনা বহু প্রাচীন। কৃষ্ণ চরিত্র সূচিত হওয়ার বহু পূর্বে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রঙ্গমতী কাব্যে তিনি তাঁহার কৃষ্ণ চরিত্রের আভাস দিয়াছেন।[৫১]

নবীনচন্দ্রের অধমর্ণত্ব এবং মৌলিকতা প্রসঙ্গে মণীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'সাহিত্য' পত্রিকায় স্পষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।[৫২] আন্তর এবং বাহ্য সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে কৃষ্ণ চরিত্র কল্পনায় নবীনচন্দ্র বঙ্কিমের নিকট ঋণী নহেন।

তিনিও কবি নির্দিষ্ট প্রমাণগুলিকেই তুলিয়া ধরিয়াছেন। কৃষ্ণ চরিত্র সম্পর্কে উভয়ের সাধারণ সাদৃশ্যটুকু তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ধর্মতত্ত্বের পৃষ্ঠায় বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্রের ধারণা ব্যক্ত হইয়াছে—"যিনি বুদ্ধি বলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়া-

ছিলেন, যিনি সেই বেদ প্রবল দেশে বেদ প্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন—'বেদ ধর্ম নয়, ধর্ম লোকহিতে' আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, যে বঙ্কিম কল্পিত কৃষ্ণ চরিত্রের যে লক্ষ্য ধর্ম ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপন, তাহা রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রেও পরিস্ফুট হইয়াছে। সাদৃশ্যের দিক দিয়া এইটুকু পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও কৃষ্ণ চরিত্রের উপস্থাপনায় উভয়ের বিপুল পার্থক্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রজলীলাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই, কৃষ্ণ চরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার কিছুটা স্বীকৃতি থাকিলেও 'শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজগোপ ও ব্রজগোপীর স্নেহের পুতুল' হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র ভাগবত লীলাকে অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি মহাভারতের উপর মূলতঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, নবীনচন্দ্র সে ক্ষেত্রে ভাগবত ও মহাভারত উভয় মিশাইয়া রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণ চরিত্রের ধারণা অনেকাংশে ভিন্ন।

অতঃপর তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবাদের কারণগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি বিষয়ে নবীনচন্দ্রের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। প্রথমতঃ কৃষ্ণের ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিকূল নবমত প্রচার, দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয় শক্তির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ ও অনার্য শক্তির মিলন ও তৃতীয়তঃ কৃষ্ণের ভারত সাম্রাজ্য স্থাপন। বঙ্কিমের মতে এই সিদ্ধান্তগুলি 'জনবাদ ও প্রস্থাদির সর্বথা বিপরীত বোধ হইয়াছিল।' সুতরাং এই চরিত্রের কল্পনায় নবীনচন্দ্র যে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ঋণী নহেন, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত।

বস্তুতঃ এইরূপ বিতর্ক আলোচনার অন্তরূপ সমাধান করা যায়। কৃষ্ণ চরিত্র আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কিছু কালের ব্যবধানে স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে হস্তক্ষেপ করিলেও তাঁহারাই যে এই আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন, এমন নহে। নবীনচন্দ্রের কথানুযায়ী 'রঙ্গমতীতে' বঙ্কিমচন্দ্রের বহু পূর্বে কৃষ্ণ চরিত্র আভাসিত হইয়াছে। তেমনি বঙ্কিম পক্ষ হইতে বলা যায়, তাঁহার কৃষ্ণ চরিত্রের আভাস আরও বহু পূর্বে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে কৃষ্ণ লীলা ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই আলোচনায় তিনি কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা ও দার্শনিকতা সম্বন্ধে প্রথম জিজ্ঞাসার অবতারণা করিয়াছেন। উভয়ের কাব্য ও প্রবন্ধরূপ পরবর্তীকালে পল্লবিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এজন্য তাঁহাদের পরস্পরের উত্তমর্ণত্ব অধমর্ণত্ব আবিষ্কারের যথার্থ উপায় নাই। তবে এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত করা যায় যে তাঁহাদের কৃষ্ণ চরিত্রের

জিজ্ঞাসাও স্বয়ম্ভূ নহে ; সেই যুগ ও জীবন বেশ কিছুদিন পূর্ব হইতেই কৃষ্ণ প্রসঙ্গ লইয়া চিন্তা করিতেছিল। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় সেই যুগের কৃষ্ণ প্রসঙ্গ চর্চার একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশক হইতে সর্বত্র কৃষ্ণের মানব মহিমা উদঘাটনের একটি প্রয়াস সুরু হইয়াছিল। কৃষ্ণ চরিত্র আলোচনার এই ধারায় ব্রাহ্ম পক্ষে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুরাগী গৌরগোবিন্দ রায় ও চিরঞ্জীব শর্মা এবং হিন্দু পক্ষে শিশিরকুমার ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকবৃন্দ আপনাপন রীতি-প্রকৃতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৫৩] লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ইহারা কৃষ্ণ চরিত্রকে মোটামুটি দুইটি দিক হইতে বিচার করিয়াছেন—যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ। এই যুক্তিবাদের ধারা বঙ্কিমচন্দ্রে চরমোৎকর্ষে পৌঁছিয়াছে। কৃষ্ণের মানবতা বিচারে তিনি শাণিত বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম যুক্তি-চিন্তার অবতারণা করিয়াছেন। আর ভক্তিবাদের ধারাতে নবীনচন্দ্র আপনার ভাগবতোপলব্ধি ও ভক্তি চেতনার আরোপ করিয়াছেন। এইভাবে বলা যায়, তাঁহারা উভয়েই একটি ট্র্যাডিশনকে বিভিন্ন দিক হইতে পুষ্ট করিয়াছেন।

তবে উভয়ের পরিকল্পনায় সাধারণ ভাবে কৃষ্ণ মহিমাই ব্যক্ত হইয়াছে। ইতিহাস পুরাণের পৃষ্ঠা হইতে তাঁহারা উপেক্ষিত ও কলঙ্ক-লাঞ্ছিত কৃষ্ণকে উত্তোলিত করিয়াছেন সন্দেহ নাই এবং কৃষ্ণ চরিত্রে লোক শ্রুতির দুরপনেয় কলঙ্ক মোচনে উভয়ের কৃতিত্বটুকু স্থায়ী ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আর এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সাফল্য যে নবীনচন্দ্র হইতে অধিক, তাহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্র-তত্ত্ব হিসাবে ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আভাসিত, সেই তত্ত্বকে তিনি পরিপূর্ণ বাস্তবমূর্তি দিয়াছেন কৃষ্ণ চরিত্রে, এই কৃষ্ণ আদৌ অস্পষ্ট নহে, ইন্দ্রিয় ও অনুভূতিতে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্যে কৃষ্ণ চরিত্রের শুধু তাত্ত্বিক রূপই আভাসিত, একটি অস্পষ্ট ধারণা দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। বঙ্কিমের বৃত্তি নিচয়ের সর্বাঙ্গীন বিকাশের মত তাঁহার শক্তিরাজির কোন সম্যক্ বিকাশ ত্রয়ী কাব্যে ঘটে নাই। সুতরাং পরিকল্পনা অপেক্ষা প্রতিষ্ঠায় বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্র নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্র হইতে প্রাণবন্ত।

কাব্যের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে দুর্বাসা ও জরৎকারু এই দুইটি পৌরাণিক চরিত্র বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। কারণ এই কাব্যে ইহাদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এই চরিত্রদ্বয়ের পরিকল্পনায় নবীনচন্দ্র সম্পূর্ণ স্বাধীনতা গ্রহণ

করিয়াছেন। মহাভারত পুরাণে দুর্বাসা সর্বত্রই কোপন স্বভাব ঋষি বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন, স্থানে অস্থানে মনস্তুষ্টির অভাব হইলেই তিনি অভিশাপের অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র এই কোপনতাকে ধর্মদ্বেষ ও বর্ণদ্বেষের পটভূমিকায় রাখিয়া তাঁহার স্বভাবকে আরও উগ্র করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি নিষ্ক্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সক্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী অনার্য বাসুকির উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিত্র এবং বাসুকি ভগিনী অন্তপ্রাণা জরৎকারুর স্বার্থান্বেষী স্বামী। এই তিনটি ক্ষেত্রেই দুর্বাসার পরিচয় কাল্পনিকভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। দুর্বাসার এই কৃষ্ণদ্বেষের কথা মহাভারত পুরাণে সমর্থিত হয় না। "বাসুকির সহিত সন্ধি, যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের নিধন ব্যাপারে তাঁহার সক্রিয় ষড়যন্ত্র এবং বুকে শিলাখণ্ড লইয়া মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনাগুলির কোনরূপ আভাস কোন পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না।"[৫৪] আবার কারুর সহিত তাঁহার বিবাহ ও তদ্দ্বারা অনার্য জাতির সহিত মৈত্রী রচনা সম্পূর্ণ কবির কল্পনা। সামগ্রিক ভাবে দুর্বাসা আলোচ্য কাব্যে যে অবিরাম ষড়যন্ত্র ও অহরহ বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন; তাহা মহাভারত পুরাণের 'মন্যুমান দুর্বাসা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। যে ন্যায় বোধ ঋষি দুর্বাসার সকল ক্রোধের কারণ তাহা এখানে অনুপস্থিত। তাঁহার এইরূপ চরিত্রায়ন সম্পূর্ণ রূপে পৌরাণিক সংস্কারের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছে।

জরৎকারু চরিত্রেও কবি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রেম ও প্রতিহিংসা, বিবাহ ও অন্তপরায়ণতা, ভ্রাতৃপ্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি প্রভৃতি বিপরীত গুণাবলীর সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই বিপরীত ধর্মিতার চরম পরিচয় হইল আজীবন কৃষ্ণ প্রেমিকা হইয়াও সে-ই কৃষ্ণের নিধন করিয়াছে। ত্রয়ী কাব্যের মধ্যে যদি কোন চরিত্রের ক্ল্যাসিক গতিভঙ্গী থাকে, তবে তাহা হইল জরৎকারুর। দ্রুত ও ঋজুগতিতে কাহিনীর বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে একপাশে রাখিয়া কারু আপন পরিণতির দিকে অনিবার্যরূপে অগ্রসর হইয়াছে। ত্রয়ী কাব্য মহাভারতী কৃষ্ণের পুণ্যনাম স্পর্শ না পাইলে অনায়াসেই তাহাকে সর্বপ্রধান চরিত্র বলিয়া ধরা যাইত। কৃষ্ণ তাঁহার বৃহৎ ভাবাদর্শে কাহিনীগুলির মধ্যে যে গ্রন্থি রচনা করিতে পারেন নাই, কারু তাহার উন্মত্ত জীবনাবেগে ও পিপাসার্ত প্রবৃত্তির তাড়নায় সমস্ত কাহিনীর সহজ সংযোগ সূত্র রচনা করিয়াছে। কবি অবশ্য কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—"কারু প্রকৃত প্রস্তাবে যে দুর্বাসার পত্নী নহে, বিবাহটি একটা ছলনা মাত্র এবং কারু একাই সন্ধির প্রতিভূ মাত্র, তাহা আমি উভয় দুর্বাসা ও জরৎকারুর মুখে প্রকাশ করিয়াছি।"[৫৫] মহাভারতের যে অনার্য দুহিতা সাত্ত্বিক পুত্রের সার্থক জননী রূপে একটি বৃহৎ জাতির রক্ষার কারণ হইয়াছে, নবীনচন্দ্র তাহাকে ধর্ষকারী

মহাশক্তির বরদান করিয়া একটি বিরাট বংশের ও ততোধিক বিরাট পুরুষের মহতী বিনষ্টির কারণ করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যায় নবীনচন্দ্র কয়েকটি পৌরাণিক চরিত্রের উপর নিজের চিন্তা-কল্পনা আরোপ করিয়াছেন। প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ হইতে দুর্বাসা, জরৎকারু, বাসুকি, অর্জুন, সুভদ্রা, অভিমন্যু প্রভৃতি অপরাপর চরিত্র অল্পবিস্তর তাঁহার দ্বারা গৃহীত ও রূপান্তরিত হইয়াছে। একেবারে পুরাণ বহির্ভূত চরিত্র হইল শৈলজা ও সুলোচনা। শৈলজাকে কবি সুভদ্রার সমগোত্রীয় করিয়া আঁকিয়াছেন। একটি অনার্য রমণীকে দুর্লভ গুণাবলীর অধিকারিণী করিয়া কবি পরিণতিতে তাহাকে নারায়ণের পার্শ্বে বসাইয়াছেন্। কৃষ্ণ প্রেমের মহিমাকে যাহারা তুলিয়া ধরিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আর্য কুলের সুভদ্রা এবং অনার্য কুলের শৈলজা অগ্রগণ্যা। সুভদ্রার সহজ ও স্বাভাবিক কৃষ্ণ প্রেমকে সহস্র প্রতিকূলতায় প্রচার করিয়া শৈলজা এক দুঃসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সুলোচনা চরিত্রে কবির কোমল সহানুভূতি বর্ষিত হইয়াছে। মহাকাশ যেমন সংকুচিত হইয়া গোপদে প্রতিভাসিত হয়, তেমনি মহাভারতের বিরাট দর্শন সংকুচিত হইয়া সুলোচনার বাৎসল্য ও স্নেহের আধারে প্রকাশ পাইয়াছে। সুলোচনার আচরণে শ্লাঘনীয় হয়ত কিছুই নাই, তথাপি বিরাট চরিত্রপুঞ্জের রাজসিক আয়োজনের পশ্চাতে তাহার স্নেহ বুভুক্ষার সহজ অভিব্যক্তি মর্মস্পর্শী হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্য বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সৃষ্টি এবং বিতর্ক সমালোচনায় বহুল আলোচিত। সমকালীন যুগ ও জীবন হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইহার নিন্দা প্রশংসার অন্ত নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হয়, এ গ্রন্থ কবির সাফল্যের নিদর্শন। মূল্যমান যতই পরিবর্তিত হউক, ইহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যেও সমালোচকগণ মহৎ কিছুর সন্ধান পাইয়াছেন। কাব্যটি সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি হইল, ইহা ইতিহাস বা পুরাণকে বিশেষ সমর্থন করে না। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম সংস্কারক প্রকৃতি বা মহাভারত প্রতিষ্ঠার রূপকে নবচরিত্র রূপায়ণ বলিয়াছেন। এবং ইহাকে ভারত ইতিহাস ও ভারত রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে অসত্য বলিয়াছেন। তথাপি ইহার পরিকল্পনার গাম্ভীর্যেই বোধকরি তিনি বলিয়াছিলেন—"**If executed adequately many will probably consider it as the Mahabharat of the Nineteenth Century.**"[৫৬] স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহাদের সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে স্নেহ সুলভ কিছু আতিশয্য আছে সন্দেহ নাই।[৫৭]

আবার মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের যে মনোজ্ঞ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা সমকালীন সারস্বত সমাজে কবিকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। তিনি ইহার ঐতিহাসিকতার ত্রুটিকে গৌণ করিয়া সাহিত্যের আবেদনকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন—"নবীন বাবুর কাব্য কৃষ্ণভক্তি প্রচার কার্যে মহাভারতের স্থানীয় হউক। তর্ক যুক্তি গবেষণায় বুদ্ধি পরিমার্জিত হয়, কিন্তু হৃদয় ভিজে না। ভক্তি গ্রন্থ কুরুক্ষেত্র রৈবতককে বাঙ্গালীর ভক্ত হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া তাহাতে কৃষ্ণ প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হউক।... চারি সহস্র বৎসর পূর্বে মহাভারত পূর্ণাদর্শ নয়নের সম্মুখে রাখিয়া আর্য জাতির যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিত, দেশ কাল ও পাত্র ভেদে কুরুক্ষেত্র রৈবতকও সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে।"[৫৪]

তথাপি সার্থক কবিকৃতিরূপে বা ভক্তিরসের আকর গ্রন্থরূপে ত্রয়ী কাব্য সর্বত্র পরীক্ষিত ও গৃহীত হয় নাই। ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া পুরাণকে অতিক্রম করিয়া আমাদের যাবতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে ইহা নির্মমভাবে পদদলিত করিয়াছে—ত্রয়ী কাব্য সম্বন্ধে এইরূপ গভীর অভিযোগ একদিন উঠিয়াছিল। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের নিরুত্তাপ অনুযোগ নহে, সমাজ প্রতিভূদের শাণিত সমালোচনা। বাংলার সংস্কৃতি পরিচর্যায় রক্ষণশীল চরমপন্থী সম্প্রদায় কোনরূপ সনাতনের ব্যত্যয় সহ্য করিতে পারেন নাই। বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় লিখিত "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতে" এই চরমপন্থী মনোভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি কাব্য মধ্যে ইতিহাস পুরাণের অসঙ্গতি উদ্ঘাটন করিয়া ইহাকে একটি সংস্কৃতি বিরোধী রচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগ—"কবি অকারণ পূর্বপুরুষগণের ও ঋষিগণের নিরতিশয় নিন্দা করিয়াছেন—হিন্দুধর্মের ও হিন্দু সমাজের বিলোপ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন—আপনাকে হিন্দু নামে পরিচিত করিয়া তাঁহার কল্পিত 'কৃষ্ণ' ও 'ব্যাসের দোহাই দিয়া অহিন্দু মত প্রচার করিতেছেন—যে মত প্রচারিত হইলে হিন্দুর অস্তিত্ব থাকিবে না তাহাকে ব্যাসের ও কৃষ্ণের মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।"[৫৫]

বস্তুতঃ এইরূপ মতামতের বিতর্কে কবি এবং কবিকৃতির সংস্কার মুক্ত আলোচনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমাদের মনে হয় ঐতিহাসিক যেমন তাঁহার কাছে তথ্য ও সত্যের পরিবেশন আশা করেন, সমাজ নায়ক ও শাস্ত্রবিদ যেমন কঠোর শাস্ত্রানুগত্য আশা করেন, তেমনি তিনি নিজেও তাঁহার কাব্যের মধ্য হইতে কিছু আশা করিয়াছিলেন; তাহা হইল একটি পুরুষোত্তম চরিত্রের যুগব্রত জীবনা-

দর্শ, যাহা বাস্তবের আক্ষরিক সত্য না হইলেও ক্ষতি নাই, স্বর্গের পদস্পর্শে তাহা সত্য হইয়া উঠিবে। যে পটভূমিকা তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা পৌরাণিক, যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক। তাঁহার সাফল্য, তিনি পটভূমিকাকে আধুনিককালের সংশয় নিরসনের উপযোগী ক্ষেত্র রূপে নির্ধারিত করিয়াছেন। এ যুগের দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ ও অনৈক্য মীমাংসায় এই প্রাচীন দেশকাল একটি উপযুক্ত-আশ্রয় হইয়াছে। তাঁহার ব্যর্থতা এই যে, তিনি আধুনিক জিজ্ঞাসা তুলিয়াও প্রাচীনতার মোহ পরিহার করিতে পারেন নাই। মধুসূদন যে বীজমন্ত্র তাঁহার নায়ক চরিত্রে আরোপ করিয়া তাহাকে আধুনিকযুগের প্রতিভূ করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি কৃষ্ণ চরিত্রকে সেই আধুনিকতার দীক্ষা দিতে পারেন নাই, অন্ধকার অতীতের কক্ষে কক্ষে ঘুরাইয়া তাঁহাকে তিনি সত্য ও আদর্শের ধূম্রলোকে সমাহিত রাখিয়াছেন। ইতিহাস পুরাণের ব্যত্যয়ে ক্ষতি হইয়াছে সেইখানে। এই বিচ্যুতি ঘটাইয়াও তাঁহার চরিত্র যদি আধুনিক কালের মর্মবাণীকে প্রকাশ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহা ত্রুটির গণ্ডীতে পড়িত না। সেইজন্যই বলিতে হয়, তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা করিতে পারেন নাই এবং এই অপূর্ণতাটুকু তিনি ভক্তি-লব্ধ ধনে পূরণ করিয়া লইয়াছেন।

পৌরাণিক কথা ॥—উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে পৌরাণিক কথা ও কাহিনী লইয়া অনেকগুলি কাব্য রচিত হইয়াছে। সমস্ত ক্ষেত্রে যে পৌরাণিক কাহিনীর বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইয়াছে এমন নহে। কেহ কেহ পুরাণের লোক প্রচলিত রূপ ও সংস্কারকে গ্রহণ করিয়াছেন, পুরাণ প্রসিদ্ধ দেবতার মাহাত্ম্য ও কীর্তিকথাও অনেকের উপজীব্য হইয়াছে। তবে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্য অংশটি যেমনভাবে যুগচিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, তেমনটি আর কোন কিছুতেই করে নাই। বোধ হয় পরাধীন দেশজীবনের সহিত নির্জিত দেবকুলের একটি সাদৃশ্য অনুভূত হইয়াছে এবং জাতীয় জীবনের শক্তি সাধনায় এই দেবীলীলাকে মহৎ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা পৌরাণিক কাব্যগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

পুরাণ সংস্কারের কাব্য ॥ হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যাকে' (১৮৮২) এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দশমহাবিদ্যা কাব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন—'দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন

না যে তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।"৬০ প্রচলিত পুরাণ কথা এই যে, দক্ষযজ্ঞে সতী পিতৃগৃহে যাইবার বাসনা জ্ঞাপন করিলে শিব তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করেন। তখন সতী একে একে তাঁহার দশমূর্তি প্রকাশ করিয়া শিবের অন্তরে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করেন। তখন শিব আদ্যাশক্তির স্বরূপ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দেন। মহাভাগবত পুরাণে দশমহাবিদ্যার এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে। হেমচন্দ্র কাহিনীকে এইভাবে পরিবর্তন করিয়াছেন—দক্ষযজ্ঞে সতীদেহ বিনষ্ট হইবার পর কৈলাস শ্রীহীন হইয়া পড়ে। সতী বিহীন শিব শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নির্বাক প্রমথকুল প্রভু শিবের মতই শোকার্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ হেন অবস্থায় কৈলাসে নারদের আবির্ভাব হইল। নারদের বীণাধ্বনিতে আত্মসম্বিত ফিরিয়া পাইয়া শিব চৈতন্যরূপিণী সতীকে জ্ঞান নেত্রে পর্যবেক্ষণ করিলেন এবং নারদকে ব্রহ্মাণ্ড পরিমণ্ডলে সেই অনাদি শক্তির ক্রিয়া কাণ্ড প্রত্যক্ষ করাইলেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এই মহাশক্তির দ্যোতনায় নানা রূপের মধ্য দিয়া আবর্তিত হইতেছে, সেখানে রূপ হইতে রূপান্তরের খেলা। ইহাই সৃষ্টি রহস্য। এই অনাদি শক্তির বিনাশ নাই। তাঁহারই বিভিন্ন রূপ দশ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ শক্তিরূপে বিরাজিত, ইহাই দশমহাবিদ্যা। ব্রহ্মাণ্ড পরিমণ্ডলের এই শক্তি মানবমনের সমূহ ভ্রান্তি অপনোদন করিতেছে। মহাকালের বুকে এই শক্তির লীলা। এ লীলারও একটি অর্থ আছে, ইহা নিত্য মঙ্গলের বার্তাবহ। সৃষ্টি ব্যাপার আদৌ বিভিন্ন বা তাৎপর্য বিহীন নহে, প্রাণীকুলের বিকাশ ও উন্নতির জন্যই কালচক্রে এই রূপান্তরের আয়োজন। জ্ঞানোন্মেষের ফলে মানুষ এই রহস্য বুঝিতে সক্ষম, অন্যথায় নহে। জ্ঞান সমৃদ্ধ চিত্ত অনন্ত শক্তির প্রেমময় প্রকৃতিকে অনুভব করিতে পারে। এই শক্তি প্রেমরূপে, স্নেহরূপে, ভক্তিরূপে, প্রীতি-রূপে মানুষকে নিত্য শুভের পথে চালিত করিতেছে। প্রাণীকুলের ক্লেশ নিবারণ করিয়া, দারিদ্র্যকে হরণ করিয়া, পাপকে নিঃশেষ করিয়া এই শক্তি অখিল বিশ্বে মহালক্ষ্মীর প্রসাদ বর্ষণ করিতেছে। দশমহাবিদ্যা এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন ও মানবমনের রূপান্তরের মধ্যে সৃষ্টি মূলের এক শুভদা শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে।

হেমচন্দ্রের এই কাব্যে পৌরাণিক অংশ গৌণ, সে তুলনায় তত্ত্বাংশ প্রখর, যদিও কবির মতে তাহা সচেতন কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে কবিচিত্তের অনুভূতি সম্বন্ধে কবি হয়ত সজ্ঞাত হইতে পারেন কিন্তু কবিচিত্তের সক্রিয় প্রকৃতি সম্বন্ধে সর্বত্র

তাঁহার সচেতনতা নাও থাকিতে পারে। দেশ কালের চিন্তাপ্রবাহ কোথায় কখন অন্তর তলদেশের পলি সঞ্চার করিয়া চলিয়াছে, তাহা ব্যক্তি কবির নিকট অস্পষ্ট থাকিতে পারে। এইজন্য এই কাব্য কল্পনার তত্ত্বাংশ-সম্বন্ধে কবির সাক্ষ্যই সর্বথা গ্রাহ্য নহে, দেশজীবনে সঞ্চিত ও আগত চিন্তাধারা অলক্ষ্যেই হয়ত তাঁহার কাব্যের কায়া গঠন করিয়া দিয়াছে। আমরা এই কাব্যে কবির তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা প্রাচ্য দর্শনের মুক্তিতত্ত্ব ও পাশ্চাত্য দর্শনের অভিব্যক্তিবাদ লক্ষ্য করিতে পারি। জাতীয় চিত্তে রক্ষিত ও আগত এই চিন্তাগুলি অলক্ষ্য অতর্কিতে হয়ত তাঁহার ভাবসমৃদ্ধ বাসনালোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকিবে।

তন্ত্রে শিব ও শক্তির দ্বৈতলীলা সৃষ্টিব্যাপারের কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নির্গুণ শিবের সহিত ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির সংযোগে সৃষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই শিব ও শক্তি অভিন্নরূপে যে মহাশক্তির সূচনা করে, তাহাই তন্ত্রের আদ্যাশক্তি, সমগ্র সৃষ্টির প্রথম উৎস। ইনিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর নানারূপের বিকাশ ঘটাইতেছেন।

> This Primal Power as object of worship is the Great Mother of all natural things and nature itself. In Herself She is not a person but she is ever and incessantly personalizing; assuming the multiple masks, which are the varied forms of mind-matter.[৬১]

হেমচন্দ্র ঘোররূপা মহাকালীকে এই অদ্বয় শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া বিশ্বসৃষ্টির বিবরণ দিয়েছেন—

> সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে।
> কৃমিকীট প্রাণী কায়া জনমে সে কল্লোলে।।
> বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
> ঘোররূপা মহাকালী গ্রাসে মুখ ব্যাদানে।।
> অঙ্গ হ'তে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
> করালবদনা কালী নৃত্য করে হুঙ্কারে।।[৬২]

আবার ভারতীয় দর্শনে জড়বস্তুর শক্তিকে মায়াশক্তি বলা হইয়াছে। ইহা বহুক্ষেত্রে আত্মচৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে। আত্মচৈতন্য বা জীবের চিৎশক্তি ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হইলে তাহা মায়াশক্তি বা জড়ের মোহকে অতিক্রম করিতে পারে। সুতরাং বস্তুর দর্শনে ভ্রান্তি বা অদর্শনে বেদনাকে সম্পূর্ণ পরিহার করিবার পথ হইল

আত্মচৈতন্য উৎকর্ষের সাধনা। মায়াশক্তির এই বিলয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

> With the greater predominance of Sattvaguna in divine man Consciousness becomes more and more divine until it is altogether freed of the bonds of Maya and the Jiva Consciousness expands into the pure Brahman Consciousness...As however ascent is made, they are less and less veiled and Pure Consciousness is at length realised in Samadhi and Moksha.[৬৩]

দশমহাবিদ্যায় নারদ জীবের ক্রমোন্নতির জন্য এই উপদেশ দিয়াছেন—

> লিখি বুকে মোক্ষনাম পুরা জীব, মনস্কাম
> 'নিখিল নিস্তার পাবে' শিব কৈল আপনি।
> লক্ষ্য করি তারি পথ চালা নিত্য মনোরথ
> জীবজন্মে ভয় কিরে? জগদম্বা জননী।[৬৪]

দশমহাবিদ্যায় ভারতীয় তত্ত্ব ও দর্শনের এই অভিব্যক্তি ছাড়া ইহার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কিছু চিন্তাও আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের বিবর্তনবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিবর্তনবাদ দ্বারা বিশেষভাবে আন্দোলিত হইয়াছে। হার্বার্ট স্পেন্সারই এই তত্ত্বের প্রথম উদ্গাতা। তিনি বিবর্তনবাদের সূত্র দিয়াছেন—

> Evolution is an integration of matter and a concomitant dissipation of motion; during which the matter passes from an indefinite, incoherent homogenity, to a definite, coherent heterogenity; and during which the retained motion undergoes a parallel transformation".[৬৫]

যদিও স্পেন্সার শেষ পর্যন্ত এই বিবর্তনকে এক নৈরাশ্যজনক পরিণতি বলিয়া মনে করিয়াছেন, তথাপি ইহাই যে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত নীতি, এ সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় নাই। হেমচন্দ্রের খাঁটি হিন্দু প্রকৃতি বিবর্তনবাদের এইরূপ শুষ্ক পরিণামকে মানিয়া লইতে পারে নাই। তিনি ইহার সহিত ভারতীয় চিন্তার শুভপরিণামবাদকে সংযোজিত করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে চিন্তাশীল বাঙ্গালী মানসে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রভাব একান্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কোম্‌ৎ, মিল ও বেন্থামের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দও অল্পবিস্তর

অনুরূপ চিন্তা ও আলোচনার পরিচয় দিয়াছেন। সেক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের পক্ষেও সমকালীন দার্শনিক প্রত্যয়ের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নহে। পুরাণ কাহিনীর দশমহাবিদ্যা এইভাবে হেমচন্দ্রের নিকট একটি তত্ত্ব দর্শনের রূপ লাভ করিয়াছে বলা যায়।

হেমচন্দ্রের কবিতাবলী (১৮৭০)।। তাঁহার কবিতাবলীর অন্তর্ভুক্ত কিছু কিছু খণ্ড কবিতা পৌরাণিক উপাদান লইয়া রচিত। অক্ষয়চন্দ্রের মতে ইহাদের মধ্যে 'কোথাও ধর্ম বিশ্বাস পরিস্ফুট হয় নাই।'[৬৩] কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। হেমচন্দ্র তাঁহার আখ্যানকাব্য ও গীতিকবিতার মধ্যে যে ধর্মচেতনা ও নীতিকথা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক মনোভঙ্গীই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, তাঁহার ইংরেজী রচনা—Brahmo Theism in India—প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় জীবনে ব্রাহ্ম ধর্মের অনুপযোগিতার কথাই বলিয়াছেন। এরূপ হইতে পারে যে, তাঁহার পথ ও সমকালীন চিন্তানায়কদের পথ এক ছিল না। তিনি কাব্যের মধ্যে সংস্কার বা ধর্মকে সূক্ষ্মভাবরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রবন্ধাদির মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কারকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই বলিয়া হয়ত সমকালীন হিন্দুভাবপুষ্ট লেখক সমালোচকগণ তাঁহার মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন।

হেমচন্দ্র মূলতঃ উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তার কবি। তাঁহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ খণ্ড কবিতাতে এই জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার পৌরাণিক কথাবস্তু লইয়া রচিত তাঁহার খণ্ড কবিতাগুলিতে দেশজীবনের সংস্কার, তীর্থ মাহাত্ম্য, নদীমাহাত্ম্য ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে। এগুলির মধ্যে কবির আধ্যাত্মিক অনুচিন্তন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা বা দেবনিদ্রার মত কবিতায় সাধারণ ভাবে দেবলোকের কথা এবং দেবমহিমার কথা ব্যক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে কবি মানবচিন্তাকেই বড় করিয়া তুলিয়াছেন। পৌরাণিক ভাবের কথাবস্তুতে কবি আধুনিক কালের আশা নৈরাশ্যের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। 'ইন্দ্রের সুধাপান' কবিতায় দেবকুলের সুধাপান ও আনন্দোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। সুধাবঞ্চিত দানবকুল দেবতাদের সহিত সংগ্রাম করিতে আসিলে সুরপতি ইন্দ্র বিলাস ব্যসন ছাড়িয়া আবার অরাতি সংহারে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ও কবি স্বাদেশিকতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তীর্থ ও নদী–

মাহাত্ম্যমূলক কবিতাগুলিতে। কবি জড়জীবনে কাশীধামের সহিত জড়িত ছিলেন। ইঁহার ফলে পুণ্য বারানসীধাম ও পুণ্যতোয়া গঙ্গার পবিত্র অনুভূতি তাঁহার কতকগুলি কবিতার বিষয়বস্তু হইয়াছে 'কাশীদৃশ্য' 'মণিকর্ণিকা' 'বিশ্বেশ্বরের আরতি', 'গঙ্গার মূর্তি', 'গঙ্গা', 'গঙ্গার উৎপত্তি' প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবিতা।

'কাশীদৃশ্য' কবিতাতে কাশীর ঐতিহাসিক স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক গৌরব ব্যক্ত হইয়াছে। জাহ্নবী কোলে পাষাণময়ী কাশী একদিন কলকোলাহলে পূর্ণ ছিল। ইতিহাসের ধারায় ইহার মহান কীর্তিগুলি বার বার ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। কাশীর মধ্যস্থলে বিশ্বেশ্বরধাম, হিন্দুর ধর্মের শিখা ঐ মন্দিরে প্রজ্জলিত। যে কাশী একদিন ভিখারী শিবের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাহাই আজ বিশ্বজনের মিলন ক্ষেত্র হইয়াছে। কবির অর্ধদগ্ধ অন্তর এই ভবরাজ্যে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিত শান্তিলাভ করিবে।

কাশীর মণিকর্ণিকা কুণ্ডকে অবলম্বন করিয়া হেমচন্দ্র 'মণিকর্ণিকা' কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। শিব-শিবানীর মর্ত্যলীলায় বিষ্ণুনামাঙ্কিত চক্রতীর্থ মণিকর্ণিকা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ভব-ভবানীর স্নানের ফলে এই কুণ্ড মহাপবিত্র হইয়াছে, তাবৎ ভক্তজন পবিত্র অন্তরে ইহাতে স্নান করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করে।

বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক আর একটি কবিতা 'বিশ্বেশ্বরের আরতি'। ইহা মৌলিক কবিতা নহে, কাশীর প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং কর্তৃক প্রকাশিত একটি গ্রন্থের অনুবাদ। কবির নিজের বক্তব্য—ইহা প্রায়ই মূলানুগ অনুবাদ, তবে বাংলা ভাষায় পঠন ও ভাব গ্রহণের জন্য কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। যোগীশ্বর বিশ্বেশ্বরের রূপ ও প্রকৃতি ইহাতে স্তোত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের গঙ্গা মাহাত্ম্য জ্ঞাপক কবিতাগুলি হইল 'গঙ্গার মূর্তি', 'গঙ্গা' এবং 'গঙ্গার উৎপত্তি'। রামনগরে কাশীরাজের ভবনে গঙ্গার মূর্তি দর্শনে প্রথম কবিতাটি রচিত। ইহার মধ্যে কবি মানবজীবনের দুঃখ জ্বালা নিবারণে গঙ্গার নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয়টিতে গঙ্গার পরহিতব্রতের প্রশস্তি রচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা হইল 'গঙ্গার উৎপত্তি'। মনীষী রাজনারায়ণ বসু কবিতাটির ধর্মভাবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বস্তুতঃ কবিতাটির একটি সহজ আবেদন আছে। হেমচন্দ্রের অনেকগুলি কবিতায় তত্ত্ব একটু বেশী, ইহাতে বহুক্ষেত্রে তাঁহার বক্তব্য অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য কবিতাটি সর্বাংশে এই ত্রুটি মুক্ত। ব্রহ্ম সনাতন চরণ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, জগৎ

ঘিরিয়া ইহার তরঙ্গের অভিক্ষেপ, পবিত্র ধারা প্রবাহে মর্ত্যধামকে শুচিসুন্দর করা ইত্যাদির মধ্যে আমাদের সুচির সঞ্চিত জাহ্নবীর পতিতপাবনী রূপটি সমর্থিত হইয়াছে। ভাববিহ্বল নারদের কণ্ঠ নিঃসৃত গঙ্গা মাহাত্ম্য কবিতাটির সর্বত্র একটি সহজ ভক্তিরসের সঞ্চার করিয়াছে।

কাশীধাম, গঙ্গা, শিব-শিবানী এই আধ্যাত্মিক বৃত্তেই হেমচন্দ্রের ব্যক্তি অনুভূতি সঞ্চরণ করিয়াছে। কাশী বারানসী আর গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া কবি ইহাদের অধিষ্ঠিত দেবতা মহেশ্বরকেও বিশেষভাবে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। 'অন্নদার শিব পূজা'য় এই শিবমাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এই কবিতাটি এক অনুপম সৃষ্টি, এক ভারতচন্দ্রই ইহার তুলনাস্থল। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে শিবের অন্নদা পূজার বিবরণ দিয়াছেন— কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরে অন্নদাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিব কাশীধামকে পুণ্যভূমি করিয়া দিয়াছেন। শিব নানারূপ প্রশস্তি করিয়া অন্নদার প্রীতিলাভ করিলেন। কাশীর পবিত্রতা সেই অন্নপূর্ণারই কৃপা। হেমচন্দ্র চিত্রটি আঁকিয়াছেন বিপরীত দিক হইতে। তাঁহার অন্নদা শিবসমীপে নিখিলের দুঃখ নিবেদন করিতেছেন। একদিন যে ব্রহ্মাণ্ডে সুখ ছিল, আনন্দ ছিল, তাহাতে এখন জরা, ব্যাধি, পীড়া। অন্নদার নিবেদন দেবাদিদেব মহেশ্বর আবার পৃথিবীকে আনন্দময় করুন, পুণ্যতোয়া জাহ্নবী শিবের এই মঙ্গল নিদানকে দিকে দিকে ঘোষণা করিবে। ভারতচন্দ্রের শিব যদি কাশীতে অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠা দিয়া থাকেন, হেমচন্দ্রের অন্নদা তবে শিবধামকে মোক্ষতীর্থের প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক কাব্য বা গীতিকাব্যের মধ্যে হেমচন্দ্র একটি পৌরাণিক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইগুলির মধ্যে পৌরাণিক তথ্য বা তত্ত্বের যে হুবহু অনুসরণ ঘটিয়াছে এমন নহে। ইহাদের বহুক্ষেত্রে পৌরাণিক তথ্য অপেক্ষা পৌরাণিক সংস্কারের পরিচয় বেশী। দেশের সাধারণ জীবন-প্রকৃতি ধূসর পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে যেভাবে নীতিধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, তাঁহার কাব্যে তাহাই হইয়াছে। আবার শাস্ত্রের অলৌকিকতা ও অতিরঞ্জন কিংবদন্তী ইতিহাস ও ভূগোলের বিক্ষিপ্ত নিদর্শনের মধ্যে যাহা আজিও টিকিয়া আছে, সেই দেবতা, তীর্থ, নদী—ইহাদিগকেই তিনি লোক মনের সংস্কার প্রকৃতির উপযোগী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহাদের এই রূপায়ণে কবিচিত্তের ব্যক্তিগত অনুভূতি যে সায় দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

বিশ্বেশ্বর বিলাপ (১৮৭৪)।—পুণ্য কাশীধামের বর্তমান দুরবস্থা বর্ণনা

করিয়া দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এই কাব্যটি রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে কবি এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন—তীর্থস্থানগুলিতে পাপের যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। কাশী সর্বপ্রধান তীর্থস্থান, পাপও এখানে সর্বপ্রধান পদ লাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে এমন পাপ নাই এখানে যাহার নিত্য অনুষ্ঠান না হয়। সেই পাপ বর্ণনা করিয়া তাহা হইতে বিরত হইবার উপদেশ দেওয়াই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।"[৬৭] স্মরণাতীত কাল হইতে কাশীধাম হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থান। কিন্তু যুগান্তের পাপ ও ব্যভিচারিতা কাশীর পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। বিশ্বেশ্বরের স্বপ্নবৃত্তান্তের মধ্য দিয়া কবি এই পাপের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীনকালে দিবোদাস ও বেদব্যাস একবার কাশীর পবিত্রতা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া কাশীধামের কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে বিধর্মীদের হস্তক্ষেপে ইহার সমূহ শান্তি ও পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যবন জাতি বিশ্বেশ্বরকে শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই। ধর্মের নাম করিয়া তাহারা ধর্মকে উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে। স্বার্থ প্রণোদিত যবন জাতি পরধর্মের মাহাত্ম্য কলুষিত করিয়াছে। আরও পরবর্তীকালে ঐহিকবাদী ইংরাজ জাতিও কাশীধামের মাহাত্ম্য খর্ব করিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম-মর্মে তাহাদের বিশ্বাস নাই, উদ্ধত সংশয়ে তাহারাও কাশীর অকল্যাণ করিতেছে। বর্তমানে কাশীর অবস্থা আরও শোচনীয়। মদের পঙ্কিল স্রোত মানুষের বিবেক অপহরণ করিয়াছে। স্বদেশ বিতাড়িত পাতকী দুর্জন কাশীকেই উপযুক্ত আশ্রয় মনে করিয়া তাহাদের পাপাচরণের ক্ষেত্র করিয়াছে। বিশ্বেশ্বর তাঁহার সাধের বারানসীর দুর্গতিতে বিচলিত। পাপীকুলকে তিনি আর একবার সদুপদেশ দান করিতেছেন। কর্তব্যকর্মে আত্মনিয়োগে তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হউক—ইহাই তাঁহার কামনা।

যুগান্তের বিরুদ্ধ জীবনধারা প্রাচীন সংস্কৃতিকে কিভাবে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়, আলোচ্য কবিতায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

অপূর্ব প্রণয় বা দক্ষবধ কাব্য (১৮৭৭)।—ছয়টি সর্গে রচিত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য কাব্যটি পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞের কাহিনী লইয়া রচিত। ইহার কাহিনী অংশে নূতনত্ব কিছুই নাই। সতীর পিত্রালয়ে গমনের পর হইতে সতীশূন্য কৈলাসের চিত্র দিয়া কাব্যটি আরম্ভ হইয়াছে। নন্দী সতীদেহ ত্যাগের বার্তা কৈলাসে আনিলে শিব দারুণ বিচলিত হইয়া পড়েন। শিবের মর্মস্পর্শী বিলাপ করুণ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। সতীশূন্য কৈলাস শিবের নিকট অর্থহীন

হইবা পড়িয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ী শিব গৃহী মানুষের বেদনায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। মর্ত্যজীবের পক্ষে এই সময় দেহত্যাগ করা সম্ভব কিন্তু তিনি ত জীবন-মৃত্যুর উর্ধ্বে। তাঁহার নিকট এ যন্ত্রণার কোনরূপ সমাধান নাই। তিনি দেখিতেছেন—

"অভাগার ভালে দেখি সব বিপরীত
আগুনে না জ্বলে না মরে গরলে
ভালরে শিবের করম-সূত।"[৬৮]

দক্ষ যে তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছে, তাহাতে ক্ষতি নাই, তিনি নিন্দা প্রশংসার অতীত হইয়াছেন। কিন্তু তীব্র পতি নিন্দা যে সতীর দেহপাত ঘটাইয়াছে, তাহার দুঃখ ভুলিবার নহে—এইজন্যই তিনি দক্ষের দর্প চূর্ণ করিবেন। শিবের সংহার মূর্তি-পরিগ্রহ, নিখিলের প্রমথকুলের আহ্বান, স্বর্গ-মর্ত্য মন্থনকারী রুদ্রলীলার যে ভাষাচিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে শিব চরিত্রের সংক্ষুব্ধ রূপটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শিবের অপর মূর্তি—আশুতোষ রূপটিও সমানভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কবি প্রস্তুতির শিবস্তুতির মধ্যে শিবের এই আশুতোষ রূপটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন—

অচিন্ত্য অব্যক্ত তোমার মহিমা
সামান্য সাধনে কে পায় বল—
তবে সে ভরসা আশুতোষ তুমি
রোষ তোষ তব ক্ষণেক হয়।[৬৯]

তথাপি শিবের এই দেবাদিদেব রূপটিই কাব্যে বড় হয় নাই। শিব দেহী মানুষের আনন্দ বেদনার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কৈলাসে সতী সান্নিধ্যে তিনি অশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন, সতীশূন্য কৈলাসে আবার তিনি সন্ন্যাসী ভিখারী হইয়াছেন। স্নেহ প্রেমের গভীর বন্ধনে দেবতার নির্মোক খসিয়া পড়িয়াছে। ছিন্ন সতীদেহ অবলম্বন করিয়া যে সাধনপীঠ গড়িয়া উঠিয়াছে, শিব ভৈরব হইয়া তাহার রক্ষণ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। আবার তিনি যে নূতন করিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন, তাহার মূলে লোকাতীত ঐশ্বর্য লাভের কোন অভীপ্সা নাই, 'করে মালা, মুখে জপ, সতী নামাবলী' লইয়া তিনি সতীকেই অন্বেষণ করিতেছেন। কাব্য হিসাবে ইহা অভিনব কিছু নহে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে সর্বপ্লাবী প্রেমের প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে, যাহা দেবতা মানবকে সমান ভাবে বিচলিত করে, তাহা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

পৌরাণিক দেব মহিমার কাব্য

তারক সংহার কাব্য (১৮৮৮)॥ শিবপুরাণ ও দেবী ভাগবতের তারকাসুর নিধন কাহিনী লইয়া অক্ষয় কুমার সরকার এই কাব্যটি রচনা করিয়াছেন। নয়টি সর্গে বিবৃত এই কাব্যটিতে তারকাসুর হস্তে দেবগণের লাঞ্ছনা, ব্রহ্মা সকাশে দেবগণের আগমন, ধূর্জটির ধ্যানভঙ্গ, উমা মহেশ্বরের মিলন, কার্তিকেয়র জন্ম ও তাঁহার হস্তে তারকাসুর নিধনের কাহিনী বর্ণিত হইযাছে। কবি স্পষ্টতঃ হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যটি অনুসরণ করিয়াছেন। তারকাসুর চরিত্রে বৃত্রাসুর ও তারকা পত্নী সুরসার চরিত্রে বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলার প্রভাব পড়িয়াছে। এমনকি ঐন্দ্রিলার যে শচী পদসেবার আকাঙ্ক্ষা, তাহাও সুরসার রতিপদসেবা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিধৃত হইযাছে। কবি নিগৃহীত দেবকুলের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। লাঞ্ছিত দেবকুলের আত্মকলহের বিবরণ তাঁহাদের চরিত্রানুগ হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে পরাধীনতার বেদনা আছে, কিন্তু জাতীযতা প্রবুদ্ধ কোনরূপ মর্মজ্বালা নাই। কবি পুরাণ কাহিনীর বিবরণ দিযাই ক্ষান্ত হইযাছেন, যুগজীবনের উপযোগী কোনরূপ বৃহৎ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। নৈমিষারণ্যে শচী-রতি সংলাপে শচীচরিত্রের মহানুভবতা প্রকাশ পাইযাছে। ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির চিত্রে কবির কৃতিত্ব আছে। হরকোপানলে মদন ভস্মীভূত হইলে রতি বিলাপকে কবি মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছেন। পরমেশ্বরী অম্বিকার মধ্যে মাতৃত্বের কোমলতা ফুটাইয়া কবি পৌরাণিকতার মধ্যে মানবিকতার সঞ্চার করিয়াছেন। তবে কাহিনী বিবৃতি ছাড়া কাব্যোৎকর্ষে ইহা কোনরূপ সার্থকতা লাভ করে নাই।

ত্রিদিব বিজয় (১৮৯৬) ॥ শশধর রায়ের 'ত্রিদিব বিজয়' কাব্যটিও তারকাসুর নিধন কাহিনী লইযা রচিত। পৌরাণিক উপাদানে ইহা অধিকতর সমৃদ্ধ। কার্তিকেয় কর্তৃক তারকাসুর নিধনের মূল কাহিনীর সহিত কবি মহামাযার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও সংহার তত্ত্বের চিত্তগ্রাহী বিবরণ দিয়াছেন। কাহিনী বিন্যাসে কিঞ্চিৎ রূপান্তর আছে। পুরাণে উল্লেখ এই যে, বিধাতার নির্দেশে দেবগণ মদনকে লইযা ধূর্জটির ধ্যানভঙ্গ করিতে গিযাছিলেন। এখানে এই নির্দেশটি দৈববাণী রূপে আসিয়াছে এবং স্বয়ং শিবানী ইন্দ্র সমভিব্যাহারে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। মহাদেব তাঁহাকে কর্মফলের অনিবার্যতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র রাজকার্যে শৈথিল্য দেখাইয়াছেন, তাহারই রন্ধ্রপথে তারক উদ্দেশ্য

সিদ্ধি করিয়াছে এবং মহাদেবের বর লাভ করিয়া অজেয় হইয়াছে। তবে মহামায়ার ক্ষমায় মহেশ্বের দেবলোকের ত্রাণ করিবেন এবং তাঁহার অংশে আবির্ভূত কুমার তারক সংহার করিবেন। তারকাসুরের অস্ত্রশিক্ষাকে কবি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং বিদায় কালে রণ নিপুণ শিষ্যকে সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ্য 'ক্ষমা অস্ত্র' দান করিলেন। মদন ভস্ম বা শিববিবাহকে কবি প্রচলিত ধারায় বর্ণনা করেন নাই, সকল ঘটনার মধ্যে একটি তত্ত্বের উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন। মদনের অশরীরী রূপ নিত্যকাল মানুষের মধ্যে বিরাজ করিবে—এই বলিয়া মাহামায়া রতির এয়োতী রক্ষা করিয়াছেন। শিব বিবাহ প্রসঙ্গে নারদের দ্ব্যর্থ ভাষায় শিবস্তুতি গভীর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিয়াছে। কাব্যটির মধ্যে পৌরাণিক চেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নিখিলের জীবকুল কর্মফলের সূত্রে আবদ্ধ, পরিণাম কোন ক্ষেত্রেই আকস্মিক নহে—দেব ও দানবকুলের উত্থান-পতনের এই একটি সূত্রই মহাকাল নির্দেশ করিয়াছেন। নন্দী মহাকালের এই নির্দেশ দৈত্যাধিপতিকে জানাইয়াছেন—

কিবা জঠরের
ভ্রূণ, কিবা শিশু, যুবা বৃদ্ধ কিবা যেই
কর্ম করে জীব এ বিশ্ব মাঝারে, ফলে
ক্রিয়া তার সুসময়ে, নহে ব্যর্থ প ও
কভু, সুফল কুফল তার যথাবিধি
উপজে সময়ে।[৭৭]

তবে ভক্তির ক্ষেত্র কোথাও সীমাবদ্ধ নহে। ভক্তিতে দৈত্যও বড় হইতে পারে। তারকাসুরকে কবি এইরূপ ভক্ত করিয়া থাকিয়াছেন। মহেশ্বরের পরম ভক্ত এই দেবারি তারকের অন্তিম বেদনায় সুরলোকও কাঁদিয়া উঠিয়াছে। কুমার কার্তিকেয় সৃষ্টি মধ্যে তাহাকে অমর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পৌরাণিক এই কাব্য কাহিনীর মধ্যে চিরন্তন মানব নীতির এক অক্ষয় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে।

পৌরাণিক দেবী মাহাত্ম্যের কাব্য

দেবী মাহাত্ম্যের কাব্যগুলি প্রধানতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্য অংশ লইয়া রচিত। একাধিক কবি দেবী চণ্ডিকার অসুর দলন রূপ লইয়া তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দেবী মাহাত্ম্যের আক্ষরিক

অনুবাদ যেমন আছে, তেমনি দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক স্বতন্ত্র কাব্যও আছে। নবীনচন্দ্র দেবী মাহাত্ম্যের একটি পদ্যানুবাদ (১৮৮৯) করিয়াছিলেন। তিনি চণ্ডীর মুখবন্ধ 'আভাষ'টি গদ্যে রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিনি কৌতুক রসের অবতারণা দ্বারা চণ্ডীতত্ত্ব এবং চণ্ডীর আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাব্য অংশটি মূলের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। কিন্তু এই অনুবাদ প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য হয় নাই। সংস্কৃত ভাষার গাম্ভীর্য ও শব্দ বিন্যাসকে কবি প্রচলিত কাব্যরীতির মধ্যে যথাযথ ব্যক্ত করিতে পারেন নাই।

দানব দলন কাব্য (১৮৭৩)॥ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানবদলন কাব্য'টি এই প্রসঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। ইহা তদানীন্তন কালে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' মন্তব্য করিয়াছিল—"নবীন কবি হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ কাব্যে বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া অসংসাহসের কাজ বটে। শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে উভয় পক্ষ অতি সাহস প্রকৃতি-বিশিষ্ট। একপক্ষ ইন্দ্রাদি দেবগণের শাস্তা অসুর কুল, পক্ষান্তরে সর্বনাশিনী মূর্তি বিশিষ্টা সাক্ষাৎ-পরমেশ্বরী।...কিন্তু এই কবি প্রথমে চণ্ডীর উগ্রচণ্ডা মূর্তিকে মানব মূর্তি সদৃশী করিয়াছেন। চণ্ডীকে কেবলমাত্র অতিপ্রাকৃত বলবীর্যের আধার কল্পনা করিয়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাকে মানব প্রকৃতি শালিনী করিয়াছেন।"[১১] বস্তুতঃ পৌরাণিক চরিত্রের এই আধুনিক রূপায়ণই আলোচ্য কাব্যের বৈশিষ্ট্য। এইজন্য ইহার পৌরাণিক চরিত্রগুলি শাস্ত্রের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ থাকে নাই, পৌরাণিকতার সীমা অতিক্রম করিয়া তাহারা আমাদের সাধারণ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। অলৌকিকতার ছায়াচ্ছন্ন চরিত্রের সহিত সামাজিক মানবের এই সার্থক যোগে সাহিত্যের আবেদন নিবিড় হয়। শুম্ভকে কবি পরম ভক্তরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। অন্তিমকালে মাতা কালিকার নিকট শুম্ভ যেভাবে আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহাতে তাহার কলুষিত দানবচরিত্র ভক্তির পুণ্যস্পর্শে সম্পূর্ণ কলঙ্কমুক্ত হইয়া গিয়াছে। দৈত্যদানব চরিত্রের মধ্যে মহৎ মানবিকতার সন্ধান এবং তাহাদিগকে গভীর সহানুভূতি দিয়া গ্রহণ—পৌরাণিক সাহিত্যের এই আধুনিক লক্ষণ কাব্যটিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কালীবিলাস কাব্য (১ম মুদ্রণ ১৮৬০ খৃঃ)॥ দ্বিজ কালিদাস তাঁহার এই কাব্যের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডী, কুমার সম্ভব, কালীপুরাণ এবং যোগিনীতন্ত্র, এই সকল মূল গ্রন্থ প্রমাণান্তে"[১২] কাব্যটি রচিত। অর্থাৎ কবি ইহাতে মাতৃশক্তি কালিকার বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহের

একটি বিবরণ দিয়াছেন। স্বরাজ্যচ্যুত রাজা সুরথ বৈশ্য অধিপতি সমাধিকে লইয়া মেধস মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহারা মুনিকে প্রশ্ন করিলেন যে বন্ধু পরিজন ও স্বজনবর্গের জন্য এইরূপ দৈন্যযুক্ত হওয়ার সার্থকতা কোথায়। মুনি উত্তর দিয়াছেন যে নিখিলের সকল প্রাণীই অসীম ক্লেশ ও যত্নে আত্মীয় পরিজনদের পালন করে। এ সমস্ত জাগতিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করিবার নহে, সবই মহামায়ার লীলাবিধান। সেই সনাতনী জগজ্জননী মোহের আবেশে জ্ঞানীজনের মন হরণ করেন, দয়া পরবশ হইয়া কাহাকে বা সংসার বন্ধন হইতে মুক্তও করেন। তখন নৃপতিদ্বয় মহামায়ার উৎপত্তি ও স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করিলেন। মুনি জানাইলেন সেই জগৎমায়া জন্ম মৃত্যুর অতীত, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপিণী, তবে দেবকার্যের জন্য তিনি মাঝে মাঝে সাকার রূপও পরিগ্রহ করেন। অতঃপর মেধস মুনি মহামায়ার এই সাকার রূপের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। মহামায়ার লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি মহিষাসুর নিধন, শুম্ভ নিশুম্ভ বধ, দক্ষযজ্ঞ কথা ও গিরিরাজ তনয়া গৌরীর তপস্যা ও সিদ্ধির বিবরণ দিয়াছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই মহামায়া স্বরূপ শক্তিতে তেজোময়ী, চামুণ্ডা, সতী ও গৌরী রূপের অভিধা গ্রহণ করিয়াছেন। দৈত্য দলন, দক্ষযজ্ঞ ও গিরি কন্যার কাহিনীতে কবি পুরাণ ও তন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। দেবীযুদ্ধ প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য, দেবী পূজা সম্বন্ধে কালিকা পুরাণ নির্দেশ এবং হরগৌরী মিলন প্রসঙ্গে কুমার সম্ভবীয় কাহিনীকে কবি সচেতন ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। প্রতিটি কাহিনীর উপবিভাগে কবি শাক্ত সঙ্গীতকে বর্ণিতব্য কাহিনীর ধুয়ারূপে সংযোজিত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কাব্যের মূল ভাবটি যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি কবির আধ্যাত্মিক আকুতিও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শিবের বিবাহ প্রসঙ্গে কবি অপূর্ব কৌতুক রস সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার এই দেবাদিদেব মহেশ্বর শক্তি বিহনে কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়েন, তাহার সকরুণ চিত্রটিও কবি দক্ষতার সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। ঐশ্বরিক বিভূতিকে অগ্রাহ্য করিয়া শিব স্নেহ প্রেমের বন্যায় ভিক্ষুক সাজিয়াছেন। পৌরাণিক কালিকা উপাখ্যানের প্রচণ্ড উগ্রতাকে কবি কোমলতার প্রলেপে মধুর ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

সুরারিবধ কাব্য (১৮৭৫)॥ রামগতি চট্টোপাধ্যায়ের 'সুরারিবধ কাব্য'টিতেও মহামায়ার দৈত্যদলন বিষয় কীর্তিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে কবি বলিয়াছেন "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে ছায়ামাত্র অবলম্বন পূর্বক সুরারিবধ কাব্য

নামে পরিণত করিলাম।"[৭৩] অষ্ট সর্গে বিভক্ত কাব্যটিতে দেবকুলের স্বর্গ নির্বাসন হইতে স্বর্গ পুনরাধিকার পর্যন্ত ঘটনা বিধৃত। দেবকুলের আরাধনায় মহামায়ার মোহিনী রূপ ধারণ, শুম্ভ নিশুম্ভকে বীর্যপণে বিবাহ প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন ও দৈত্যকুলের সহিত ক্রমাগত সংগ্রামে কবি দেবী মাহাত্ম্যকে যথোচিত উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। দেবীর বিভিন্ন রূপ বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইয়াছে। দেবীর পুরাণোক্ত সমস্ত রূপ ও পরিচয়কে কবি গ্রহণ করেন নাই। পার্বতীর দেহকোষ হইতে বহির্ভূতা হইলেন যে দেবী, তিনিই পুরাণে কৌষিকী নামে খ্যাত। কিংবা চণ্ডিকা শুম্ভ নিশুম্ভকে স্বর্গরাজ্য প্রত্যর্পণের প্রস্তাব শিবের দ্বারা পাঠাইলে শিবদূতী নামে খ্যাত হন। এগুলি কাব্যে গৃহীত হয় নাই। দেবী স্বরূপের মাহাত্ম্য কীর্তনে কবি নাগরূপের প্রধান কয়েকটি ক্ষেত্র[৭৪] গ্রহণ করিয়াছেন। দেবীর স্বশক্তি উদ্ভূতা কালিকা ও চামুণ্ডার বিবরণ তিনি অবিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। রক্তবীজ দৈত্যের নিধন কালে অম্বিকার যুদ্ধাযোজন ও সম্মিলিত দেবশক্তির পরিচয় প্রদানে কবি মূল পুরাণের গাম্ভীর্যকে অদ্ভুতভাবে রক্ষা করিয়াছেন। হংসবিমানে ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, বৃষভবাহনে মাহেশ্বরী শক্তি, গরুড় বাহনে সশস্ত্র বৈষ্ণবী শক্তি, ময়ূর বাহনে গুহরূপিণী কৌমারী শক্তি, বরাহরূপে অন্যতম বিষ্ণু শক্তি, নৃসিংহরূপে নারসিংহী শক্তি, গজস্কন্ধে বজ্রধৃত ঐন্দ্রী শক্তি জগন্মাতা মহামায়ার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন। ইহাদের ভীম পরাক্রমে ও চামুণ্ডার প্রসারিত জিহ্বায় শূন্যদেশে রক্ত বীজের রক্ত লেহনে দেবী রক্তবীজ দৈত্যকুল ধ্বংস করিয়াছেন। যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে দেবী চণ্ডীকার মারণরূপের যে মহাভয়ংকরতা কবি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। দেবীর অদ্বয় মহাশক্তিরূপ শুম্ভের নিকট পরিশেষে প্রতিভাত হইয়াছে। সুরকুলকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহামায়ার সংহার লীলার অবসান ঘটিয়াছে। মূলানুগ রচনা হিসাবে কাব্যটি উল্লেখযোগ্য।

দেবীযুদ্ধ (১৮৭৮)॥ শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর 'দেবীযুদ্ধ' কাব্যটিও মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্য লইয়া রচিত। একাদশ সর্গে বিভক্ত কাব্যটিতে কবি দেবী চণ্ডীকার অসুর দলনের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। পৌরাণিক উপকরণকে কবি বিশেষ নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন এবং মহামায়ার বিবিধ রূপকল্পনাকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। দেবকুলের মন্ত্রণা ও শক্তিভূমিতে যাত্রাকালীন বিবিধ বিঘ্ন সাক্ষাতের মধ্যে কবি নিজস্ব মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। স্বয়ং পদ্মযোনি অসুরকুলের দম্ভ ও দৌরাত্ম্যের জন্য মহাদেবকে

দায়ী করিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা চিরন্তন নীতিশাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত। মহাদেব বলিয়াছেন তপস্যার অধিকার সকলেরই। দেবকুল যখন অহংকারে মত্ত হইয়া বিলাস স্রোতে অমরা পরিবেশকে প্লাবিত করিয়াছিল, তখন দৈত্যগণ সুকঠোর তপস্যায় অজেয় হইবার আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে। ভক্তাধীন ভগবানের নিকট কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব নাই। জাতিবর্ণ বিচার করিয়া অভীষ্ট বরদান করিলে ভক্তির মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়। দেবকুলের মোহনিদ্রাই তাহাদের পতন আনিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাঁহার বরদান দৈত্যদের নিগ্রহের কারণ নহে। অবশ্য এই তপস্যার ফল যখন বিশ্ববিধানকে লংঘন করে, তখন পতন অনিবার্য। শুম্ভ নিশুম্ভ বিশ্বের মঙ্গলের জন্যই বরলাভ করিয়াছিল, এখন তাহাদের অত্যাচার গগনচুম্বী হইয়াছে। এই কর্মফলই তাহাদের ধ্বংস ও বিনষ্টি আনিয়া দিবে। ভক্ত বৎসল দেবাদিদেবের চরিত্রটি এইভাবে সুন্দর হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। বিঘ্ন বিজয় অধ্যায়ে সাধনার বিচিত্র বিঘ্নের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ অত্যন্ত দুরূহ। অনৈক্য, ঈর্ষা, স্বার্থ, অবসাদ, আত্মকলহ সাধনার জীবন্ত বিঘ্ন, দেব মানব সকলেই ইহার কুক্ষিগত। ইহাদের প্রকোপ হইতে উদ্ধার পাইলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সৎগুরুর নির্দেশে কঠোর আত্মশাসন ও অসীম ধৈর্যের দ্বারা এই বিঘ্ন বিজয় সম্ভব হয়।

দেবী যুদ্ধের বিবরণটি ইহাতে মূলানুগ হইয়াছে। ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ, শুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যবীর সংহারে মহামায়ার কালিকা, চামুণ্ডা, ও চণ্ডিকারূপ যথাস্থানে বিধৃত হইয়াছে। কবি তাঁহার শিবদূতী রূপটিও গ্রহণ করিয়াছেন। শিবানীর নির্দেশে শিব শুম্ভকে ত্রিলোকের আধিপত্য ত্যাগ করিবার শেষ উপদেশ দান করিয়াছেন, কিন্তু মদগর্বী শুম্ভ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই, পরন্তু তীব্র ভাষায় গুরুনিন্দা করিয়াছে। অতঃপর চণ্ডিকা তাহার সংহারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পৌরাণিক নির্দেশকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া কবি দেখাইয়াছেন যে শুম্ভের অবিচল প্রতিজ্ঞা পরায়ণতার জন্য দেবী স্বয়ং তাহার দ্বারা কেশাকর্ষিতা হইতে চাহিয়াছেন এবং পরে তাহাকে একক শক্তিতেই পরাভূত করিয়াছেন। অসুর দলনের এই অভিনব ভূমিকার মধ্যে দেবীর যথার্থ মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। দেবী মাহাত্ম্যের কাব্য হিসাবে অন্যান্য রচনার তুলনায় ইহাকে সার্থক বলা চলে।

সামগ্রিক ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের পৌরাণিক কাব্যসাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ নহে। পুরাণ চেতনা অপেক্ষা পুরাণ কাহিনীর

দিকে অধিকাংশ কবির দৃষ্টি পড়িয়াছিল। পুরাণ চেতনাকে উপলব্ধি করিয়া তাহার যথার্থ ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করিবার দুরূহ সাধনা প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয় নাই। একমাত্র হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মধ্যে কবিকৃতির এই সিদ্ধি কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনা সমগ্র দেশ কালের চিন্তার সহিত গৃহীত হইযাছে। তাঁহারা পুরাণ নির্দিষ্ট চরিত্র ও কথাকে গ্রহণ করিলেও তাহাদের মধ্যে নবযুগোদ্ভূত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটাইয়াছেন। যুগন্ধর কবি মধুসূদন কবিকৃতিতে যে দুর্লভ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, অন্য কোন কবির ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র তাঁহার প্রদর্শিত পথে স্বকীয় রীতিতে পদক্ষেপ করিযাছিলেন, সংস্কৃতির রক্ষণ বা পুনর্মার্জনা দ্বারা তাঁহারা জাতীয় চিন্তাকে কিছুটা প্রদীপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন। অন্যান্য ভূরি প্রমাণ কাব্য ও তাহাদের রচয়িতাগণ এইরূপ কোন বৃহৎ চিন্তার সূত্রপাত করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র কাহিনীগত আবেদনে আকৃষ্ট হইযা সেই কাহিনীর কাব্যরূপকেই তাঁহারা পাঠক মহলে উপহার দিযাছেন। রামাযণ মহাভারতের করুণ ও বীর রসাত্মক কাহিনী, লোকশ্রুতিতে যেগুলি পূর্বেই আদৃত, সেইগুলিকেই তাঁহারা কাব্যরূপ দিয়াছেন। রাবণ দুর্যোধন আপন প্রকৃতি-গৌরবে যে স্মরণের শীর্ষচূড়ায় সমাসীন, তাহা যুগান্তরের মানুষও জুগুপ্সা-সংস্কারের মিশ্র অনুভূতিতে সাদরে গ্রহণ করিবে। পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে দেবকুলের অসীম লাঞ্ছনা বর্ণিত হইযাছে। এইরূপ নিগ্রহে বৃহৎ দেশজীবন আপনার দুরদৃষ্টের ছাযাপাত দেখিয়াছে এবং তাহা হইতে মুক্তির জন্য দেবানুরূপ মহাশক্তির শরণাপন্ন হইতে চাহিয়াছেন। আলোচ্য পর্বের কবিগণ সাধারণ জীবনের এই সহজ আকাঙ্ক্ষাকেই রূপ দিতে চাহিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা উদ্দেশ্যানুকূল বিক্ষিপ্ত ঘটনা নির্বাচন করিয়া তাহাদের কাব্যরূপ দিয়াছেন। এগুলি মহাকবিদের রচনা নহে, যুগান্তের কলধ্বনি তাঁহাদের স্বল্প কয়েকজনই শুনিতে পাইযাছিলেন। সেই জন্য কাব্য রূপায়ণে নবযুগ চেতনা অপেক্ষা পুরাতন সংস্কারই জযী হইয়াছে। শতাব্দীর শেষভাগে ধর্ম সংস্কৃতির যখন পুনরুজ্জীবন শুরু হইয়াছে, তখন এই কবিকুল পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের মহিমাকে যথাসাধ্য উজ্জ্বল করিয়া দেশ কালের সমক্ষে আপনাদের ভূমিকা রাখিয়া দিযাছে।

পাদটীকা

১। বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য—প্রভাময়ী দেবী পৃঃ ৩৩

২। বাল্মীকি রামায়ণ—রাজশেখর বসু পৃঃ ২২০

৩। বালিবধ কাব্য, ৪র্থ সর্গ—গিরিশচন্দ্র বসু

৪। বাল্মীকি রামায়ণ—রাজশেখর বসু পৃঃ ২২১

৫। বালিবধ কাব্য, ৪র্থ সর্গ—গিরিশচন্দ্র বসু

৬। ঐ

৭। ভার্গব বিজয় কাব্য সমালোচনা—ভার্গব বিজয় গ্রন্থ সংযোজিত—গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী

৮। ঐ

৯। ঐ

১০। মুকুটোদ্ধার কাব্য, বিজ্ঞাপন—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

১১। ঐ পৃঃ ১৭৪

১২। উর্মিলা কাব্য—দেবেন্দ্রনাথ সেন পৃঃ ২৬

১৩। রাবণবধ কাব্য, উপক্রম—হরগোবিন্দ লস্কর

১৪। সীতাচরিত্র, শিরোনামা—কৃষ্ণেন্দ্র রায়

১৫। যাদব নন্দিনী কাব্য, ৩য় সর্গ

১৬। ঐ ৫ম সর্গ

১৭। অভিমন্যু সম্ভব কাব্য—প্রসাদ দাস গোস্বামী, ৮ম সর্গ

১৮। দুর্যোধন বধ কাব্য, ২য় সর্গ—জীবনকৃষ্ণ ঘোষ

১৯। ঐ ৩য় সর্গ

২০। পাণ্ডব বিলাপ কাব্য, ২য় সর্গ—হরিপদ কোঁয়ার

২১। নৈশকামিনী কাব্য, ১১শ স্তবক—বিপিনবিহারী দে

২২। বৃত্রসংহার কাব্য, বিজ্ঞাপন—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩। কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয় চন্দ্র সরকার পৃঃ ৭৫

২৪। কবি হেমচন্দ্র—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য, চৈত্র সংখ্যা ১৩১১

২৫। কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার পৃঃ ৮১

২৬। বৃত্র সংহার কাব্য, ১২শ সর্গ—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭। ঐ

২৮। বৃত্র সংহার—বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮১

২৯। বৃত্র সংহার কাব্য, ৭ম সর্গ—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০। ঐ ১২শ সর্গ

৩১। বৃত্র সংহার কাব্য, ১৩শ সর্গ—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩২। আমার জীবন, ৪র্থ ভাগ। নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড। পরিষৎ সং। পৃঃ ৪১২

৩৩। ঐ পৃঃ ৪৫৮

৩৪। ঐ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৮৮

৩৫। ঐ ৫ম ভাগ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩০৯

৩৬। ঐ পৃঃ ৩০৯

৩৭। রৈবতক, ১৭শ সর্গ—নবীনচন্দ্র সেন

৩৮। কুরুক্ষেত্র, ৯ম সর্গ —নবীনচন্দ্র সেন

৩৯। ঐ

৪০। ঐ ১৭শ সর্গ

৪১। মহাভারত, আদি পর্ব—রাজশেখর বসু পৃঃ ১৫

৪২। ঐ পৃঃ ১৬

৪৩। মহাভারত, আদি পর্ব, কাশীরাম দাস—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃঃ ২১৪

৪৪। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভূমিকা পৃঃ ৪৬

৪৫। আধুনিক বাংলা কাব্য—তারাপদ মুখোপাধ্যায় পৃঃ ২২৮

৪৬। ঐ পৃঃ ২২৯

৪৭। ঐ পৃঃ ২৩০

৪৮। প্রভাস, ১ম সর্গ—নবীনচন্দ্র সেন

৪৯। রৈবতক, ১০শ সর্গ—নবীনচন্দ্র সেন

৫০। কুরুক্ষেত্র সমালোচনা—নব্যভারত, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩০০

৫১। আমার জীবন, ৪র্থ ভাগ। নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড। পরিষৎ সং। পৃঃ ৯৩—৯৪,৯৫

৫২। কুরুক্ষেত্র ও নব্য ভারত—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সাহিত্য, ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩০০

৫৩। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভূমিকা পৃঃ ৩৫

৫৪। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত—বীরেশ্বর পাঁড়ে পৃঃ ১১৫

৫৫। আমার জীবন, ৪র্থ ভাগ—নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড। পরিষৎ সং। পৃঃ ৯১

৫৬। নবীনচন্দ্রকে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের পত্র, ১০ই জানুয়ারী, ১৮৮৩। আমার জীবন, ৪র্থ ভাগ, নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড। পৃঃ ৪৬২

৫৭। নবীনচন্দ্রকে লিখিত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রাবলী—ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭—৯০, ৩১৪

৫৮। কুরুক্ষেত্র সমালোচনা—হীরেন্দ্র নাথ দত্ত। সাহিত্য, কার্তিক সংখ্যা, ১৩০১

৫৯। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত—বীরেশ্বর পাঁড়ে পৃঃ ২৪৯

৬০। দশ মহাবিদ্যা—বিজ্ঞাপন—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৬১। Shakti & Shakta—Sir John Woodroffe p 83

৬২। দশ মহাবিদ্যা, মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষৎ সং। পৃঃ ৩০

৬৩। Shakti and Shakta—Sir John Woodroffe p 101

৬৪। দশ মহাবিদ্যা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৩৯

৬৫। Story of Philosophy, Herbert Spencer—Will Durant— p 367

পৃঃ ৭৭

৬৬। কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়কুমার সরকার

৬৭। বিশ্বেশ্বর বিলাপ, বিজ্ঞাপন—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—

৬৮। অপূর্ব প্রণয়, ২য় সর্গ—ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

৬৯। ঐ ৫ম সর্গ

৭০। ত্রিদিব বিজয়, ৮ম সর্গ—শশধর রায়

৭১। বঙ্গ দর্শন, জ্যৈষ্ঠ—১২৮০

৭২। কাশী বিলাস কাব্য, মুখবন্ধ—দ্বিজ কালিদাস

৭৩। সুরারিবধ কাব্য, বিজ্ঞাপন—রামগতি চট্টোপাধ্যায়

৭৪। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবীমাহাত্ম্য—পঞ্চাশীতম ও অষ্টাশীতম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

নাট্য সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সামাজিক আন্দোলন বা রাজনৈতিক উত্তেজনা ততখানি তীব্র ছিল না বলিয়া শেষপাদের নাট্য সাহিত্য প্রধানতঃ পৌরাণিক ভাবধারাকেই গ্রহণ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সামাজিক সমস্যা ও অশান্তি উপদ্রব লইয়া শতাব্দীর প্রথমদিকে অনেকগুলি সামাজিক নাটক ও প্রহসনের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই যুগে সামাজিক প্রশ্নগুলির উপর একপ্রকার মীমাংসা টানা হইয়াছিল। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ, সংস্কার মুক্তির আয়োজন, বিধবা বিবাহের সমর্থন প্রভৃতি প্রগতিশীল চিন্তাধারা শতাব্দীর শেষ পাদে নীতিনিষ্ঠার কঠিন মুদ্গরে হঠাৎ করিয়া আঘাত প্রাপ্ত হয়। আমাদের সমাজ জীবনে এই প্রশ্নগুলি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই ইহাদের শেষ উত্তর দেওয়া হইয়াছিল।[১] সমাজ চিন্তার এই বিপরীত প্রকৃতিতে অনিবার্যভাবে এযুগের নাটকে সামাজিক জিজ্ঞাসার তীব্রতা অনুভূত হয় নাই। আবার হিন্দুমেলা, ভারতসভা, জাতীয় মহাসভা ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশের মধ্যে স্বাদেশিকতার যে নবপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়, তাহা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ নাট্যকার-বৃন্দ ঐতিহাসিক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেও বিংশ শতাব্দীর কোঠায় দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেই ইহার চরমোন্নতি ঘটে। সমকালীন দেশ জীবন এই উভয় প্রকার চিন্তা চেতনার দ্বারা বিশেষ ভাবে উদ্দীপ্ত হয় নাই। পরন্তু হিন্দু জাগৃতির প্রভাব বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন দেশবাসীর সমক্ষে একটি উজ্জ্বল অধ্যাত্ম আদর্শ সংস্থাপিত করিয়াছিল। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে এইরূপ জীবনচিন্তার প্রতিফলন সহজসাধ্য হইয়াছে।

এ যুগের পৌরাণিক নাটকে যাত্রাগানের অনুরূপ সঙ্গীতের আধিক্য এবং ভক্তির উচ্ছ্বাস বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। আবার ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক কথাবস্তুর অবিকৃত অনুসরণই ঘটিয়াছে, নব যুগের মানব জিজ্ঞাসার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা প্রায় ক্ষেত্রেই অনুক্ত ছিল। তবে সনাতন ধর্ম ও অধ্যাত্ম বিশ্বাসের পুষ্টির জন্য সেবা, দয়া, পরার্থ প্রীতি, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানব ধর্মের গুণাবলী কিছু কিছু নাটকীয় চরিত্রগুলিতে

সংযুক্ত হইয়াছে। দেশের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় ইহা মানবিক অভিব্যক্তি এবং বৃহত্তর ধর্ম সাধনের উপায় রূপে ইহাদের মূল্য স্বীকৃত। মানুষের উচ্ছৃঙ্খল পুরুষকার নহে, সুনিয়ন্ত্রিত চরিত্র ধর্মই যাহা কিছু মানবিক উপাদান রূপে ইহাদের মধ্যে গৃহীত হইযাছে, ইহা ছাড়া সর্বত্রই অলৌকিকতা ও অতিমানবিকতা, দেবতা ও দৈবের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা, অসম্ভব ও অতিরঞ্জনের একচ্ছত্র আধিপত্য।

আমরা শতাব্দীর শেষপাদের এই পৌরাণিক নাটক ও নাট্যকারদিগের একটি ধারা বিবরণী দিতে চেষ্টা করিব। মনোমোহন বসুকে এই পর্বের প্রথম নাট্যকার রূপে গ্রহণ করা যায়। তাঁহার নাটকে গীতি বহুলতা এবং ভক্তিরসের কথা পূর্বে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। মনোমোহনের নাট্যধারা বাংলা নাটকের আদর্শ ও প্রেরণা হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িতেছিল বলিয়া নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসকার অভিমত পোষণ করিয়াছেন।[২] সিদ্ধান্তটি সম্বন্ধে দ্বিমত প্রকাশ করিবার অবকাশ নাই। কারণ তিনি নাটকের মধ্যে এত সঙ্গীতের প্রয়োগ করিতেন যে ইহাতে অভিনয় ক্রিয়া অপেক্ষা গীতিসুরই প্রধান হইয়া উঠিত। এইজন্য তাঁহার নাটককে আধুনিক শিল্পরীতির বাংলা নাটকের অনুক্রম বলা যায় না। তবে এই কথাটি মনে রাখা সমীচীন যে নাটকের মধ্যে দেশকালের একটি পরিচয় অবশ্যই থাকিবে যে দেশ অভিনয়ের মধ্যে সঙ্গীতকে বহুদিন ধরিয়া স্থান দিয়া আসিযাছে। যেখানে দেবতার কথা প্রাকৃত ভাষায় উচ্চারিত হয় না সেখানে দেবমহিমার নাটকগুলিতে গানের প্রাচুর্য থাকা একান্ত স্বাভাবিক। ইহা বাংলাদেশের মনোধর্মের কথা এবং মনোমোহন তাঁহার নাটকে ইহাকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। সতী নাটকের ভূমিকাতে তিনি এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন: "ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। ইটী জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পর্যন্ত স্বরসংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না, যে দেশের লোক সঙ্গীতের সাহচর্য বিরহিত পুরাণ পাঠ ও শ্রবণ করে না,..... অধিক কি, যে দেশের দিবা ভিক্ষু ও রাত্‌ভিখারীরাও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি?"[৩] এইজন্য তাঁহার নাটকগুলি 'গীতাভিনয়' পর্যায়ভুক্ত হইলেও সেগুলির নাট্যিক আবেদন কম ছিল না। সে যুগে নাটকের শিল্পকলা অপেক্ষা নাটকের বক্তব্য এবং বাণীভঙ্গীই বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। মনোমোহন আবার বাণী ভঙ্গীরই একটি দিক-সুরের দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন। সেইজন্য

পৌরাণিক কথার মধ্যে তিনি সর্বত্র আত্মবিলোপ ঘটাইতে পারেন নাই, দেব চরিত্র আঁকিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃত সংসারের জীবনচিত্র আঁকিয়াছেন। সংগীত-গুলিতে আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মভাব প্রকাশ করা যেমন সহজ, সংলাপে ঠিক তেমন নহে। সংলাপ লৌকিক হইলেই নাটক লৌকিক স্তরে নামিয়া আসিবে। পৌরাণিক পরিমণ্ডলে লৌকিকতার অনধিকার প্রবেশে তাঁহার পৌরাণিক নাটকের বিশুদ্ধতা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

তাঁহার প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রামাভিষেকে'র বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য পৌরাণিক নাটক এই প্রসঙ্গে আলোচ্য।

সতীনাটক ॥ 'সতীনাটক' (১৮৭৩) মনোমোহনের যথার্থ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা। ইহা পুরোপুরি একটি গীতাভিনয়। নাটকের অন্তর্নিহিত ভক্তিভাব দেবর্ষি নারদ ও তৎ শিষ্য শান্তি রামের গানের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। আবার প্রস্তাবনা অংশে নটনটীর অবতারণা করিয়া লেখক সংস্কৃত নাটকের ধারাটিও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞের কাহিনী লইয়া সতীনাটক রচিত। একাধিক পুরাণ ও তন্ত্রে—ব্রহ্ম পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, স্বতন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে দক্ষ রাজার বিবরণ বা সতীর দেহত্যাগের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে দক্ষরাজার বিষয় আলোচিত হইয়াছে আবার শিব মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে গিয়া সতী শিবের সম্পর্ক এবং প্রসঙ্গক্রমে দক্ষের সহিত বিবাদ সংঘর্ষের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পৌরাণিক প্রসঙ্গে দক্ষ-শিবের এতখানি আলোচনার কারণ আছে। অনার্য দেবতা বলিয়া শিবের মর্যাদা বহুদিন আর্য সমাজে স্বীকৃত হয় নাই। বহুদিনের সামাজিক সংঘর্ষে আর্যসমাজে শিবের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সামাজিক ইতিবৃত্ত, পুরাণগুলিতে দক্ষ শিবের বিবাদের মধ্যে পল্লবিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মনোমোহন বসুও এই পুরাণ কথা হইতে সাধারণ বিবাদমূলক কাহিনীটুকুর অবতারণা করিয়াছেন। ভৃগুযজ্ঞে দক্ষ প্রজাপতি কৈলাসনাথ শিবের দ্বারা যথোচিত অভ্যর্থিত হন নাই। তিনি জামাতার উপর দারুণ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং ইহার প্রতিশোধে তিনি এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। এই শিবহীন যজ্ঞে শিবের অবমাননা ও সতীর দেহত্যাগ নাটকের বিষয়বস্তু হইয়াছে। নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় এই মহাযজ্ঞ সম্বন্ধে নারদের উক্তি: "সে যজ্ঞের নাম 'দক্ষযজ্ঞ' অথবা 'শিবহীন যজ্ঞ': অভিমান তার মূল, দর্প তার কাণ্ড, মত্ততা তার পাতা, শিবাপমান তার ফুল....অশিব যজ্ঞের অশিব ফল বৈ আর

কি হতে পারে ?"[৪] অশিব ফলরূপে সতীর দেহপাত ঘটিয়াছে। নাট্যকার এই পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। দক্ষযজ্ঞ বিনাশ বা দক্ষের মর্মান্তিক দণ্ড দানের বিষয় নাটকে গৃহীত হয় নাই।

নাটকের উপসংহার সতীর দেহত্যাগে। বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার দিক দিয়া ইহাই সঙ্গত। কিন্তু এ দেশীয় লোকের মিলনাত্মক কাহিনীর প্রতি একটি বিশেষ আগ্রহ থাকায় তাহাদের মুখ চাহিয়া লেখক পরবর্তীকালে ক্রোড় অঙ্করূপে হর-পার্বতী মিলন অংশটি সংযোজন করিয়াছেন। এই অংশটি যাহাতে পৌরাণিক সত্যের অপহ্নব না ঘটায় তাহার জন্য নাট্যকার হরপার্বতীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তির কল্পনা করিয়াছেন। শিব সতীকে বলিতেছেন—"এবার দুই দেহে আর রব না, এস অর্ধাধিভাবে দুজনে এক হই।" বলাবাহুল্য, নাটকের শিল্পকলায় ইহা গুরুতর ত্রুটি এবং সাধারণের স্থূল শিল্পবোধের খাতিরে নাট্যকার এই ত্রুটিটুকু পরিহার করিতে পারেন নাই।

চরিত্র চিত্রণে দেখা যায় ইহার দক্ষ, প্রসূতী, শিব, সতী, নারদ, নন্দী প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলি সবই পুরাণ আহৃত। তবে ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক মহিমা প্রায় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। ইহারা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের বন্দ্ব-মধুর চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দক্ষপুরী ও কৈলাস বাঙ্গালী কন্যার পিতৃগৃহ ও স্বামীগৃহ রূপে চিত্রিত হইয়াছে। দুইটি পরিবারের অসম আত্মীয়তার অশান্তি গৃহস্বামীদের একদিকে দক্ষ ও অন্যদিকে শিব দ্বারা প্রভূত। একটি তৃতীয় পক্ষ এই মিলন বা বিদ্বেষের সহায়ক হয়, আলোচ্য নাটকে নারদ সেই ভূমিকাটি গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে শিব চরিত্রেই পৌরাণিক মহিমা কিছুটা রক্ষিত হইয়াছে। নারদ, শান্তিরাম, সতীর মত শিবভক্তদের ত কথাই নাই, বিপক্ষে দক্ষপ্রজাপতিও শিবের মহিমময় রূপের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। শিবের মহত্ত্ব সম্বন্ধে দক্ষেরও একদিন ধারণা ছিল, তিনি "সকল দেবতার চেয়ে মহিমাতে বড়, ঐশ্বর্যে বড়, রূপ গুণ বিদ্যা সাধ্য সর্বপ্রকারেই বড়।"[৫] দক্ষ এ ধারণা রাখিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য। শিবের একটি আত্মভাষণের মধ্যে তাঁহার পরিচয় সুপরিস্ফুট হইয়াছে—"সকল দেবতা সকল প্রকার অপূর্ব ভূষণ বাহন ঐশ্বর্যে শ্রীমান্, আমি সকলের পরিত্যক্ত বাহন ভূষণ বিভবেই তুষ্ট। সকলের পানীয় অমৃত, আমার বিষ। সকলের বহুক্লেশে, আমার অল্পেই তোষ তাই নাম আশুতোষ। আমার অশুভ নাই, তাই নাম শিব।"[৬] তবে আলোচ্য নাটকে শিবের ভূমিকা বিশেষ

নাই বলিয়া তাঁহার গুণরাজির যথোচিত বিকাশ ঘটে নাই। তাঁহার ভক্ত বৎসল রূপটি শান্তিরামের প্রতি বরদানে এবং প্রেমময় রূপটি সতী সংলাপে প্রকাশিত হইয়াছে।

সতী ও প্রসূতী চরিত্র দুইটিতে নারী জীবনের স্বভাবধর্ম ও আদর্শের দ্বন্দ্ব সূচিত হইয়াছে। পৌরাণিক চরিত্র হইলেও ইঁহারা বাংলা দেশের কন্যা ও মাতা। স্বামী ও পিতা এবং স্বামী ও কন্যা এই দুইটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ আসিলে জীবন কতখানি মর্মন্তুদ হইয়া উঠে, এখানে তাহা দেখা যায়। সতীর চরিত্র আগাগোড়া মানবী রূপে চিত্রিত হইয়াছে। শিব সমক্ষে তাঁহার পৌরাণিক দশমহাবিদ্যার রূপও নাট্যকার দেখান নাই। স্নেহ বুভুক্ষু মাতা ও বীতস্পৃহ পিতার সমক্ষে এক কোমল প্রাণ কন্যার আত্মাহুতি সমগ্র পৌরাণিক মহিমাকে ম্লান করিয়া দিয়া অপূর্ব মানব রসের সঞ্চার করিয়াছে।

এই নাটকের একটি অদ্ভুত সুন্দর চরিত্র শান্তিরাম। ইহা পৌরাণিক চরিত্র নয়, নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। ভক্তি, তন্ময়তা ও তত্ত্বজ্ঞানে শান্তিরাম দেবর্ষির উপযুক্ত শিষ্য। নারদ এই শিষ্য সম্বন্ধে যথার্থ উক্তি করিয়াছেন "নিষ্ক্রিয় ভাবুক, প্রকৃত ভক্ত, বিরক্ত বৈষ্ণব, প্রলাপী, দরিদ্র সেবক।"[৭] পরম ভক্ত নারদ দৌত্যকার্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি উপাসনা করা সম্ভব হয় নাই, সে ক্ষেত্রে শান্তিরামই নাটকের মধ্যে ভক্তিরসের ধারাটি টানিয়া রাখিয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫)।। পুরাণ প্রখ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ প্রভৃতিতে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান আছে। আবার দশম শতাব্দীতে রচিত ক্ষেমিশ্বরের সংস্কৃত নাটক 'চণ্ডকৌশিক'ও বাংলায় অনূদিত হইয়া হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর লোকপ্রিয়তা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্য হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া একাধিক নাটক রচিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের অতুলনীয় দান ও চারিত্রিক মহত্ত্ব এতখানি লোকপ্রিয়তার কারণ। মনোমোহন এই মহৎ চারিত্র ধর্মের একটি নাটকীয় উপস্থাপনা দিয়াছেন। আবার ইহার মধ্যে পরাধীনতার শাসন শোষণের ইঙ্গিত দিয়া আমাদের জাতীয়তা-বোধকেও উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী এইভাবে বিবৃত হইয়াছে যে মৃগয়াবেশী রাজা হরিশ্চন্দ্রের শরীরের মধ্যে সর্ব কার্যের বিনাশকারী ভয়ঙ্কর বিঘ্নরাজ প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের তপোবনের অবিদ্যাবালাদিগকে রক্ষণ কার্যে প্রণোদিত

করিয়াছে। বিশ্বামিত্র তাঁহার আচরণে ক্রুদ্ধ হইলে হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছেন, ধর্মজ্ঞ মহীপতি হিসাবে ক্ষেত্রপাত্র অনুসারে দান কার্য, রক্ষা কার্য বা যুদ্ধ কার্য করা তাঁহার কর্তব্য। বিশ্বামিত্র এই সূত্র হইতে রাজার দান ক্ষমতার পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রকে সমগ্র রাজ্য ও ঐশ্বর্য দান করিতে বলিলেন। অতঃপর পুরাণকার হরিশ্চন্দ্রের কঠিন দান, কঠোর কর্তব্য সম্পাদন ও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগের বিবরণ দিয়া তাঁহাকে মহৎ ধর্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়াছেন। মনোমোহন বিষয়বস্তুর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন। মৃগয়াবেশী রাজা স্বয়ং বিপন্ন নারীদের আর্তনাদে তাঁহাদের বিপন্মুক্তিতে অগ্রসর হইয়াছেন, অজ্ঞানকৃত অপরাধ জানাইয়া তিনি বিশ্বামিত্রের ভৎর্সনা ও অর্থদণ্ডকে নীরবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং আরও বৃহত্তর ত্যাগের দ্বারা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিলে বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট সাম্রাজ্য অর্পণের বাসনা জানাইয়াছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই যে, ইহাতে হরিশ্চন্দ্র জীবনের একটানা দুঃখবেদনার কাহিনী নাই, ইহার সহিত নাগেশ্বর খগেন্দ্র কমলার একটি লৌকিক কাহিনী সংযুক্ত হইয়া মূল কাহিনীর মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে। এই পার্শ্ব উপাখ্যানটি নাট্যকারের অভিনব মৌলিকত্ব। বিশ্বামিত্রের চণ্ডত্ব শুধু হরিশ্চন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া, কিন্তু নাগেশ্বরের চণ্ডলীলা সমগ্র রাজত্বে সম্প্রসারিত। ইহাকে পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়া, রাজপুরুষ ও প্রজাবৃন্দের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বামিত্র তাঁহার ব্রহ্মত্ব অপেক্ষা ক্ষাত্র ধর্মের অধিক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তবে নাট্যকার মূল লক্ষ্যটিকে ঠিক রাখিয়াছেন, তাহা হইল ধর্মের মর্যাদা রক্ষা। অত্যাচারী নাগেশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বামিত্র শেষে বলিয়াছেন—"সমস্ত আর্যাবর্তের প্রতি মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করছি—তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করগে—তোমরা যেরূপে পার দুরাত্মাকে শাসন করগে—আমি তাতে কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হব না।"[৮]

নাটকের চরিত্র চিত্রণ সুন্দর হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের চণ্ডত্ব ক্রমপারম্পর্যে ঊর্ধ্বমুখী হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রের একটি রাজসিক মহিমা আছে। তিনি বিশ্বত্রয়ের সহিত মিত্রতা করিতে পারেন নাই, তাঁহার আগ্নেয় চারিত্র ধর্ম কোন কোমল অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেয় নাই। আলোচ্য নাটকে তাঁহার চরিত্রের এই পরুষ কঠিন রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে নাগেশ্বরের চণ্ডত্ব সমর্থন করায় তাঁহার চরিত্র মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দুঃখের নেপোমাল উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে হরিশ্চন্দ্র ও রাজ্ঞী শৈব্যা। হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে বিশ্বামিত্রের

উক্তিই শেষ কথা—"মানব সহিষ্ণুতার উচ্চ চূড়া পর্যন্ত দেখা হলো, আর না।"[৯] দাতা হিসাবে হরিশ্চন্দ্র পুরাণ স্মর; আলোচ্য নাটকে তাঁহার দাতা রূপের সহিত আশ্রয় দাতা রূপটিও সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে। অদৃষ্টের পরিহাসে নাগেশ্বর শেষ ক্ষণে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিয়াছেন, "সহস্র কৃতঘ্ন হ'ক, যখন বিপন্ন হয়ে শরণাপন্ন বলে জানিয়েছে, তখন আমার ধর্ম আমায় রাখতেই হবে।"[১০]

কিন্তু নাটকের সর্বাপেক্ষা সুন্দর চরিত্র বোধ করি পাতঞ্জল। এই চরিত্রটির মধ্যে অপূর্ব মানবিক আবেদন আছে। অনুক্ষণ বিশ্বামিত্রের ছায়ানুসরণ করিয়াও তিনি সর্বদা গুরুকে সমর্থন করেন নাই, দুঃখ দীর্ণ রাজার প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া, অত্যাচারী নাগেশ্বরের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া এবং সর্বোপরি ধর্মের কৃচ্ছ্রতার প্রতি সময়ে সময়ে বিদ্রোহ জানাইয়া পাতঞ্জল চরিত্র মানবিক হৃদয়বত্তাকেই প্রকাশ করিয়াছে। নাটকের পৌরাণিক ক্ষেত্রে বাস্তব সচেতন পাতঞ্জল খানিকটা ভার-সাম্য রক্ষা করিয়াছে।

পার্থ পরাজয় নাটক। মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়া মনোমোহন 'পার্থ পরাজয়' বা 'বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জুনের পরাভব' নাটক (১৮৮১) রচনা করিয়াছেন। যজ্ঞাশ্বের রক্ষকরূপে অর্জুন পাণ্ডব বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া ভীম বৃষকেতু, মদনাদির সহিত বিভিন্ন দেশ পর্যটনকালে প্রমীলা পুরী, রক্ষদেশ প্রভৃতি স্থানে উপনীত হন। নারী রাজ্য প্রমীলাপুরীতে প্রমীলার পাণিগ্রহণ করিয়া ও রক্ষদেশের রাক্ষসরাজ ভীষণকে নিহত করিয়া সপারিষদ অর্জুন মণিপুরে উপস্থিত হন। সেখানে আপন তনয় মণিপুর রাজ বভ্রুবাহনের যুদ্ধে তিনি নিহত হন এবং পরিশেষে নাগপত্নী উলূপীর মৃতসঞ্জীবনী মণির স্পর্শে পুনর্জীবন লাভ করেন। কাহিনী মূল মহাভারতের অনুরূপ, কাশীরাম দাসের অতিবিস্তৃত বিবরণ ও পার্শ্বকাহিনীর অবতারণা ইহাতে নাই। পাতালপুরীতে নাগবাহিনীর সহিত বভ্রুবাহনের যুদ্ধ এবং নাগগণ কর্তৃক বৃষকেতু অর্জুনের অচেতন দেহ হইতে মুণ্ড লইয়া পলায়ন ইত্যাদি কাহিনী ইহাতে স্থান পায় নাই। উলূপীর বিবরণ ইহাতে একটু অন্যভাবে সংযুক্ত হইয়াছে। মহাভারতে উলূপীই সপত্নীপুত্র বভ্রুবাহনকে ক্ষত্রোচিত বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়া অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলিয়াছেন। মনোমোহন উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদাকে সমান কোমলপ্রাণারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। নিহত পুত্রের স্মরণ কথায় উলূপীর মর্মবেদনার সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে—"বাছা আমার বড় দুঃখী ছিল। তারপর যখন শুনলে তার পিতা পিতৃব্যগণকে দুষ্ট দুর্যোধন ত্রয়োদশ বৎসর নানা ক্লেশ দিয়ে তখনো যথার্থ প্রাপ্য

স্বাস্থ্য দিচ্ছে না, বরং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিয়েছে, অস্থি বাছ ক্রোধে আর আহ্লাদে নেচে পিতৃ সাহায্য কর্ত্তে গেল—সেই কাল কুরুক্ষেত্র হতে আর ফিরে এলো না। আমাকে সকলে বুঝায়, অভিমন্যুর মতন বীরত্ব দেখিয়ে অভিমন্যুর সঙ্গে সে স্বর্গে গেছে, তার জন্যে শোক ক'রো না।"[১১] মহাভারতে বভ্রুবাহন অর্জুন কর্তৃক তিরস্কৃত হইলে উলুপী তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়াছেন। মনোমোহন সেখানে বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখবেদনার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। দুই প্রোষিতভর্তৃকা নারী—চিত্রাঙ্গদা ও উলুপী একত্রেই স্বামী বিরহের বেদনা অনুভব করিতেছেন আর একমাত্র পুত্র বভ্রুবাহনকে কেন্দ্র করিয়া উভয়ে নারী জীবনের পূর্ণতার স্বাদ আস্বাদন করিতেছেন। লোকরুচি অনুযায়ী মনোমোহন মিলনাত্মক নাটক রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য পার্থের পুনর্জীবন দানের মধ্যেই শুধু নাটক সমাপ্ত হয় নাই, তাঁহার চারি পত্নী সুভদ্রা, প্রমীলা, উলুপী ও চিত্রাঙ্গদাকে তাঁহার পার্শ্বে আনিয়া মিলনকে সম্পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছে।

রাজকৃষ্ণ রায়॥ মনোমোহন বসুর গীতাভিনয়ের ধারাটি রাজকৃষ্ণ রায় সার্থকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। আবার নাট্যরীতির দিক দিয়া তিনি কিছু কিছু নূতনত্বেরও পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্যতম প্রবর্তক রূপে তাঁহাকে গ্রহণ করা যায়। এ সম্বন্ধে সুধী মহলে কিছুটা মতানৈক্য আছে। রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার হরধনুভঙ্গ নাটকে প্রথমে এই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহা গিরিশ চন্দ্রের 'রাবণ বধ' নাটকের দুইদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ রায়কে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন, "রাবণ বধের অভিনয়ের মাত্র দুই দিন পূর্বে প্রকাশ কাল হইলেও রাবণ বধই যে মৌলিক এবং নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম নাটক, এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক।"[১২] এই তর্কের মীমাংসা এইরূপে হইতে পারে যে তখন নাটকের বিশেষতঃ পৌরাণিক নাটকের সংলাপের জন্য একটি সহজ তরল বাণীভঙ্গীর প্রয়োজন হইতেছিল এবং ইঁহারা সেই প্রয়োজনের দাবীতে স্ব স্ব প্রচেষ্টায় অভিনব বাক্যরীতির অনুশীলন করিতেছিলেন। সুতরাং কোন গ্রন্থের প্রকাশ কাল বা অভিনয় কাল দেখিয়া সেই গ্রন্থকারকেই শুধু ইহার প্রবর্তকরূপে গণ্য করা সমীচীন নহে। রাজকৃষ্ণ রায়ের ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা পদ্য পংক্তি গদ্য রচনা এইরূপ একটি অনুসন্ধানের ফল। তবে তিনি স্বল্প শক্তি হেতু ভঙ্গ অমিত্রাক্ষরকে সর্বাঙ্গ-

সুন্দর করিতে পারেন নাই, আর গিরিশচন্দ্র তাঁহার বিরাট প্রতিভায় ইহাকে ভাবপ্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

সাহিত্যের বহুতর ক্ষেত্রে পাদচারণা করিলেও পৌরাণিক নাটকের মধ্যেই রাজকৃষ্ণ রায় যাহা কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রসঙ্গে তাঁহার অনেকগুলি নাটক আছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির বিষয় এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

রামায়ণী কথা ॥ সংস্কৃত রামায়ণের কাব্যানুবাদ রাজকৃষ্ণ রায়ের একটি মহৎ কীর্তি। ইহা হইতেই তিনি রামায়ণী কথার নাটক রচনা করিতে প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"আমার বিবেচনায় দেবোপম বাল্মীকির অমৃত-সমুদ্র স্বরূপ রামায়ণ কেবল পঠন ও শ্রবণ করিয়া প্রাণানন্দ ও জ্ঞানানন্দ লাভ করিলে আশার পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি হয় না, দর্শনানন্দও ভোগ করা চাই। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত দর্শনানন্দ লাভ হইতে পারে না। এইজন্য আমি বাল্মীকির রামায়ণের বালকাণ্ড হইতে শেষ উত্তর কাণ্ড পর্যন্ত সপ্ত কাণ্ডের অন্তর্গত নির্বাচিত ও সুন্দর সুন্দর অংশগুলি ক্রমান্বয়ে নাটকাকারে লিখিতে ইচ্ছা করি।"[১৩] এই প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ দশরথের মৃগয়া, হরধনুভঙ্গ ও রামের বনবাস—তাঁহার 'রামচরিত নাটকাবলী' একসঙ্গে রচিত হইয়াছে। রামায়ণী কথার আরও কয়েকটি নাটক তিনি লিখিয়াছেন, যথা—অনলে বিজলী, তরণীসেন বধ, ঋষ্যশৃঙ্গ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে সাধারণভাবে রামচরিত্রের মহিমা ও রামায়ণ প্রাসঙ্গিক চরিত্র-রাজির গুণকীর্তন করা হইয়াছে।

দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধু বধ (১৮৮২) নাটকটি রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের মুনিকুমার বধের কাহিনী লইয়া রচিত। মূল কাহিনীর অনুসরণে ইহাতে রাজা দশরথের কাল মৃগয়া, শব্দবেধী বাণের প্রয়োগ, সিন্ধুবধ এবং মুনি ও মুনি-পত্নীর চিতা আরোহণে দেহত্যাগের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অন্ধ মুনির বিলাপ, রাজাকে তাঁহার অভিশাপ দান এবং ব্রহ্ম হত্যা জনিত দশরথের আত্মগ্লানির একটি ভাবাচিত্র অঙ্কন করিয়া লেখক ইহাকে করুণ রসের প্রস্রবন করিয়া তুলিয়াছেন।

তাঁহার হরধনুভঙ্গ (১৮৮২) নাটকের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। ইহাতেই তিনি সর্বপ্রথম ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন। রামায়ণের বালকাণ্ড হইতে রামের কৈশোর জীবনের বীরত্বের কাহিনীটুকু এখানে গৃহীত হইয়াছে। যজ্ঞ বিঘ্নকারী তাড়কা ও সুবাহুর নিধন, মারীচের নিগ্রহ, অহল্যা

উদ্ধার, হরধনুভঙ্গ, সীতার পাণিগ্রহণ ও পরশুরামের দর্পচুর্ণ—এই কয়টি প্রধান ঘটনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। নাট্যকার সুকৌশলে শ্রীরামচন্দ্রের বিষ্ণু অবতার রূপটি নাটকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র গুরু সুলভ অনুজ্ঞার মধ্যেও রামচন্দ্রের নারায়ণ সত্তাকে প্রণাম জানাইয়াছেন, অহল্যা সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া তাঁহার স্তব গাহিয়াছেন, গৌতম তাঁহার কাছে বৈকুণ্ঠের পথনির্দেশ চাহিয়াছেন, সর্বশেষে পরশুরামও তাঁহার নারায়ণত্বের নিকট মাথা নত করিয়া পৌরুষদীপ্ত অহংকে বিসর্জন দিয়াছেন। নাটকটিতে রাজকৃষ্ণের উচ্ছ্বসিত ভক্তিবাদের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে।

রামের বনবাস (১৮৮২) নাটকের মধ্যে লেখক অযোধ্যাকাণ্ডের কাহিনীকে বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। দশরথ কর্তৃক রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন হইতে কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা, দশরথের বাৎসল্য ও সত্যরক্ষার গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, রামচন্দ্রের পিতৃসত্য রক্ষাকল্পে বনগমনের উদ্যোগ, লক্ষ্মণের উষ্মা, সীতার বনগমনের অভিপ্রায়, সুমন্ত্রের সহগমনোদ্যোগ, অযোধ্যা ও রাজপুরীর অশান্ত বিলাপ প্রভৃতি বনবাস-এর পূর্বাপর ঘটনাগুলি নাট্যকার একে একে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রামায়ণে যে কয়টি কেন্দ্রীয় ঘটনা বেদনা ও কারুণ্যের উদ্রেক করে, রামের বনবাস তাহাদের মধ্যে প্রথম এবং বলিতে গেলে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া রামকাহিনীর পরবর্তী ঘটনাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যেই রামায়ণী চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে। নাট্যকার সেদিকে যথোচিত লক্ষ্য রাখিয়াছেন। রামকে কর্তব্যনিষ্ঠ পুত্ররূপে, লক্ষ্মণকে তেজদৃপ্ত ভ্রাতারূপে, সীতাকে পতিব্রতা পত্নীরূপে অঙ্কন করিয়া নাট্যকার রামায়ণী সংস্কারকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে চরিত্র ও ঘটনা বিসদৃশ হইয়াছে। কৈকেয়ী চরিত্রে আদি কবির বলিষ্ঠ বিরোধিতা রক্ষিত হয় নাই। সেখানে কৈকেয়ীর এইরূপ আত্মানুশোচনা নাই, তিনি স্বয়ং রামের বনবাস আয়োজন করিয়া দিয়াছেন। আবার দশরথও এখানে কৈকেয়ীকে কটূক্তি ও পদাঘাত করিয়া এক সাধারণ সংসারী মানুষ হইয়া গিয়াছেন। আদি কবির নিরাসক্ত দৃষ্টি ও ঘটনা নিচয়ের স্বাভাবিকতাকে নাট্যকার রক্ষা করিতে পারেন নাই।

রামায়ণ পর্যায়ে রাজকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হইল 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮)। রামায়ণের যুদ্ধ কাণ্ডের অন্তর্গত সীতার অগ্নি পরীক্ষা ইহার বিষয়বস্তু। রামায়ণী কথার এই অশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশটির নাট্যরূপ দিতে গিয়া নাট্যকার একাধারে মূল রামায়ণের আনুগত্য এবং রামের মানবতা বিরোধী আচরণের উপর আলোকপাত

করিয়াছেন। আদি কবির রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের পর তাঁহাকে পরুষ কঠিন ভাষায় বলিয়াছিলেন, "তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখেছে, এখন যদি তোমাকে পুনর্গ্রহণ করি তবে কি করে নিজের মহৎ বংশের পরিচয় দেব? যে উদ্দেশ্যে তোমাকে উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও।"[১৪] রামায়ণের কবি রামচন্দ্রকে এইরূপ অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই চারিত্র ধর্ম সাধারণ ধারণার বহির্ভূত। রাজকৃষ্ণ রায় ইহার সহিত কিছুটা সংগতি রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার রামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন—

> "পূর্ব্ব পত্নী তুমি মম, পূর্ব্ব স্বামী আমি,
> এবে তুমি পরপত্নী, চাহিনা তোমারে
> স্পর্শিতে এ পূত ধনুস্পৃষ্ট করতলে,
> মম চিত্ত বলিতেছে—জানকী অসতী।"[১৫]

কিন্তু রামচরিত্রের অবিচল প্রতিজ্ঞাপরায়ণতা এবং কর্তব্য সম্বন্ধে দৃঢ়চিত্ততা রামায়ণে যেভাবে রক্ষিত হইয়াছে, রাজকৃষ্ণ ততটা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাম 'দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা' হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। ইহা রামায়ণানুগ না হইলেও দর্শকজনের অপ্রিয় হয় নাই, পরন্তু রামের কর্তব্য কর্মের অন্তরালে এই আত্মদ্রোহ একপ্রকার মানবিক প্রীতির উদ্রেক করিয়াছে। কিন্তু হনুমানের মুখে লেখক যে রামবিরোধী উক্তি বসাইয়াছেন, মানবতার খাতিরেও তাহাকে গ্রহণ করা যায় না। রাম সীতাকে প্রত্যাখ্যানের কথা বলিলে হনুমান তাঁহাকে বলিয়াছে—

> "দশানন ঘাতী নাম লভিয়াছ তুমি
> বধিয়া রাবণে, রাম, তোমারে বধিয়া
> রামঘাতী নাম আমি লভিব এখনি।"[১৬]

সীতা চরিত্রে নাট্যকার তাঁহার স্বভাবসুলভ সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্যের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র 'সতীর পবিত্র মূর্তি—অনলে বিজলী'। সীতার সমান্তরালে মন্দোদরী চরিত্রও অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। সীতার মধ্যে যেমন বেদনা ও সহিষ্ণুতার সমাবেশ ঘটিয়াছে, মন্দোদরীর মধ্যেও তেমনি বেদনা ও ক্রোধের সঞ্চার ঘটাইয়া নাট্যকার তাঁহাকে রক্ষঃরাজ রাবণের যোগ্য সহধর্মিণীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

রামায়ণ প্রসঙ্গে তাঁহার আরও দুইটি নাটক হইল তরণীসেন বধ এবং ঋষ্যশৃঙ্গ।

তরণীসেনের কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে নাই। রাজকৃষ্ণ রায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে এই কাহিনীটি সংগ্রহ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের নামভক্তিবাদ তরণীসেনের মধ্যে প্রকাশিত। নাট্যকার পরমভক্ত তরণীসেনের গুরু শিষ্য মহারণের চিত্র নাটকটিতে অঙ্কন করিয়াছেন। তরণীসেন রামচন্দ্রের নিকট দয়াযুদ্ধের প্রার্থনা জানাইয়াছে যাহার শেষফল 'দয়াল রামের দয়া।' নাট্যকার তরণীসেনের মধ্যে ভক্তির নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি নাটকীয় কৌশল ও আঙ্গিক বিন্যাসের দিকে ততটা লক্ষ্য দেন নাই। অলৌকিকতার অতিরেকে ইহার নাট্য ধর্ম যে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আদি কাণ্ডের ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনী লইয়া ঋষ্যশৃঙ্গ পৌরাণিক গীতিনাট্যটি রচিত হইয়াছে। মহর্ষি বিভাণ্ডকের তপশ্চর্য', তাঁহার পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সংসার অনভিজ্ঞতা, রাজা লোম্পাদের ইন্দ্রিয় ভোগ্যতা ইত্যাদির পরিচয় ইহাতে মূলানুরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্য দান ও কন্যাদানের মধ্যে নাটকটি শেষ হইয়াছে। কাহিনীর শেষে মহর্ষি বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গের পরবর্তী কার্যকলাপের একটি ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহাতে নাট্যগুণ কিছুই নাই, একটি পৌরাণিক কাহিনীই আনুপূর্বিক বিবৃত হইয়াছে মাত্র।

মহাভারতী কথা। মহাভারতী কথা লইয়া রাজকৃষ্ণ রায় পতিব্রতা, প্রমদ্বরা, যদুবংশ ধ্বংস, দুর্বাসার পারণ, ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতি কয়েকটি নাটক রচনা করিয়াছেন। পতিব্রতা (১৮৭৫) তাঁহার প্রথম পৌরাণিক নাটক। মহাভারতের সত্যবানের কাহিনী লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহা সংলাপ কেন্দ্রিক নাটক নহে, গীতাভিনয়ের বৈশিষ্ট্যই ইহাতে সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। মহাভারতের আদি পর্বের রুরু প্রমদ্বরার কাহিনী হইতে প্রমদ্বরা নাটকটি রচিত। গভীর প্রেম ও মহান আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া রুরু মহাভারতে অক্ষয় আসন লাভ করিয়াছেন। নাটকের অন্যতম চরিত্র ধর্মরাজ যম রুরুর এই আত্মত্যাগের মর্যাদা দিয়াছেন—"মনুষ্যগণ, এমনকি দেবগণও আজ হতে তোমাকে ত্রিভুবনে আদর্শ পতি বলে, তোমার ও তোমার ধর্মপত্নী প্রমদ্বরার যশোগান করবে।"[১৭] নাটকের কাহিনী বিন্যাস মহাভারত হইতে একটু স্বতন্ত্র। মহাভারতে বিবাহের পূর্বে প্রমদ্বরার সর্প দংশনে মৃত্যু হয় এবং মৃত প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করার জন্য দেবতারা শোকাহত রুরুকে অর্ধ আয়ুদানের নির্দেশ দেন। রাজকৃষ্ণ বিবাহোত্তর দাম্পত্য জীবনে প্রমদ্বরার অকালমৃত্যু ঘটাইয়াছেন। অতঃপর রুরু মৃত্যু ও যমকে সাবিত্রীর অনুরূপ তর্কযুদ্ধে অভিভূত করিয়া প্রমদ্বরাকে অর্ধ আয়ুদানে পুনর্জীবিত

করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। মৃত্যু-রুরু সংলাপ বা যম-রুরু সংবাদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর নাটকীয়তা প্রকাশ পাইযাছে।

মহাভারত প্রসঙ্গে রাজকৃষ্ণের, 'যদুবংশ ধ্বংস' একটি জনপ্রিয় নাটক। যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী মহাভারতের মৌষল পর্ব ছাড়া ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও ভাগবতে পাওয়া যায়। এই কাহিনীর মূল বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া আলোচ্য নাটকটি রচিত হইযাছে। বৃষ্ণি বংশীয়গণের দুর্নীতি পরায়ণতা, কৃষ্ণ পুত্র শাম্বকে মুনি কর্তৃক মুষল প্রসবের অভিশাপ দান, কৃষ্ণপুরীতে কাল পুরুষের আনাগোনা, প্রভাস তীর্থে যাদবগণের তীর্থস্নান উদ্দেশ্যে গমন, সেখানে সাত্যকি ও কৃতবর্মার কলহ সূত্রে যাদবগণের পারস্পরিক হানাহানি ও শেষ পরিণতিতে কৃষ্ণ বলরামের দেহত্যাগ—মহাভারতী উপসংহারের এই কাহিনীগুলিই যদুবংশ ধ্বংস নাটকে গৃহীত হইয়াছে। ইহার মায়া চরিত্রের কল্পনাটি লেখকের মৌলিক। মহাকালের ধ্বংসকারী শক্তি কালপুরুষের মধ্যে এবং মানুষের পার্থিব আসক্তির পরিচয় মায়া চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। কৃষ্ণের নিস্পৃহ দৃষ্টি যেমন নাটকে একটি ভাগবতী মহিমার সৃষ্টি করিযাছে, তেমনি বলরামের মায়াবশ চরিত্র গভীর মানবিক আর্তি প্রকাশ করিয়াছে। যদুবংশ বিনাশে তিনি কৃষ্ণের সহিত একমত নহেন, কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবার শক্তিও তাঁহার নাই। চরম বিনষ্টির মুহূর্তে তিনি কৃষ্ণের নিকট 'আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। সমগ্র নাটকে কৃষ্ণলীলার মহিমা ব্যক্ত হইযাছে, কিন্তু ইহা সর্বাংশে কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র বিকাশের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। আবার যদুবংশ ধ্বংস কাহিনীর উপজীব্য হইলেও নাট্যকার শেষ দৃশ্যে বেদব্যাসকে দিযা অর্জুনকে গোলকধামে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তি দর্শন করাইযাছেন। এই মিলনাত্মক পরিণতি নাটকের করুণ অঙ্গীরসের মধ্যে শান্তরসের ফলশ্রুতি আনিয়া দিয়াছে।

'দুর্বাসার পারণ' ও 'ভীষ্মের শরশয্যা' তাঁহার মহাভারতী কথার আরও দুইটি নাটক। 'দুর্বাসার পারণ' এক ধর্মসংঘর্ষণের কাহিনী। ধর্মশীল যুধিষ্ঠিরের সহিত ধর্ম প্রতিপালক দুর্বাসার এক বিচিত্র ধর্মপালনের বিবরণ এখানে বিবৃত হইয়াছে। কাহিনীভাগ মহাভারতের বনপর্ব হইতে গৃহীত। দুর্দশাগ্রস্ত বনবাসী পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখাইবার জন্য সপরিষদ দুর্যোধনের ঘোষযাত্রা ও দ্বৈতবনে গন্ধর্বহস্তে তাঁহাদের নিগ্রহ ইহার একটি ঘটনাসূত্র। ইহার সহিত নাট্যকার কৌশলে দুর্বাসার পারণ অংশটি সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। মূল কাহিনীতে দুইটি ঘটনা স্বতন্ত্র। এখানে যুধিষ্ঠিরের কথাসূত্র হইতে দুর্বাসার উগ্রমূর্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া দুর্যোধন

তাঁহাকে দিয়া দ্বৈতবনে পাণ্ডবকুটীরে অসময়ে আতিথ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করাইয়াছেন। দুর্যোধনের পরিচর্যায় দুর্বাসা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া এই অন্যায় অনুরোধও তিনি রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের সহিত দুর্বাসার এই প্রতিশ্রুতিরক্ষা তথা ধর্মরক্ষার বিষয়টি নাটকে বিবৃত হইয়াছে। ইহার ফলাফল পুরোপুরি মহাভারতের মত দেখান হয় নাই। সেখানে সশিষ্য দুর্বাসা কৃষ্ণ কৌশলে উদর পূরণ করিয়া আগে আগে প্রস্থান করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ রায় দুর্বাসাকে পরম ভক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার কৃষ্ণস্তুতির মধ্য দিয়া নাটকের উপসংহার টানিয়াছেন।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব ও ভীষ্ম পর্বের কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনা অবলম্বন করিয়া ভীষ্মের শরশয্যা নাটকটি রচিত হইয়াছে। আলোচ্য নাটকটিকে দুইটি স্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে কুরুক্ষেত্র মহারণের প্রস্তুতি, ইহাতে দুর্যোধনই প্রধান চরিত্র; তাঁহার মধ্যে নাট্যকার পাণ্ডব বিরোধিতা তথা কৃষ্ণ বিমুখতার পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে ভীষ্মের মৃত্যুয়োজন তথা কৃষ্ণ পূজা। ভীষ্মের শরশয্যা নামকরণ হইলেও নাটকটি কৃষ্ণ কেন্দ্রিক। সেইজন্য মহাভারতী কৃষ্ণের নানা অলৌকিক পরিচয় ইহার মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। দ্বারকাপুরীতে অর্জুন দুর্যোধনের সন্তুষ্টি সাধন হইতে হস্তিনাপুরের রাজসভায় দৌত্যকার্য ও অর্জুনের সারথ্য গ্রহণের মধ্যে কৃষ্ণের যে মানবিক ভূমিকা আছে, ইহার সহিত তাঁহার অলৌকিক ভাগবতী মহিমাও মাঝে মাঝে সংযুক্ত হইয়াছে। ভীষ্ম কাহিনী হিসাবে নাটকটিতে পূর্বাপর ঘটনার যথাযথ সংযোগ নাই, কিন্তু কৃষ্ণ কাহিনী হিসাবে ভীষ্ম বিদুর কর্ণের ভক্তি ও সমর্পণের মধ্যে নাটকের ভাববস্তু বিপর্যস্ত হয় নাই। উপসংহারে নাট্যকার রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির আবির্ভাব ঘটাইয়া মহাভারতের ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের প্রেমময় কৃষ্ণে পরিণত করিয়াছেন। মহাভারতী কাহিনীর সহিত এই পরিণতির সংগতি নাই। ভক্তি মার্গের সহজতম উপায়টি এখানে নাট্যকার ভীষ্মের মাধ্যমে প্রচার করিয়াছেন।

পুরাণ কাহিনী ।। রাজকৃষ্ণ রায়ের পুরাণ কাহিনীর নাটকগুলির মধ্যে 'তারক সংহার', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'বামন ভিক্ষা', 'গিরি গোবর্ধন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কাহিনীর চমৎকারিত্ব অপেক্ষা ভক্তির উচ্ছ্বাস ইহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে।

তারক সংহারের কাহিনী পুরাণ হইতে যথাযথ গৃহীত হয় নাই। শিবপুরাণ বা দেবী ভাগবতে মহাদেব পুত্র কার্তিকের কর্তৃক দৈত্যাধিপতি তারকাসুর

নিধনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। নাট্যকার মূল সংঘর্ষের বিষয়টি গ্রহণ করিলেও বহু অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিয়া নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। দেবাসুরের সংগ্রামের মধ্যে ব্যক্তি চরিত্রের ক্রোধ ও কামনা, কৌশল ও ষড়যন্ত্রের সূচনা করিয়া লেখক ইহার পৌরাণিক গরিমগুলকে লঘু করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে দেব সেনাপতি কার্তিকেয়র কোন সংগ্রাম ও সাফল্য প্রাধান্য পায় নাই, নারদের সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রের কৌশলে দৈত্য কুলের বিপর্যয়ের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রুদ্রভক্ত তারকাসুরের অন্তিম দৃশ্যটি নাট্যকার নিপুণতার সহিত অঙ্কন করিয়াছেন।

পুরাণ প্রসঙ্গে তাঁহার সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক হইল 'প্রহ্লাদ চরিত্র'। ইহা একটি মঞ্চসফল নাটকও বটে। বেঙ্গল থিয়েটার এই নাটকটি মঞ্চস্থ করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিয়াছিল। বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে প্রহ্লাদ চরিত্র ব্যক্ত হইয়াছে। নাট্যকার এই পৌরাণিক উৎসগুলি হইতে প্রহ্লাদের কৃষ্ণভক্তি, হিরণ্যকশিপুর কৃষ্ণবিদ্বেষ ও প্রহ্লাদের নির্যাতনের বিবরণগুলি একের পর এক নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রহ্লাদ সেই পৌরাণিক চরিত্র যাহার উপর বিষ্ণুভক্তি প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। পরম ভাগবত প্রহ্লাদের এই ভক্তিধর্ম প্রচারের কাহিনীই নাটকের উপজীব্য।

পুরাণের রীতি অনুযায়ী হিরণ্যকশিপুকে প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণভক্তরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। নাট্যকার তাহার পূর্বজন্মের চিত্রটি সূচনা অংশে প্রকাশ করিয়াছেন। বিষ্ণুর দ্বারপাল রূপে জয় ও বিজয় কর্তব্যরত ছিল। ঋষি সনকের অভিশাপে তাহারা কৃষ্ণহারা হইয়া অসুরযোনী প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈরীভাবের আরাধনায় ত্রি-জন্মের মর্ত্যলীলায় তাহারা পুনরায় কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিবে। হিরণ্যকশিপু রূপে তাহার উদ্ধত কৃষ্ণদ্বেষ প্রকারান্তরে তাহাকে কৃষ্ণাভিমুখী করিয়াছে। নাটকের শেষে নৃসিংহরূপী বিষ্ণু ভক্ত হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া তাহাকে আপন বক্ষে টানিয়া লইয়াছেন।

নাটকের মধ্যে কৃষ্ণময়তার যে আবহাওয়া সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার সহিত হিরণ্যকশিপুর কার্য ও আচরণ সুসংগত হয় নাই। তাঁহার কৃষ্ণদ্বেষ কারণ ও কার্যের মধ্য দিয়া কোথাও সুস্পষ্ট হয় নাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের বিষ্ণু হস্তে নিধন একটি সংবাদ মাত্র। ইহার আগে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার কোন সংঘর্ষের সূচনা দেখা যায় নাই বা পরেও কোনরূপ সংঘাত উপস্থিত হয় নাই। এক অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে বীর্য সঞ্চয় করিয়া সেই শক্তির আধার আপন পুত্রের উপর

তিনি পীড়ন ও প্রতিহিংসা চালাইয়াছেন। ইহা পৌরাণিক সংস্কারকে রক্ষা করিয়াছে বলিয়া অসুবিধা কিছু হয় নাই, কিন্তু নাটক হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে।

হিরণ্যকশিপুর বিপরীত কোটিতে রহিয়াছে প্রহ্লাদ চরিত্র। পিতা যেমন প্রতিহিংসা পরায়ণ, পুত্র তেমনি সহিষ্ণুতার প্রতীক। বিষ্ণুর অদৃশ্য হস্ত প্রহ্লাদকে কিভাবে সর্ববিধ দলনকার্যে রক্ষা করিয়াছে তাহার নাটকীয় উপস্থাপনা দর্শকমণ্ডলীকে নিঃসন্দেহে অভিভূত করিবে সন্দেহ নাই। নাটকের দৃশ্যছের দিক দিয়া এগুলি চিত্তাকর্ষক, কিন্তু নাটকীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টিতে ইহাদের পৌনঃপুনিক আয়োজনের কোন সার্থকতা নাই।

তবে একটি চরিত্র ইহাতে আছে যাহার মধ্যে পুরাণের অলৌকিকতা ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাহা হইল কয়াধু চরিত্র। বিষ্ণুভক্ত সন্তান ও বিষ্ণুদ্বেষী স্বামীর মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষা করিতে তাহাকে প্রাণান্ত হইতে হইয়াছে। পৌরাণিক পরিমণ্ডলে এই চরিত্রটির মধ্যে লেখক মানবিক অনুভূতি গভীর মাত্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। পিতৃবৈরিতায় বিপন্ন পুত্রের ত্রাণকল্পে কয়াধুর মাতৃহৃদ অসহায় ক্রন্দনে নাটকের সমস্ত দেবমহিমাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে।

ভাগবত পুরাণ অন্তর্গত বলিরাজার কাহিনী হইতে 'বামনভিক্ষা' নাটকটি রচিত। ইন্দ্র এক সময়ে ব্রাহ্মণ বেশে ছলনা করিয়া প্রহ্লাদের পৌত্র দৈত্যরাজ বলির পিতা বিরোচনের প্রাণভিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে বলি তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রবিজয়ের বরলাভ করিয়া স্বর্গ-মর্ত্যের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। এই প্রতাপ প্রমত্ত বলিকে আবার ছলনার সাহায্যে হতদর্প করিবার জন্য বিষ্ণু বামন অবতার রূপে অদিতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বামনভিক্ষা নাটকে বিষ্ণুরূপী বামনের জন্মবৃত্তান্ত, তাঁহার ভিক্ষাগ্রহণের তাৎপর্য, বলিরাজার যজ্ঞ সভায় ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা ও পরিণতিতে বলিরাজার মস্তকে তাঁহার তৃতীয় পদ সংস্থাপনের চমকপ্রদ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ভক্তির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বহিয়া গিয়াছে। সেইজন্য ইহাতে অলৌকিকতার মাত্রা একটু অধিক—বামনের উপনয়ন কালে অন্নপূর্ণামূর্তিতে দুর্গার আগমন, অদিতি কর্তৃক বামনের কৃষ্ণ মূর্তি দর্শন, নাবিকের কাষ্ঠ নৌকার স্বর্ণ নৌকায় রূপান্তর, সর্বোপরি বলিরাজার যজ্ঞ সভায় বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বিরাট মূর্তি প্রদর্শন প্রভৃতি ঘটনাগুলি নাটকের অলৌকিকতাকে ক্রমে ক্রমে উচ্চগ্রামে লইয়া গিয়াছে। অবশ্য নাটকের উপজীব্যই হইল ছলনা, ছলনাবেশে বিষ্ণুর ভক্ত পরীক্ষা। সেইজন্য এইরূপ অলৌকিকতাও নাটকটিতে বিশেষ রসাভাব ঘটায় নাই। নাটকের

মধ্যে পৌরাণিক ভক্তিবাদের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। বামনরূপী বিষ্ণু এই ভক্তির স্বরূপ ও লক্ষ্য নির্ধারণ করিয়াছেন—

"জীবগণ যদি

... ...

সমস্ত দেবতাই হরি
আর হরিই সমস্ত দেবতা,
এই জ্ঞানযোগের সহিত
ভক্তিযোগ মিশ্রিত করে'
অন্ততঃ একবারও 'হরি' বলে
তা হলে, তারা মুক্তি লাভ করে
আমার সাযুজ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত হবে।"[১৮]

নাটকটির সব চরিত্রই একমুখী। সেইজন্য ইহাতে নাটকীয়তার বিশেষ অবকাশ নাই। একমাত্র দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিপরীতমুখী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তিনিও ভৃঙ্গার মুখে একটি চক্ষু নষ্ট করিয়া ভক্তের দানকার্যের বাধাদানে সমুচিত দণ্ড পাইয়াছেন। দাতা চূড়ামণি বলি ও যোগ্যতমা সহধর্মিণী বিন্ধ্যাবলী ভক্তি ধর্মের প্রগাঢ়তায় যাবতীয় উৎকণ্ঠার নিরসন ঘটাইয়া একটি শান্তরসাশ্রিত পরিণতি আনিয়া দিয়াছেন।

ভাগবতের গিরি গোবর্ধন কাহিনী হইতে রাজকৃষ্ণ 'গিরিগোবর্ধন' নামে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কাহিনী বা চরিত্রের নূতনত্ব কিছুই নাই। বৃন্দাবনের গোপকুল কৃষ্ণের নির্দেশে ইন্দ্রপূজা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপূজা করিতে মনস্থ করিয়াছিল। ইন্দ্রের রোষে ও ক্ষোভে বৃন্দাবন বজ্রপাত ও শিলা-বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হইলে কৃষ্ণ বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে গিরিগোবর্ধন উত্তোলন করিয়া বৃন্দাবনবাসীদের রক্ষা করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই নাট্যকার এখানে কৃষ্ণের এই অলৌকিকতাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কৃষ্ণ এই লীলার কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন—"তোমাকে দেখে নির্বোধ ঐশ্বর্যশালী লোকেরা সাবধান হোক। অসার ধনগর্বী নরাধমদের গর্ব খর্ব করবার জন্য আজ আমার এই গোবর্ধন লীলা।"[১৯] পুরাণে এই পর্বত যজ্ঞের মধ্য দিয়া একটি ধর্মীয় তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা হইল এই যে কৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় একদা ইন্দ্রানুরাগী ভারত সমাজ ভক্তি মার্গ অবলম্বন করিয়া বাসুদেব কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর আরাধনায় নিযুক্ত হয়। এই পৌরাণিক তত্ত্বটির মধ্যে নাট্যকার সামাজিক

জীবনে ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের অহংকার ও পতনের কথা ব্যক্ত করিয়া কাহিনীর মধ্যে একটি লৌকিক তাৎপর্য আনিয়া দিয়াছেন।

পৌরাণিক পরিমণ্ডলে লৌকিকতার আরোপ আরও স্পষ্ট হইয়াছে তাঁহার 'নরমেধ যজ্ঞ' নাটকটিতে। সূক্ষ্ম বিচারে ইহাকে পৌরাণিক নাটকই বলা যায় না। ইহার মধ্যে প্রাকৃত সমাজের এক বীভৎস চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সংসার ক্ষেত্রে কুসীদজীবীদের যে হিংস্রতা ও পীড়ন, দরিদ্র অধমর্ণের উপর যে পাশবিক অত্যাচার তাহাই নাটকের রক্তদন্ত চরিত্রের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাজা যযাতি কর্তৃক পিতৃ আজ্ঞায় নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন ইহার পৌরাণিক বিষয়বস্তু। কিন্তু ইহা যেন যযাতির নরমেধ যজ্ঞের ব্যাপারই নহে, ইহা কুসীদজীবীদেরই নিত্য নরমেধ যজ্ঞ। এই যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে দরিদ্র গৃহস্বামী অর্জুন ও তাহার পুত্র পরিবার। আবার ইহার মধ্যে নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া সকলে অনুমান করেন। রাজকৃষ্ণ রায় এই সময়ে ঋণভারে জর্জরিত ছিলেন। অধমর্ণের সেই জ্বালা আর উত্তমর্ণের প্রতাপ ও পীড়নকে তিনি স্বভাবসুলভ পৌরাণিক নাটকের আকারে রূপদান করিয়াছেন। যাহা হউক নাট্যকার স্বয়ং ইহাকে 'ভক্তি ও করুণ রসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক' বলিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র যযাতির পৌরাণিক চারণক্ষেত্রে এক রূঢ় কঠিন কর্তব্য ও মানবতার দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত করিয়াছেন। অষ্টমবর্ষীয় শিশু কুশধ্বজকে যজ্ঞানলে আহুতি প্রদান করিতে রাজা যযাতির তীব্র মর্মদাহ উপস্থিত হইয়াছে। পরিশেষে হোমকুণ্ড হইতে জীবিত কুশধ্বজকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের উত্থান ঘটিলে নাটকের যাবতীয় উৎকণ্ঠা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়াছে। নাট্যকার বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে আলোচ্য নাটকে প্রথা সম্মত পৌরাণিক রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

রাজকৃষ্ণ রায় ও পৌরাণিক চেতনা ॥ একথা অবশ্য স্বীকার্য রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকগুলি উচ্চশ্রেণীর শিল্পগুণ সমৃদ্ধ নহে। নাটকের আঙ্গিক বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা সংস্থাপনে তাঁহার চরম শৈথিল্য দেখা গিয়াছে। চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমুখী, তাহাদের মধ্যে ভাবের উত্থান পতন নাই। প্রথম হইতেই তাহাদের ভক্তি চেতনা উচ্চগ্রামে উঠিয়াছে। যে বিরুদ্ধ শক্তির সহিত ভক্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়াছে তাহা মায়াত্মকরূপে দুর্বল। লেখকের সমর্থন অভাবে তাহা পুরাণের প্রমত্ত অহংকারেরও অধিকারী হইতে পারে নাই। এই অ-সুর চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই প্রায় প্রচ্ছন্ন ভক্ত, অন্তিমকালে সংহারক শত্রু বা দর্পহারী

শক্তিকে আরাধ্য দেবতারূপে তাহারা শেষ প্রণাম নিবেদন করিয়াছে। পুরাণের মহিমাকে তিনি দুই কক্ষে দুইভাবে স্থাপন করিয়াছেন। ভক্ত যাহারা তাহাদের নিকট ভক্তির অমেয় মূল্য উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। সেখানে ভগবানের কথা—

"ব্যথা পাই ভক্তের ব্যথায়,
ভক্তে স্নেহ করিবারে
ভক্তের দুয়ারে দ্বারী হই,
শিরে বই বাধাহারী বাধা,
বিষ-অন্ন খাই কর পাতি,
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠপুরী হই বনচারী
ভীমাকার গিরিধরি করে....।"[২০]

সমস্ত নাটকে তিনি ভগবানের এই ভক্তবৎসল রূপটিই অনুসন্ধান করিতে চাহিয়াছেন। অপর কক্ষে বৈরীরূপে যাহারা ঈশ্বর বিমুখ হইয়া ক্রমাগত নিগ্রহ ও পীড়ন করিয়া চলিয়াছে, তাহারাও পরিণতিতে ভক্তির অমৃত প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়াছে। এই বৈরীভক্তবৃন্দ অন্তিমকালে ভগবানের চরণ ধ্যান করিয়াই মুক্তি লাভ করিয়াছে—

"তোমার ভক্তগণে কাঁদালে,
তোমার রাঙা চরণ বিনাতপে মেলে
কত যোগী ঋষি তপ করে বনে
কই, দেখা হয় কি তোমার সনে?"[২১]

রাজকৃষ্ণ রায় পুরাণের এই ভক্তিবাদকেই নাটকে প্রচার করিয়াছেন। ইহা গীতার মোক্ষ সাধনা হইতে বহু দূরবর্তী নহে।[২২]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ॥ মনোমোহন রাজকৃষ্ণে যে পৌরাণিক নাটক রচনার সূত্রপাত, গিরিশচন্দ্রের মধ্যে তাহার পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক নাটক রচনায় নিঃসন্দেহে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। বাংলা সাহিত্যের অপর কোন নাট্যকার এই দিক দিয়া তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। নাটক রচনা, অভিনয়, মঞ্চ পরিচালনা প্রভৃতি বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি বাংলা নাট্য জগতে নূতন সম্ভাবনার সূচনা করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি দিকে তাঁহার প্রতিভা ও মৌলিকতা পরিস্ফুট হইয়াছে। নাট্য জগতের সর্বাত্মক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া নিঃসন্দেহে তিনি আধুনিক বাংলা মঞ্চ ও

নাটকের গুরুস্থানীয়। গিরিশচন্দ্র নিজেই একটি যুগ। উনবিংশের সপ্তম দশক হইতে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তিনি বাংলা মঞ্চ জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া সমগ্র যুগটি আলোড়িত হইয়াছে বলিয়া যথার্থই তিনি যুগপ্রতিভূ।

নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র সাহিত্যগত শিল্পবোধকে খুব বেশী স্পষ্ট করেন নাই। এক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিনি যুগজীবন ও জনজীবনের মুখ চাহিয়াছিলেন। দর্শক ও সাধারণ জীবনের চাহিদায় তিনি নাটকগুলিকে শিল্প সজ্জা হইতে লোকপ্রিয়তার ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছেন। আবার তাঁহার ব্যক্তি জীবনের উপলব্ধি যখন যুগজীবন ও লোকজীবনের চিন্তাদর্শের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছে, তখন স্বতন্ত্র কোন শিল্পবোধের আবশ্যকতাও অনুভূত হয় নাই। সেইজন্য শিল্পবোধের মানদণ্ডে গিরিশচন্দ্রের বিচার সর্বত্র সম্ভব নহে। শিল্প অপেক্ষা যে জীবন বিশ্বাসে-অনুভূতিতে বড, তিনি সেই জীবনকেই তাঁহার নাটকের সম্মুখে রাখিয়াছেন। ধর্মচেতনা ও অধ্যাত্মবোধ সমৃদ্ধ জীবন চিরকালই আমাদের দেশে ক্ষয়-ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবন হইতে বড হইয়াছে। এই অধ্যাত্ম জীবনের কথা যাঁহারা বড় করিয়া বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যাশা করা সমীচীন নহে। গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে ব্যক্তি জীবন বা সামাজিক সমস্যার পরিচয় আছে তাহা নিতান্তই দেশকালের চিন্তাধারায় নিয়ন্ত্রিত। ইতিহাস ও বাস্তব হইতে তিনি কিছু কিছু উপাদান লইয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলি তাঁহার প্রত্যয় বোধের দ্বারা পুষ্ট হয় নাই, যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই রাখিয়া দিয়াছেন। পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকে তাঁহার নিজস্ব অনুভূতি ও প্রত্যয়ের পরিচয় আছে, সেইজন্য এইখানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের সাফল্যের পশ্চাতে কয়েকটি কারণ অনুসন্ধান করা যায়। প্রথমতঃ তাঁহার সমকালীন যুগচেতনা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার জাতীয় চরিত্রের যথার্থ মর্মোপলব্ধি, তৃতীয়তঃ তাঁহার ব্যক্তি জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম প্রভাব। গিরিশচন্দ্রের যুগ হিন্দু জাগৃতির যুগ। পুনরুত্থিত হিন্দুধর্মের প্লাবনে দেশের সর্বত্র একটি ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছিল। সাহিত্য ও জীবন চিন্তার উভয় ক্ষেত্রেই ধর্ম একটি আবশ্যিক উপাদান হইয়া গিয়াছিল। আমরা ইহার সাংস্কৃতিক মূল্য পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে সকলের মত গিরিশচন্দ্রের মধ্যেও ইহার প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ এই যুগচিন্তার একটি সাময়িক রূপ থাকিলেও ইহা যে এদেশের জীবন ও মননের সহিত সম্পৃক্ত, তাহা তিনি ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন। দেশের চিন্তাধারা একটি সনাতন ধর্ম ও চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহার সহিত পরিচিত না হইলে দেশকে সঠিকভাবে বুঝা যাইবে না—ইহাই ছিল তাঁহার অভিমত। 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র তাঁহার এই বক্তব্য সুস্পষ্ট করিয়াছেন—"জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম—ধর্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হল সঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সর্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ নামেই হইবে।"[২৩] এইভাবে তিনি পৌরাণিক নাটকে জাতীয় অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন।

সর্বশেষে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকে শুদ্ধ ও সমুন্নত করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য লাভের পূর্বে তিনি আত্মসত্তা ও শিল্পীসত্তাকে পৃথক রাখিয়াছিলেন। এই পর্যায়ের পৌরাণিক নাট্যধারায় তিনি লোক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভে তাঁহার ব্যক্তি জীবনে যেমন শান্তি লাভ করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী আরও উদার, প্রসন্ন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। গিরিশ চরিতকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার ধর্মজীবনের স্তর বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং যুগের অবিশ্বাসী গিরিশচন্দ্র পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে কিরূপ পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। গুরুদেবকে তিনি বিরাট সম্বল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাতেই "গুরুই সর্বস্ব আমার বোধ হইল। যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাঁহার সাধন ভজন নিষ্প্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল—আমার জন্ম সফল।"[২৪] তাঁহার সাহিত্য জীবনে এই অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রভাব সুগভীর। ইহার ফলে তিনি পৌরাণিক নাটকের স্থানে ভক্তিমূলক মহাপুরুষ কাহিনীর নাটক লিখিতে সুরু করেন। তাঁহার পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকগুলি মূলতঃ ভিন্নধর্মী নহে। ইহাদের মধ্যে ভক্তিরসের শ্রেণীগত কোন প্রভেদ নাই, মাত্রাগত ব্যবধান আছে মাত্র। পৌরাণিক নাটকে যাহা সাধারণ চিন্তারূপে প্রকাশিত হইয়াছে, মহাপুরুষ জীবনীতে তাহা বিশেষ চরিত্রাশ্রয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য ।। গিরিশচন্দ্র পুরাণ কাহিনীর যথার্থতা রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন না। এ বিষয়ে রাজকৃষ্ণ রায় বরং বেশী মূলানুগ উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। আবার তিনি পৌরাণিক বিষয়বস্তুর নবমূল্যায়নও করিতে চাহেন নাই। মধুসূদন, নবীনচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র স্ব স্ব দৃষ্টিতে পৌরাণিক চিন্তার যে পুনর্বিবেচনা সুরু করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র সে পথে যান নাই। তাঁহার চিন্তাধারা বৈপ্লবিক ছিল না। মধুসূদন যে সংস্কার মুক্তির আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা জাতীয়তা ও সংস্কৃতি বিরোধী ছিল বলিয়া বঙ্কিম—নবীন জাতীয় চিন্তার অনুকূলে—সংস্কার পরিমার্জনা সুরু করিয়াছিলেন। পথের অনৈক্য থাকিলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্যের ঐক্য ছিল—বোধ বুদ্ধি ও মননের আলোকে একটি শুদ্ধ ও পরিমার্জিত জাতীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধান করা। গিরিশচন্দ্র এইরূপ কোন শুদ্ধিকরণের পথ গ্রহণ করেন নাই। তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতির লোকাশ্রিত রূপটিই আশ্রয় করিয়াছিলেন। ভক্তি ধর্মের প্রাবল্যে তিনি সংস্কারকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন এবং দেশ জাতির উজ্জীবনে ইহাই তাঁহার নিকট সর্বাধিক অনুকূল পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

এইজন্য বাল্মীকি অপেক্ষা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ব্যাস ভারত অপেক্ষা কাশীরাসী মহাভারত এবং মূল পুরাণ বিবরণ অপেক্ষা লোকপ্রচলিত পুরাণ কাহিনীই তিনি বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি মহাকাব্য পুরাণের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার জীবনীকার অনুমান করেন বাল্যকালে খুল্লপিতামহীর নিকট নিত্য তিনি যে পুরাণ কথা শ্রবণ করিতেন, তাহাই তাঁহাকে পৌরাণিক নাটক রচনার প্রথম প্রেরণা দিয়াছে।[২৫] এই পুরাণ কাহিনীগুলির মধ্যে এক প্রকার চমৎকারিত্ব আছে। নির্বাচিত ঘটনা ও চরিত্রকে বীর ও করুণ রসের আধারে সংস্থাপন করিয়া তিনি ইহাদের উপভোগ্যতা বৃদ্ধি করিতেন। দর্শকমনে এই দুইটি রসের আবেদন সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু অপ্রাকৃত ঘটনা ও অলৌকিকতার অতিরেকে ইহাদের নাট্যরস যে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৌরাণিকতা ও নাটকীয়তা—পৌরাণিক নাটকের এই দুইটি দিকের মধ্যে তিনি সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন্ নাই। পৌরাণিকতাকে বড় করিতে গিয়া প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি নাটকীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিলেও ভক্তি ধর্ম উভয় ক্ষেত্রে প্রবল। বিশুদ্ধ পৌরাণিক নাটকগুলিতে ভক্তি ধর্ম

বীর ও করুণ রসের মধ্যে উৎসারিত হইয়াছে এবং নাটকীয় ঘটনাগুলি Situation ভিত্তিক, আর ভক্তিমূলক নাটকের ভক্তি ধর্ম প্রধানতঃ শান্তরসের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাদের নাটকীয় ঘটনা অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। মহাপুরুষদের জীবনে বা ব্যক্তিগত জীবনে যে অধ্যাত্ম ভাবের স্ফুরণ তিনি প্রত্যক্ষ করিযাছেন, তাহা এই ভক্তিমূলক নাটকগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে। সেইজন্য অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র যত অধিক হইযাছে, নাটকগুলির মধ্যে তত বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। চৈতন্য লীলা ও নিমাই সন্ন্যাসে প্রেমধর্ম, বুদ্ধদেব চরিত্রে করুণা কথা, শঙ্করাচার্যে অদ্বৈতবাদ, তপোবনে ব্রাহ্মণ্য মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রকীর্তিত হইযাছে। সমস্ত নদী যেমন পরিণতিতে সাগরে মিশিয়া যায, এই বিচিত্র অধ্যাত্ম অনুভূতির নাটকগুলি তেমনি তাঁহার হৃদয় উৎসারিত ভক্তি সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। দ্রবীভূত চেতনার আলোকে তিনি এই মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী উপলব্ধি করিয়াছেন।

আমরা এক্ষণে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া তাঁহার পৌরাণিক প্রজ্ঞার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

রামায়ণী কথা ।। রামায়ণী কাহিনী লইয়া রচিত গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি হইল 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস' ও 'সীতাহরণ'। ইহাদের মধ্যে 'রাবণ বধ' ও 'সীতার বনবাসে' তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রহিয়াছে। অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে নাট্যগুণ খুব বেশী নাই, তবে সব কযটির মধ্যে কৃত্তিবাসী ঘটনালেখ্য অঙ্কন করিয়া গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর উপযোগী রামায়ণী কথায় নাটক পরিবেশন করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসী কাহিনীর রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের বিবরণ লইয়া রচিত 'অকাল বোধন' তাঁহার রামায়ণী কথার প্রথম নাটক হইলেও নাট্যগুণে ইহা প্রায় অনুল্লেখ্য। এইজন্য 'রাবণ বধ'কেই (১৮৮১) এই প্রসঙ্গে তাঁহার যথার্থ প্রথম রচনা বলা যাইতে পারে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের ভক্তি রসধারার পবিত্র গঙ্গোত্রী এই রাবণ বধ নাটক। কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে ইহার কাহিনী গৃহীত হইযাছে। ইহার চরিত্রচিত্রণও কৃত্তিবাসের অনুরূপ। একের পর এক রক্ষবীরদের পতনের পর রক্ষোরাজ রাবণের যুদ্ধায়োজন, রাম-রাবণের সংগ্রামের বিচিত্র ঘটনাবলী বিশেষভাবে দেবকুল কর্তৃক রামের সহায়তা, অম্বিকা আরাধনায় ব্রহ্মার নির্দেশ, রামের অকালবোধন, নীলোৎপলের জন্য রামের চক্ষুমণি উৎপাটনের সংকল্প, ব্রাহ্মণ বেশে হনুমানের রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, মুমূর্ষু রাবণ কর্তৃক রামচন্দ্রকে রাজনীতি শিক্ষাদান প্রভৃতি ঘটনাগুলি হুবহু কৃত্তিবাস হইতে আহৃত। তবে

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে কৃত্তিবাসের মত তাঁহার রাবণও রামচন্দ্রের একজন পরম ভক্ত। ভক্তকে নিধন করিতে কৃত্তিবাসের মত তাঁহার রামও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন। কৃত্তিবাস দেখাইয়াছেন—

কার্য নাই রাজপাটে পুনঃ যাই বনে।
রাবণ পরম ভক্ত মারিব কেমনে॥
কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রাম নাম না করিবে আর॥[২৬]

গিরিশচন্দ্রের রামচন্দ্রের উক্তি:

ছার রাজ্যধন, ধিক ধিক সীতা।
হেন ভক্তে প্রহারিনু সীতা লাগি,
রটিল কলঙ্ক নামে,
এতদিনে রাম নাম উঠিল ধরাতে।[২৭]

ইহার পরে দুষ্টা সরস্বতীর প্রভাবে রাবণের পরুষ ভাষণও কৃত্তিবাসের অনুরূপ। কৃত্তিবাসের এই ভক্তি দর্পণকে গিরিশচন্দ্র আরও উচ্ছ্বাস দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রাবণ, মন্দোদরী প্রভৃতি দেবকুল ও রক্ষকুলের সকলেই রামকে বিষ্ণু অবতাররূপে গ্রহণ করিয়া অন্তরের ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। এমনকি, রামের আরাধ্য দুর্গাও রামকে গোলোক বিহারী দয়াময় বলিয়া তাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। এইভাবে রাবণবধের আদ্যন্ত ভক্তিরসে পরিপ্লাবিত হইয়াছে। স্বাভাবিক ভাবেই ইহার চরিত্রগুলি সজীব হইতে পারে নাই। রামের মধ্যে বৈষ্ণবীয় করুণা ও রাবণের মধ্যে ভক্তি বিনম্রতা রাবণের অন্তিম অধ্যায়কে শোকাবহ না করিয়া শান্তিময় করিয়াছে। একমাত্র মন্দোদরী চরিত্রেই বলিষ্ঠতা পরিস্ফুট হইয়াছে। জন্ম এয়োতীর বরদান করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার সতী ধর্মের মর্যাদা রাখিয়াছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যে সীতার অগ্নিপরীক্ষা যোগ করিয়া গিরিশচন্দ্র মূল কাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়াছেন। রাবণবধের দর্শকের নিকট ইহা অবাঞ্ছিত এবং রসাভাবযুক্ত হইয়াছে।

'সীতার বনবাস' রামায়ণের একটি বিষাদ করুণ অধ্যায়। ইহাতে নাট্যরস সৃষ্টির সুযোগও বেশী। স্বাভাবিক ভাবে গিরিশচন্দ্র কাহিনীর এই সুযোগ ও সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। 'সীতার বনবাস' (১৮৮১) নাটকের মধ্যে তিনি করুণ রসকে প্রধান করিয়া বীর ও বাৎসল্য রসের উপযুক্ত প্রকাশ ঘটাইয়াছেন। কাহিনী অংশ পুরোপুরি কৃত্তিবাসী অনুসরণ। কৃত্তিবাস সীতার

বনবাসের একটি অতিরিক্ত বাস্তব কারণের অবতারণা করিয়াছেন। সখীদের অনুরোধে সীতা রাবণের আলেখ্য অঙ্কন করিয়া তাহাতেই নিদ্রাতুর হইয়া শয়ন করিলে রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হন। গিরিশচন্দ্র সীতা বনবাসের এই মনস্তাত্বিক ভিত্তিটিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু প্রজানুরঞ্জন হেতু জানকীর বিসর্জন যথেষ্ট বিবেচিত নাও হইতে পারে, এইজন্য তাঁহার রামচন্দ্র সীতার কলঙ্ককে দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরে তাঁহাকে বিসর্জন দিতে তৎপর হইয়াছেন। এইখানে রামচন্দ্র সীতা চরিত্র সম্বন্ধে যে উক্তি করিযাছেন, তাহা নিঃসন্দেহে রামচন্দ্র বিরোধী উক্তি। রাম চরিত্রেই এই আচরণ একদিকে যেমন তাঁহাকে সীতা বনবাসের একটি শক্তিশালী কারণের সন্ধান দিয়াছে, তেমনি অপর দিকে অপাপবিদ্ধা সীতার বনবাসের কারুণ্যকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। তবে সীতার বনবাসে রাম-ভূমিকা অপেক্ষা সীতা-ভূমিকাই উজ্জল। বেদনা ও বাৎসল্য, পাতিব্রত্য ও সহিষ্ণুতা এক কথায় নারীধর্মের সুমহান অভিব্যক্তিতে সীতা চরিত্র সমুজ্জ্বল। বেদনার পটভূমিতে সীতার বাৎসল্যকে গিরিশচন্দ্র অতি সুন্দর ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্বার নিয়তি নির্দেশে জীবনে চরম বিপর্যয় নামিয়া আসিয়াছে, ত্রিলোকধন্য স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, গর্ভস্থ সন্তান স্বামীর স্মারকচিহ্ন হইয়া রহিয়াছে, পত্নী হিসাবে কর্তব্য অসমাপ্ত থাকিলেও মাতা হিসাবে কর্তব্য শিথিল করিবার উপায় নাই। গিরিশচন্দ্র পূর্ণ সহানুভূতি দিয়া সীতা চরিত্রকে বেদনা বারিধির প্রস্ফুটিত শতদল করিয়া তুলিয়াছেন। বিরহখিন্ন সীতার উক্তি :

জগৎমাতা,
শিখাও গো দুহিতারে জননীর প্রেম,
ছিন্ন অন্য ডুরি,
প্রেমে বাঁধা রেখ মা সংসারে,
ওরে কে অভাগা এসেছে জঠরে।[২৮]

বাৎসল্যের আধার কুশী ও লব মহর্ষি বাল্মীকির যোগ্য শিষ্যরূপে বীর্যে জ্ঞানে রঘুবংশ অবতংসরূপে যথার্থ পরিচয় বহন করিয়াছে। নরসূর্য রামচন্দ্রের কর্তব্য কঠোর চারিত্র ধর্ম, সীতাচরিত্রের গভীর বেদনা ও কারুণ্য এবং কুশীলবের বীরধর্ম ও মাতৃমন্ত্রের উজ্জল সাধনাকে গিরিশচন্দ্র সীতার বনবাসে অপূর্ব সাফল্যের সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় নাটকটি মিলনাত্মক। যজ্ঞ

সভায় সীতার পাতাল প্রবেশের পরে নাট্যকার শূন্যে কমলাসনে লক্ষ্মীরূপে সীতার আবির্ভাব ঘটাইয়া রাম সীতার মিলন সাধন করিয়াছেন।

রাম চরিত্রের কঠিনতম কর্তব্য পালন এবং প্রতিজ্ঞারক্ষার ক্ষেত্র বোধ করি লক্ষ্মণ বর্জনে। গিরিশচন্দ্র এই ভ্রাতৃবিসর্জনের কাহিনী লইয়া 'লক্ষ্মণ বর্জন' (১৮৮১) নাটকটি লিখিয়াছেন। লক্ষ্মণের আত্মবিসর্জনের মধ্যে তাঁহার বীরধর্ম ও প্রেমধর্মের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা সূচিত হইয়াছে। লক্ষ্মণের সর্বোত্তম পরিচয় তাঁহার প্রেমে। শ্রীরামের প্রেমে তাঁহার সেবা এত গভীর হইয়াছিল। নরঘাতী বীর্যের সাধনায় নহে, প্রেম প্রণোদিত বীর্যের প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্মণ চরিত্র এতখানি সমুজ্জ্বল। রামায়ণী কথার এই আন্তর উদ্দেশ্যকে গিরিশচন্দ্র আলোচ্য নাটকে রূপায়িত করিয়াছেন।

রামায়ণী কথার নাটক 'সীতার বিবাহে'র (১৮৮২) মধ্যে অযোধ্যার রাজসভায় বিশ্বামিত্রের উপস্থিতি হইতে রামের হরধনুভঙ্গ ও পরশুরাম সাক্ষাৎ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের ঐশ্বরিক মহিমা প্রদর্শন ও রামসীতার শুভলগ্নে মিলনের মধ্যে রক্ষরাজ রাবণের বিনষ্টির সূচনা নাটকের উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ রায়ের হরধনুভঙ্গ নাটকের মত গিরিশচন্দ্রের এই নাটকেও ভক্তিরসের ব্যাপকতা রক্ষিত হইয়াছে। এই ভক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে পরশুরামের মধ্যে। হৃতদর্প পরশুরাম স্বর্গলোক বা ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করিয়া নরনারায়ণ শ্রীরামের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য নাটকে রামায়ণী সংস্কার প্রায় রক্ষিত হইয়াছে, তবে বিশ্বামিত্রের অতিদুর্বলতা ও রাক্ষস পীড়নে মৃত্যু-শঙ্কা তাঁহার তেজদীপ্ত চরিত্রের মাহাত্ম্য কিছুটা ক্ষুন্ন করিয়াছে।

তাঁহার 'রামের বনবাস' (১৮৮২) নাটকে রামের বনবাস যাত্রা হইতে চিত্রকূট পর্বতে ভরত-মিলন পর্যন্ত কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কাহিনী বিন্যাসে ইহা কৃত্তিবাসী কথার অনুরূপ, চরিত্র চিত্রণে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই। দশরথের পুত্রবিচ্ছেদ জনিত বেদনা ও বিলাপকে গিরিশচন্দ্র সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। ভরতের ভর্ৎসনায় কৈকেয়ীর মোহভঙ্গ ও রাম প্রশস্তির মধ্যে গিরিশচন্দ্র কৈকেয়ী চরিত্রের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন।

দণ্ডকারণ্যে রামলক্ষ্মণের প্রণয় প্রার্থনায় লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন হইতে হনুমানের অশোক কানন হইতে সীতা সংবাদ লইয়া প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনী তাঁহার 'সীতাহরণ' (১৮৮২) নাটকের অন্তর্ভুক্ত। কাহিনী বা চরিত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিশ্বস্ত অনুসরণ আছে। মারীচ-রাবণ কথোপকথনের মধ্যে

রামমাহাত্ম্যটি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাড়কার পুত্র মারীচ রামচন্দ্রের পূর্বকীর্তি পর্যালোচনা করিলে রাবণ তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রাম যদি নারায়ণ হন, তবে রাবণ তাঁহার লক্ষ্মী হরণ করিয়া রক্ষঃ সমাজে কীর্তি রাখিবেন। বালিবধ কাহিনীতে গিরিশচন্দ্র ভক্তি রস প্রকাশের উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহার বালি রামচন্দ্রকে কৃত্তিবাসের মতও ভৎ'সনা করিতে পারে নাই। রামায়ণী সংস্কারকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন বালি সামান্য কিছু তিরস্কার করিয়াছে। ইহার পরেই মুমূর্ষু বালি রামচন্দ্রকে পূর্ণ সনাতন নারায়ণ বলিয়া অন্তিম প্রণাম নিবেদন করিয়াছে। এই ভক্তিবাদের আলোকেই গিরিশচন্দ্র রামের বালিবধ কলঙ্ককেও ক্ষালন করিতে চাহিয়াছেন। রাজ্যহারা পত্নীহারা সুগ্রীব দীনতম চরিত্র, সেই দীন জীবনকে দয়া করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার কর্তব্য রক্ষা করিয়াছেন। আর সেই দয়া এইবার পরম দীন চরিত্র বালিও পাইবে। বালি এই দীননাথের কৃপা লাভ করিয়া অনন্ত প্রয়াণ করিয়াছে।

অদ্ভুত রামায়ণের অম্বরীষ কন্যা শ্রীমতীর স্বয়ংবরার কাহিনী লইয়া গিরিশচন্দ্র 'অভিশাপ' নামে একটি ক্ষুদ্র নাটক রচনা করিয়াছেন। দুষ্টা সরস্বতীর অভিশাপে পর্বত ও নারদ মুনির মতিভ্রম ও অম্বরীষ রাজার কন্যা শ্রীমতীকে বিবাহ করিবার বিড়ম্বনা ইহাতে এক কৌতুককর ভঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়াছে। এই ঋষিযুগলের ক্রোধ হইতে অম্বরীষকে রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণু সুদর্শন চক্র প্রেরণ করিয়াছেন। তবে ঋষিদের অভিশাপ অম্বরীষকে স্পর্শ না করিলেও বিষ্ণু তাহা নিজের উপর টানিয়া লইয়াছেন। ভক্তের সহিত ভগবানের প্রভেদ নাই এবং ভগবানের বিভিন্ন রূপকল্পনা মূলতঃ এক, ইহাই আলোচ্য নাটিকার বক্তব্য।

মহাভারতী কথা ।। গিরিশচন্দ্রের মহাভারতী কথার নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অভিমন্যুবধ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', ও 'জনা' ও 'পাণ্ডবগৌরব'। মহাভারতের এক একটি বিশিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটকগুলি রচিত হইয়াছে।

বীর বালক অভিমন্যুকে কেন্দ্র করিয়া বীর ও করুণরসের সংমিশ্রণে 'অভিমন্যুবধ' (১৮৮১) নাটকটি রচিত হইয়াছে। ইহা গিরিশচন্দ্রের মহাভারতী কথার প্রথম নাটক এবং সর্বপ্রথম পৌরাণিক বিয়োগান্ত নাটক। লোকরুচির মুখ চাহিয়া সে যুগের নাট্যকারবৃন্দ সহসা কোন বিয়োগান্ত নাটক লিখিতে চাহিতেন না। সেইজন্য অলৌকিকতা ও অতি প্রাকৃতের সমবায়ে টানিয়া বুনিয়া এক প্রকার অবাস্তব মিলনাত্মক পরিণতির সূচনা করা হইত। গিরিশচন্দ্রও এই

লোক প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু অভিমন্যু বধের মধ্যে তিনি এই অযৌক্তিক ট্র্যাডিশনকে কাটাইতে চাহিয়াছেন। ইহার মধ্যে নাটকীয় সংঘাত ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠিয়া অভিমন্যুর মৃত্যুতে চরম মুহূর্তে পৌঁছাইয়াছে। অভিমন্যুর বীরধর্মের সাধনা, মাতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম এক কর্তব্য কঠিন মুহূর্তে তাহাকে উদ্বেলিত করিয়াছে। তথাপি মহাভারতের যুদ্ধ ধর্মক্ষেত্রের ধর্মাচরণ। অভিমন্যু সেই কুরুক্ষেত্র রণভূমির মহাকর্তব্যে আত্মদান করিয়াছে। সপ্তরথীর অন্যায় সমর, অভিমন্যুর অমিত বিক্রমে ব্যূহভেদ, জ্যেষ্ঠতাত ভীমের অসহায়তা পাণ্ডব পক্ষে মহা সঙ্কট সূচনার সঙ্গে সঙ্গে দর্শককুলকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। প্রচলিত কাহিনী বলিয়াই ইহার গুরুত্ব কমিয়া যায় না। গিরিশচন্দ্র ইহার পৌরাণিক ফলশ্রুতিকে পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও সুভদ্রার চরিত্রে মানবিক স্নেহ দুর্বলতা ও স্বভাব ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। বিরাট মৃত্যু শোক তাঁহাদের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে শিথিল করিয়া দিয়াছে। মহাভারতী প্রজ্ঞার ধারক শ্রীকৃষ্ণ কর্তব্য সাধনের মধ্যে এই পুত্রশোকের সান্ত্বনা দিতে চাহিয়াছেন—

> সত্য, শূলসম পুত্রশোক
> কিন্তু বজ্রসম ক্ষত্রিয় হৃদয়,
> বীর বীর্য প্রকাশি সমরে
> বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু লভেছে কুমার
> ক্ষত্র পিতা, অধিক কি চাহ আর ?[২৯]

তথাপি ক্ষত্র ধর্মের এই মহৎ সান্ত্বনাও অর্জুনকে স্থিতধী করিতে পারে নাই। তাঁহার পিতৃহৃদয় নিঃসীম শূন্যতায় হাহাকার করিয়াছে। পুত্রের অকাল বিয়োগ, পিতার অশান্ত বিলাপ, মাতৃহৃদয়ের মর্মভেদী আর্তনাদ মহাভারতের মহাকর্তব্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অভিমন্যুবধ নিঃসন্দেহে চিরকালীন অকাল বিয়োগের শোক কথা। গিরিশচন্দ্র এই বেদনার দিকটিই নাটকে বড় করিয়াছেন, মহাভারতের উদ্দেশ্য ও মহিমা এখানে গৌণ।

দ্যূতপণে পরাজিত পাণ্ডবগণের বিরাট রাজার আশ্রয়ে বৎসরকাল অজ্ঞাত বাসের বিবরণ লইয়া পাণ্ডবের 'অজ্ঞাতবাস' (১৮৮৩) নাটকটি রচিত। নাটকের ঘটনা প্রধানতঃ তিনটি বিষয়কে আশ্রয় করিয়াছে। বিরাট রাজার শ্যালক কীচকের কামলালসা ও ভীমের হস্তে মৃত্যু মাশুলে সেই প্রবৃত্তির নিরসন নাটকের প্রথম কাহিনী। দ্বিতীয় ঘটনা হইল বিরাট রাজকে কুরু রথিগণের আক্রমণ ও অর্জুনের যুদ্ধে কৌরব কুলের পরাজয়। তৃতীয় ঘটনা হইল বিরাট দুহিতা

উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ সম্পাদন। নাটকের ঘটনাগুলি কিছুটা বিচ্ছিন্ন হইলেও বৃহন্নলাবেশী অর্জুন প্রায় সব কয়টির মধ্যে সংযোগ সেতু রচনা করিয়াছে। অজ্ঞাতবাস কালে ধর্মনিষ্ঠ পাণ্ডবদের যে সঙ্কুচিত অথচ বলিষ্ঠ জীবন যাত্রা, যাহা কৌরব পক্ষের শত সমারোহের মধ্যেও সুন্দর হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা আলোচ্য নাটকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাইযাছে। কাহিনী অংশে কাশীরাম হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য সূচিত হইযাছে। সুশর্মার হস্তে বিরাটের বন্দীত্ব ও ভীম কর্তৃক সেই বন্দীত্ব মোচনের কাহিনী গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার কীচকও কাশীরামের কীচক হইতে হীনবল। পঞ্চ পাণ্ডবের চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে গিরিশচন্দ্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, বিশেষভাবে অর্জুনের বীরত্ব ও যুধিষ্ঠিরের ধৈর্যকে তিনি বিশ্বস্ততার সহিত রক্ষা করিয়াছেন।

পাণ্ডবজীবনের অজ্ঞাতবাসের কাহিনী বলিয়া ইহার মধ্যে স্পষ্টভাবে পাণ্ডবদের জীবনচর্যা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তবে ছদ্মবেশে তাঁহারা স্ব স্ব ভূমিকাকে যে ভাবে প্রকাশ করিযাছেন তাহা নাটকীয়তা সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। কৃষ্ণের ভূমিকা এবং নীতি নির্দেশও এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প। তবে অজ্ঞাতবাস শেষ হইলে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে আসন্ন কুরুক্ষেত্র মহাসমরের ইঙ্গিত দিয়াছেন—

শুন সতি জ্বালিব অনল,
দুরন্ত ক্ষত্রিয় দলবল
জ্বালাইব সে আগুনে,
ধর্মরাজ্য করিব স্থাপন,
তুমি সখী, পার্থ সখা, সে কার্যে আমার।[৩০]

এইভাবে গিরিশচন্দ্র পাণ্ডব কথার মধ্যেও নাটকের মধ্যে কৃষ্ণ কথাকে টানিয়া আনিয়াছেন। রসের দিক দিয়া ইহার মধ্যে বীররস ও বাৎসল্যরসের যুগ্ম প্রকাশ ঘটিয়াছে। উত্তরার প্রতি অর্জুনের স্নেহ বাৎসল্য নাটকের যুদ্ধ ও সংগ্রামের ভীম গর্জনের মধ্যে এক ছায়া-শীতল আচ্ছাদন প্রসারিত করিয়াছে।

শুধু মহাভারতী কাহিনীরই নহে, সমগ্র পৌরাণিক নাটকের মধ্যে বোধ করি গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা হইল তাঁহার 'জনা' (১৮৯৩) নাটক। এই নাটকটি তাঁহার ভক্তিমূলক নাটক রচনার সময়ে রচিত হয়। পৌরাণিকতা ও নাটকীয়তার সমন্বয়ে এই নাটকটি যথার্থ রসোত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্পের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে। জনা কাহিনীর মূল পাওয়া যায় জৈমিনি

ভারতে। কাশীরাম দাস সেখান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আশ্বমেধিক পর্বে ইহাকে পল্লবিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তবে তিনি মূল জৈমিনির জনা চরিত্রের প্রতিহিংসা প্রবণতাকে কোমলতা ও কারুণ্যের আবরণে অপেক্ষাকৃত স্তিমিত রাখিয়াছেন। কাশীরামের জনা নিরুদ্যম ও ভগ্ন মনোরথ হইয়া গঙ্গাগর্ভে দেহ বিসর্জন দিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র উভযরূপের একটি সমন্বয় করিয়া জনা চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার জনা মাতৃত্বে কোমল, প্রতিহিংসায় কঠোর, প্রতিশ বিধানে নির্মম। মহাভারতের মূল আখ্যানে যে স্বল্প সংখ্যক বীরাঙ্গনার পরিচয় পাওয়া যায়, ভারত কথায় উপসংহার পর্বে ঘটনাচক্রে আবির্ভূতা জনা চরিত্রকে অনায়াসে তাঁহাদের পার্শ্বে স্থাপন করা যায়। গিরিশচন্দ্র জনার এই বীরাঙ্গনা রূপের কথা বিস্মৃত হন নাই।

জনা নাটকের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে ভক্তিরসের প্রাধান্য থাকিলেও তাহা কাহিনীর গতি বা চরিত্রের বাস্তবতাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে নাই জনার মাতৃত্ব ও বাৎসল্য, প্রবীরের ক্ষত্রধর্ম পালন ও কর্তব্য নিষ্ঠা ঘটনাধারার অগ্রগতির সহিত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব ধরিয়া প্রবীর বীরোচিত কর্তব্য করিয়াছে। ইহাতে পিতার সমর্থন না পাইলেও মাতা জনা তাহাকে পূর্ণভাবে উৎসাহিত করিয়াছে। জনার মাতৃত্ব প্রবীরের জীবন ও মৃত্যুর আলোকে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম দিকে তাঁহার স্বভাবকোমল মাতৃত্ব পুত্রের যুদ্ধস্পৃহায় আতঙ্কিত হইয়াছে। পরে তাহা ক্ষত্রোচিত কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রবীরকে অপূর্ব প্রেরণা দান করিয়াছে, স্বামী নীলধ্বজকে দোষারোপ করিতেও তাঁহার দ্বিধা নাই। সর্বশেষে প্রবীরের মৃত্যুর পরে এই কোমল মাতৃত্ব আহত ফণিনীর মত প্রতিহিংসা ও বৈরীদলনে ভৈরবীমূর্তি ধারণ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের এ চরিত্রের তুলনা নাই। শোকাহতা জনা প্রতিহিংসাস্পৃহায় উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছেন। তীব্র কণ্ঠে জনা স্বামীর শত্রুপ্রীতিকে ধিক্কার দিয়াছেন। হরিভক্তির মধ্যে এইরূপ হীনতা কেন, ইহাই তাঁহার প্রশ্ন। স্বামী নীলধ্বজ মাহিষ্মতী রাজপুরীতে কৃষ্ণার্জুনের আগমন ও অভ্যর্থনার কথা বলিলে তেজস্বিনী জনা উত্তর দিয়াছেন—

যাও তবে হস্তিনানগরে—
অশ্বমেধে হইও সহায়,
তথা বহু কার্য আছে তব,—
ব্রাহ্মণ ভোজনে যোগাইবে বারি,

নহে দ্বারী হয়ে বসিবে দুয়ারে
সখ্যতার দিবে পরিচয়।
উচ্চাসনে বসিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির,
পদপ্রান্তে ব'স গিয়ে তার।
হতো ভাল পারিতে যদ্যপি
আমারে লইয়ে যেতে দ্রৌপদী সেবায়।[৩১]

কিন্তু জনার এই প্রতিহিংসাস্পৃহা চরিতার্থ হয় নাই। মাতৃহৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনা স্বামীভ্রাতা অনুচরদের নিষ্করণ উদাসীনতায় মরুপথে হারাইয়া গিয়াছে। জাহ্নবী ধারায় আত্মবিসর্জন দিয়া তিনি এই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়াছেন। প্রবল জীবন উত্তাপ কৃষ্ণ ভক্তির আর্দ্র বারিতে শীতল হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণভক্তির এই ভাবাবহ না থাকিলে ইহা অনায়াসে একটি শ্রেষ্ঠ লৌকিক নাটক হইয়া যাইত। গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে, বাস্তবানুভূতির বিশ্বস্ত পরিচয় দিয়াও তিনি নাটকের ভক্তিরস অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। নীলধ্বজ, বিদূষক, উলুক প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির পরিপূর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে। নীলধ্বজ নবরূপী বিষ্ণু কৃষ্ণকে দেখিয়া সম্মোহিত, বিদূষকের ভক্তির তুলনা নাই, তাঁহার ভক্তিতে মৃত বৃক্ষ সঞ্জীবিত হয়, ভগবান ভক্তবাঞ্ছিত মধুর রূপে মূর্ত হন, উলুকও বিষ্ণু পাদপদ্মকে সংসারের সার বলিয়া মনে করেন। তবে কৃষ্ণপ্রেমিক নীলধ্বজও পুত্রশোকে বিচলিত হইয়াছেন, ভগবানের প্রতি ভক্তের অভিমান জাগিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন "আমি মুরলীধারীকে একবার জিজ্ঞাসা করব, এ বৃদ্ধ বয়সে কেন আমার বক্ষে দারুণ শেল আঘাৎ কল্লেন। অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করব যে, কুসুম সুকুমার কুমারের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে তাঁর মনে ব্যথা লাগল না ?"[৩২] শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তর দিয়াছেন—

"জেনো বীর প্রপঞ্চ সকলি,
মহাকাল করে খেলা পঞ্চভূত লয়ে,
ভাঙ্গে গড়ে ইচ্ছামত তার।"[৩৩]

ইহাই ভক্তি ও বিশ্বাসের শেষ কথা। স্নেহ মায়া মমতার ঊর্ধ্বে বিশ্ববিধানের একটি অমোঘ নির্দেশ রহিয়াছে। যে ভাবেই হউক, তাহাকে মানিয়া লইতে হয়। এই বিধাতা বিধানকে মানবিক দৃষ্টিতে সকল সময় ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রবীরের মৃত্যুতে জনার মাতৃত্ব হাহাকার করিয়াছে, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ করিবার নাই। মহাভারতী পৃষ্ঠায় সুভদ্রা চরিত্রের বিপরীত পার্শ্বে জনার স্থান।

শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী মহিমা তদ্গতপ্রাণা সুভদ্রা যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, মানবপ্রাণা জনা সেভাবে করিতে পারেন নাই। ভগবানের সেই অহেতুক লীলাতত্ত্ব এবং মানবের সেই চিরকালীন হৃদয়বত্তার যুক্ত বেণী রচিত হইয়াছে গিরিশচন্দ্রের অমর সৃষ্টি জনা নাটকে।

'পাণ্ডব গৌরব' (১৯০০) নাটকটিও তাঁহার ভক্তি মূলক নাটক রচনার সময় লিখিত হয়। ইহার কাহিনী মহাভারত হইতে গৃহীত নহে, 'দণ্ডীপর্ব' গ্রন্থ হইতে আহৃত। তবে ইহার ঘটনা ও চরিত্রের সহিত মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্রের নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। দণ্ডীরাজার উপাখ্যান নাটকের বিষয়বস্তু। গিরিশচন্দ্র ইহার মধ্যে আশ্রিত-রক্ষারূপ পরমধর্মের জয়গান গাহিয়াছেন। ইহার জন্য পাণ্ডব ও কৃষ্ণের মধ্যে বিবাদ বাধিলে পাণ্ডবগণ ধর্মবলে দেবতাদেরও অজেয় হইয়া উঠিয়াছেন। বিপন্নকে আশ্রয় দিয়া যে ধর্মাচরণ, তাহা শ্রীকৃষ্ণ অনুমোদিত। শ্রীকৃষ্ণ প্রারম্ভে সুভদ্রাকে উপদেশ দিয়াছেন—

"সার ধর্ম আশ্রিত পালন,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান।
যে বা দেয় অনাথে আশ্রয়,
চিরদিন গাই তার জয়,
বাঁধা রহি তার দয়া গুণে।"[৩৪]

ইহাই পাণ্ডব গৌরব নাটকের ভিত্তি। শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশিত এই ধর্মরক্ষণের জন্য সুভদ্রা পাণ্ডবগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। পাণ্ডবদের মধ্যে আশ্রিত রক্ষায় দ্বিধা নাই, কিন্তু বিবাদের সূত্রপাত তাঁহাদের পরম হিতৈষী ও সংকটত্রাতা শ্রীকৃষ্ণের সহিত। অভিশাপগ্রস্তা উর্বশীর ঘোটকীরূপ ধারণ ও অষ্ট বজ্র মিলনে শাপমুক্তি নাটকের কাহিনী অংশের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিলেও গিরিশচন্দ্র ইহার মধ্যে আপন উদ্দেশ্যকেই বড় করিয়া তুলিয়াছেন। ভগবানের পরাজয় ভক্তের নিকটেও হয়, তাহাতে ভগবানের মহিমা বৃদ্ধি পায়, ভক্তও গৌরবান্বিত হয়। পাণ্ডবরা এইরূপ ভক্ত। মহাদেবের সহিত সংগ্রামে ভীম ধর্মাচারী পাণ্ডবদের জয়ের কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন—

চক্রধর বারবার দেখায়েছ তরু,
ফল তাহে ফলেনি মুরারি।
ধর্মবলে ক্ষত্রকুলবলী,
দেবদলে দলি দেখাইবে ধর্মের প্রভাব।[৩৫]

পৌরাণিক নাটক হিসাবে পাণ্ডবগৌরব একটি সার্থক রচনা। শ্রীকৃষ্ণের আহ্ব'নে দেবকুল সমরে নামিয়াছেন। দেবতাদের রণ আয়োজন, বৃহত্তর কারণ ব্যপদেশে তাঁহাদের ব্যর্থতা নাটকে একটি অতিমানবিক পটভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। আবার এই পৌরাণিক পরিমণ্ডলে ইহার মানব রসও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কামনা ও ঈর্ষা প্রণোদিত দণ্ডীর চরিত্রে মানবিক উত্তাপ লক্ষ্য করা যায়। সুভদ্রা ও ভীম চরিত্র মানবিক সীমায় উচ্চতম আদর্শের পরিচয় দিয়াছেন। নাট্যকারের কল্পিত কঞ্চুকী চরিত্র অপূর্ব ধর্মপ্রাণতায় উভয় কোটির মধ্যে সংযোগ সেতু রচনা করিয়াছে।

মহাভারতের মূল কথার বহির্ভূ'ত কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্রকে লইয়া গিরিশচন্দ্র 'নল দময়ন্তী', 'বৃষকেতু' ও 'শ্রীবৎসচিন্তা' নাটক লিখিয়াছেন। নাটক হিসাবে এইগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, চরিত্র সংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলি নাটকীয় ভঙ্গীতে বিবৃত হইয়াছে মাত্র। তবে সব ক্ষেত্রেই শান্ত ও আনন্দময় পরিণতির দ্বারা নাট্যকার ইহাদের পৌরাণিক পরিমণ্ডলকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। 'নল দময়ন্তী'তে কলি দ্বারা নলের লাঞ্ছনা, 'শ্রীবৎসচিন্তা'য় শনির দ্বারা শ্রীবৎসর দুর্ভোগ এবং 'বৃষকেতু'র মধ্যে ছদ্মবেশী বিষ্ণু কর্তৃক দাতাকর্ণের দারুণতম পরীক্ষার মধ্যে নাটকীয় কৌতুহল বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে, আবার ইহাদের শান্তিময় পরিণামে নাট্যকার সেই সমস্ত কৌতুহলের স্বস্তিকর সমাপ্তিও টানিয়া দিয়াছেন।

পুরাণ কথা ।। পুরাণ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র কয়েকটি নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক মহিমা ও নাট্যধর্মে সমুজ্জল 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া 'ধ্রুব চরিত্র' ও 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকের মধ্যে তিনি পুরাণ প্রসিদ্ধ দুইটি ভক্ত চরিত্রের ভাগবত সাধনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রজাপতি দক্ষ ও সতীর পৌরাণিক কাহিনী লইয়া 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকটি রচিত হইয়াছে। মঙ্গল কাব্যের ধারায় বাংলার গার্হস্থ্য জীবনে লৌকিক শিব ও পৌরাণিক শিবের এক যুগ মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পৌরাণিক শিবের ধ্যান গম্ভীর রূপ সতী কাহিনী ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে আর লৌকিক রূপ শিব ও দুর্গার গার্হস্থ্য জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। তবে সব কাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, শিব ও দুর্গা বিশেষ মায়া সম্মোহিত হইয়া এই মর্ত্যজীবনের মাধুর্য ও বেদনা উপলব্ধি করিতেছেন। স্বরূপে তাঁহারা অভিন্ন—শিব ও শক্তির একীকরণ। গিরিশচন্দ্র দক্ষযজ্ঞে শিব মহিমার এই তাত্ত্বিক দিকটিকেই বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। মনোমোহনের 'সতী' নাটকে যে

মানবীয় রসের আধিক্য আছে, গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞে তাহা নাই। তাঁহার শিব ভোলানাথ, স্বরূপ ভুলিয়া, সাধনা ভুলিয়া তিনি মায়ার সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। মায়াতেই সৃষ্টি, প্রেমে সৃষ্টি। মায়াবশে জগজ্জননী সতীরূপে দক্ষগৃহে আবির্ভূতা হইয়াছেন। প্রেমে ও সাধনায় তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে লাভ করিয়াছেন। মহাদেব প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। দক্ষের ভ্রান্তি এইখানে। অহংকার প্রমত্ত হইয়া তিনি সৃষ্টিবিধানের নারী শক্তিকে অস্বীকার করিয়াই সৃষ্টি রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে প্রেম নাই, দম্ভ আছে, যে দম্ভ বিধাতা পুরুষের সৃষ্টি বিধাতাকেও পরিবর্তিত করিতে চায়। মহাযজ্ঞে দক্ষের এই ভ্রান্তির নিরসন ঘটিয়াছে। শিব সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—

আমি শিব, যে শক্তি অধীন,
সে শক্তি প্রভাবে যজ্ঞ করে দক্ষপতি,
যজ্ঞ হবে—যাবে অহংকার।
প্রেম, নহে অহংকারে প্রজা রবে ভবে,
ভ্রমে দক্ষ ভাবে
অহংকারে রবে ভবে জীব,
সে ভ্রান্তি ঘুচিবে,
প্রেমে রবে ধরা—যজ্ঞে হইবে প্রচার।[৩৩]

আলোচ্য নাটকে মহাদেব চরিত্রে যোগীশ্বর রূপই প্রকট হইয়াছে। তবে সতীর পিত্রালয় যাত্রা প্রসঙ্গে তাঁহার মানবিকতাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সতী দশ মহাবিদ্যার রূপ দেখাইয়া তাঁহার এই মানবমোহকে ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। একার্ণবে শক্তি সাধনার মন্ত্র ত ইহা ছিল না। স্নেহে প্রেমে যে বদ্ধতা, তাহাতে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সাময়িক মায়ার কাল বর্দ্ধিত হইলে সাধনায় শৈথিল্য আসে, উদ্দেশ্য গৌণ হইয়া যায়। সুতরাং পিত্রালয় যাত্রার অনুমতি প্রার্থনায় মায়ার আধার সতী দেহত্যাগের পূর্বভূমিকা রচনা করিয়াছেন। এইভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের দিক দিয়া সতী ও শিবের চরিত্র নাটকটিতে মূর্ত হইয়াছে। নাট্যকারের কল্পিত চরিত্র তপস্বিনী লৌকিক ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্বক্ষণ ইহার অন্তর্নিহিত ভক্তিরসকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছে।

দক্ষরাজ চরিত্রে নাটকীয় সংঘাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পৌরুষ ও অনমনীয় দৃঢ়তা সমূহ নীতি উপদেশকে তুচ্ছ করিয়া দিয়াছে। এই চরিত্রটির মধ্যে এক প্রকার ক্ল্যাসিক মহত্ব আছে। ভারতীয় পুরাণ কথায়

বিপথগামী এইরূপ চরিত্রই যুগে যুগে বিধাতার অকৃপা কুড়াইয়াছে। তথাপি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইহাদের শৌর্যবীর্য অসংনম্য দৃঢ়তায় ভাগবতী মহিমার পার্শ্বে উজ্জ্বল কলঙ্করূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেন না ইহাদেরই কেন্দ্র করিয়া মর্ত্যধামে বিধাতার মঙ্গল প্রসাদ বর্ষিত হইয়াছে।

পৌরাণিক আখ্যান উপাখ্যান লইয়া নাটক লিখিতে লিখিতে গিরিশচন্দ্র ক্রমশঃ একটি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ করিতেছিলেন। ইহার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মজীবনের স্তর পরিবর্তিত হইতেছিল। ভক্তিমার্গে যাত্রার এই প্রাথমিক স্তরে লিখিত হইয়াছে 'ধ্রুব' নাটক (১৮৮৩)। ইহাতে বিষ্ণু পুরাণান্তর্গত ধ্রুবের কৃষ্ণান্বেষণ ও সাধনার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। ধ্রুব যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছিল তিনি ত্রিভুবনের দেবকুলেরও আরাধ্য। ব্রহ্মা, মহাদেব, ঋষি সকলেই সেই দুর্লভ কৃষ্ণচরণের অভিলাষী। 'যে ভক্ত কৃষ্ণ কৃপা লাভ করিয়াছে, তিনিও আরাধ্য হইয়া যান। পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব এই আরাধ্য বৈষ্ণব। মহাদেব তাহাকে বলিয়াছেন "আমি যুগে যুগে ধ্যান করে পাই নে, হরিভক্তি আমায় দে, আমি তারে খুঁজি"।[৩৭] নারদও তাহার নিকট হরিপ্রেম ভিক্ষা করিয়াছেন—'হরিপ্রেম দে রে মোরে অবোধ বালক'। সর্বোপরি বিষ্ণু তাহাকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। পরমভক্ত ধ্রুব হরিগুণগানে নিখিলের পরিত্রাতা, মর্ত্য-লোকে ও ধ্রুবলোকে তাহার অক্ষয় আসন। নিরঙ্কুশ ভক্তিভাবের প্রকাশে ধ্রুব চরিত্র নাটকটি এককালে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল, তবে ইহার নাটকীয় আবেদন বিশেষ কিছু নাই। গিরিশচন্দ্র ইহার মধ্যে যেন শুধু হরিগুণগানের কথকতা করিয়াছেন।

বিষ্ণু পুরাণের প্রহ্লাদ কাহিনীকেও গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপ দিয়াছিলেন। ধ্রুব চরিত্রের মত প্রহ্লাদ চরিত্রও পুরাণে কৃষ্ণভক্তরূপে স্মরণীয় হইয়া আছে। সে যুগের নাট্যকারবৃন্দের অনেকেই ধ্রুব প্রহ্লাদের অনুপম কৃষ্ণপ্রেমকে নাটকে রূপায়িত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ কাহিনীর মধ্যে মানব রসের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত অধিক। হিরণ্যকশিপুর কৃষ্ণদ্রোহিতা ও পুত্র পীড়ন প্রহ্লাদের কৃষ্ণপ্রেম ও সহিষ্ণুতার সহিত একপ্রকার সংঘাতের সূচনা করিয়াছে। প্রহ্লাদের মাতা কয়াধুর মধ্যে মাতৃহৃদয়ের বেদনা অনুভূত হয়। তবে প্রহ্লাদের সর্বপ্লাবী কৃষ্ণময়তা সমস্ত নাট্যিক উৎকণ্ঠাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের প্রায় সমস্ত পৌরাণিক নাটক লিখিত হইয়াছে। শতাব্দীর শেষপাদের জীবনধারার সহিত এই নাটকগুলির একটি

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয়তাবোধের নূতন প্লাবন আসিয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে তখন ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রেরণা অনুভূত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রও এই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তবে তাঁহার পৌরাণিক চেতনাটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। বিংশ শতকের কোঠাতেও তিনি রচনা করিয়াছেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক 'তপোবল' (১৯১১)। রামায়ণের বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের বিবাদ কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে, তবে ইহার মধ্যে পরশুদ্ধ মানবতাবোধের উজ্জ্বল পরিচয় অঙ্কিত হইয়াছে। মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠায় তপোবলের মূল্য অপরিসীম, কৃচ্ছ্রতা ও সাধনায় যে কোন জাতি মনুষ্যত্বের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিতে পারে, এই মহৎ আশ্বাসবাণী আলোচ্য নাটকে উচ্চারিত হইয়াছে। 'তপোবল' নাটক লিখিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটক রচনার ব্রত উদযাপন করিয়াছেন। পৌরাণিক আখ্যানের রস পরিবেশন, পৌরাণিক আদর্শের সন্ধান, পৌরাণিক প্রজ্ঞা ও ভক্তিবাদের উপলব্ধি তাঁহার বিভিন্ন স্তরের পৌরাণিক নাটকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। একটি দৃঢ় প্রত্যয় চেতনা অনুকূল মনও শিল্পের আলোকে কিরূপ উজ্জ্বল বর্ণালী সৃষ্টি করিতে পারে, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি তাহার দৃষ্টান্ত।

গিরিশচন্দ্র ও পৌরাণিক প্রজ্ঞা ।। পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র ভাগবত ধর্মকেই বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সাধারণ বাঙ্গালীর মত শাক্ত ধর্ম ও সাধারণ দেবভক্তির কথাও বলিয়াছেন। তথাপি তিনি অধিকাংশ নাটকে কৃষ্ণ ভক্তিকেই মুখ্য করিয়া দেখাইয়াছেন। বৈষ্ণব ভক্তির ধারা বাংলা দেশে বহুদিন ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া এ দেশের চিত্তভূমিকে আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছে। পৌরাণিক চরিত্রে, প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে, ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে এই ভক্তির ধারা যুগ পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, সনাতনের মধ্য দিয়া এই ভক্তির বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত, বিষ্ণু পুরাণ, ভক্তি সূত্র, ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য দিয়া ইহা যুগান্তরের বাংলা দেশে সঞ্চারিত হইয়াছে। সর্বোপরি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উচ্ছ্বসিত প্লাবন দেশের জনজীবনকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র দেশজীবনের এই মহার্ঘ উত্তরাধিকারকে অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ কথার নাটকগুলিতে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট রামচন্দ্র নরচন্দ্রিমা হিসাবে গৃহীত হয় নাই বা শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক বীর নায়ক নহেন, তাঁহারা উভয়েই বিষ্ণু বিগ্রহ এবং তিনি ভক্তির বিম্বদলে তাঁহাদের চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন

করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা করিয়া তিনি স্বতন্ত্রভাবে 'দোল লীলা', 'ব্রজবিহার' ও 'প্রভাস যজ্ঞ' নামে আরও কয়েকটি নাটক লিখিয়াছিলেন। বাংলা দেশের কৃষ্ণায়ন কাব্যগুলির মত এই নাটকগুলিকে কৃষ্ণায়ন নাটক হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

এই ভক্তি ধর্ম গিরিশচন্দ্রকে সাধক করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার অবিশ্বাসী চেতনা আস্তিক্যবোধে সমাহিত হইয়া ভাগবত মহিমাকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছে। চিত্তের এই তুরীয় অবস্থায় তিনি অন্তর উৎসারিত ত্যাগমন্ত্র ও ভক্তি প্রণোদিত আত্ম সমর্পণের কথা বলিয়াছেন। চিরকালের ভক্তি শাস্ত্রের শেষ কথা আত্ম সমর্পণ। গিরিশচন্দ্রও সাধন জীবনের কথা বলিতে গিয়া এই আত্মসমর্পণের কথাই বলিয়াছেন—

ত্যজি সংসার আশ্রয়
পদাশ্রয় লয়েছি রে তাঁর
সে রাখে রহিব, মারে সে মরিব।
আমি অতি দীন, আমি অতি হীন।[৩৮]

ভক্তি ধর্ম ও আত্মসমর্পণ—পুরাণ চিন্তার এই রূপটি গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে ফুটাইয়াছেন।

অতঃপর গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক ধারণার সহিত আরও কয়েকটি তত্ত্বের সংযোজন করিয়াছেন। এগুলি তাঁহার গুরু কৃপার ফল। অধ্যাত্ম জীবনের নির্বেদ ও বৈরাগ্যের সহিত তিনি ক্ষমা, সেবা, মমতা, উদারতা প্রভৃতি মহৎ মানবিক গুণাবলীর সংযোজন করিয়াছেন। পৌরাণিক সংস্কৃতিকে শুধু নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার মধ্যে না রাখিয়া গিরিশচন্দ্র তাহাকে মানব সীমায় স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মানববিকতার মহিমা ঘোষণা করিতে গিয়া এই যুগে যে বিদ্রোহাত্মক জীবন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র সেদিকে লক্ষ্য না দিয়া মানবতাকে চারিত্রনীতির দিক হইতে জীবনে প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছেন। ইহা নবযুগের চাহিদা অনুরূপ পুরাতনের সহিত নূতনের সংযোগ নহে, পরন্তু চিরকালের চাহিদায় চিরন্তনের পুনর্ভাবনা। নব যুগের চিন্তা ও চেতনার পুনর্বিবেচনাকালে তিনি এই চারিত্র ধর্মগুলিকে মানব জীবনের শ্রেয়ো ধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সর্বশেষে বলা যায় তাঁহার পুরাণ প্রজ্ঞা ভাগবত ধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে পুষ্ট হইলেও ধর্ম সম্বন্ধে তাহা একটি সমদর্শিতার সন্ধান দিয়াছে। ভারতীয় পুরাণে

বিভিন্ন দেবতার প্রাধান্য পৃথকভাবে ঘোষিত হইলেও সেখানে একপ্রকার ধর্ম সমন্বয়ের কথাও উচ্চারিত হইয়াছে। আধুনিককালের প্রেক্ষাপটে গিরিশচন্দ্রও এইরূপ ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলিয়াছেন। ইহাও তাঁহার গুরু কৃপার অবদান। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'—চিন্তাকেই তিনি তাঁহার নাটকে সম্প্রসারিত করিয়াছেন। সেইজন্য নাটক রচনায় দ্বৈতবাদী ভক্তি সাধক চৈতন্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া শূন্যতাবাদী বুদ্ধ এবং অদ্বৈতবাদী শঙ্কর পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হইয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের সমকালীন নাট্যকারবৃন্দ ॥ গিরিশচন্দ্রের সমকালীন নাট্যকারবৃন্দের মধ্যে অতুলকৃষ্ণ মিত্র এবং বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায় তাঁহার পৌরাণিক নাটকের ধারাটি সার্থকভাবে বহন করিয়াছেন। অন্যান্য শক্তিশালী নাট্যকারদের মধ্যে অমৃতলাল বসু ও অমরেন্দ্র দত্ত নাটকের অন্যান্য শাখায় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহারাও দুই একটি পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছিলেন; তবে ইঁহাদের নাটকীয় প্রবণতা কিছুটা বাস্তবমুখী থাকায় পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে তাঁহারা ততটা সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

পৌরাণিক নাটক ও পৌরাণিক বিষয়ের গীতিনাট্যে অতুলকৃষ্ণ সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের মত তিনিও কয়েকটি রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বিশেষভাবে এমারেল্ড থিয়েটারে তাঁহার অধিকাংশ নাটক মঞ্চস্থ হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তিনি নাট্যজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মত উজ্জ্বল প্রতিভা তাঁহার ছিল না। বিশেষতঃ পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের যে ভাবতন্ময়তা ও প্রত্যয় বোধ ছিল, অতুলকৃষ্ণ তাহার কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্য দিয়া কোন একটি বক্তব্য পরিস্ফুট হয় নাই, কেবলমাত্র কতকগুলি পৌরাণিক বিষয়কে তিনি নাটকে রূপায়িত করিয়াছেন। আবার সঙ্গীতের দিকে বেশী ঝোঁক থাকায় তাঁহার নাটকে নাটকীয়তা অপেক্ষা গীতিময়তাই প্রবল ছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি মনোমোহনের অপেরা বা গীতাভিনয়ের ধারাটিকেই পুষ্ট করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার সমকালীন নট ও নাট্যকারের উক্তি গ্রহণযোগ্য: "অতুলবাবুর অপেরা লিখিবার হাত ছিল খুব ভাল। তিনি শিরী-ফর্হাদ হইতে আরম্ভ করিয়া মিনার্ভায় যে কয়খানি বই দিয়াছিলেন তার একখানিও 'ফেল' হয় নাই। ভাল অপেরা ভালভাবে অভিনীত হইলে, সে যে ষ্টেজ জমানো নাটকের মতই অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে যুগে লিখিত অতুলবাবুর গ্রন্থগুলি।"[৩২]

গিরিশচন্দ্রের মত অতুল কৃষ্ণও তাঁহার নাটকে কৃষ্ণ কথাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। আবার তাঁহার নিকট মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বেশী আকর্ষণীয় হইয়াছে। এই জন্য কৃষ্ণের ব্রজলীলা জ্ঞাপক কাহিনীই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রজভূমি ও কৃষ্ণলীলার নাটক লিখিতে গিয়া স্বাভাবিকভাবেই তিনি গীতিনাট্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর নাটক হইল 'প্রণয় কানন' বা 'প্রভাস', 'নন্দোৎসব গীতিকা' ও 'গোপীগোষ্ঠ'। 'নন্দ বিদায়' ও 'নিত্যলীলা' নাটকে কৃষ্ণ-কথা উপজীব্য হইলেও এই দুইটিকে তিনি পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকের আকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও মথুরালীলাকে ভিত্তি করিয়া 'নন্দ বিদায়' নাটকটি রচিত। ব্রজভূমিতে কৃষ্ণ-বলরাম মাধুর্যকে প্রকাশ করিয়াছেন আর মথুরায় কংস নিধনকল্পে তাঁহারা ঐশ্বর্য রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে তাঁহাদিগকে শাস্তা ও পালকরূপে দেখা যায়। মথুরার ভক্তকুলকে তাঁহারা একের পর এক উদ্ধার করিতেছেন। পিতা মাতার বন্ধন মুক্তি, কুব্জার কৃপা, অক্রূর ও অন্যান্য ভক্তদের বাঞ্ছা পূরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবৎসল নাম সফল হইয়াছে। অতঃপর মথুরায় তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য হইয়াছে কংসের নিধন ও রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন। মথুরা লীলার এই প্রেক্ষাপটে ব্রজ ভূমির নিঃসীম শূন্যতা নাটকে আভাসিত হইয়াছে। যশোদা ও গোপিকাকুলের ত কথাই নাই, নন্দ-উপানন্দের মত পুরুষেরাও কৃষ্ণ বিহনে আকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা লীলার একটি অংশ অবলম্বন করিয়া 'নিত্যলীলা' বা 'উদ্ধব সংবাদ' নাটকটি রচিত। কংস নিধনান্তে শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসন প্রদান করিয়া রাজকার্য তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মগধরাজ জরাসন্ধ জামাতৃনিধনের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প। যুদ্ধে পরাজিত জরাসন্ধ বন্দী রূপে কৃষ্ণ সমীপে আনীত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। অপমানাহত জরাসন্ধ মনঃক্ষোভে চলিয়া গেলেন। মথুরার রাজকার্যে ব্যস্ত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। ভক্ত অনুচর উদ্ধব ব্রজ ভূমি পরিক্রমা করিয়া সেখানকার বেদনা কৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন। গোকুলের হাহাকার রব উদ্ধব বহন করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীরাধা মনোবেদনায় কাত্যায়নী সমক্ষে আত্মহত্যা করিতে উদ্যতা। মাতা কাত্যায়নী তখন কৃষ্ণকে রাধিকার নিকট আনিয়া দিলেন। তাঁহাদের এই যুগল রূপ অভিন্ন হইবার নহে। রাধা মাধবের এই নিত্যলীলা চিরকাল চলিবে।

কৃষ্ণ কথার এই নাটকগুলিতে ভাগবতের কৃষ্ণলীলা কিংবা পদ্ম পুরাণ বা ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণের রাধা বিবরণ যে সচেতনভাবে অনুসৃত হইয়াছে এমন নহে। ভাগবতের কৃষ্ণ কথা ও অন্যান্য পুরাণের রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনী যে লোকপ্রচলিত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, অতুলকৃষ্ণ তাহাকেই ভিত্তি করিয়া নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন। বিশেষভাবে কৃষ্ণের মথুরাগমনের পর ব্রজে যে বেদনায় বর্ষা নামিয়াছিল, অতুলকৃষ্ণ সেই বেদনাকেই নাটকের অঙ্গীরস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আবার ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই বিরহের পরে চিরন্তন মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যের এই পরিচিত ও সাধারণ দিকটিই অতুলকৃষ্ণ তাঁহার নাটকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং এই নাটকগুলিকে ঠিক পুরাণ কাহিনীর অনুবৃত্তি বলা যায় না, এগুলিকে ভক্ত ভাবনায় রাধাকৃষ্ণের লীলা কথন বলাই সঙ্গত।

অতুলকৃষ্ণের মহাভারতী কথার নাটকগুলি হইল 'আদর্শ সতী' ও 'ভীষ্মের শরশয্যা'। 'আদর্শ সতী' সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী লইয়া রচিত। কাহিনীর নাট্যরূপ ছাড়া ইহার বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছুই নাই, তবে পৌরাণিক নাটক হিসাবে ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা। 'ভীষ্মের শরশয্যা' তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব ও ভীষ্ম পর্ব হইতে নির্বাচিত কয়েকটি ঘটনা লইয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে। কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যকার্য হইতে আরম্ভ করিয়া ভীষ্মের শরশয্যা পর্যন্ত কাহিনী ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। কাহিনীর মূল কেন্দ্র ভীষ্মের পতন বলিয়া নাট্যকার অন্যান্য ঘটনাকে খুব বেশী বিস্তৃত করেন নাই। এই দিক দিয়া তাঁহার নাটকটি রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ভীষ্মের শরশয্যা' নাটক হইতে বহুল পরিমাণে সংহত। তাঁহার অন্যান্য নাটকের মত ইহা গীতিপ্রধান নহে, গতি প্রধান। পাণ্ডব ও কৌরব শিবিরের যুদ্ধ মন্ত্রণা, উভয় পক্ষের রণসজ্জা, উভয় কুলের রথী মহারথীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রারম্ভিক ঘটনাবলী ইহাতে নাটকীয় ভঙ্গীতে বিবৃত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র ভীষ্মের মধ্যে ধর্মপরায়ণতা ও কর্তব্য বোধ দুইটি দিকই মহাভারতের আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা যথারীতি থাকিলেও কৃষ্ণময়তা নাটকীয় গতিকে একেবারে সমাচ্ছন্ন করে নাই। মুমূর্ষু ভীষ্ম সকাশে পুত্র শোকাতুর ভাগীরথীর করুণ ক্রন্দনে লেখকের কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের অন্যত্র মূল মহাভারতের কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদের পরিবর্তে নাট্যকার একেবারে কর্ণ-কুন্তী সংবাদ পরিবেশন করিয়া একটি স্বতন্ত্র নাটকীয় আবেদন সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন।

নাটকটি অভিনব কিছু না হইলেও মহাভারতী মহানায়কের উজ্জ্বল চরিত্রাঙ্কন হিসাবে সুন্দর ও উপভোগ্য হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের উত্তর সাধক রূপে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যান্য শাখায় কিছু নাটক লিখিলেও পৌরাণিক নাটকের মধ্যেই তাঁহার সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে গিরিশ-চন্দ্রের খর প্রতিভার সম্মুখে তাঁহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু লক্ষ্য করা যায় না। বিষয় নির্বাচন ও চরিত্র চিত্রণেও তিনি খুব বেশী মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তৎকালীন নাট্যকারদের গৃহীত বিষয়বস্তু লইয়াই তিনি অধিকাংশ নাটক রচনা করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের লোকপ্রচলিত আখ্যান উপাখ্যানই তাঁহার নাটকের উপজীব্য।

রামায়ণ শাখায় তাঁহার উল্লেখযোগ্য নাটক হইল 'রাবণ বধ' ও 'সীতা স্বয়ম্বর'। গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ বধ' নাটক হইতেই তিনি 'রাবণ বধ' নাটক লিখিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার উৎসও কৃত্তিবাসী রামায়ণ। রাম-রাবণের সংগ্রাম দিয়াই তিনি নাটক আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংগ্রামে রাবণের বীরত্ব দেখিয়া রাম আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ অভয়া স্বয়ং রক্ষোরাজকে রক্ষা করিলে রামচন্দ্রের সমস্ত আশা নির্মূল হইল। বিহারীলাল রামের অভয়া আরাধনায় নূতনত্ব আনিয়াছেন। ব্রহ্মার স্থানে নারদ ও পর্বত মুনি আসিয়া রামকে অম্বিকা পূজার নির্দেশ দিয়াছেন। আবার এই নারদ রাবণের নিকট গিয়া তাঁহাকে অম্বিকার কৃপা বঞ্চিত করিয়াছেন। রাবণ বধের অন্যান্য প্রস্তুতি কৃত্তিবাস আহৃত। চরিত্রের দিক দিয়া তিনিও রাবণকে পরম ভক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কৃত্তিবাসের সহজ ভক্তিবাদ এখানে আরও উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছে। তাঁহার রাবণ উচ্চশ্রেণীর ভক্ত ও দার্শনিক। অন্তিমকালে শ্রীরামের উদ্দেশ্যে তিনি ভক্তি নিবেদন করিতেছেন :

আরাধি না পায় যাঁরে সুরাসুর নরে,
হেন লক্ষ্মী বাঁধা মোর অশোক কাননে।
জ্ঞান যোগে ধ্যানে ধরি যে চরণ যুগ,
প্রাণ অন্ত করে সাধু যোগী ঋষি সব,
সেই চিন্তামণি মোরে চিন্তে অবিরাম
এ হ'তে আমার ভাগ্যে আরকি হইবে ?[৮০]

গিরিশচন্দ্রের মত তিনিও রাবণ বধের অনুক্রমণিকা টানিয়াছেন। সীতার

অগ্নি পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া তিনিও নাটকটিকে কেন্দ্রচ্যুত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ভ্রাতা, মিত্র ও অনুচর বর্গের মধ্যে যথাবিহিত প্রীতি ও কৃপা বিতরণ করিয়া রামচন্দ্রের যে বিজয়োৎসব সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা রাবণ বধের বিষাদ-করুণ ফলশ্রুতি হইতে বহু দূরবর্তী।

রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্র উভয়েই সীতা বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া নাটক লিখিয়াছেন। বিহারীলালও তাঁহাদের পথ অনুসরন করিয়া 'সীতা স্বয়ম্বর' নাটকটি রচনা করিয়াছেন। কাহিনী বিন্যাসে ইহার নূতনত্ব কিছুই নাই, রামের কৈশোর জীবনের কীর্তিকথাগুলি একের পর এক বিবৃত হইয়াছে মাত্র। হরধনু ধারণ করিয়া সীতার নিত্যদিনের গৃহমার্জনা নাট্যকারের নূতন কল্পনা। ইহার দ্বারা সীতা চরিত্রের অলোকসামান্যতার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অহল্যা উদ্ধারের আলোকে রামচন্দ্রের নারায়ণ রূপটি নাট্যকার বিশেষভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

মহাভারতী আখ্যান লইয়াই বিহারীলাল সর্বাপেক্ষা বেশী নাটক লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'পাণ্ডব নির্বাসন', 'দুর্যোধন বধ', 'ভীষ্ম মহিমা', 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর', 'রাজসূয় যজ্ঞ', 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মহাভারতের সভাপর্বের প্রাসঙ্গিক ঘটনা লইয়া "পাণ্ডব নির্বাসন" নাটকটি রচিত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দেখিয়া অসূয়া আক্রান্ত দুর্যোধন পাণ্ডবদের নিগ্রহ করিবার জন্য মাতুল শকুনির পরামর্শে যে দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার ফলস্বরূপ পাণ্ডবদের সর্বস্ব হারাইতে হয়। সভাস্থলে দ্রৌপদীর নিগ্রহ ইহার চরম ফল। দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবদের অদৃষ্টে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস ঘটে। এই ঘটনাধারায় দুর্যোধনের দম্ভ, দুঃশাসনের পাপাচরণ ও পাণ্ডব ভ্রাতাদের অসীম ধৈর্য মহাভারত-নির্দিষ্ট ধারায় নাটকে অঙ্কিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়ার প্রাক্কালে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে গান্ধারীর আবেদন এক অশুভ ভবিতব্যের ইঙ্গিত করিয়াছে। গান্ধারীর ঔদার্য ও মহত্বকে নাট্যকার পূর্ণ মর্যাদায় রক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার পরাভূত পাণ্ডবদের বনবাস যাত্রার চিত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ভীমার্জুনের কঠোর প্রতিজ্ঞা, কুন্তীর দুশ্চিন্তা, পুরবাসিনীগণের করুণ ক্রন্দন ও সর্বোপরি যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য ও সত্যনিষ্ঠা পাণ্ডব নির্বাসনের যথাযোগ্য প্রতিক্রিয়া রূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

বাংলা নাটকের আদি যুগে রচিত হরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরব বিয়োগে'র মত বিহারীলাল 'দুর্যোধন বধ' নাটক রচনা করিয়াছেন। কুরুপতি দুর্যোধনের অন্তিম জীবনের বিষাদকরুণ কাহিনী ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতের শল্য পর্ব,

সৌপ্তিক পর্ব ও স্ত্রী পর্ব হইতে প্রাসঙ্গিক ঘটনা চয়ন করিয়া ইহার আখ্যানভাগ গঠিত হইয়াছে। দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্যোধনের আত্মগোপন হইতে সমন্তপঞ্চকের গদাযুদ্ধে তাঁহার উরুভঙ্গ পর্যন্ত ঘটনাবলী নাটকের প্রথম ধারারূপে গৃহীত হইতে পারে। দ্বিতীয় ধারায় অশ্বত্থামার পাণ্ডব বধ প্রতিজ্ঞা এবং পাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নিধন সংঘটিত হইয়াছে। তৃতীয় ধারায় দুর্যোধনবধের প্রতিক্রিয়ায় ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর বিলাপ ও বেদনার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাভারতের এই অংশে সমস্ত প্রধান চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁহাদেরই চারিত্র ধর্ম এই ক্ষয়-ক্ষতি ও বেদনার মধ্যে যথার্থ রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। নাট্যকার এই চরিত্রগুলিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়াছেন। ক্ষত্রোচিত ঔদার্য, রাজোচিত মহিমা ও অসংনম্য দৃঢ়তায় দুর্যোধন চরিত্র ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই আলোকোজ্জ্বল। স্বজন পরিবৃত হইয়া মহাভোগে তিনি জীবন কাটাইয়াছেন, ক্ষত্রিয় সুলভ মৃত্যুতে আজ তিনি অমরাবতী যাত্রা করিতেছেন, কুরু বিধবাদের হৃদয়োত্থিত ক্রন্দনধ্বনি যুধিষ্ঠিরকে নিত্যদিন ব্যঙ্গ করিবে—জীবন ও মৃত্যুর এই মহাসাকল্যে তাঁহার অগৌরব কিছু নাই। দুর্যোধনের মৃত্যু ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর উদার সমদর্শিতাকেও শিথিল করিয়া দিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের লৌহ ভীমের আলিঙ্গন ও গান্ধারীর কৃষ্ণকে অভিশাপ পুত্রশোকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রূপে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গান্ধারীর অভিশাপকে নাট্যকার আরও ব্যাপ্তি দিয়াছেন। যুগ যুগান্তের সতীকুল প্রিয় বিচ্ছেদের কারণ রূপে নর-নারায়ণকে অভিশাপ দিয়াছে। গান্ধারী তাঁহাদের ধারায় আজ কৃষ্ণকে যদুবংশ ধ্বংসের অভিশাপ দিয়াছেন। চরিত্রের উজ্জ্বলতায় এবং ভাবগাম্ভীর্যে 'দুর্যোধন বধ' একটি প্রথম শ্রেণীর নাটক রূপে গৃহীত হইতে পারে।

আদি পর্বের ভীষ্ম কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'ভীষ্ম মহিমা' নাটকটি রচিত। শাপভ্রষ্ট বসুরূপে গঙ্গাগর্ভে ভীষ্মের জন্ম, তাঁহার সিংহাসন ত্যাগ ও কৌমার্য গ্রহণের ভীষণ প্রতিজ্ঞা, কাশীরাজ কন্যাদের বিচিত্রবীর্যের জন্য বল-পূর্বক হরণ, জ্যেষ্ঠা রাজকন্যা অম্বার শাল্বরাজকে পতিরূপে প্রার্থনা ও ব্যর্থতা, পরশুরামের নিকট অম্বার প্রতিকার প্রার্থনা ও পরশুরামের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ-কাহিনী আলোচ্য নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। ভীষ্ম-জীবনের ধর্মপরায়ণতা ও কঠোর কর্তব্যবোধ এক একটি ঘটনায় প্রকাশিত হইয়াছে। পরশুরামের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ নাটকের প্রধান আকর্ষণ। তাঁহার সত্যনিষ্ঠাকে মর্যাদা দিতে [illegible]

পরশুরাম আপন পরাভব মানিয়া লইয়াছেন। যে জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহ আপন মহিমায় মহাভারতের পৃষ্ঠায় উজ্জল হইয়া আছেন, তাঁহার প্রথম পরিচয় নাট্যকার সাফল্যের সহিত অঙ্কন করিয়াছেন।

'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' নাটকের কাহিনীও আদি পর্ব হইতে গৃহীত। বারণাবত নগরে জতুগৃহদাহ হইতে পঞ্চাল নগরে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর পর্যন্ত ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। নাটকের দুইটি অংশে যথাক্রমে ভীম ও অর্জুনের প্রাধান্য দেখা যায়। জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ, সুড়ঙ্গ পথে পাণ্ডবদের পলায়ন, অগ্নিশিখায় মন্ত্রী পুরোচনের মৃত্যু, হিড়িম্বা প্রসঙ্গ, বকরাক্ষস নিধন প্রভৃতি ঘটনাগুলিতে ভীমের পরাক্রম প্রকাশ পাইয়াছে। নাটকের দ্বিতীয় ধারায় দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনের বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ছদ্মবেশী অর্জুনের বাণ দ্বারা গুরুপদ বন্দনা সুন্দর হইয়াছে। পাঞ্চালীর পঞ্চস্বামী লাভের বিবরণটি নাট্যকার আড়ম্বরের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিবাহে মহাভারতের ব্যাস বিধানের সহিত তিনি কাশীরাম অনুরূপ অগস্ত্যের সমর্থনও যোগ করিয়াছেন। তবে নাটকটি একান্তই ঘটনাপ্রধান। পাণ্ডবদের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত কীর্তি ও সাফল্যের বিবরণ ছাড়া ইহার মধ্যে আর কিছুই নাই।

মহাভারতের সভাপর্ব হইতে 'রাজসূয় যজ্ঞের' কাহিনী গৃহীত।, ভীম কর্তৃক মগধ রাজ জরাসন্ধের নিধন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞায়োজন, যজ্ঞ সভায় চেদীশ্বর শিশুপালের কৃষ্ণ ও ভীষ্ম নিন্দা এবং পরিশেষে সুদর্শন চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তকচ্ছেদন বিবরণ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইযাছে। যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এই রাজসূয় যজ্ঞের উদ্দেশ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বই সূচিত হইয়াছে। নাটকের গতিধারা কৃষ্ণ কেন্দ্রিক করিয়া নাট্যকার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। ঘটনা বিবরণ কাশীরাম দাস হইতেই সংগৃহীত। কাশীরাম এই কাহিনীর মধ্যে যে লঙ্কেশ্বর বিভীষণের উপস্থিতি ঘটাইয়াছেন, বিহারীলাল তাহাও বাদ দেন নাই। নাটকের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশ হইল ভীষ্ম-শিশুপাল বাদানুবাদ। এই তপ্ত বিতর্কের মধ্যে একদিকে যেমন শিশুপালের সুপ্ত প্রতিহিংসা ও জঘন্য কৃষ্ণদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে ভীষ্মের কৃষ্ণ প্রেম ও কর্তব্যবুদ্ধির যথার্থ পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। কৃষ্ণের বিরাট রূপ ধারণ ও শিশুপাল বধের মধ্যে নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। মহাভারতে উল্লেখ, চেদীশ্বর নিহত হইলে তাঁহার পুত্রকে রাজা করিয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সমাপ্ত করা হইয়াছে। বিহারীলাল ততদূর অগ্রসর হন নাই। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সম্পূর্ণ বিবরণ আলোচ্য নাটকে নাই।

মহাভারতী ঘটনার অনেক পরে রাজা পরীক্ষিতের কাহিনী। মহাভারতী কথা বিবৃত করিতে গিয়া সৌতি এই কাহিনীকে প্রথম দিকে ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজা পরীক্ষিতের পবিত্র জীবনকথা লইয়া বিহারীলাল 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' নাটকটি রচনা করিযাছেন। পরীক্ষিতের মৃগযা, ধ্যানস্থ শমীক মুনির সহিত সাক্ষাৎ ও আতিথেয়তার ত্রুটিতে তাঁহার গলদেশে মৃত সর্প বেষ্টন, শমীক পুত্র শৃঙ্গীর অভিসম্পাত প্রদান ও পরম ভাগবত পরীক্ষিতের সহিষ্ণুতার সহিত সেই মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ—পরীক্ষিত জীবনের এই ঘটনাগুলি নাটকে বিধৃত। কলির বিবরণ ইহাতে নাট্যকারের মৌলিক সংযোজনা। পরীক্ষিৎকে কলির শাস্তা হিসাবে অঙ্কন করিয়া নাট্যকার তাঁহার মহত্ত্ব আরও বর্ধিত করিয়াছেন। নাটকের প্রথম হইতেই তাঁহার চরিত্র মাধুর্য পরিস্ফুট হইয়াছে। তপস্বী শমীকের প্রতি অশোভন আচরণ করিয়া তিনি অনুতপ্ত এবং গৌরমুখ তাপসের মুখে শৃঙ্গীর অভিশাপ শ্রবণ করিয়া কাল-মুহূর্তের জন্য চিত্ত শুদ্ধিতে রত। উত্তরার বেদনাহত মাতৃত্বের প্রকাশ অতি সুন্দর হইয়াছে। মাতৃত্বের দৃষ্টিতে তিনি নারায়ণের নরলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"কৃষ্ণ যখন যারে মা বলে ড'কেন তাকেই হা পুত্র হা পুত্র বলে কাঁদতে হয়।"[৪১] নাটকটির সর্বত্র কৃষ্ণপ্রেমের ফল্গু ধারা প্রবাহিত। পরীক্ষিতের মত শ্রোতার নিকট শুকদেবের ভাগবত পাঠ এই কৃষ্ণময়তাকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে।

কৃষ্ণ কথা লইয়া অতুলকৃষ্ণের মত বিহারীলালও 'নন্দ বিদায' ও 'প্রভাস মিলন' নামে দুইটি নাটক রচনা করিয়াছেন। 'ব্যাস কাশী' নাটকে ব্যাসের দ্বিতীয় কাশী প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টা রূপায়িত হইযাছে। এগুলি যথার্থ পুরাণ কথা নহে, কৃষ্ণ কথা বা শিব কথার লোক বিবরণ মাত্র। পুরাণ প্রসঙ্গে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা হইল 'বাণ যুদ্ধ' নাটক। বিষ্ণু পুরাণের উষা অনিরুদ্ধের প্রণয় কাহিনী এই নাটকের বিষয়বস্তু। বলি রাজার দর্পচূর্ণের মত বলি পুত্র বাণের দর্পচূর্ণও শ্রীকৃষ্ণের এক মহৎ কীর্তি। শিব উপাসক বাণের সহিত বিষ্ণুর সংগ্রাম সুরু হইয়াছে। বাণ কন্যা উষা ও শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধের মিলন ব্যপদেশে বাণের কৃষ্ণবৈরিতা প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্ত বিনোদ মহেশ্বর বাণকে রক্ষা করিতে আসিয়া কৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ত্রিলোকের দেবকুল এই মহারণে ত্রস্ত হইযা উঠিয়াছেন। পরিশেষে ব্রহ্মা হরিহরের অভিন্নতা জ্ঞাপন করিয়া এই যুদ্ধের নিবৃত্তি ঘটাইয়াছেন। বাণ যুদ্ধের কেন্দ্রীয ঘটনা উষা-অনিরুদ্ধের মিলন হইলেও নাট্যকার ইহার গূঢ়ার্থ হরিহরের অভেদ প্রমাণের দিকে সবিশেষ

লক্ষ্য দিয়াছেন। মহাদেব নির্দেশে বাণের ভেলজ্ঞান লুপ্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মহাকাল রূপে প্রমথগণের শীর্ষদেশে স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন পুরাণ কাহিনীর সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শটি নাট্যকার আলোচ্য নাট্যকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

গিরিশ প্রভাবিত নাট্যকার অমৃতলাল বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকটি ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে রচিত। তবে এই নাটকখানি আদৌ তাঁহার রচনা নহে বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; তাঁহার মতে ইহা নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্নের রচনা।[৪২] যাহা হউক আলোচ্য নাটকটি হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর উপর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। হরিশ্চন্দ্রের পৌরাণিক কাহিনী ইহার বিষয়বস্তু হইলেও ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' নাটক বা মনোমোহনের হরিশ্চন্দ্র নাটক ইহার গঠন বিন্যাসে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য নাটকের কাহিনী বিন্যাসে একটু নূতনত্ব আছে। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কোন এক চণ্ডাল যজ্ঞের ব্যর্থতার ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছেন। তখন তিনি ধর্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্য পোষণ করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ত্রিবিদ্যা সাধনা করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন। পরবর্তী অংশ চণ্ডকৌশিকের অনুরূপ। বিঘ্নরাজ হরিশ্চন্দ্রকে দিয়া তাঁহার যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইতে চাহিয়াছেন। বরাহরূপ ধারণ করিয়া তিনি মৃগয়াসক্ত রাজাকে তপোবনে টানিয়া আনিয়াছেন। মনুষ্যের উপস্থিতি বিশ্বামিত্রের আহুতি ব্যর্থ করিয়া দিল, ত্রিবিদ্যা মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিতা হইলেন। কুপিত বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের প্রস্তাবিত ক্ষত্রোচিত কর্তব্যের পরীক্ষাকল্পে তাঁহাকে পৃথিবী দানের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। উপসংহারে নাট্যকার বিশ্বামিত্রের আত্মসংশয়ের মীমাংসা ঘটাইয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগে হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পরোক্ষ ভাবে ধর্মেরই জয় ঘোষিত হইয়াছে। বিশ্বামিত্র বলিতেছেন—"ধর্ম তুমি আছ, আমি বলছি তুমি আছ। ফলটা অনেক সময় অপ্রত্যক্ষভাবে দাও, কিন্তু আছ। বিশ্বামিত্র দর্পী কিন্তু মুক্ত কণ্ঠে, তুমি সত্য সত্যই আছ।"[৪৩] এইভাবে হরিশ্চন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বামিত্রেরই এক মহৎ পরীক্ষা সংসাধিত হইয়াছে।

এইজন্যই বোধকরি নাটকের ঘটনাধারা হরিশ্চন্দ্র চরিত্রকে ততখানি উজ্জ্বল করিতে পারে নাই, পরন্তু বিশ্বামিত্রই যেন বহুলাংশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও হরিশ্চন্দ্র ত্যাগের মহিমা সম্যক বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার স্মৃতি চারণা তাঁহাকে অহরহ বিচলিত করিয়াছে। সে তুলনায় শৈব্যা

চরিত্র বহুলাংশে সজীব ও প্রাণবন্ত। রোহিতাশ্বের লঘু চরিত্রে অনেক ক্ষেত্রে গুরু বক্তব্য আরোপিত হইয়া নাটকের গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তবে ইহার বিশ্বামিত্র চরিত্রটি অপূর্ব। এখানে বিশ্বামিত্র সর্বদা চণ্ডকৌশিক নহেন, তিনি কর্মফল বিশ্বাসী এক মহ্যমান তপস্বী। হরিশ্চন্দ্রের দুঃখভোগকে তিনি অমোঘ কর্মফল বলিয়া মনে করেন—"তপ যপ যাই করি, কর্মফল যাবার নয়। হরিশ্চন্দ্রের কর্মফল দুঃখভোগ, আমার কর্মফল দুঃখদান।"[৪৪] এইজন্য তাঁহার চরিত্রে অবিমিশ্র কঠোরতা নাই, অহেতুক পীডন প্রভৃতি নাই। দক্ষিণা সংগ্রহের সময়েই শৈব্যার আত্মোৎসর্গে তিনি বিচলিত, প্রজা সন্তোষে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি। এই দুরূহ পরীক্ষার মধ্যে তিনি নিজেই বিচলিত—নির্বেদ বৈরাগ্যেব আরাধনায় হরিশ্চন্দ্রই বুঝি সফল হইযাছেন আর তাঁহার তপস্যা বিমুখ জীবন, রাজত্ব ঐশ্বর্যের কুম্ভীপাকে জডাইয়া পডিতেছে। আলোচ্য নাটকে বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের ধর্মোপাসনায় সার্থক তন্ত্রধারকরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র শিষ্য কামন্দক চরিত্র নাট্যকারের মৌলিক কল্পনা। মনোমোহনের হরিশ্চন্দ্র নাটকের পাতঞ্জল চরিত্রের প্রভাব যে ইহার উপর আসিয়া পডিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে রচিত আরও অনেকগুলি পৌরাণিক নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। মদনমোহন মিত্রের 'বৃহন্নলা নাটক' (১৮৭৪), প্রমথনাথ মিত্রের 'বীর কলঙ্ক নাটক' (১৮৭৭), রাধামাধব হালদারের 'শৈব্যাসুন্দরী' (১ ৭৬), রাধাবিনোদ হালদারের 'নাগযজ্ঞ' (১৮৬৬), ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী ভট্টাচার্যের 'কীচকবধ' ও 'দুর্যোধন বধ', নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সতী কি কলঙ্কিনী' (১৮৭৪), রাধানাথ মিত্রের 'শ্রীবৎস চিন্তা' (১২৯১), ভবনকৃষ্ণ মিত্রের 'ধর্মপরীক্ষা' (১৭৮৬), নন্দলাল রায়ের 'অর্জুনবধ' (১৮৭৯), চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিন্ধুবধ' (১৮৭৯), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জয়দ্রথ বধ' (১৮৮৪), রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভরত বিলাপ নাটক' (১৮৮৪), অঘোরনাথ তত্ত্বনিধির 'সতী বিয়োগ নাটক' (১২০৯), প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চম বেদ বা মহাভারত নাট্যকাব্য' (১৮৮৯) প্রভৃতি ভূরিপ্রমাণ নাট্য সাহিত্য এই অধ্যায়ে রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী লইয়া রচিত হইয়াছে।[৪৫] লেখকদের বৈশিষ্ট্যে বা রচনারীতির কোন নৈপুণ্যে এই নাটকগুলি সাহিত্যে স্মরণীয় হয় নাই, তবে এতগুলি নাটক যেখানে রচিত হইয়াছে, তাহার

পশ্চাদবর্তী সমাজ মানসের দৃষ্টিভঙ্গীটি সহজে অনুমেয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনর্বিচার কালে আমাদের জীবনচিন্তার আদি উৎসকে সাগ্রহে বরণ করা হইয়াছে। যে কথা ও কাহিনী, চরিত্র ও কীর্তিরাজি অতীতের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহাদিগকে আর একবার জাতির সমক্ষে উৎস্থাপিত করা হইয়াছে। পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের এই শাশ্বত আবেদনেই শ্রেষ্ঠ ও সাধারণ লেখক নির্বিশেষে সকলকে দৃশ্যকাব্য রচনায় এতখানি প্রবর্তনা দিয়াছে এবং দর্শক সাধারণও কোনরূপ শিল্পোৎকর্ষের অপেক্ষা না রাখিয়া বিপুল মানসিক তৃপ্তিতে ইহাদের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকের ধারা ক্রমে বিংশ শতাব্দীর দিগন্ত-স্পর্শ করিয়াছে। তবে জীবন জিজ্ঞাসা ও সমাজ চেতনার দ্রুত পরিবর্তনে এই নাটকের অন্তর ও আঙ্গিকে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নবযুগের মানবতা-বোধ যখন সাহিত্য ও জীবনের সকল দিকে সম্প্রসারিত হইয়েছে, তখন স্বাভাবিকভাবে নাট্যসাহিত্যও বাস্তবমুখী হইয়াছে। পৌরাণিক নাটকের অলৌকিকতা ও অতিমানবিকতা এইজন্য শিথিল হইয়া যায় এবং তাহার স্থানে মানবিক জিজ্ঞাসার সবল পদক্ষেপ ঘটে। বিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকগুলি এইরূপ মানব রসে সম্পৃক্ত, মানবিক স্নেহ মমতা ও বিচারবোধে ইহাদের ঘটনাগুলি পুনর্বিন্যস্ত ও চরিত্রগুলি পুনর্বিবেচিত। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' বা 'ভীষ্মে' এইরূপ দৈব নিরপেক্ষ মানবিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। তথাপি ইহা সংস্কারপুষ্ট সমাজমনকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে নাই। নবযুগের উজ্জ্বল আলোকেও ত্যাগ ভক্তি বিশ্বাসের আবেদনটি একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই ;-পরন্তু বৃহৎ দেশ জাতি স্বপ্ন বাসনালোকে এগুলিকে নিরন্তর পোষণ করিয়াছে। এক্ষেত্রে যে লেখক নূতন করিয়া ভক্তি বিশ্বাসের সুরটি জাগাইতে পারিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যেই সাফল্যের বরমাল্য জুটিয়াছে। অপরেশ চন্দ্র বা ক্ষীরোদ প্রসাদ-এইজন্যই পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী সাফল্য লাভ করিয়াছেন। উভয়ের কর্ণ চরিত্রেই নবযুগ ঘোষিত মানবতার বার্তাবহ, কিন্তু উভয় চরিত্রই-শেষ পর্যন্ত ভক্তি বিশ্বাসে নরনারায়ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—ইহাই ভক্তিবাদী দর্শকের কাম্য। গিরিশচন্দ্রের ভক্তিধারার অনুক্রমটি ইহারাই রক্ষা করিয়াছেন। যুক্তি বুদ্ধিতে আমাদের চিন্তা যাহা চাহিয়াছে, ভক্তি বিশ্বাসে আমাদের বিবেক তাহাতে সায় দেয় নাই। কালের যাত্রায় নূতন ক্ষেত্রে আমাদের গন্তব্য নির্দিষ্ট হইলেও আমরা বার বার বলিয়াছি, 'মন চল নিজ নিকেতনে'।

পাদটীকা

১। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ও শেষভাগের সমাজচিন্তার মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান। এক বিবাহ সম্পর্কে দুই যুগের ধারণা প্রত্যক্ষ করিলে পার্থক্যটি সহজে অনুমান করা যাইবে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব' সমাজের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। বিরোধিতা থাকলেও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু আইনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ কোনদিনই জনপ্রিয় হয় নাই। আবার ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের 'সিভিল ম্যারেজ বিল'-এর মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ সমর্থিত হইলেও হিন্দুর পক্ষে তাহা কার্যকরী হয় নাই কেবল মাত্র প্রগতিবাদী ব্রাহ্মদের মধ্যেই তাহা প্রযুক্ত হইয়াছে। বাংলা দেশের সমাজ জীবন এইরূপ প্রগতির নীতি উপেক্ষা করিয়া রক্ষণশীলতার নীতিতেই স্থিতি লাভ করিয়াছে। সমকালীন সাহিত্যে এই সামাজিক শুচিতার চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিম সাহিত্যের প্রখর নীতিবাদ কিংবা গিরিশচন্দ্রের নাটকের গার্হস্থ্যধর্ম ও সতীধর্মের প্রশস্তির মধ্যে সমাজের শুদ্ধাচার ও নীতিধর্মের আদর্শটিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

২। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম সং। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ২৪৮

৩। সতী নাটক—মনোমোহন বসু—ভূমিকা

৪। ঐ ২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক

৫। ঐ ৫ম অঙ্ক

৬। ঐ ৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

৭। ঐ ২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

৮। হরিশ্চন্দ্র, ৫ম অঙ্ক—মনোমোহন বসু

৯। ঐ ৬ষ্ঠ অঙ্ক

১০। ঐ ৬ষ্ঠ অঙ্ক

১১। পার্থপরাজয়, ৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক—মনোমোহন বসু

১২। বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ১৬৩

১৩। রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী। বসুমতী সং। ২য় খণ্ড, বিজ্ঞাপন

১৪। বাল্মীকি রামায়ণ—রাজশেখর বসু পৃঃ ৩৮১

১৫। অনলে বিজলী, ৫ম অঙ্ক রাজকৃষ্ণ রায়

১৬। ঐ ৫ম অঙ্ক

১৭। প্রমদ্বরা, ২য় অঙ্ক, ২য়দৃশ্য—রাজকৃষ্ণ রায়

১৮। বামন ভিক্ষা, ৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য— ঐ

১৯। গিরি গোবর্ধন, ৩য় দৃশ্য— ঐ

২০। দুর্বাসার পারণ, ৪র্থ অঙ্ক ৫ম দৃশ্য —ঐ

২১। ঐ ৪র্থ অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য

২২। অন্তকালে চ মামেব স্মরণমুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয় ॥ —শ্রী মদ্ভগবদ্গীতা ৮।৫

২৩। পৌরাণিক নাটক—গিরিশচন্দ্র
২৪। গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ ৫০৩
২৫। ঐ পৃঃ ১৮
২৬। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। পৃঃ ৪১৫
২৭। রাবণ বধ, ৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য—গিরিশচন্দ্র
২৮। সীতার বনবাস, ২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক—ঐ
২৯। অভিমন্যু বধ, ৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক—ঐ
৩০। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, ৪র্থ অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক—ঐ
৩১। জনা, ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য—ঐ
৩২। জনা, ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য—ঐ
৩৩। জনা, ৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য—ঐ
৩৪। পাণ্ডব গৌরব, ১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক—ঐ
৩৫। পাণ্ডব গৌরব, ৫ম অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক—ঐ
৩৬। দক্ষযজ্ঞ, ৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য—ঐ
৩৭। ধ্রুব চরিত্র, ৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য—ঐ
৩৮। বিল্বমঙ্গল, ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য—ঐ
৩৯। রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১৭১
৪০। রাবণ বধ, ৪র্থ অঙ্ক—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
৪১। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, ২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক—ঐ
৪২। অমৃতলাল বসু। সা. সা. চ ষষ্ঠ খণ্ড। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৫৭
৪৩। হরিশ্চন্দ্র, ৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক—অমৃতলাল বসু
৪৪। হরিশ্চন্দ্র, ৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক—ঐ
৪৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ২২৮, ২৫৬-৫৭, ২৬১

একাদশ অধ্যায়

ঐতিহ্য সাধনার অনুবৃত্তি

রবীন্দ্রনাথ ।। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে বিংশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ কাল পরিধিতে ভারতধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। একটি বিরাট মহীরুহ সমগ্র দেশ কালকে কিভাবে ছায়াদান করিতে পারে, রবীন্দ্রজীবন তাহার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রভাবের প্রশ্নই উঠে না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি দিকেই তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার মত সৃষ্টি ক্ষমতা লইয়া সমাসীন। তবে ভারতধর্মের ধারায় তিনি কোন প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং দেশজীবনে তাঁহার প্রভাব কতখানি তাহা পর্যালোচনা করা যায়।

ব্রহ্ম সাধনায় পূর্বসূরিবৃন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ।। বেদান্ত ধর্মের নবউজ্জীবনে রামমোহন রায় যে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাই পল্লবিত ও রূপান্তরিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে সৃষ্টি করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রবল প্রেরণা হিসাবে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ সমগ্র দেশে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা গেল এই শতকের শেষপাদ হইতে নব্য হিন্দু জাগৃতির সূত্রপাত হইয়াছে। নব্য হিন্দুধর্ম বহুলাংশে পৌরাণিক আচার অনুশাসন ও পরিমার্জিত সংস্কার লইয়া জনমনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শতাব্দীর শেষভাগে এই পৌরাণিক প্রভাব দেশের জীবন ও সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। হিন্দু ধর্মের লুপ্ত ঐশ্বর্যের আবিষ্কার ও প্রচার এবং তাহার সাহায্যে জনমনকে জাতীয় আদর্শে সচেতন করা নব্য হিন্দু আন্দোলনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দুধর্মের একটি লোকাশ্রয়ী চেতনাকেই প্রাধান্য দিয়াছে, সেইজন্য প্রকৃতিতে ইহা পৌরাণিক রূপাশ্রয়ী। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এই ক্ষেত্রে ভিন্নভাবকে পুষ্ট করিয়াছে। তিনি এই পৌরাণিক ধারাকে গ্রহণ করিয়া আসেন নাই, তিনি ধরিয়াছেন ব্রহ্ম সাধনার ধারা, যাহা শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা রামমোহনের দ্বারা সূত্রপাত হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে তাঁহার ব্রহ্ম সাধনা পূর্বসূরীদের পথেই, তবে রূপে প্রকৃতিতে কিছুটা স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনকে উচ্চ প্রশস্তি জানাইয়াছেন—"রামমোহন রায়

আমাদিগকে আমাদেরই ব্রাহ্মধর্ম দিয়া গিয়াছেন। আমাদের ব্রহ্ম যেমন নিকট হইতে নিকটতর, আত্মা হইতেও আত্মীয়তর, এমন আর কোনো দেশের ঈশ্বর নহেন। রামমোহন রায় ঋষি প্রদর্শিত পথে সেই আমাদের পরমাত্মীয়ের সন্ধান পাইয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।"[১] ব্রাহ্ম ধর্মই রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক ধর্ম। ইহা অপেক্ষা বড কথা এই যে তিনি ব্রাহ্মধর্মের অভীষ্ট পরম পুরুষকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন। ধর্মের অনুষ্ঠানকে অতিক্রম করিয়া তিনি ইহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। যে বিশিষ্ট মনোপ্রকৃতিতে ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি এই উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে তাঁহার পূর্বসূরী রামমোহন বা পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ হইতে স্বতন্ত্র।

রামমোহনের ব্রহ্মবাদ সম্পর্কে নানা বিতর্ক আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি খাঁটী শঙ্করপন্থী না কিছুটা দ্বৈতবাদী, তিনি নৈর্ব্যক্তিক পরম সত্তায় আস্থাবান না পরমের কোন রূপ কল্পনায় শ্রদ্ধাশীল এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের রচনাতেই স্ববিরোধ আছে। তবে ঈশ্বর যে নিরাকার চৈতন্যরূপী এবং তাঁহার সহিত জীবের একাত্মতা অর্জন সাধনার পরম লক্ষ্য—এই অদ্বৈত চেতনাকে তিনি যে মূল চিন্তাধারারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবেন্দ্রনাথে এই অদ্বয়তত্ত্বের সহিত দ্বৈতসাধনা স্পষ্টতর হইয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন, বিরাট পুরুষ বিশ্ব আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছেন। বিশ্বের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে তাঁহার অস্তিত্বের 'ধারণা' করা যায় কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করিতে হইলে গভীর অন্তধ্যানের প্রয়োজন। জ্ঞানে যাঁহার ধারণা, প্রেমে তাঁহার অনুভব—ইহাই দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার মীমাংসা।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার মধ্যে আত্মচৈতন্য ও পরমচৈতন্যের মিলন কল্পনা করিয়াছেন। এই পরমচৈতন্য নৈর্ব্যক্তিক নহে, বিরাট ব্যক্তি আশ্রয়ী। তিনিই রবীন্দ্রনাথের বিরাট, পরম পুরুষ ইত্যাদি। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এ সম্বন্ধে সুন্দর বলিয়াছেন: "This power is not abstract. It is the infinite will belonging to a supreme person and this cannot be an abstraction. This person manifests his power on the one hand as the earth, the sky, and the starry heavens and on the other hand as our consciousness.........The general purport of meditation therefore is the realisation that one's own consciousness and vast world outside are one."[২] রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় এইভাবে দ্বৈত

অদ্বৈতের মিলন ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি: "আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তো তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিলন।...যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে।"[৩]

উপনিষদের বীজ ও ফল॥ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনায় উপনিষদ যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য: "ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ, আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারিদিকে, তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ কোরো না। কাব্য সাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য।"[৪] এই যে বিশ্বপ্রকৃতির সবকিছু একের দ্বারা আচ্ছাদিত, সেই একত্বে অনুভব করার দৃষ্টিই কবিদৃষ্টি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই চিরন্তনের অখণ্ড লীলা রহিয়াছে, ইহা হইতে বিচ্যুত হইয়া 'অহং'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবনের যাবতীয় বোধ ও দৃষ্টি একান্ত খণ্ড ও অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বার বার করিয়া মানুষের এই দ্বৈত সত্তার কথা বলিয়াছেন। এই দুইটি অহংই মুণ্ডকোপনিষদ কথিত সেই দুইটি পাখী—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া........একটি ফল আস্বাদন করে, অপরটি দেখিয়া যায়। আস্বাদনকারী ক্ষুদ্র অহং মানুষকে ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে আর দ্রষ্টা 'বৃহৎ আমি' সীমার বন্ধন কাটাইয়া তাহাকে অসীমের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়।

এই মৌল অনুভূতি হইতে রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রত্যয় গড়িয়া উঠিয়াছে। যে ভৌম পরিমণ্ডলে তিনি পাদচারণা করিয়াছেন, তাহার নানা প্রকার অনুজ্ঞা ও নির্দেশ তাঁহার উপর বিভিন্ন সময়ে আসিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। তথাপি সব কিছু বহিঃপ্রভাবের মধ্যে তিনি চিত্তের এই স্থির প্রত্যয়কে হারাইয়া ফেলেন নাই। বস্তুতঃ এই প্রত্যয়ই তাঁহাকে যাবতীয় মহত্ত্ব ও গৌরব দান করিয়াছে।

রবীন্দ্রমানসের কয়েকটি প্রধান উপলব্ধির বিষয় আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার মধ্যে এই উপনিষদিক প্রভাবকে বুঝিতে পারিব। তাঁহার জীবন ও সাধনা ব্যাপক অর্থে ভূমার প্রতি শ্রদ্ধা। তিনি সংকীর্ণকে গ্রহণ করেন নাই,

তাহার দাসত্বকে স্বীকার করেন নাই। যাহার নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি সেই বিরাট। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই বিরাট অযুত সৃজনী শক্তি লইয়া অধিষ্ঠিত, তিনিই মানব প্রকৃতির মধ্যে মহামানব বা বিশ্ব মানবরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই মহামানবের করস্পর্শে মানবও বিশ্ববিমোহনরূপে প্রতিভাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকেই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন: "আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"[৫] এই ভূমাবোধ, বিরাটের প্রতি আত্মসমর্পণ বা বিশ্ব মানবকে বন্দনা—ইহা তাঁহার উপনিষদের পরমপুরুষের আরাধনা।

অতঃপর বিশ্বে একের বিচিত্র প্রকাশ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। কঠোপনিষদের 'একোবশী সর্ব ভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি'—এই বাণীর মর্মসত্যকে তিনি জল, স্থল, অন্তরীক্ষে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছেন। বিশ্বের তাবৎ বস্তুকে একের প্রেক্ষাপটে মনন মার্গে অনুভব, ইহাই তাঁহার জ্ঞান সাধনা। ইহার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার সর্বেশ্বরবাদ। তবে উপনিষদের সত্যকে নিজের অনুভূতির আলোকে গ্রহণ করাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। তিনি সর্বেশ্বরবাদের অন্তার্থক দিকটিকে ঠিক উপনিষদের মতই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার অনুভূতির দিকটিকে আরও ঘনীভূত চেতনায় স্বীকরণ করিয়াছেন। নিজেকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া সেই এককে তিনি অনুভবের অতিরিক্ত করিয়া ভাল বাসিয়াছেন। "এক দিকে মনন শক্তি দ্বারা তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্বত্র স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত হয়েছেন, অপর পক্ষে তিনি কবি, তিনি অনুভূতিপ্রবণ, তাই তিনি ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করে দেবতার সহিত ভালবাসাবাসির প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছেন। এইভাবে তাঁর মন চেয়েছে সর্বেশ্বরবাদের গলায় বরমাল্য দিতে, অপর পক্ষে হৃদয় চেয়েছে এমন একটা কিছু ব্যবস্থা যার দ্বারা দেবতাকে প্রিয়ভাবে পাওয়া যেতে পারে। এ যেন উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শনের মধুর রসের ভিত্তিতে সাধনার দ্বন্দ্ব।"[৬] সর্বেশ্বরবাদের মধ্যে এই দ্বৈতভাবের কল্পনা—ইহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। উপনিষদ কেন্দ্রিক অদ্বৈত বেদান্ত চিন্তাকে তিনি গ্রহণ করিতে চান নাই। যে এক 'প্রেমে মাধুর্যে সৌন্দর্যে পূর্ণ', সেই একই তাঁহার লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বৃহৎ চেতনা—আনন্দবাদ। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার আনন্দ চেতনার উৎসদেশে বৃহদারণ্যকে উপনিষদকে রাখিয়া এ বিষয়ে সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, উপনিষদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সেই অক্ষররূপী ব্রহ্মের একটি প্রশাসন রহিয়াছে। ইহা তাঁহার ভয়ের দিক। সর্বব্যাপী প্রাণরূপ সর্বনিয়ন্তা এই অক্ষরই মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্—উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহৎ ভয়। রবীন্দ্রনাথ এই ভয়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়া সৃষ্টির অন্তরালবর্তী আনন্দের দিকটি গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অক্ষর রসরূপ, সেই রসকে জানিয়া সকলে আনন্দ স্বরূপ হইয়া যায়।[৭] রবীন্দ্র সৃষ্টির মধ্যে এই আনন্দচেতনা একটি পরিব্যাপ্ত প্রভাবরূপে গৃহীত হইয়াছে। সৃষ্টির মাধুর্য এই আনন্দেরই প্রকাশ, সৃষ্টির দুঃখবেদনার পরিণতিও এই আনন্দ। "সেখানে যে আনন্দ, সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়।"[৮] রবীন্দ্রচেতনা কেন এত বলিষ্ঠ, কেন যে তাহা সাময়িকতা দ্বারা পর্যুদস্ত নহে, তাহার কারণ অন্বেষণ করিলে তাঁহার মধ্যে এই উপনিষদের বোধটিকে জানিতে হয়।

রবীন্দ্র মানসে উপনিষদের প্রভাব সম্বন্ধে সার কথা এই যে, তিনি কোন কিছুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখেন নাই। মানুষের জীবন বিচ্ছিন্ন নহে, জন্ম পরম্পরায় তাহা একটি পূর্ণতাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। সৃষ্টিও অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড, কোনটিই তাৎপর্যবিহীন শূন্যতা নহে। আর স্রষ্টা সব কিছুর উপর নিজের বিরাট ছায়া দিয়া আচ্ছাদন করিয়া আছেন। স্রষ্টার বিরাট শক্তি, তাহাতে ভয় হইবারই কথা। কিন্তু জীব ভালবাসিয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে তাঁহার রুদ্র রূপ খসিয়া পড়িবে। তাই পরমের উপলব্ধির পাথেয় হইল প্রেম ও আনন্দ।

এই ভাবে উপনিষদের বাণী রবীন্দ্রনাথ নূতন আলোকে গ্রহণ করিয়াছেন। জীবনে ব্রহ্মচেতনার উপলব্ধি, হৃদয়ের মধ্যে সেই অণু হইতে অণীয়ান, মহৎ হইতে মহীয়ানের অনুধ্যান তাঁহার সাহিত্য সাধনায় মহামন্ত্র রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। আরণ্যক ভারতবর্ষের এই দিকটির সহিতই তিনি চিত্তের সাধর্ম্য অনুভব করিয়াছেন।

তথাপি অদ্ভুত গ্রহীষ্ণু চেতনা রবীন্দ্রনাথের। চিত্তের উদার দাক্ষিণ্য, অন্তরমনের প্রসন্ন প্রশান্তি, তাঁহাকে সর্বত্র প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়াছে। এই জন্য স্বভাব ধর্মে উপনিষদের চেতনা বহন করিলেও সৃজন ধর্মে তিনি সকল ক্ষেত্রেই পাদচারণা করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারতের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিভংগী সেইজন্য

গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। উপনিষদের মত ইহাদের মধ্যেও তিনি ভারত সংস্কৃতির চিরন্তন উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন।

রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।। রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতেতিহাসের একটি সামাজিক বিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি এই ঐতিহাসিক ক্রমাভিব্যক্তির তিনটি স্তর নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথম, আর্য অনার্যের সংঘর্ষ ও আর্য শক্তির জয়লাভ, দ্বিতীয়, আর্যের কৃষি বিস্তারে রাক্ষস তথা অনার্য শক্তির প্রতিবন্ধকতা ও পরিশেষে আর্য শক্তির প্রাধান্যে কৃষি ব্যবস্থার নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তর আর্য সমাজভুক্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শক্তির সংঘর্ষ ও সমন্বয়। এই তৃতীয় উপাদানটি ভারত সমাজকে বিশেষ ভাবে আন্দোলিত করিয়াছে এবং ইহার ফলে সমাজের চিন্তাদর্শ ও মনোপ্রকৃতি একটি স্থায়ীরূপ লাভ করিয়াছে। ভারতেতিহাসের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রভুত্ব সূচিত হইয়াছে। কিন্তু আচার অনুষ্ঠানে, যজ্ঞ কর্মে ও ধ্যান ধারণায় শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে যে অনুশাসন-নির্দেশ অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা সমাজের সর্বস্তরে অভিনন্দিত হয় নাই। এই সংগুপ্ত প্রতিবাদই ক্ষাত্র শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী করিয়াছে। রামায়ণ মূলতঃ এই ক্ষাত্রশক্তির বীর্যবত্তার কাহিনী। এই বিরোধ সুদীর্ঘ কাল স্থায়ী হইয়াছিল। পরবর্তী কালে রচিত মহাভারত ও পুরাণের মধ্যেও ইহার অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের রামচরিত্র এই ক্ষাত্র শক্তিরই পুরোধা। বিশ্বামিত্র সাহচর্যে রামচন্দ্র বশিষ্ট প্রমুখ ব্রাহ্মণ্য ধ্বজাধারী সমাজ প্রতিভূর বিরোধিতা করিয়াছেন এবং পরিশেষে জয়লাভও করিয়াছেন। এই জয়ের মন্ত্র ছিল প্রেম ও ভক্তি যাহা সমাজের অনুশাসন বন্ধনকে শিথিল করিতে পারিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্য হইতেই এই ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম ঘোষিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—"প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহারা দুইজনেই ক্ষত্রিয়—একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর একজন শ্রীরামচন্দ্র। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় ক্ষত্রিয় দলের এই ভক্তিধর্ম, যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তেমনি রামচন্দ্রের জীবনের দ্বারাও বিশেষ-ভাবে প্রচার লাভ করিয়াছিল।"[৯]

তবে ভারত ধর্মের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ভাগবত ধর্ম কোনটিই এককভাবে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করে নাই। রামায়ণের প্রথম যুগে ক্ষত্রিয়দের দ্বারা ভাগবতধর্ম সূচিত হইয়াছে কিন্তু পরবর্তীকালে আবার ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের

অনুশাসন আসিয়া মিশিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অনুমান করেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রতাপে হিন্দুধর্ম ও সমাজ যখন বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিল, তখন হিন্দু সমাজ অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য নিজেদের বিভেদ বৈষম্যকে ভুলিয়া যাইতে চাহিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের দেবতাকে স্বীকার করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়ও কিছু পরিমাণে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে পোষণ করিয়াছে। রামায়ণে ইহা স্পষ্টরূপ চিত্রিত হইয়াছে। যে রামচন্দ্র গুহক মিতা তিনি ক্ষত্রিয় বীর, উদারতা দ্বারা বর্ণভেদের উর্ধ্বে। কিন্তু রামচন্দ্র শূদ্র শম্বুকের হত্যাকারী, তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত, বর্ণাশ্রম ধর্ম ও আচার নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাশীল। এই আপোষ মীমাংসার যুগে ব্রাহ্মণ্য দেবতা ব্রহ্মার প্রায় অবলুপ্তি এবং ক্ষত্রিয় দেবতা বিষ্ণুর প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা। বিষ্ণুই ক্রমে ক্রমে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতায় পর্যবসিত হইয়াছেন। রামচন্দ্র এই সময়েই অবতার বলিয়া পরিগণিত এবং তাঁহার একখানি প্রাধান্য লাভের পরিবর্তে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের ধারক হইতে হইয়াছে।

বৌদ্ধ পরিপ্লাবন ও ইহার সহিত বহির্ভারতীয় অনার্য জাতিদের অবাধ প্রবেশ ভারতবর্ষের সমাজধর্মকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের ইহা ছিল পরম সংকটকাল। কারণ আর্য প্রকৃতি-বিরোধী বিধর্মীয় রীতি প্রকৃতি ভারতবর্ষের সনাতন বোধটির মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছিল। এই সময় বিশ্লিষ্ট সমাজকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য এমন একটি পুরাতন শাস্ত্রকে মাঝখানে দাঁড় করাইবার প্রশ্ন আসিয়াছিল যাহাতে সকল লোক ও সম্প্রদায়ের সংশয় নিরসন হইতে পারে। একটি বিচ্ছিন্ন জাতির দৃঢ় নিশ্চল কেন্দ্রকে তখন আবিষ্কার করিবার প্রয়োজন আসিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন এই সময় আর্য সমাজে যত কিছু জনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া ছিল, তাহাদিগকে একত্র করিয়া মহাভারত নামে সংকলিত করা হইল। এই জন্য মহাভারত কোন ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত।[১০]

রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন মহাভারতের মধ্যে জাতির মূল অভিপ্রায় ও চরম তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে ভারতীয় জাতির মনোধর্মের বিচিত্র অনুভূতির সংহতি ঘটিয়াছে। এই সংহতির কেন্দ্রটি হইল গীতা। মানুষের ইতিহাসে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম অনেক সময় স্বতন্ত্রভাবে এমন কি পরস্পর বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে। তবে একটি জায়গায় আসিয়া এই বিরোধ বা স্বাতন্ত্র মিলিয়া যায়। "মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে

মিলিতে পারে। মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা।"[১১]

এইভাবে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ইতিহাসের গতি রেখায় ভারত জীবনের পরম লক্ষ্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারতকে গ্রহণ করিয়াছেন।

রামায়ণের রূপক রহস্য ॥ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে একটি রূপক হিসাবেও লক্ষ্য করিয়াছেন। রামায়ণের দুইটি দিক—রাম সীতার দিক ও রাবণের দিক একটি গূঢ় অর্থব্যঞ্জনা প্রকাশ করিতেছে। সীতা অর্থে হলরেখা। সীতাপতি রামচন্দ্র তাঁহার নবদূর্বাদল শ্যামবর্ণে শ্যামল শোভন কৃষি সম্পদকেই ধারণ করিয়াছেন। হলরূপী সীতা এবং সম্পদরূপী লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে অনুক্ষণ সাহচর্য দিয়া এই কৃষি সম্পদকে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। তারপর রামচন্দ্রের সহিত রাবণের দ্বন্দ্ব। কুবের বিজয়ী রাবণ অমিত স্বর্ণসম্পদের অধিকারী। সে সম্পদে প্রতাপ আছে, প্রেম নাই। সে সম্পদ অমিত আসুরী বলের জন্ম দেয়। সেই সম্পদ অধিকারীর দম্ভে সকলে রব বা আর্তনাদ করিয়া উঠে সেইজন্যই সে রাবণ। ঐশ্বর্য ও শক্তির ধারক রাবণ স্বর্ণমৃগের মায়া দেখাইয়া নিরীহ কৃষি জীবীদের প্রলোভিত করে। এই প্রলোভন হইতে পরিত্রাণ নাই। ইহা বোধ করি কৃষিজীবী মানুষের স্বেচ্ছামৃত্যু। "কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্ম বিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটি গা ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়া মৃগের বর্ণনা আছে।"[১২] রবীন্দ্রনাথের এই রূপক ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে আধুনিক। স্বর্ণ মরীচিকাতে শান্ত মানুষের মৃত্যু একালীন যন্ত্র সভ্যতার ভয়াবহ পরিণতি। তবে এই রূপকের অভিনবত্ব থাকিলেও ইহা নিছকই কল্পনা-সম্ভব। এই দৃষ্টিতে রামায়ণ বিচার্য নহে। ইহা রবীন্দ্রনাথেরও মত, কারণ "রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা, মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা।"[১৩]

রামায়ণ মহাভারতের সাহিত্যরস আস্বাদন ॥ রামায়ণের এই মানব মহিমোজ্জ্বল দিকটি ইহাকে সাহিত্যোৎকর্ষ দান করিয়াছে। মহাভারতেরও তাহাই। এই দুই মহাকাব্য ভিন্নতর রীতি প্রকৃতিতে মানবকে মহীয়ান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ-মহাভারত কেন্দ্রিক সৃষ্টধর্মী রচনাগুলি এই মানবরসের দ্বারা পুষ্ট।

রামায়ণী কাহিনী লইয়া রচিত রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য—'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', কাহিনী কাব্যের দুইটি কবিতা—'ভাষা ও ছন্দ' এবং 'পতিতা'।

বাল্মীকি রামায়ণে বাল্মীকির কবিত্বলাভ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বেদজ্ঞ তপস্বী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নারদকে মুনিবর বাল্মীকি পৃথিবীর মধ্যে সর্বগুণান্বিত এক মানুষের সন্ধান দিতে বলিলেন। নারদ ইহার উত্তরে রামচন্দ্রের কথা বলিলেন। অতঃপর নারদের অন্তর্ধানে সশিষ্য বাল্মীকি তমসার তীরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় এক ব্যাধ মিথুনরত ক্রৌঞ্চকে শরবিদ্ধ করিল। নিহত ক্রৌঞ্চকে দেখিয়া বাল্মীকির চিত্ত বিগলিত হইল। তিনি ব্যাধের নৃশংস আচরণকে ধিক্কার দিয়া 'মা নিষাদ' শ্লোকটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবৃত্তি করিয়া ফেলিলেন। শিষ্য ভরদ্বাজের সংগে শ্লোক বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া তিনি এ সম্বন্ধে সবিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া এই শ্লোকের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁহাকে অবহিত করাইলেন। তিনি জানাইলেন যে তাঁহারই ইচ্ছায় বাল্মীকির কণ্ঠে অভূতপূর্ব এই শ্লোকের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা তিনি নারদের নিকট শ্রুত রামকাহিনী লইয়া কাব্যরচনা করিবেন। তিনি আরও জানাইলেন যে যাহা অবিদিত আছে, সে সমস্তও তাঁহার বিদিত হইবে, তাঁহার কাব্যের কোন কথা মিথ্যা হইবে না।[১৪]

আদি রামায়ণে বাল্মীকি মুনিবর, তিনি দস্যু নহেন। দস্যু রত্নাকরের কাহিনী অধ্যাত্মরামায়ণের কাহিনী হইতে গৃহীত। বাল্মীকি প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ রত্নাকর কাহিনীকে গ্রহণ করিয়াছেন, তবে বাল্মীকি নামটি প্রথম হইতেই আছে। লোকশ্রুতি এই যে দস্যুরা কালীভক্ত এবং সেই ধারা অনুসারী রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিকে দস্যু সেতারূপে কালীর স্তবরত দেখাইয়াছেন। নরবলির জন্য সংগৃহীত একটি বালিকাকে দেখিয়া দস্যু বাল্মীকির মনে করুণার উদয় হইল। তিনি বালিকার বন্ধন মোচনের আদেশ দিলেন। করুণা বিগলিত এই বাল্মীকির সম্মুখেই অতঃপর ক্রৌঞ্চ নিহত হইল। তখনই তাঁহার হৃদয় হইতে উৎসারিত হইল 'মা নিষাদ' শ্লোক। এমন সময়ে তাঁহার সম্মুখে সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। বিমুগ্ধ বাল্মীকি তাঁহার দিকে ভাব বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। অতঃপর সরস্বতীর অন্তর্ধানের পর লক্ষ্মীর আবির্ভাব। বাল্মীকি লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পুনরায় তাঁহার নিকটে সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। তিনি তাঁহাকে কাব্যরচনার বরদান করিলেন।

আলোচ্য গীতিনাট্যের কাহিনীগত উপাদান পরবর্তী রামায়ণের রত্নাকর

কাহিনী। তবে ইহার ভাববিন্যাসে বিহারীলালের 'বাল্মীকির কবিত্বলাভে'র ধারণা গৃহীত হইয়াছে। প্রথম দিকে তিনি যে বিহারীলালের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহার ভাব সত্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন: "বাল্মীকি প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তরগূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়; একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে।"[১৫] রবীন্দ্রনাথের বহু বিঘোষিত মানবধর্মের প্রাথমিক প্রকাশরূপে এই গীতিকাব্যটিকে গ্রহণ করা যায়।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড হইতে 'কালমৃগয়া'র কাহিনী গৃহীত। ইহাতেও কবির নিজস্ব কল্পনা সংযোজিত হইয়াছে। গীতিনাট্যের সুরমূর্ছনা অব্যাহত রাখিবার জন্য এখানে বনদেবীগণের কল্পনা করা হইয়াছে। অন্ধমুনি পুত্রের মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া বনদেবীগণের করুণ গীতোচ্ছ্বাস একটি শোকাবহ পরিবেশ রচনা করিয়াছে। রামায়ণের মুনিপুত্র দিব্যদেহ ধারণ করিয়া ইন্দ্রের সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।[১৬] আদি কবির শান্তরসকে রবীন্দ্রনাথ করুণ রসে পর্যবসিত করিয়াছেন।

আদিকাণ্ডের ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান লইয়া 'পতিতা' কবিতাটি রচিত। অঙ্গরাজ লোমপাদের প্রয়োজনে মন্ত্রিগণ মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে বারাঙ্গনাদের দ্বারা প্রলোভিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্যে লইয়া আসেন। বারাঙ্গনাদের রূপের ফাঁসে বন্দী হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে চলিয়া আসেন।[১৭] এই ঘটনার একটি সূক্ষ্ম ভাব লইয়া রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য কবিতা 'পতিতা' রচিত হইয়াছে। বারাঙ্গনাদের একজন দেহোপজীবিনীর জীবনকে ধিক্কার দিয়া তরুণ তাপসের জ্যোতির্ময় মূর্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিল। কেন তাহার পক্ষে রূপের লাস্য বা রূপোপজীবিনীর কটাক্ষের দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে কবলিত করা সম্ভব হয় নাই, সেই কথাই সে রাজমন্ত্রীর নিকট ব্যক্ত করিতেছে। মানুষের মধ্যে দেবতার অধিষ্ঠান। বারাঙ্গনার সেই অন্তর্নিহিত দেবতাকে উদ্বোধন করিয়াছেন ঋষ্যশৃঙ্গ। পতিতার অন্তর্লোক যে দিব্যভাবের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কোনরূপ লোকবুদ্ধিতে বোধগম্য নয়। মুক্ত প্রাণের প্রবর্তনায় মানুষের অন্তরাত্মার বিভাসন—রবীন্দ্র সাহিত্যের বহুশ্রুত উপলব্ধি আলোচ্য কবিতায় প্রতিফলিত।

কাহিনীর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি বাল্মীকির কবিত্ব লাভের কাহিনী কেন্দ্র করিয়া রচিত। ইহার মধ্যে রামায়ণের মানবমহিমা আধুনিক রূপ লইয়া ব্যক্ত

হইয়াছে। দৈব প্রেরণা উদ্দীপ্ত বাল্মীকি দেবতার কথা বলিবেন না, মানুষই হইবে তাঁহার উপজীব্য। মানুষের জীবনের জীর্ণতাকে তিনি ছন্দের দ্বারা মুক্ত করিবেন। আবার বাল্মীকির রামপরিচয়ের অসম্পূর্ণতাকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্য তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবিচিত্তই চিরকালের শ্রেষ্ঠ বাণী উৎস, তাহার সহিত বাস্তবের সম্পূর্ণ মিল না হইলেও ক্ষতি নাই। ব্রহ্মার নির্দেশ বাণী—তোমার কিছুই অবিদিত থাকিবে না—রবীন্দ্রনাথ একটি সাহিত্য মীমাংসা-রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মহাভারতী কাহিনী হইল তাঁহার কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'নরকবাস' ও 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ'।

'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদিপর্ব হইতে গৃহীত। বনবাস কালীন অর্জুনের মণিপুররাজ চিত্রবাহন কন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ কাহিনীকে[১৮] রবীন্দ্রনাথ অভিনব রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রাঙ্গদা দ্বৈতরূপে ভূষিতা। অর্জুনকে দেখিয়া বালকবেশী চিত্রাঙ্গদার মধ্যে নারীত্বের জাগরণ ঘটিল এবং তিনি অর্জুনের নিকট আত্ম নিবেদন করিলে অর্জুন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অতঃপর মদনের সহায়তায় চিত্রাঙ্গদা মোহিনী মূর্তিতে অর্জুনকে আকৃষ্ট করিলেন। ইহার পরে চিত্রাঙ্গদার মনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার রূপই অর্জুনকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাঁহার মন নহে। তিনি নিজের সুগোপন স্থায়ী সত্তাকে ফিরিয়া পাইতে চাহেন। এই ছদ্মরূপ অপেক্ষা তাহা শ্রেষ্ঠ শতগুণে। অর্জুনের মধ্যেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া। তিনিও চিত্রাঙ্গদার বহিঃসজ্জায় ক্লান্ত। তাঁহার অন্তরের সত্যকে বুঝিয়া অর্জুন তাঁহাকে নিজের সত্য অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদাকে কবি বলিষ্ঠ নারীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেম কল্পনায় নারীর যে ব্যক্তিত্বময়ী রূপের পরিচয় আছে, চিত্রাঙ্গদায় তাহারই আভাস পরিলক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে সূচনায় তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন: "যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে, তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়।"[১৯] চিত্রাঙ্গদা সেই শক্তিদীপ্ত প্রেমেরই পরিচয় দিয়াছে।

মহাভারতের আদিপর্বের কচ ও দেবযানী উপাখ্যান লইয়া 'বিদায় অভিশাপ' রচিত। কাহিনীভাগ ও চরিত্র চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ ইহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়াছেন। বৃহস্পতি পুত্র কচ সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষার জন্য দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দৈত্যরা কচের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য তাঁহাকে বারবার হত্যা করেন। কিন্তু দেবযানীর অনুরোধে প্রতিবারই শুক্রাচার্য তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। শেষবারে কচ গুরু শুক্রাচার্যের দেহ হইতে বিনির্গত হইলে তাঁহার পুত্ররূপে প্রতীয়মান হইলেন। এ হেন কচকে চিত্ত নিবেদন করিলে তিনি দেবযানীকে গুরু পুত্রী এবং ভগিনী স্থানীয় প্রতিপন্ন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। দেবযানী কচকে অভিশাপ দিয়াছেন যে তাঁহার মন্ত্র নিজের দ্বারা সফল হইবে না। কচও তাঁহাকে প্রত্যাভিশাপ দিয়াছেন যে তাঁহার সহিত কোন ঋষি কুমারের বিবাহ হইবে না।[২০] রবীন্দ্রনাথের কাহিনী আখ্যানে কচের জীবন নাশের পূর্বসূত্র নাই, শুধু বিদ্যালাভের জন্য তিনি অদম্য পরিচর্যায় গুরু ও গুরু কন্যার চিত্ত বিনোদন করিয়াছেন। দেবযানী সুকৌশলে কচের সুপ্তিভঙ্গ করিয়া তাঁহার চিত্তে প্রেমোদ্বোধন ঘটাইয়াছেন। তবুও বৃহৎ কর্তব্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলিয়াই দেবযানীর আহ্বান তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের দেবযানী প্রেমে ও প্রতিহিংসায় একটি জীবন্ত চরিত্র, চিরন্তন নারীধর্ম তাঁহাকে স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে লইয়া গিয়াছে। আবার কচের মধ্যে তিনি একটি বৃহত্তর মহত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার কচ দেবযানীকে অভিশাপ না দিয়া তাঁহাকে সুখী হইবার বরদান করিযাছে। 'বিদায় অভিশাপে' রবীন্দ্রনাথ কাহিনীগত পারম্পর্যকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়া মানব হৃদয়ের একটি চিরন্তন অনুভূতিকে অসহ উচ্ছ্বাস ও বিপুল বেদনার মধ্যে প্রকাশ করিযাছেন।

'গান্ধারীর আবেদন', 'নরকবাস' ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'—কাহিনী অন্তর্ভুক্ত এই কাব্য নাট্যগুলি মহাভারতী কথাকে আশ্রয় করিয়া লিখিত হইয়াছে। গান্ধারীর আবেদনে কবি মহাভারতের অন্যতম ভাস্বর নারীচরিত্র গান্ধারীর চরিত্র মাহাত্ম্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ইহার পটভূমিও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত। কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাভূত পাণ্ডবদের সমস্ত কিছু ফিরাইয়া দিয়া ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবার অনুমতি দিলেন। এই সময় কর্ণ-শকুনির প্ররোচনায় দুর্যোধন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দ্যূতক্রীড়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের ফিরাইয়া আনিবার আদেশ দান করিলেন। মহাভারতে গান্ধারী এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে দুর্যোধনের পাপ আচরণের নিন্দা করিয়া পাণ্ডবদের পুনর্বার আহ্বান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।[২১] রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়ার পরের সময়টি। পাণ্ডবেরা তখন দ্বিতীয় অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইযা সর্ত অনুযায়ী বনগমনে প্রস্তুত। মহাভারতী চরিত্র গান্ধারী এখানে আরও

মহনীয়া হইয়া উঠিয়াছে। চিরন্তন ন্যায়বোধ ও সত্যধর্মের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি আপন পুত্রের বিরুদ্ধেও গভীর অভিযোগ আনিয়াছেন। মূল মহাভারতে গান্ধারীর যে চারিত্রনীতি 'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ' এই বাণীর মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ এখানে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

ভাগ্যাহত ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে কবি তাঁহার মর্ত্যমানবসুলভ দুর্বলতার কথাই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাভারতেও তিনি অক্ষমতা জানাইয়াছেন, কিন্তু এতখানি হৃদয় কারুণ্যের অবকাশ সেখানে নাই। দুর্যোধন চরিত্রে কবি অহং উদ্দীপ্ত রাজসিকতার সন্ধান পাইয়াছেন। সত্যধর্মকে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই এই অরণ্য-বনস্পতির পতন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দুর্যোধন বাত্যা-বিক্ষোভের পূর্ববর্তী উন্নত বর-বনস্পতি।

বনপর্বের সোমক রাজার উপাখ্যান 'নরকবাস' কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু। রাজা সোমক এবং পুরোহিত ঋত্বিক যথাক্রমে স্বর্গবাস এবং নরকবাসের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কারণ এই যে, রাজার পুত্রলাভের জন্য ঋত্বিক তাঁহার আয়োজিত যজ্ঞে রাজার পুত্রকে আহুতি দিয়াছেন। এতবড় অমানুষী কাজের হোতা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নরকবাস। বহু সুকর্মের ফলরূপে রাজা সোমকের জন্য স্বর্গবাস নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পথিমধ্যে ঋত্বিকের অবস্থা দেখিয়া তিনি আপন কর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং যমের নিকট নরকবাস প্রার্থনা করিলেন। নরক ভোগান্তে তাঁহারা উভয়ে পুণ্যধামে চলিয়া যান।[২২] মূল কাহিনীর এই সরলরৈখিক গতিকে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা পরিবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার সোমক নিজেই পুত্র আহুতি দিয়াছেন। ইহারই অনুতাপে তিনি সারাক্ষণ জর্জ্জরিত হইয়াছেন। রাজার মনের পাপবোধ, জীবনে অনুশোচনার নরকভোগ তাঁহার নিকট স্বর্গলোকের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে আর শাস্ত্রাভিমানী ঋত্বিক মহাপাপী, তাঁহার পরিত্রাণের কোন আশা নাই। তবুও সোমকের মহৎ চরিত্র এই পাপ চরিত্রকে বর্জন করে নাই, ইহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নরক বর্ণনা ও প্রেতগণের অদ্ভুত জীবন প্রকৃতি অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ' রচিত। অন্যান্য সব কাহিনীর মত এখানেও রবীন্দ্রনাথ আপন প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। মূল মহাভারতে কর্ণের জন্মরহস্য পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উন্মোচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবরূপে স্বীকৃতি দিয়া পাণ্ডবপক্ষে মিলিত হইতে বলিয়াছেন। কর্ণ তাহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান

করিয়া আসন্ন সংগ্রামে কৌরব পক্ষ গ্রহণের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই উদ্যোগ পর্বেই অতঃপর কুন্তী কর্ণ-সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতে বলিয়াছেন। পিতা ভাস্কর কুন্তীর কথা অনুমোদন করিলেন। কিন্তু কর্ণ উভয়ের অনুরোধই প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং নির্মম পরুষ ভাষায় কুন্তীকে ভর্ৎসনা করিলেন। তিনি জানাইয়া দিলেন যে কর্তব্য পালনই তাঁহার বড় কথা। কার্যকালে যে কর্তব্য পালন করে না, তাঁহার ইহকাল নাই কিংবা পরকালও নাই।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ ঘটনাকালকে কর্ণপর্বে লইয়া গিয়াছেন। আসন্ন যুদ্ধের দুশ্চিন্তায় কুরু সেনাপতি কর্ণ যখন দারুণ চিন্তিত, তখনই গঙ্গাতীরে, রণভূমিতে কুন্তীর সাক্ষাৎ। প্রদোষের পাণ্ডুর আলোকেও কুন্তী যথেষ্ট সাহস পাইতেছেন না, সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার নামিলে তিনি কর্ণের জন্ম পরিচয় উন্মোচন করিলেন। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ তাহা পূর্ববিদিত নহেন। রহস্যঘন জন্মবিবরণের এই আকস্মিক উন্মোচনে কর্ণ বিহ্বল ও বিমূঢ়। ইহার পরই বিচিত্রভাবে কর্ণের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে—জলপ্রপাতের গম্ভীরগুরু বজ্রনিস্বনে, কুলুনাদিনী নদীর মৃদু তরঙ্গধ্বনিতে কখনও বা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার নীরব প্রবাহে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য কৃতিত্ব। তাঁহার কর্ণ অপূর্ব বীর্য ও অনুপম মমত্বের বিগ্রহ, তাঁহার কুন্তী নিখিলের ভাগ্যাহতা নারীর সকরুণ দীর্ঘশ্বাস। মাতা হইয়া পুত্রের নিকট নির্মম প্রত্যাখান—মাতৃত্বের এতবড় লাঞ্ছনার বোধ করি তুলনা নাই। আবার কর্ণের বুভুক্ষু অন্তরাত্মার ব্যাকুল আর্তনাদ ও কর্তব্যকঠোর জীবনধর্মে তাহার নিঃশেষ বলিদানের মত অকলঙ্ক চারিত্রনীতিও বোধ করি নাই। একটি কর্তব্যে মহৎ ও অপরটি বেদনায় উজ্জ্বল—কর্ণ-কুন্তী সংবাদ এই প্রভাত সন্ধ্যার মিলন।

কবির দৃষ্টিতে মহাকবি ॥ রামায়ণ মহাভারত আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মহাকবিদের বিষয়ও কিছু কিছু বলিয়াছেন। তিনি তাঁহাদেরই মহাকবি বলিয়াছেন যাঁহাদের রচনা সমগ্র দেশ ও যুগকে বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করিয়া মানব মনের চিরন্তন সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য ব্যাস-বাল্মীকি অভিধাযুক্ত কেহ স্বতন্ত্র ভাবে নাও থাকিতে পারেন। "রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।"[২৪]

এই কবিদের সমালোচনা করা প্রচলিত রীতিতে সম্ভব নহে। সমালোচনার পূর্বে ভাবিতে হইবে সহস্র বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ইহাদিগকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে। নিঃসন্দেহে তাহা ভক্তির দৃষ্টি, গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথও

মহাকবি ও মহাকাব্যদ্বয়কে সেই পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার কাছে 'যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারী পুরোহিত'। আধুনিক দৃষ্টিতে আদি কবির অকরুণা ও ঔদাসীন্য তাঁহাকে কিছু কিছু পীড়া দিয়াছে। পূজারী রবীন্দ্রনাথ সন্তর্পণে মহাকবিকে সেই মর্মব্যথা নিবেদন করিয়াছেন। কবিগুরু উর্মিলার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকান নাই। বধূবেশে ক্ষণিক দর্শন দানের পর রঘুরাজকুলের সুবিপুল অন্তঃপুরে তিনি চিরকালের জন্য বন্দিনী হইয়া আছেন। অপূর্ব সহানুভূতি দিয়া কবি এই চরিত্রটিকে পাদপ্রদীপের আলোকে আনিয়াছেন এবং আদি কবির উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, যে ঋষি কবি ক্রৌঞ্চ বিরহিনীর বৈধব্য দুঃখে দারুণ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি কি করিয়া উর্মিলার এতবড় নীরব দুঃখকে নির্মূল্য করিতে পারিলেন। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানী দৃষ্টি ইহার কারণও খুঁজিয়া পাইয়াছেন। সীতার সহিত উর্মিলার পরম দুঃখ তুলনা করিলে সীতা চরিত্র ম্লান হইয়া যাইবে। সেই জন্যই হয়ত কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে উর্মিলার চিরনির্বাসন দিয়াছেন।[২৫] আধুনিক দৃষ্টিতে রামায়ণ-মহাভারতের অসংগতিকে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেন নাই, ইহা এক করুণা বিগলিত মহাকবির ঔদাস্যে আর এক সংবেদনশীল কবির স্বগতোক্তি।

এইভাবে মূলতঃ ঔপনিষদিক চেতনায় পরিপুষ্ট হইয়াও রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ মহাভারতের বিপুল মহিমাকে স্বীকরণ করিয়াছেন। ধর্মীয় ইতিহাসের ধারায় তিনি উপনিষদের চেতনাকেই পুনরুদ্বুদ্ধ করিয়াছেন যদিচ সাহিত্য সৃষ্টিতে উপনিষদের মত রামায়ণ-মহাভারতের প্রতিও তাঁহার সমান আগ্রহই প্রকাশ পাইযাছে।

মহাভারত অনুবাদের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ॥ রবীন্দ্রনাথ মূল মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ করিয়াছেন 'কুরুপাণ্ডব গ্রন্থে'। এই গ্রন্থ রচনার উপলক্ষ সম্বন্ধে রবীন্দ্র জীবনীকার জানাইয়াছেন যে কানাডা যাত্রার পথে "কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা ২৬শে ফেব্রুয়ারি (১৯২৯) কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিলেন। ট্রেনে বসিয়া কবি সুরেন্দ্রনাথঠাকুরের 'মহাভারত'খানি কাটাকুটি করিতেছেন—সংক্ষিপ্ততর সংস্করণ করিবেন, পরে ইহা কুরু পাণ্ডব নামে প্রকাশিত হয়।"[২৬] তাঁহার সম্পাদিত এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইহার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন—"আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তিকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্য। এই কারণে যে বাংলা রচনা রীতি বিশেষভাবে

সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাংলা ভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কথা মনে রাখিয়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উচ্চতর বর্গের জন্য এই গ্রন্থখানির প্রবর্তন হইল।"[২৭]

বস্তুতঃ মহাভারতের ভাবানুবাদ বহুদিন হইতে প্রচলিত থাকায় এই অনুবাদের একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাগাধুনিক সাহিত্যের সমস্ত অনুবাদই পদ্যে রচনা। ইহাদের মধ্যে ব্যাস ভারতের ভাষা গাম্ভীর্য ও শব্দ সম্পদ অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ ইহার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কিন্তু কালী প্রসন্নের অনুবাদ এত বিপুলকায় যে তাহাতে তরুণ শিক্ষার্থী সমাজের প্রবেশ প্রায় দুর্গম। এইরূপ অনুবাদ বিদগ্ধ সমাজের জন্যই নির্দিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ 'কুরু পাণ্ডব' গ্রন্থখানি মূলতঃ ছাত্রপাঠ্য হিসাবেই রচনা করিয়াছেন, প্রধান উদ্দেশ্য হইল ইহার ভাষা রীতির মধ্য দিয়া সংস্কৃত ভাষারীতির পরিচয় সাধন। শুদ্ধ গদ্য গঠনে ক্ল্যাসিক্যাল রচনারীতির যে অবদান তাহা স্মরণে রাখিযাই রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গদ্যানুবাদের ভাষা গঠন করিয়াছেন।

'কুরু পাণ্ডব' গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দ সম্পদ যুক্ত রচনারীতির নিদর্শন :

"তখন অর্জুন তূণীর হইতে ইন্দ্রের বজ্র সদৃশ এক বাণ গ্রহণ ও গাণ্ডীবে যোজনা করিলেন। ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায় সেই ভীষণ অস্ত্র অর্জুন কর্তৃক আকর্ণ আকৃষ্ট ও পরিত্যক্ত হইলে তাহা প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় দিঙ্ মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া কর্ণের মস্তকচ্ছেদন পূর্বক শরৎকালীন নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় তাঁহার দেহ হইতে ভূতলে পতিত হইল। সূত পুত্রের উন্নত কলেবরও কুলিশ বিদলিত গৈরিকস্রাবী গিরিশিখরের ন্যায় ধরাশায়ী হইল।"[২৮]

ইহা পণ্ডিতী ভাষা নহে, শব্দ সম্পদ ও পদবিন্যাসে ইহাতে কোন প্রকার আড়ষ্টতা নাই, অথচ ইহাতে একপ্রকার ক্ল্যাসিক্যাল গাম্ভীর্য আছে। বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা-সীতার বনবাসের রচনারীতি আরও মার্জিত ও শ্রুতিমধুর হইয়া এইরূপ আদর্শ অনুবাদের রচনাশৈলী নির্মিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ বলিয়া 'কুরু পাণ্ডব' গ্রন্থে মহাভারতের সমগ্র কাহিনী বিবৃত হয় নাই। আদিপর্বে কুরু পাণ্ডবের বাল্য জীবন হইতে শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির-এর রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ঘটনা ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। আবার ইহাদের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীকে সন্তর্পণে পরিহার করিয়া রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের মূল ঘটনা কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ কাহিনীকেই উপজীব্য করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের

আগুন্ত ঘটনা ধারাকে তিনি এমন সুনির্বাচিত করিয়া সাজাইয়াছেন যে তাহাতে কাহিনীর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিতে আদৌ অসুবিধা হয় না। ঘটনাধারা বর্ণনার সহিত মহাভারতী জীবন, চরিত্র ও আদর্শ সমূহকেও তিনি অপূর্ব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করিয়াছেন। গীতার শ্রীকৃষ্ণ বাণী অত্যন্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইলেও ইহার মূল বক্তব্য আদৌ অস্পষ্ট হয় নাই। গীতোক্ত উপদেশকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"ক্ষুদ্র মানবীয় সুখ দুঃখের উপর কর্তব্যাকর্তব্য নির্ভর করে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি অনুসারে ফলাফল বিচার করিতে গেলে সংশয়শূন্য ও স্থির সংকল্প হইয়া কোন কার্যই করা যায় না। সেই নিমিত্ত ফলাফল ও স্বীয় সুখ দুঃখ নগণ্য করিয়া স্বশ্রেণীর নির্দিষ্ট ধর্মানুসারে কর্তব্য পালন করিতে হয়। হে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, তুমি হৃদয় দৃঢ় করিয়া ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে তোমাকে কিছুমাত্র পাপস্পর্শ করিবে না। হে পার্থ, যে চিরন্তন ঘটনা পরম্পরার ফলে এই সুমহান কুলক্ষয় আজি উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তোমার বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রভুতা বা দায়িত্ব নাই, অতএব হে স্বজন বৎসল, তুমি এই সান্ত্বনালাভ করো যে, তুমি কাহারও মৃত্যুর কারণ স্বরূপ হইতে পারো না। কার্যকারণ প্রবাহে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে। তন্মধ্যে তুমি স্বীয় কর্তব্য অকাতরে পালন করিলে তোমার ধর্মরক্ষা ও পরিণামে শাশ্বত মঙ্গল লাভ হইবে"।[২৯] গীতার সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মূল কথা এখানে বিবৃত হইয়াছে। অর্জুনের ভ্রান্তি অপনোদনে তথা সংসার সীমায় তাবৎ সংশয়াকুল মনুষ্য সমাজের মোহমুক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের মহার্ঘ উপদেশাবলী এইভাবে সংক্ষেপে আলোচিত হইলেও ইহা সমগ্র গীতার গভীর আদর্শ ও ধারণার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটায় না। মহাভারতের অনুবাদের ধারায় রবীন্দ্রনাথের কুরু-পাণ্ডব যে একটি বাস্তব প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাভারতের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ।। আধুনিক জীবন ও সমাজের নানা আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের জীবন ও সমাজের কথা কয়েক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের অতীত সভ্যতা কেবলমাত্র অধ্যাত্মমুখী ছিল না, জীবন ও কর্মের সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। বিকাশমান জীবনের সহিত সংগতি রক্ষা করাই সভ্যতার সজীবতার লক্ষণ। প্রাচীন ভারতে এই সভ্যতারই অনুশীলন ও বিকাশ হইয়াছিল। যুদ্ধ, বাণিজ্য ও জীবন কর্মের নানা বিভাগে মানুষের শক্তি নিত্য নিয়োজিত হইয়াছিল। সভ্যতার সেই পূর্ণাঙ্গরূপ বর্তমানে ভারত ভূমি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শক্তিহীন কর্মহীন বর্তমান

জীবনযাত্রায় অতীতের সেই কর্মচঞ্চল জীবনের ধারণা করা একান্তই কঠিন। গতিচ্ছন্দ মুখর ভারতবর্ষের সেই পরিচয় লাভ করিতে হইলে মহাভারতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন—"এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজ বিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজ কোনো একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্প চতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি সুচারু পরিপাটি সমভাব বিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। সে সমাজে একদিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ অসংযত অহংকার, অন্য দিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্য চরিত্রকে সর্বদা মথিত করে জাগ্রত করে রেখেছিল।"**

সমকালীন সমাজ আন্দোলনের ধারায় রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছেন যে অতীত জীবনচর্যা উজ্জীবনের নামান্তরে দেশে একটি জড়ত্বপূর্ণ সনাতনত্বের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছে। নবযুগের চিন্তা চেতনায় আচার আচরণের এই দৌরাত্ম্য নিঃসন্দেহে জাতির পশ্চাদগতির ধারক। এইরূপ অন্ধ অনুশাসন প্রীতি জাতির সম্মুখে কোন সত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে ও লিখনে বহু জায়গায় এই প্রকার সংকীর্ণ ধর্মাদর্শের নিন্দা করিয়াছেন। মহাভারতের সমাজে এক উদার ক্ষেত্র ছিল, বহু মত পথ ও চিন্তাধারা বিরোধ সংঘর্ষের মধ্যেই সেখানে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে। বহুমুখী সমাজ জীবনের এই স্বীকৃতি, সরল চলচ্ছক্তিতে জীবনের এই বিস্তৃততা মহাভারতের এক মহান সত্য ছিল।

'পরিচয়'-এর প্রবন্ধগুলিতে বিশেষভাবে ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, আত্ম পরিচয় ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সমাজের একটি ক্রমপরিবর্তনের কথা আলোচনা করিয়াছেন। এই সমাজ বিবর্তন এক কথায় আত্ম সংকোচনের অচৈতন্য হইতে আত্ম প্রসারণের উদ্বোধন আয়োজন। আর্য-ভারতের প্রথম পর্বে আত্মার পূর্ণ বিকাশ সমর্থিত হইলেও যুগান্তরের লোকাচার, শাস্ত্রবিধি ও অভ্যাসের অন্ধ দাসত্ব জীবনকে সংকুচিত করিয়া দিয়াছে। বহির্বিশ্বের চঞ্চল জীবন ধারাকে আমরা এখন স্বাগত জানাইতে পারিতেছি না, আর্যমন্য জাতির উগ্র অহংকারে আমরা সে যুগের ছায়াদর্শ ধরিয়া মিথ্যা ঘুরিয়া মরিতেছি। অথচ প্রকৃতই সে যুগ সজীব ও চঞ্চল ছিল, তাহার কর্ম প্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল, মহাভারতের পৃষ্ঠাকে অন্ততঃ ইহার সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা চলে।

মহাভারতের সমাজ, জীবনের সামগ্রিকতাকে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ফলে

তাহা ভালোমন্দের কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র সংরক্ষিত না করিয়া এক বিরাট ছত্রতলে সকলের অধিষ্ঠান ঘটাইয়াছে। ইহা জীবনের পূর্ণতার প্রতি আগ্রহ, সমাজের সামঞ্জস্যের প্রতি বিশ্বাস। বর্তমান জীবন ও সমাজে এই সামঞ্জস্যের সুর কাটিয়া গিয়াছে। সেইজন্য ছোট বড়, ভালো মন্দের স্বতন্ত্র মূল্যায়ন ঘটে। কিন্তু মহাভারতী চরিত্রের মধ্যে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা থাকিলেও তাহা মর্যাদাচ্যুত হয় নাই, আধুনিককালের ক্ষুদ্র নির্মাণ ও তাহার সুন্দর প্রসাধনকলার ঊর্দ্ধেও সেই অপূর্ণতার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' আলোচনায় দ্রৌপদী ও কর্ণ চরিত্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতী সমাজের এই বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন—"মহাভারতকার কবি যে একটি বীর সমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একটি সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র সুসংগতি নাই। খুব সম্ভব আধুনিক খ্যাত অখ্যাত অনেক 'আর্য' বাঙালি লেখকই সরলা বিমলা দামিনী যামিনী নামধেয়া এমন সকল সতী চরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন যাহারা আদ্যোপান্ত সুসংগত, অপূর্ব নৈতিকগুণে দ্রৌপদীকে পদে পদে পরাভূত করিতে পারেন। কিন্তু তথাপি মহাভারতের দ্রৌপদী তাঁহার সমস্ত অপূর্ণতা অসংকোচে বক্ষে বহন করিয়া এই সমস্ত নব্য বল্মীক রচিত ক্ষুদ্র নীতিস্তূপগুলির বহু ঊর্দ্ধে উদার আদিম অপর্যাপ্ত প্রবল মাহাত্ম্যে নিত্যকাল বিরাজ করিতে থাকিবেন।"[৩১] কর্ণ চরিত্রের উপরও রবীন্দ্রনাথ একইরূপ মাহাত্ম্য আরোপ করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারত তাহার কর্মের সাধনায় সমাজ ও সভ্যতার চলিষ্ণু রূপকে কতখানি মূল্য দিয়াছিল, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা ভরা জীবনকে কিরূপ মহান মর্যাদায় গ্রহণ করিয়াছিল, মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতে রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

পাদটীকা

১। চারিত্র পূজা, রামমোহন রায়, রবীন্দ্র রচনাবলী। বিশ্বভারতী সং। ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫২১

২। Rabindranath—Poet and Philosopher, Dr. S. N Dasgupta

৩। আত্মপরিচয় রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৭৮

৪। ঐ পৃঃ ১০৫

৫। ঐ পৃঃ ১০৬

৬। রবীন্দ্র দর্শন, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৫৪

৭। উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র মানস—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত পৃঃ ৪৯
৮। আত্ম পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৭৭
৯। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা—রবীন্দ্র রচনাবলী। বিশ্বভারতী সং।. ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৪২৯
১০। ঐ পৃঃ ৪১
১১। ঐ পৃঃ ৪৪১
১২। রক্ত করবী—রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থ পরিচয়
১৩। ঐ
১৪। বাল্মীকি রামায়ণ—বালকাণ্ড, ১ম ও ২য় সর্গ
১৫। বাল্মীকি প্রতিভা—রবীন্দ্রনাথ, সূচনা
১৬। বাল্মীকি রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৪ তম সর্গ
১৭। বাল্মীকি রামায়ণ—বালকাণ্ড, ১০ম সর্গ
১৮। ব্যাস মহাভারত—আদি পর্ব, অর্জুন বনবাস পর্বাধ্যায়
১৯। চিত্রাঙ্গদা—রবীন্দ্রনাথ, সূচনা
২০। ব্যাস মহাভারত—আদি পর্ব, সম্ভব পর্বাধ্যায়
২১। ঐ—সভাপর্ব, অনুদ্যূত পর্বাধ্যায়
২২। ঐ—বনপর্ব, তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায়
২৩। ঐ—উদ্যোগ পর্ব, ভগবদ্যান পর্বাধ্যায়
২৪। প্রাচীন সাহিত্য, রামায়ণ—রবীন্দ্র রচনাবলী। বিশ্বভারতী সং। ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫০২
২৫। প্রাচীন সাহিত্য, কাব্যে উপেক্ষিতা—ঐ পৃঃ ৫১০
২৬। রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ ২১৬
২৭। কুরু পাণ্ডব, রবীন্দ্রনাথ—বিজ্ঞাপন
২৮। কুরু পাণ্ডব—রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৩৮
২৯। ঐ ঐ পৃঃ ৮৫
৩০। য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড। জন্মশতবার্ষিক সং, পৃঃ ৩৬১
৩১। কৃষ্ণ চরিত্র। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড। জন্মশতবার্ষিক সং পৃঃ ১৩৩

দ্বাদশ অধ্যায়

পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আধুনিক বাঙ্গালী জীবন

বিংশ শতাব্দীর চেতনা ।। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলন ও সমাজ সংস্কারের ধারাটি অব্যাহত ভাবে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে চলিয়া আসে নাই। বস্তুতঃ দুই শতকের জীবনযাত্রার মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য বর্তমান। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তথা বিবেকানন্দ পর্যন্ত যে যুগ, তাহার মধ্যে জাতীয় জীবনের যে উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ধর্মচেতনা ও নীতিনিষ্ঠার একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই যুগে ধর্মবোধ ও নীতিবোধের রক্ষণ-বর্জনের মধ্যে দেশের উন্নতি-অবনতির মান নির্ণীত হইয়াছে। সেইজন্য সমাজ সংস্কারের সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে ধর্মীয় অনুজ্ঞা একটি বড় উপাদান ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই বোধ হয় একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম যিনি ধর্মচিন্তার কোন নির্দিষ্ট পরিচয় না দিয়া সমাজ সংস্কারে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বস্তুতঃ এইরূপ হইবার একটি কারণও ছিল। আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদের সূচনা হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এবং তাহাও কোনরূপ প্রবল আন্দোলনের দ্বারা চিহ্নিত হয় নাই। হিন্দু মেলা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কিংবা জাতীয় কংগ্রেস নবোদগত জাতীয় ভাবধারাকে ধীরে ধীরে পুষ্ট করিয়াছে। ইহাদের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত শতাব্দীর সুদীর্ঘ অধ্যায় আত্মচিন্তা ও আত্মোপলব্ধির মধ্যে কাটিয়াছে। আমাদের জীবনধারা কর্মপ্রধান না হইয়া ধ্যানপ্রধান হইয়াছে। সামাজিক ক্ষেত্রে ধ্যানপ্রধান চিন্তার অনিবার্য পরিণতি রূপেই আমাদের স্বল্প আয়োজিত কর্মধারাগুলি আত্মচর্চা, শাস্ত্রীয় বিরোধ বিতর্ক, আচার অনুষ্ঠান ও অনুশাসনের বিধি নিষেধ লইয়া ব্যস্ত ছিল। তবে এই চেষ্টাগুলি একেবারে নেতিবাচক ছিল না বলিয়াই ইহাদের মধ্যে জাতীয় জীবনের লক্ষ্যগুলি নির্ধারিত হইয়াছে। শতাব্দীর সুদীর্ঘ অধ্যায়ে ধর্মবোধ ও ধর্ম জিজ্ঞাসার নানারূপ আলোড়ন বিলোড়ন ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে বহিরাগত খ্রীষ্টধর্ম সাময়িক আবেদন জানাইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্মের তীব্র বহ্নিশিখা ক্ষুদ্র গৃহপ্রকোষ্ঠ উজ্জ্বল করিয়া নির্বাপিত হইয়াছে, আর হিন্দু ধর্মের আচার সংস্কার বহুলাংশে

মার্জিত ও শোধিত হইয়া জাতীয় জীবনের পরম আশ্রয়রূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে।

শতাব্দীর শেষ দিক হইতে জাতীয়তাবাদের রূপটি স্পষ্ট হইতে থাকে। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য যে দেশব্যাপী আয়োজন সুরু হয়, তাহাই ক্রমশঃ জীবনের অন্যান্য দিকগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সমাজ সংস্কার অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তখন দেশের লক্ষ্যবস্তু হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সংহত প্রচেষ্টার সূত্রপাত করে। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ সারা বাংলা দেশে বিস্তৃত হইয়া ব্যাপক জনজাগৃতির সূচনা করে। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরাট বিক্ষোভ জাগিয়া উঠে, তাহার মধ্যে বাংলার জাতীয় মানস এক অভূতপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। স্বরাজচেতনার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালীর দৃপ্ত মানসভঙ্গীর নিকট দমনকারী নীতি ব্যর্থ হইয়া যায়। রাউলাট আইন, অমৃতসর হত্যা, মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। ইহার পরবর্তী পদক্ষেপ অসহযোগ আন্দোলন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ নীতি সমগ্র ভারতবর্ষে মুক্তি সাধনার নূতন পথ নির্দেশ করে। সত্যাগ্রহের নৈতিক রূপায়ণ সর্বত্র সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে ইহা যুগান্তকারী ভাববিপ্লবের সূচনা করিয়াছে। ইহার পর ১৯৩০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী লইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের নবপর্যায় সুরু হয়। ইহার অনুক্রমে '৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সূত্রপাত এবং পরিশেষে '৪৭-এর স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর মুক্তি সংগ্রামের স্থায়ী যতিপাত হয়। সুতরাং দেখা যায়, স্বাধীনতা লাভকে সম্মুখ লক্ষ্যে রাখিয়া উনবিংশ শতকের শেষ দিক এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধ দেশের সমগ্র জীবন আন্দোলিত হইয়াছে। অনিবার্য ভাবে সামাজিক জীবন চিন্তার গুরুত্বের লাঘব হইয়াছে এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থচিন্তা সামাজিক ক্ষয়ক্ষতিকে বহুলাংশে গৌণ করিয়া দেখিয়াছে।

আবার সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাটিও এই সময়ে লক্ষণীয়। শতাব্দীর নিষ্পেষণে দেশে আভ্যন্তরীণ অবস্থা একেবারে সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছিল। কোম্পানীর আমল হইতে সমাজের আর্থিক বনিয়াদটি একেবারে ধ্বসিয়া পড়ে। কোম্পানীর শাসনে দেশীয় শিল্পের যে ক্ষতি হয় এবং বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি যেভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে পরবর্তী কালের বাংলা দেশ কোনদিনই তাহা পুনরুদ্ধার

করিতে পারে নাই। আবার রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিপূর্ণ শোষণ কার্যের উদ্দেশ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে যে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রচলন করেন, তাহাতে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। এই ধারার অনুক্রমণিকা সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসে। শতাব্দীর শেষের দিকে জমিদার সম্প্রদায় নিজেদের খুসীমত খাজনা বাড়াইতে সুরু করেন। খাজনার সহিত বেআইনি নানারূপ কর আদায় করিয়া সাধারণ প্রজাবর্গকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলা হইত। ইহার প্রতিক্রিয়ায় বাংলা দেশের বহুস্থানে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইহাদের মধ্যে পাবনার কৃষক বিদ্রোহ রীতিমত ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। "খাজনা বৃদ্ধি, আবয়াব বৃদ্ধি আর জমিদারী জুলুম এই তিনের বিরুদ্ধেই এই বিদ্রোহ।"[১] বিদ্রোহ যাহাতে তীব্র না হইয়া উঠে, তাহার জন্য ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী সচেষ্ট হইয়া উঠে। লর্ড লিটন 'অস্ত্র আইন' পাশ করিয়া (১৮৭৯) বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ বলিয়া জারি করিলেন। অবশ্য বিক্ষুব্ধ প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কয়েকটি বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্যোগও চলে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং 'প্রজাস্বত্ব আইন' প্রণয়ন প্রজাদের বিপুল অশান্তি নিরসনে সাহায্য করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে প্রজা তথা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই আইনকে কয়েকবার নূতন করিয়া পরিবর্তন করা হইয়াছে। অতঃপর সাধারণ সমাজের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দানের উদ্দেশ্যে পরপর আরও কয়েকটি আইন রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে 'বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন' (১৯৩৫), 'বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিল আইন' (১৯৩৭), 'বঙ্গীয় দুঃস্থ আইন' (১৯৪৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই আইনগুলির মধ্যে যতই কল্যাণকর নীতির উল্লেখ থাকুক না কেন, সেগুলি যে জনজীবনের নগ্ন দারিদ্র ও দুরবস্থার পরিচয় দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ ক্ষেত্রে সমাজের অর্থনৈতিক সংকট কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাচেতনার মধ্যে ইহার সাংস্কৃতিক ভাবধারাগুলি যে কিছুটা ব্যাহত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার বা জনসেবার আদর্শের সহিত বিশ শতকীয় সমাজ কল্যাণ আদর্শের মৌল পার্থক্য রহিয়াছে। অর্থাৎ বিশ শতকীয় চিন্তায় জাতীয় দুর্ভরতাকে মোচন করিবার জন্য রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য উনিশ শতকের সমাজচিন্তার অণুক্রমণিকা হিসাবে বিশ শতককে গ্রহণ করা যায় না, ইহার স্বতন্ত্র জিজ্ঞাসা ও স্বতন্ত্র চিন্তা।

তথাপি একথা ঠিক, সমাজের আভ্যন্তরীণ রূপ সকল প্রকার বহিঃপ্রভাবের

মধ্যেও নিজের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিয়াছে। ইতিহাস বা সমসাময়িক চেতনা সমাজের উপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করিলেও তাহা সমাজের বৃহৎ অস্তিত্বকে একেবারে গ্রাস করিতে পারে না। ভারতীয় সমাজের এই অনড প্রকৃতি ইতিহাসের সর্বপ্রকার ঝঞ্ঝা হইতে পাশ কাটাইয়া আপন চিন্তা ভাবনা লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। রাজনীতি বা অর্থনীতি সমাজকে কোনদিনই সর্বতোভাবে গ্রাস করিতে পারে না। ভারতীয় সমাজের এই রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "দেশের উপর দিয়ে রাজ্য সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন কাড়াকাড়ি করতে লাগল, লুঠপাট অত্যাচারও কম হল না, কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে, যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে।"[২] যে শক্তিতে সমাজ আত্মরক্ষা করিয়াছে তাহা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি। পরাধীন ভারতবর্ষে সমাজের এই শক্তি একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। দোল দুর্গোৎসব, যাত্রা পার্বণ, পুকুর প্রতিষ্ঠা, মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি হাজার রকম জনকল্যাণমূলক কার্যের মধ্য দিয়া সমাজের এই শক্তিকে সজীব রাখা হইয়াছে। এই শক্তির একটি আস্তিক্য রূপ আছে, যাহা কোন প্রকার বহিঃকেন্দ্রিক প্রভাবের দ্বারা নস্যাৎ হইবার নয়। এই জন্য সুদীর্ঘ কালের পরাধীনতার মধ্যে এ দেশের বৃহৎ জনজীবনকে আপন জীবনচর্যা পরিত্যাগ করিতে হয় নাই।

আধুনিক যুগ একান্তই এই দ্বৈতচেতনার যুগ। সমাজ ও জীবনের চলচ্ছক্তি আধুনিকতার স্পর্শে, নূতন ভাবচেতনার সংঘাতে, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় একদিকে আগাইয়া চলিয়াছে, আর একদিকে তাহার রক্ষণশীল শক্তি পূর্বাপর সমগ্র জীবন সাধনার ঐতিহ্য বহন করিয়া, আস্তিক্যবোধ ও নীতিবোধকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়া আত্মমুক্তি ও জনকল্যাণকে তাহার লক্ষ্যবস্তু করিয়াছে। সমাজের গতিশীলতা তাহার নূতন সঞ্চয় ও নূতন প্রাপ্তির সিংহদ্বারে আহ্বান জানাইয়াছে; রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি, ব্যক্তি অধিকার স্বীকৃতি প্রভৃতি তাহার ফল। সমাজের রক্ষণশীলতা তাহার এই প্রাপ্তি স্বীকৃতির মধ্যে আপন সঞ্চয় ও সম্পদকে সযত্নে আগলাইয়া রাখিয়াছে। সমাজের বৃহত্তর অংশ এই শেষোক্ত প্রকৃতির ধারক এবং বাহক। সুতরাং আধুনিক যুগে যতই নবচিন্তার প্রসার ঘটুক না কেন, তাহার স্থির চিন্তাটি এই যুগপটে নূতন করিয়া প্রতিফলিত হইবে মাত্র, ইহার অবলুপ্তির কোন প্রশ্নই নাই।

পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আধুনিক বাঙ্গালী মানস।। আধুনিক বাঙ্গালী মানস নূতন চিন্তা বোধ ও জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইলেও অন্তর প্রকৃতিতে তাহার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিতে পারে নাই। উনবিংশ শতকে এই ঐতিহ্য একটি বিশেষ রূপ লইয়া জনমনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা পুরাণ কেন্দ্রিক এবং শাস্ত্র কেন্দ্রিক, জ্ঞান বা তত্ত্বকেন্দ্রিক নহে। যুক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞানের অভিনব পরিচর্যা এই যুগেও হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা জাতির আন্তর সত্তাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। এ যুগে একদিকে স্মৃতি পুরাণ তাহাদের সহস্র নির্দেশ অনুদেশ লইয়া সমাজের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে পৌরাণিক ভক্তি ধর্ম বৃহৎ লোক সমাজকে প্রাণে রসে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। উনবিংশ শতকে জ্ঞানবাদের ধারা ও ভক্তিবাদের ধারা অনেকটা স্বতন্ত্রভাবে চলিয়াছে। কিন্তু বর্তমান কালে জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আবার বৃহৎ সামাজিক অংশ জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছে। ইহা লোকমনের একটি সহজাত বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানমার্গীয় বোধ ও চিন্তা যথেষ্ট নহে। বর্তমান কালের মননশীল চিন্তাধারায় ইহা এক অদ্ভুত রক্ষণশীলতা। আধুনিক বাঙ্গালী জীবন তাহার আচার ও আচরণে পূর্ব নির্দেশকে অনেক সময় অজ্ঞাতসারেই বহন করিয়া চলিয়াছে, মননশীলতার কষ্টিপাথরে সব সময় সেগুলিকে বিচার করিয়া দেখে না। ধর্মীয় অনুজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই সহজগ্রাহ্য রূপই তাহার কাম্য, কোন নির্বিশেষ তত্ত্বে তাহার আসক্তি নাই। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগে বহুক্ষেত্রে যে অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছেন তাহার কারণ ইহাই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে উপনিষদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। বুদ্ধি-বাদের যুগে এই জ্ঞানবাদ ব্রহ্মাস্ত্র সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা মননশীল সমাজ কিছুটা প্রভাবিতও হইয়াছে। কিন্তু রামমোহন শতাব্দী সুরুতে সমাজ সংস্কারের মধ্যে জাতীয় মানসে যে ভাবের সঞ্চারণ করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথও উত্তর যুগে সাহিত্য ও জীবন সমালোচনায় বৃহৎ দেশ সমাজে সেই ভাবের সম্যক প্রসার ঘটাইতে পারেন নাই। ইহাতেই দেখা যায় লোকমানস সাধারণ ভাবে এইরূপ সূক্ষ্ম অধ্যাত্মভাবনাকে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে চাহে না। জাতীয় সংস্কৃতির যে দিকগুলিতে ধর্ম ও জীবন এক হইয়া গিয়াছে, যেখানে ভক্তি ও বিশ্বাস সর্ব প্রকার আধ্যাত্মিক সমাধান দিয়াছে ও যেখানকার নীতি-নির্দেশ ব্যবহারিক কর্মধারার দিগ্‌দর্শন হইয়াছে, সেই সব দিকেই তাহার আগ্রহ। এই জন্যই এ যুগেও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের একটি স্থায়ী আবেদন আছে। আধুনিক বাঙ্গালী

মানস স্বতন্ত্রভাবে এইগুলিকে এবং সমগ্রভাবে পৌরাণিক সংস্কৃতিকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহা আমরা আলোচনা করিতে পারি।

রামায়ণ ও আধুনিক বাঙালী জীবন ॥ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির মধ্যে রামায়ণই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার দ্বারা ভারতীয় জীবনও সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত হইয়াছে। বৈদিক যুগের পর সূত্র ও স্মৃতি যুগের সময়ে রামায়ণ রচিত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন। সেই সুপ্রাচীন কাল হইতে রামায়ণী কথা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। বেদ, সূত্র ও স্মৃতির নির্দেশ কিছু পরিমাণে সাঙ্গীকৃত করিয়া ও পরবর্তীকালের সমাজচেতনার দ্বারা আরও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হইয়া রামায়ণ একক ভাবে ভারতীয় সভ্যতার ধারাকে বহন করিতেছে। সেইজন্য প্রাচীন যুগের ধারায় ইহার যেমন উৎপত্তি, পরবর্তীকালের মধ্যেও তেমনি ইহার ব্যাপ্তি। এই পরবর্তীকাল নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইযাছে। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যে সামাজিক বিবর্তন দেখাইয়াছেন, 'তাহাতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির সহিত ক্ষত্রিয় জীবন চেতনার একটি প্রবল সংঘর্ষ ঘটিয়াছে এবং পরিশেষে পারস্পরিক গ্রহণ-বর্জন নীতিতে তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। এই সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের প্রকৃতি সমাজজীবনে স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া দিয়াছে। সেই অতীতকাল হইতে ভারতধর্ম মোটামুটি এই দুইটি মোটা খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি শত আচার সংস্কারে সমাজের উপর ক্রমশঃ চাপিয়া বসিয়াছে এবং ক্ষত্রিয় জীবন চেতনা বিচিত্র ক্রিয়াশীলরূপে সামাজিক বিপ্লব ও পরিবর্তন আনিয়াছে। ভারতধর্মের ধারায় একাধিকবার আন্দোলন-আলোড়ন ঘটিয়াছে। যেখানে উদার প্রাণ ধর্মের যোগ, সেইখানে ভারত-আত্মার একটি দিক সাড়া দিয়াছে। কিন্তু সন্ধিপত্র উল্লংঘন করিয়া সম্পূর্ণ হাত মিলাইবার উপায় নাই, কারণ সমাজ জীবন একটি স্থির লক্ষ্য গ্রহণের কথায় স্বীকৃতি দিয়াছে। ক্ষত্রিয় শক্তির বিরাট কীর্তির কথা মাঝে মাঝে ঘোষিত হইলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে ব্রাহ্মণ্য শক্তির। এই ব্রাহ্মণ্য শক্তিই কিছুটা স্বার্থ ছাড়িয়া দিয়া ক্ষত্রিয় শক্তির প্রেম ধর্মের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক জীবনচর্যায় এইজন্য ব্রাহ্মণ্য কাঠামোর প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠা। প্রেমধর্মের সাধারণ লক্ষণ ইহাতে অনুশাসনের খর্বতা, বর্ণভেদের বিলোপ, পুরোহিত তন্ত্রের প্রাধান্য হ্রাস এবং মানব ও ভগবানের একটি মধুর সম্পর্ক। বর্তমানকালে এই লক্ষণগুলি অল্প-বিস্তর প্রকাশমান। জাতিভেদ, বর্ণভেদ লুপ্তপ্রায়, পৌরোহিত্যের শাসন শৈথিল্য ইত্যাদি

মানবিক দিকগুলিতে প্রেমধর্মের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ঈশ্বর-মানব সম্পর্কটি স্থির ঈশ্বরানুভূতি অপেক্ষা অস্থির মানবানুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন মহাকাব্যের মানব নায়ক যেমন ঈশ্বরের অবতার হইয়াছেন, তেমনি বর্তমান কালে মানব পূজাকেই পরম মূল্য দেওয়া হইয়াছে। মানবের পূজা ঈশ্বরের পূজা —ইহাই ত বর্তমানকালের উপলব্ধি। এই লক্ষণগুলিতে ক্ষত্রিয় ধর্মের সেই প্রসারণশীলতা (elasticity) প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম বহু উদার হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নীতি-শৃঙ্খলাকে মানিয়া লইয়াছে। বর্তমান সমাজে এই উদারতা, জাতি বর্ণ বিলোপকারী চেতনা যতই গভীর হইয়া দেখা দিক, ইহার আভ্যন্তরীণ দিক ব্রাহ্মণ্য চিন্তার উপর ভর করিয়া আছে। সেইজন্য সমাজের অন্তর্নিহিত এই শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া শুধুমাত্র ব্যক্তি মানবকে অতিমূল্য আরোপ করিতে গিয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান যুগচিন্তায় দেশ জীবন যেমন সামাজিক রীতি নীতির সংস্কার চাহিয়াছে, তেমনি সংস্কার মার্জনার মধ্যেও কতকগুলি মৌল সত্যকে টিকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছে। জাতীয় চিন্তায় ইহাকে ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রভাব বলা যায়। এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সেই রামায়ণের যুগ হইতে সহস্র সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যেও অদৃশ্যভাবে সমাজের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

রামায়ণে রামচন্দ্রের ভগবানরূপে এবং মানবরূপে দুইটি স্বতন্ত্র আবেদন আছে। দেবকল্প চরিত্র যে দেবতা বা ঈশ্বরের অংশ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণ উভয় চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়। সেইজন্য দেশ জাতি পৃথক ভাবে ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বর মহিমা অনুসন্ধান করিতে চাহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, একবার এই অবতারবাদ স্বীকৃত হইলে প্রচারের দ্বারা তাহাকে সর্বজনমনে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাপক আয়োজনও হইয়াছে। এইজন্য রামচন্দ্রকে ঘিরিয়া ক্রমে ক্রমে নূতন ধর্ম গঠিত হইয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধেও তাহাই। ইহাই ইতিহাসের রামভক্তি শাখা এবং কৃষ্ণভক্তি শাখা। ভারতীয় মন অদ্ভুত দ্বৈতবোধের দ্বারা চালিত হইয়াছে। সে মানবসীমায় অতি মানবিক কৃতিত্ব দেখিতে চাহিয়াছে আবার পরমুহূর্তেই তাহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ না করিয়া পারে নাই। একবার ভক্তির বন্যা নামিলে সংশয় ও বিচারবোধ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সেইজন্য মানব রামচন্দ্র ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। এই রামভক্তি 'রামায়েত ধর্ম' এই বিশিষ্ট নামে অভিহিত হইয়া সম্প্রদায় বিশেষের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্রের অবতারত্ব অসম্পূর্ণ বোধ হওয়ায়

পরবর্তীকালে অধ্যাত্ম রামায়ণও রচিত হইয়াছে। ইহাতে রামচন্দ্রের পূর্ণ ব্রহ্মরূপ প্রতিষ্ঠা এবং রামায়েত ধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রামানন্দের দ্বারা এই ধর্ম প্রথমে সুষ্ঠু ভাবে প্রবর্তিত হইলে পরবর্তীকালে কবীর, নানক, দাদূ এই ধারাকে সমগ্র উত্তর ভারতে সার্থকভাবে বিস্তৃত করেন। শ্রীপ্রবোধ সেন রামায়েত ধর্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও ভারতীয় মনে ইহার সুবিপুল প্রভাব সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন সামাজিক বর্ণলোপের দ্বারা সামাজিক সাম্যস্থাপন, নৈতিক প্রবর্তনা দ্বারা পৌরুষের উদ্দীপন ও দেশের চিত্তকে উন্নততর ও মহত্তর আদর্শের প্রতি আকর্ষণ, ধর্মক্ষেত্রে কর্মনিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার আদর্শ স্থাপন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবভাবের উজ্জীবন ও হিন্দী সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার দ্বারা রামানন্দের রামায়েত ধর্ম যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রামায়েত ধর্মের তরঙ্গোদ্ভূত তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'ই বোধ হয় সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় গ্রন্থ যাহা দেশের সুবিপুল জনসমাজের চিত্ত জয় করিতে পারিয়াছে।

বাংলা দেশে এই প্রভাব ততটা ক্রিয়াশীল নহে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করিয়াছেন। "বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হর-গৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"[৫] রামচন্দ্রের উদাত্ত পৌরুষ ও উদার চারিত্রধর্মকে বাঙ্গালী অন্তর মনে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া তিনি ক্ষোভ করিয়াছেন। ইহা অতি সত্য কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য হয়ত এই যে, সে যতই বিরাট আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া দিক, সেই আদর্শকে জীবনে অনুসরণের অপেক্ষা তাহার নাম উচ্চারণের মধ্যেই সার্থকতা খুঁজিয়া দেখে। ইহা তাহার অতিরিক্ত মাত্রায় মন্ময় প্রকৃতির ফল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই নাম মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। দস্যু রত্নাকর যে রাম নাম উচ্চারণ করিয়া উদ্ধার লাভ করিয়াছে, ইহা বাঙ্গালীকে নামগুণগান করিতেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কেও তাহার একই দৃষ্টিভঙ্গী। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনাদর্শ ছিল "আপনি আচরি ধর্ম, জীবেরে শেখায়।" বাঙ্গালী নিজের জীবনে এই আচরণ কতখানি করিয়াছে তাহা সন্দেহের বিষয়; কিন্তু মহাপ্রভুর নামসংকীর্তনে তাহার অবহেলা নাই। অনুরূপ ভাবে রামাদর্শের অনুবর্তন অপেক্ষা রামনাম উচ্চারণ তাহার কাছে শ্রেয়

হইয়াছে। রামনাম তাহার কাছে মুক্তিমন্ত্র। গভীর শঙ্কায়, ত্রাসে ও বিভীষিকায় এই রামনাম উচ্চারণ করিয়া সে স্বস্তি পাইতে চাহিয়াছে।

তথাপি রাম নাম মাহাত্ম্য, রামের ঐশী মহিমা যতই গভীর হউক, রামায়ণের মানবিক আবেদন যে চিরকালের মানুষের কাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামায়ণের কবি রামকে মানুষ করিয়াই আঁকিয়াছেন। উত্তর যুগ ভক্তির বিল্বদলে তাঁহাকে অবতারত্বে ভূষিত করিলেও তাঁহার মানবসত্তাটি নিষ্প্রভ হয় নাই। এই অত্যুজ্জল মানবচরিত্র দেশবাসীর সমক্ষে একটি উন্নত ও মহৎ জীবনাদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছে। রামের মধ্যে মানব দুর্লভ গুণরাজির সমাবেশ হইয়াছে। এমনভাবে বীর্যের সহিত ক্ষমা, ঐশ্বর্যের সহিত বিনম্রতা, দৈন্যের মধ্যে অনবনত চেতনা, সম্পদ অধিকারে ত্যাগশীলতা, বিপদে নির্ভীকতা, এমন প্রাপ্তির প্রতি উপেক্ষা, ত্যাগের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, এমন মহাদুঃখ গ্রহণে অনুদ্বেলিত চিত্ত সংসার সীমায় দুর্লভ। রামের সমগ্র জীবন মানব চরিত্রের নিরঞ্জন রূপ প্রকাশের পরীক্ষা ক্ষেত্র এবং তিনি তাহাতে সগৌরবে উত্তীর্ণ। মানুষের কাছে চিরদিনই একটি ধ্রুব আদর্শের লক্ষ্য থাকে। সে আদর্শে পৌঁছাইবার পথ ভিন্ন জনে ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিলেও তাহার প্রতি নিষ্ঠা বা আনুগত্য কাহারও কম নহে। সে দিক হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে রামায়ণের মর্যাদা। সেখানে বাঙ্গালী মানস ভারতীয় চেতনা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।

রামায়ণের এই মানব মহিমা দুইটি দিক দিয়া বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটি ইহার গার্হস্থ্য আদর্শে ও অপরটি রামায়ণী নীতিতে। গার্হস্থ্য আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয়: "রামায়ণের আদি কবি, গার্হস্থ্য প্রধান হিন্দু সমাজের যত কিছু ধর্ম রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে, ব্রাহ্মণ ধর্মের রক্ষাকর্তারূপে, অবশেষে রাজারূপে বাল্মীকির রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।........ নিজের সমুদয় সহজ প্রকৃতিকে শাস্ত্রমতে কঠিন শাসন করিয়া সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। আমাদের স্থিতিপ্রধান সভ্যতায় পদে পদে যে ত্যাগ ক্ষমা ও আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয়, রামের চরিত্রে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়া রামায়ণ হিন্দু সমাজের মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।"[৬]

বস্তুতঃ গার্হস্থ্য আদর্শের এমন উজ্জল প্রতিষ্ঠা আর কোথাও নাই। ন্যায় বিধান, কর্তব্য পালন, স্বার্থত্যাগ—এইগুলি গার্হস্থ্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পারিবারিক গোষ্ঠীর প্রয়োজন। রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন দিক হইতে এই গার্হস্থ্য ধর্মের উপর আলোকপাত করিয়াছেন।

স্বয়ং রামচন্দ্র সুকঠোর জীবন চর্যায় ইহার মূল সূত্রধার, অনুজ লক্ষ্মণ, ভরত তাঁহারই উত্তর সাধক। অবিচল নিষ্ঠা ও নীরব কর্তব্য বহনে ইঁহারা আপন আপন সীমারেখায় রামের আদর্শকেই বহন করিয়াছেন। সীতার পাতিব্রত্য, কৌশল্যার বাৎসল্য, হনুমানের প্রভুভক্তি সব কিছুর মধ্য দিয়া গৃহধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। রামায়ণের যদি কিছু 'মিশন' থাকে, তাহা এই গার্হস্থ্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা, মহাভারতের 'মিশন' যেমন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। ধর্মরাজ্যের ক্ষেত্র পাত্র এত বিরাট ও বিস্তৃত যে তাহাদিগকে ব্যক্তি চিত্তের সীমায় গ্রহণ করা কঠিন। জাতির সামগ্রিক আদর্শ ও প্রচেষ্টার দিক হইতে মহাভারতের মূল্য যেমন বেশী, ব্যক্তি জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যে রামায়ণের মূল্যও তেমনি অধিক। মহাভারতে ব্যক্তি যেখানে পূজিত হইয়াছেন, ব্যক্তি মানুষের মহৎ গুণেই তিনি সেখানে অর্চিত। মহাভারতী উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করিবার পথে তাঁহারা যে অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদিগকে একান্ত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। কুরুক্ষেত্র মহাসমর না হইলেও শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্র অসমুজ্জল হইত না। তবে মহাভারতে যুদ্ধ বিগ্রহ রাষ্ট্রনীতির বিক্ষোভ ঝঞ্ঝা এত অধিক যে ব্যক্তি মহত্ত্ব বহু ক্ষেত্রেই বৃহৎ কর্মাবর্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। রামায়ণ সেদিক হইতে অনেকখানি ব্যক্তি প্রধান। রাবণের সহিত সংঘর্ষে ও রাবণবধের মধ্যে রাম-চরিত্রের মহত্ত্ব পৃথক ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। সমগ্র জীবনের মধ্যে রামচন্দ্র যে সুকঠোর সাধনা ও সত্যধর্ম পালন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে রণবিজয়ীর গৌরব হইতে অধিক মহত্ত্ব দান করিয়াছে।

রামায়ণে গার্হস্থ্য ধর্মের পরিপূরক ইহার নীতিধর্ম। এ সম্পর্কে ডঃ দীনেশ সেন বলিয়াছেন, "পরিবারের গণ্ডীই ধর্মের সুপ্রশস্ত আঙিনা। এই পারিবারিক ধর্মের পথ কুসুমাকীর্ণ নহে। ভিক্ষু ধর্মের কঠোর পথ পরিহার করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন উপভোগ করিবার জন্য পারিবারিক ধর্ম পরিকল্পিত হয় নাই। মুণ্ডিত শির হইয়া উপবাস ও ব্রতাদি পালন পূর্বক ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হওয়া অপেক্ষা গৃহের জীবন্ত দেবতাদের সেবা উৎকৃষ্ট ইহাই রামায়ণের প্রতিপাদ্য।"[১] বস্তুতঃ এই নীতির একটি সুকঠিন সাধনা আছে। তাহা আনুষ্ঠানিক তপস্যার কৃচ্ছ্রতা হইতে কম গৌরবের নহে। আমাদের পারিবারিক বন্ধন এখনও যে সম্পূর্ণ শিথিল হয় নাই তাহার কারণ পরিবার পরিজন সম্পর্কে আমরা একেবারে নীতিভ্রষ্ট হই নাই। জীবনের দুইটি চূড়ান্ত দিক লক্ষ্য করা করা যায়—একটি, সমাজ সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু জীবন ও সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ, অপরটি আত্মজীবনকে সুখী করিবার

উদ্দেশ্যে একান্ত আত্মকেন্দ্রিকতা। বৌদ্ধ বিপ্লব ও বৌদ্ধ প্রভাব সঞ্জাত ভারতীয় মনে এই কর্তব্যবিমুখ বৈরাগ্য দেখা দিয়াছিল। আবার সাম্প্রতিক কাল আত্মকেন্দ্রিকতাকে পোষণ করিতেছে। এই উভয়বিধ জীবন ধারার প্রতিবাদ আছে রামায়ণে। রামায়ণ বিপুল প্রভাবরূপে জনচিত্তকে যেমন বৈরাগ্যের অসারতা দেখাইয়াছে, তেমনি আজিও তাহার আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যর্থতা দেখাইবে। আজিও বৃহৎ গ্রামীণ জীবনে একান্নভুক্ত পরিবারের নিয়মশৃঙ্খলা একেবারে শেষ হয় নাই, আতিথেয়তা, সেবা, দান দেশের মাটি হইতে একেবারে লোপ পায় নাই।

রামায়ণের আন্তর ধর্মের এই বৃহৎ আদর্শ ছাড়াও ব্যবহারিক জীবনের নীতি ও সদাচারের বহু নির্দেশ ইহাতে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে হোম, যজ্ঞ, পূজা, স্বস্ত্যয়ন, মানসিক ইত্যাদি গৃহ ধর্মের আবশ্যিক অনুষ্ঠানগুলির উল্লেখ আছে। অবৈধ ও অধর্ম কার্য সম্বন্ধেও ইহাতে যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। পাদ দ্বারা শয়ানা গাভীকে তাড়না, পাপী ব্যক্তির কার্যস্বীকার, কর্মান্তে ভৃত্যকে বেতন না দেওয়া, ষষ্ঠাংশ কর লইয়াও প্রজা পালন না করা, গুরুনিন্দা, মিত্রদ্রোহিতা, পরনিন্দা কথন, প্রত্যুপকার না করা, পরিজন পরিবৃত হইয়া নিজে উৎকৃষ্ট অন্নভক্ষণ করা, অনুগত ভৃত্যকে পরিত্যাগ করা, সর্বদা মদ্য, স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত থাকা ইত্যাদি অসংখ্য অবৈধ কর্মের উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া যায়।[৮] তখন সবে মাত্র অনুশাসনের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। উত্তরোত্তর ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রাধান্যে রামায়ণের এই অনুশাসন-নির্দেশগুলি আরও কঠোর হইয়া যায়। এই অনুশাসন ও নীতিগুলি বহু যুগ ধরিয়া আমাদের সামাজিক সম্পর্ককে অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আধুনিক জীবন ইহাদিগকে বিদায় দিতে পারে নাই।

পরিশেষে রাষ্ট্রীয় চেতনার দিক হইতে রামরাজ্যের আদর্শ আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। বাঙ্গালী জীবন বৃহৎ ভারতীয় জীবনচিন্তার সহিত সুর মিলাইয়া রামরাজ্যের কল্পনাটি পোষণ করিয়াছে। অবশ্য রামরাজ্য কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়, হয়ত ইহা একান্তই কল্পনা লালিত, কাল্পনিকতা প্রসূত। রামরাজ্যের বাস্তব বিমুখ কল্পনার দিকে দৃষ্টি দিয়া মনস্বী লেখক প্রবোধচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, "বস্তুতঃ রামরাজ্য হচ্ছে শক্তি হীনের কল্পনাবিলাস, কর্মহীনের আত্মবঞ্চনা, অসহায়ের সান্ত্বনাস্থল। রামরাজ্য কল্পনার মূলে যদি পৌরুষ সংকল্পের বেগ থাকত তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসই অন্যরূপ ধারণ করত।"[৯] তবে ইহার একটি কল্যাণকর প্রভাবের কথাও তিনি

আলোচনা করিয়াছেন: "রামরাজ্যের কল্পনা ভারতীয় জনচিত্তকে মোহাচ্ছন্ন ও নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল বটে, কিন্তু একটা বিশেষ উপকারও করেছিল। একই স্বপ্ন জালের বেষ্টনে আবদ্ধ করে এই কল্পনা সমগ্র ভারতীয় জনচেতনায় যে ঐক্য সঞ্চার করেছিল তার গুরুত্বও কম নয়।"[১০] বস্তুতঃ রামরাজ্য কল্পনার ইহাই বাস্তব প্রভাব। সমগ্র ভারতবাসী যে রাজনৈতিক দিক হইতে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হইতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার মূলে রামরাজ্যের মত একটি আদর্শ রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা থাকা স্বাভাবিক। গান্ধীজী ভারতমনের সেই সংগুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই নবভারতের পুরোধারূপে পরিগণিত হইয়াছেন। এইভাবে দেখা যায় ব্যক্তি জীবন গঠনে, সাংসারিক ও সামাজিক নীতিনির্দেশ পালনে, জীবন সম্বন্ধে একটি সমুন্নত আদর্শ স্থাপনে এবং আদর্শ রাষ্ট্রের ধ্যান কল্পনায় রামায়ণের প্রভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত জাতীয় জীবনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এইরূপ বৃহৎ কাজ করিয়াছে বলিয়া রামকাব্য সর্বভারতে এতখানি বিস্তৃত হইয়াছে। কালিদাসের রঘুবংশ যেমন ইহার একটি স্মারক স্তম্ভ, তুলসী দাসের রামচরিত মানস তেমনি আর এক বিজয় বৈজয়ন্তী। বাংলার কৃত্তিবাসও সেই ধারা রক্ষা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে স্থান কালের কিছু ব্যবধান আছে বলিয়াই রাম অয়নের রূপ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইয়াছে। রঘুবংশের কবির রাজসিক আয়োজন, তুলসীদাসের ভক্তির চন্দনচর্চা, কৃত্তিবাসের ভক্তি ও প্রীতির অশ্রু আরাধনা। কৃত্তিবাসের দৃষ্টিই বাঙ্গালীর দৃষ্টি। পল্লীবাংলার নিভৃত কুটিরে, উন্মুক্ত প্রান্তরে আজিও যে রামায়ণ গান হয়, তাহার মধ্যে এই ভক্তি ও অশ্রুর একাকার। আধুনিক জীবনের বহিরাবরণের অন্তরালে শাশ্বত বাঙ্গালী জীবন রামায়ণী কথাকে একটি শক্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।

মহাভারত ও আধুনিক বাঙ্গালী জীবন ।। মহাভারত নিঃসন্দেহে ভারতীয় জীবনের অন্তর ইতিহাস। সামাজিক ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি, লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি, দার্শনিক চিন্তাবোধ, শিক্ষা সাধনা প্রভৃতি জীবনের সকল দিক স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে মহাভারতে। বৈদিক যুগের পরবর্তীকালীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাধান্য মহাভারতেও পরিদৃশ্যমান। তৎকালীন যুগের পটভূমিকায় বা স্থান কাল পাত্রের দৃষ্টিভংগীতে মহাভারতের বহু আখ্যান ও বিবরণকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু তাহার মধ্যেই ইহা চিরকালের ভারতবর্ষকে তুলিয়া ধরিয়াছে। ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষের সাধনায় ভারতবর্ষ যে জীবনচর্যাকে পরম মূল্য দিতে চাহিয়াছে, মহাভারতে তাহাই চিত্রিত। কালের ব্যবধানে

বর্তমান যুগ সে যুগ হইতে অনেক দূরে সরিয়া আসিলেও ব্যষ্টি ও সামাজিক জীবনের অনুসৃত কতকগুলি মৌল আদর্শবোধকে সে একেবারে বিস্মৃত হইতে পারে না। পরন্তু মহাভারতের অদ্ভুত বৈচিত্র্য, বিপুল মানব মহিমা, জীবন সম্বন্ধে সমুন্নত ধারণ', ব্যবহারিক জীবনে নীতিবোধের সযত্ন পরিচর্য' ইত্যাদির মধ্য দিয়া বর্তমান কাল মহাভারতী জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।

মহাভারতে যে চরিত্ররাজির সম্মুখীন হওয়া যায়, তাহাদের রূপ বৈচিত্র্য ও ভাববৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে। ইহাতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, বিদুর, গান্ধারী প্রভৃতি সুমহান চরিত্র আছে, তেমনি দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি মনুষ্যধর্ম বিরোধী চরিত্রও আছে। ইহাতে দৈব ও পুরুষকারের বিচিত্র মিশ্রণ দেখা যায়। পুরুষকার চেতনাটি বর্তমানকালে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছে। মহাভারতে ন্যায়ের শংখকে যেমন অনেকেই তুলিয়া ধরিয়াছেন, অন্যায়ের পরিপোষকও তেমনি অনেকেই ছিলেন। অন্যায়ের পক্ষে এত লোকবল ছিল বলিয়াই ত দুর্যোধন কুরুক্ষেত্র সমরে নামিতে পারিয়াছিলেন। এই সমস্ত চরিত্র আধুনিক যুগে বিরল নহে। ইহাদের স্বরূপ ও ক্রিয়া সবই বর্তমান যুগে অব্যাহত। ন্যায় অন্যায়ের নিত্য বিরোধ এবং ইহার জন্য ন্যায়ের লাঞ্ছনা বর্তমান জীবনে অনিবার্য। মহাভারতের অগণিত চরিত্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে আহৃত হইয়াছে। আমাদের সংসার জীবনে পরিদৃষ্ট সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দের বিচিত্র শোভাযাত্রাকে আমরা অনায়াসে ইহার বিচিত্রতার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে পারি এবং মহাভারতী চরিত্রের আলোকে তাহাদের চিনিয়া লইতে পারি।

মহাভারতে মানুষের জয়গান উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত। এ মানুষ নিত্য মানুষ। সত্য বটে ইহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অনেক অলৌকিক কথার অবতারণা রহিয়াছে, দেবতা ও দেবলোকের অমৃত স্পর্শে ইহার পটভূমি অভিষিক্ত, কিন্তু তাহাদিগকে উপলক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তাহাদের দ্বারা মানুষই নন্দিত হইয়াছে। দেবতা ও মানুষের অবাধ মেলামেশা, মানুষের প্রয়োজনে দেবতার আগমন, দেবতার প্রয়োজনে মানুষের অভিযান, চিত্তের-পবিত্রতা ও চরিত্রের পরিশুদ্ধিতে দেবতার আশীর্বাদ লাভ আবার অসংযত আচরণ ও চরিত্র ধর্মের অশুচিতে মহতী বিনষ্টি সবই সমগ্রভাবে মানবচরিত্রকে আলোকিত করিয়াছে। এই আলোকিত চরিত্র দেবত্বের মহিমাযুক্ত। এইজন্যই বোধ করি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও গান্ধারী অভিশাপ দিতে পারিয়াছিলেন। মানবিক ক্ষয় ক্ষতি, ত্রুটি বিচ্যুতি, পাপ দুর্বলতা সব কিছু লইয়া যে নর জীবন, মহাভারত তাহাকেই পরম নিষ্ঠার সহিত অঙ্কিত

করিয়াছে। বর্তমান যুগে মানব মহিমার ঘোষণায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব ও তাহার নিষ্কলুষ চারিত্রধর্ম এত অস্পষ্ট যে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়। মানুষের প্রতি মানুষ বিশ্বাস হারাইয়াছে, তাহার চারিত্রধর্মে কলঙ্ক লাগিয়াছে। কলুষ কালিমাময় জীবন পরিবেশ হইতে নিত্য মানুষকে খুঁজিয়া লইতে হইলে তাহার সেই মানবিক অভিজ্ঞানগুলি দেখিতে হইবে। এইজন্য মহাভারত যে চরিত্রমালাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমাদের আকর্ষণ অম্লান রহিয়া গিয়াছে।

চিরকালের এই আদর্শ মানুষ জীবনের কতকগুলি শাশ্বত সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছে। সেগুলি মহাভারতের যুগে যেমন সচল, আজিও তেমনি অর্থবহ। মহাভারত দেখাইয়াছে ইহলোক ও পরলোকে স্থিতির অনুকূল যে আচরণ তাহাই ধর্ম।[১১] যাহা দ্বারা ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে লোকস্থিতি বিধৃত অর্থাৎ যাহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেকের জীবনযাত্রা চলিতেছে অথবা যে বস্তু সাধু উপায়ে অর্থকামাদি-লাভের সহায়ক, তাহার নাম ধর্ম।[১২] সমস্ত জগতের সুখদুঃখের সহিত আপনার সুখদুঃখের অনুভূতিকে মিশাইয়া দেওয়াই মহাভারতের মতে পরম ধর্ম।[১৩] এই ধর্মের অনুশীলন ও পরিচর্যা এবং ইহার বিরোধী চেতনার ক্ষয় ও তাহার প্রতি জুগুপ্সা সৃষ্টি মহাভারতে ছত্রে ছত্রে বর্ণিত হইয়াছে। গান্ধারীর সেই বিখ্যাত উক্তি মহাভারতের মর্মবাণী বহন করিতেছে—যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। বস্তুতঃ এইরূপ ধর্মাচরণের মধ্যেই জীবনের পরম সার্থকতা সূচিত হয়।

মহাভারতের কর্মকোলাহলের মধ্যেও ব্যষ্টি জীবনের এক একটি দিক অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেই কর্মে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর প্রভৃতি চরিত্র স্ব স্ব জীবনে ও আচরণে এই ধর্মের ধ্বজাই বহন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ধর্মের সহিত কর্মের এক অদ্ভুত সহিতত্ব রচিত হইয়াছে। কর্ম যেখানে ধর্ম বিমুখ, প্রবৃত্তি যেখানে উন্মার্গগামী সেখানে কোন শুভ ফলাফল ঘটিতে পারে না। গীতার শেষ শ্লোকে এই কথা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে—যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর পার্থ মিলিত হইয়াছেন, সেখানেই শ্রী সম্পদ ও জয় রহিয়াছে।

বস্তুতঃ এই সত্যই জীবনের আলোকবর্তিকা। বর্তমান যুগে কর্মের অপূর্ব আবেদন জাগিয়াছে। প্রতিটি মানুষকে কর্মপ্রবাহে নামিতে হইয়াছে। কিন্তু এই কর্মকে জ্ঞানশূন্য, ভক্তিশূন্য বা যোগশূন্য করিলে তাহা অনর্থ ডাকিয়া আনিবে। সেইজন্য আধুনিকযুগের কর্ম ব্যাখ্যায় গীতোক্ত নিষ্কামধর্মের সুবিপুল আবেদন

রহিয়াছে। পুরাণ ও স্মৃতি যেমন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একই আচার ধর্মকে গণসমাজ ও সারস্বত সমাজে বিভিন্ন ভাবে পরিবেশন করিয়াছে, তেমনি মহাভারতের কথা, কাহিনী ও চরিত্র গণসমাজকে পুষ্ট করিয়াছে এবং ইহার দার্শনিক তত্ত্ব-জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির গূঢ় অর্থ সারস্বত সমাজকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। গীতার নিষ্কাম তত্ত্ব, ইহার ওজোময় কর্মবাদ, ইহার অহং বিমুক্ত সমর্পণ বাণী দেশজীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকগণ গীতাকেই তাঁহাদের কর্মপ্রেরণার উৎসরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। একাধারে কর্মাসক্তি ও কর্মফলত্যাগ, ঈশ্বর বিভূতি ও মানব প্রজ্ঞার পরিচয়, স্বধর্মাচরণের নিষ্ঠা ও বৈশ্বিক বিধানের অমোঘ ফলশ্রুতি—এক কথায় মানুষের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধির নির্দেশ দান করিয়াছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা। এইজন্য আজিও ইহা লক্ষকোটি মানুষের নিত্যপঠিত ধর্মপুস্তক।

মহাভারতের অসংখ্য উপাখ্যান ও কথোপকথনের মধ্যে নীতিধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগের উল্লেখ আছে। যযাত্যুপাখ্যান, সেনজিতুপাখ্যান, উষ্ট্রগ্রীবোখ্যান, শাকুলোপাখ্যান, চিরকারিকোপাখ্যান প্রভৃতি উপাখ্যানে, যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদ, বিদুর-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ, শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ, ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদ প্রভৃতি সংলাপ কথোপকথনে এবং শ্রীকৃষ্ণ বাক্য, ব্যাস বাক্য, যুধিষ্ঠির বাক্য, বিদুর বাক্য, প্রভৃতি সুভাষিতাবলীতে প্রচুর নীতি উপদেশ কথিত হইয়াছে।[১৪] এই নীতিগুলি স্থান কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, ইহা সেই যুগের মত এই যুগেও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণীয়।

ভারতীয় চিত্তে মহাভারতী নির্দেশ ও অনুজ্ঞা স্বাভাবিকভাবে অনুবর্তিত হইয়াছে। ব্যক্তিসংস্কারের মত ইহা জাতীয় সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। এত স্বাভাবিক ভাবে এই প্রভাব জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছে যে ইহাকে অনুভব করিবার জন্য পৃথকভাবে ইহার অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যিক ভারতীয় জীবনের উপর মহাভারতের প্রভাব সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন :

ভারতের কোটি কোটি নিরক্ষরের মনও মহাভারতীয় কাহিনীর রসে লালিত। ভারতীয় চিত্রকরের কাছে মহাভারত হলো রূপের আকাশ পট, ভাস্করের কাছে মূর্তির ভাণ্ডার। গ্রাম ভারতের কথক ভাট চারণ ও অভিনেতা, সকল শ্রেণীর শিল্পী মহাভারতীয় কাহিনীকে তার নাটকে সংগীতে ও ছড়ায় প্রাণবান করে রেখেছে। মহাভারতের কাহিনী এবং কাহিনীর নায়ক নায়িকার চরিত্র ও রূপ ভারতীয় ভাস্কর স্থপতি চিত্রকর নাট নর্তক ও গীতকারের কাছে তার শিল্প

সৃষ্টির শত উপাদান, ভাব, রস, ভঙ্গী, কারুমিতি ও অলংকারের যোগান দিয়েছে। মহাভারত গ্রন্থ প্রতিশব্দ, উপমা ও পরিভাষার অভিধান। ভারতের জ্যোতির্বিদ মহাভারতীয় নাযক'নায়িকার নাম দিয়ে তাঁদের আবিষ্কৃত ও পরিচিত গ্রহ-নক্ষত্র-উপগ্রহের নামকরণ করেছেন।....মহাভারতীয় কাহিনীর নায়ক-নায়িকার নাম হলো ভারতের শত শত গিরি পর্বত নদ নদী ও হ্রদের নাম। ভারতীয় শিশুর নাম-পরিচয়ও মহাভারতীয় চরিত্রগুলির নামে নিষ্পন্ন হয়।[১৫]

এইভাবে মহাভারতী কথা বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমানভাবে আবেদন জানাইয়াছে। মহৎ সাহিত্যরূপে ইহা প্রকৃতই জনজীবনের সহিত সহিতত্ব রচনা করিয়াছে। ইহাতে 'মহা'ভারতবর্ষের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী মানস তাহার মধ্যে নিজের চিন্তাভাবনা আরোপ করিয়া ভারত জীবনের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়াছে। তবে তাহার মনোপ্রকৃতি অনুসারে মহাভারতীয় বীর্য ও গাম্ভীর্যকে সে বহুলাংশে কোমল ও নমনীয় করিয়া লইয়াছে। তাহাতে মহাভারতের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইহার করুণ ও বিমর্ষ-ম্লান চরিত্রগুলিকে সে আরও সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিয়াছে। কাশীরাম দাস বা কৃত্তিবাসের লোকপ্রিয়তার কারণ এইখানেই। আর সেইজন্য বাংলা সাহিত্যে মহাভারতী বা রামায়ণী উপাদানে রচিত কাব্য নাটকাদিতে ইহাদের চরিত্রের মর্মস্পর্শী দিকগুলিই বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কর্ণ কুন্তীর বিড়ম্বিত জীবন, শকুন্তলার প্রেম ও প্রত্যাখ্যান, কৌরব বিয়োগ, সাবিত্রী সত্যবানের করুণ কাহিনী, গান্ধারীর মর্মস্পর্শী আবেদন, শর্মিষ্ঠার ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ বর্জন ইত্যাদি মহাভারতীয় ও রামায়ণী কাহিনীই বাংলা সাহিত্যের আসর জুড়িয়া আছে। বাঙ্গালী জীবনের মধ্যে একটি সংগুপ্ত বেদনাবোধ আছে। সেই বেদনার দৃষ্টিতেই তাহার কাব্য ও সাহিত্য। তাহার মাধুর্য উপভোগেও বেদনা, বিচ্ছেদ সহনেও বেদনা। তাহার গীতি কবিতা এই বেদনার স্বচ্ছ স্ফটিক, তাহার মহাকাব্য ইহার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে সেইজন্য সে দুর্বৃত্ত দমনকারী মহৈশ্বর্যময় পুরুষ বলিয়া সব সময় ভাবিতে পারে নাই। মানবিক বেদনার পরম নিরাময় রূপেই সে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়াছে। এইজন্য কৃষ্ণ কেন্দ্রিক কথা:-কাহিনী বা কাব্যনাটকের ফলশ্রুতি সর্বত্রই আত্মসমর্পণ। উদ্ধত আসুরীশক্তি পরাভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়াছে। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী মানস তাহার সাহিত্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছে।

স্মৃতি পুরাণ ও আধুনিক বাঙালী জীবন ।। আধুনিক বাঙ্গালী জীবনে পুরাণ প্রভাব বহুলাংশে স্মৃতি অনুশাসনের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত। বাংলাদেশের সামাজিক বিধানগুলি আজ পর্যন্ত স্মৃতি নিয়ন্ত্রিত। স্মৃতি গ্রন্থগুলিকে দুই ভাবে ভাগ করা যায়। একটি প্রাচীন স্মৃতি; অপরটি নব্যস্মৃতি। মনু কিংবা যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ ঋষিবৃন্দ শ্লোকাকারে যে গ্রন্থগুলিতে ধর্মকার্য সংক্রান্ত এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচার আচরণের রীতিনীতি ব্যক্ত করিয়াছেন, সেইগুলি হইল প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থ। ইহা ছাড়া আপস্তম্ব, বৌধায়ন, গৌতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি কর্তৃক সূত্রাকারে গ্রথিত ধর্মসূত্রগুলিও প্রাচীন স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত। ইহার পর নব্যস্মৃতির উদ্ভব। নব্যস্মৃতি রচনার কারণ হইল প্রথমতঃ স্মৃতিনিবন্ধকারদের নিজ নিজ প্রতিভা অনুযায়ী স্মৃতি অনুশাসনগুলিকে নূতন রূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা অঞ্চল বিশেষের রীতি নীতি ও সামাজিক অবস্থার সহিত স্মৃতিশাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন।[১৬] বাংলাদেশে এই নব্য স্মৃতির উল্লেখযোগ্য অনুশীলন ঘটিয়াছে। বাংলার নব্য স্মৃতির যুগকে পণ্ডিতগণ তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন—প্রাক্ রঘুনন্দন যুগ, রঘুনন্দন যুগ এবং ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির যুগ। ইহাদের মধ্যে রঘুনন্দন যুগই সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। বলিতে গেলে, বাংলাদেশের সমাজ রঘুনন্দনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের যে গ্রন্থগুলি স্মৃতি অনুশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেগুলি হইল, স্মৃতি তত্ত্ব, অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব, দায়ভাগ টীকা, তীর্থ যাত্রাতত্ত্ব, দ্বাদশ যাত্রাতত্ত্ব, গয়া শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, রাস যাত্রাপদ্ধতি, ত্রিপুষ্কর শান্তিতত্ত্ব, গ্রহযাগতত্ত্ব ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে স্মৃতিতত্ত্বের বিষয়বস্তু ও তাহার আলোচনা রঘুনন্দনকে বাংলাদেশের স্মার্ত শিরোমণি করিয়া তুলিয়াছে। রঘুনন্দন স্মার্ত প্রভাবকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ধারায় ক্ষয়িষ্ণুযুগে নব্য স্মৃতি গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দনের আবির্ভাব এবং ইহার পরবর্তীকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির যুগ বলিয়া ধরা হয়। যদিও এই যুগের লেখককুলের মধ্যে রঘুনন্দনের সমতুল্য প্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই, তাহা হইলেও তাঁহারা স্বল্প প্রতিভায় স্মৃতি ট্র্যাডিশনকে বহন করিতে চাহিয়াছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এই যুগের প্রায় ৩৬ জন নিবন্ধকারের সন্ধান পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া এই যুগে প্রসিদ্ধ স্মৃতি গ্রন্থ সমূহের বহু টীকা টিপ্পনীও রচিত হইয়াছে।[১৭]

এই স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রভাবের উল্লেখযোগ্য অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে পুরাণের

নীতি নির্দেশ বিশেষভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কারণ স্মৃতিগ্রন্থগুলি যে ব্যবহারিক নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে, পুরাণগুলির মধ্যে তাহাদের উল্লেখ ছিল। পুরাণে কাহিনী ও আখ্যানের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়, তাহাকেই স্মৃতি বিধানকারগণ নিজেদের কাজে ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলার নব্য স্মৃতি-গ্রন্থগুলি যখন সমাজের উপর নূতনভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে সুরু করিয়াছে, তখন তাহাদের মধ্যে ভুরি প্রমাণ পৌরাণিক উপাদান আসিয়া মিশিয়াছে। অনুরূপভাবে বাংলার সমাজ দেহে তন্ত্র ধর্ম যখন বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, সেই সময় স্মৃতি নিবন্ধকারগণ স্বধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য তন্ত্র প্রভাবকেও কিছুটা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।[১৮]

সুতরাং দেখা যায় বাংলাদেশের সামাজিক বিধিব্যবস্থা আজ পর্যন্ত বহুলাংশে স্মৃতি নিয়ন্ত্রিত এবং স্মৃতির যথোচিত প্রতিষ্ঠায় এখানে পুরাণ ও তন্ত্রকে স্বীকার করা হইয়াছে। বাংলাদেশে বর্তমান কালে যখনই সামাজিক বিশৃঙ্খলার প্রশ্ন উঠিয়া থাকে, তখনই এই স্মৃতি বিধানগুলির পর্যালোচনা করা হয়। একেবারে সমাজ বহির্ভূত না হইলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই বিধানগুলির আনুগত্য না জানাইয়া উপায় নাই। এইভাবে পৌরাণিক নীতি-নির্দেশ বহুলাংশে স্মার্ত বিধানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া আজিও বাংলার সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

পৌরাণিক 'ত্রি-মূর্তি' কল্পনা স্মার্ত পঞ্চোপাসনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রভাব রাখিয়া চলিয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পৌরাণিক দেবতারূপে সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রহ্মা প্রজাপতিকে কেন্দ্র করিয়া কোন ভক্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই। বস্তুতঃ বৈদিক দেবতাগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়া কোন ভক্তি কেন্দ্রিক ধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্ট হয় নাই। কতকগুলি লৌকিক দেবতা বা মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় এইরূপ লৌকিক দেবতা কেন্দ্রিক। বৈদিক দেবতা ব্রহ্মাকে কেন্দ্র করিয়া কোন ভক্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই। শুদ্ধ বেদচারীদিগের দ্বারা তাঁহার সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিলেও তাহা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নাই।[১৯] পৌরাণিক ত্রিমূর্তির মধ্যে অপর দুই মূর্তি বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, বৈষ্ণব ও শৈব ভক্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া স্মার্ত পঞ্চোপাসনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গণপতির উপাসনা এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বর্তমানে এই পূজার বিশেষ প্রচলন নাই, তবে স্মার্ত মতাবলম্বী হিন্দুদের মধ্যে ইহার উপাসনা কিছু কিছু আছে। গৃহস্থবাটীর অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদি

সংস্কার সমূহের অনুষ্ঠানের সময় এবং নিত্য পূজাপার্বণের ক্ষেত্রে প্রায় স্থলে সিদ্ধিদাতা গণপতির অর্চনা করা হয়। পঞ্চ দেবতার পূজার সময় গণেশকেই আদি দেবতা রূপে গ্রহণ করা হয়।[২০]

ত্রিমূর্তির অন্যতম বিষ্ণু, পুরাণকারের মতে মনুষ্যপ্রকৃতির দেবতা। সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, অনিরুদ্ধ এই পাঁচজন বংশের বীর বলিয়া বায়ু পুরাণে কথিত হইয়াছেন। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর রূপ প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে—মনুষ্য প্রকৃতি দেবতা বাসুদেব-কৃষ্ণ, আদিত্য-বিষ্ণু এবং নারায়ণ। এই ত্রিরূপের একীকরণের মধ্যেই বিষ্ণু রূপের পূর্ণ পরিণতি ঘটে।[২১] বাসুদেব কৃষ্ণের ঐশী সত্তা প্রাপ্তি এবং তাঁহার সহিত বিষ্ণু ও নারায়ণের অভিন্নতা দেখাইয়া ভাগবতধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার সর্বভারতে ব্যাপক হইয়াছিল। বাসুদেব কৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগণ মধ্য দেশের অন্তবর্তী মথুরা ও তন্নিকটস্থ অঞ্চল সমূহের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া গবেষক মহল অনুমান করেন। পরে দক্ষিণ ভারতে বা দ্রাবিড় দেশে ইহা সম্প্রসারিত হয়। স্কন্দ পুরাণের কয়েকটি শ্লোকে বৈষ্ণব ধর্মের দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতির কথা আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভাগবতধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত যে দক্ষিণ ভারতে রচিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ প্রায় একমত। দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম আলোয়ার সম্প্রদায়ের দ্বারা বিশেষভাবে গৃহীত ও অনুশীলিত হইয়াছে। তাঁহারা অপূর্ব আবেগে ও আবেশে নৃত্যগীতের দ্বারা তাঁহাদের ভক্তি নিবেদন করিতেন। অনুমান করা কঠিন নয় যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাবাবেগ পূর্ণ নামসংকীর্তন আলোয়ার সম্প্রদায়ের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যে সহজেই এইরূপ ভজন আরাধনায় আকৃষ্ট হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব আজিও অব্যাহত। মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বাংলাদেশের স্থায়ী সম্পদ। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইহা অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাংলার জনগণকে প্রভাবিত করিয়া চলিয়াছে। সর্বভারতীয় ভাগবত ধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মরূপে বাঙ্গালী জীবনের নিকট বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে। কৃষ্ণের ভাগবত লীলার উপর মাধুর্যের আরোপ করিয়া এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে মাধুর্যের মূর্ত বিগ্রহরূপে স্থাপন করিয়া বৈষ্ণব ধর্মকে বাঙ্গালী মানস নিজের মত

করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। নাম সংকীর্তনের বিশেষ মাধ্যমে সে তাহার এই বিষ্ণুভক্তি নিবেদন করে। বিশিষ্ট বৈষ্ণব সমাজই যে শুধু কীর্তন গানে অংশ গ্রহণ করেন, তাহা নহে, সম্প্রদায় নির্বিশেষের ভক্তকুল আজিও কীর্তনকে তাঁহাদের ভক্তি নিবেদনের সাধারণ পন্থা বলিয়া বিবেচনা করেন। এই নাম সংকীর্তন বাংলা দেশের নিজস্ব। কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থ সর্বত্রই নাম মাহাত্ম্য প্রকীর্তিত হইয়াছে। গ্রামীন জীবন ধারায় মহোৎসব ও মেলা পার্বণে কীর্তন অপরিহার্য অঙ্গ। বাঙ্গালী তাহার শ্রাদ্ধ ও স্মৃতি তর্পণে কীর্তনকে উচ্চাসন দিয়াছে। এইভাবে ভাগবত ধর্ম প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সাধারণ প্রভাবরূপে বাঙ্গালী মনকে নিত্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

ত্রিমূর্তির মহেশ্বর বিভিন্ন ভাবে অর্চিত হইয়াছেন। ভক্তি ধর্মের প্রভাবে বেদের রুদ্র-শিবের উপাসনা পদ্ধতিতে ক্রমে রূপান্তর আসিতেছিল। ইহার ফলে পৌরাণিক কালে বৈদিক রুদ্র 'শিবে' পরিবর্তিত হইয়াছেন এবং তিনি প্রলয়ের দেবতারূপে অভিহিত হইয়াছেন। শিব মাহাত্ম্য জ্ঞাপক পুরাণগুলিতে তাঁহার বৈদিক রূপ ও পরিবর্তিত রূপের সংমিশ্রণ দেখা যায়। পুরাণকারগণ অবস্থানুযায়ী শিবের রুদ্রত্ব ও শিবত্বের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন। শৈব মতাবলম্বীগণ যে কয়টি সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হইল পাশুপত সম্প্রদায়। অর্বাচীন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কাপালিক, কালামুখ, অঘোরপন্থী ইত্যাদির নাম করা যায়। পাশুপত সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় বিস্তৃতি ছিল। প্রাচীন চিন্তানায়ক ও দর্শনশাস্ত্রকারগণের মধ্যে অনেকে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। নকুলীশ প্রবর্তিত এই পাশুপত ধর্ম ও ইহার অনুবৃত্তি রূপে রচিত কাপালিক, কালামুখ এবং অঘোরপন্থী ধর্ম সম্প্রদায় শৈবধর্মের মধ্যে বহু অসামাজিক বিধি ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছেন। বাংলা দেশে এইজন্য নকুলীশের ধর্মের বিশেষ প্রচলন নাই। পরন্তু এদেশের জন সমাজ শিবের শুদ্ধ শান্ত মূর্তির পক্ষপাতী বলিয়া তাঁহার নামে আচরিত ধর্মের উপর কোনরূপ ঘৃণিত উপায়ের সমর্থন করিতে চাহে না। বাংলাদেশে কালামুখো (কালামুখের অপভ্রংশ) 'হাঘোরে' (অঘোর পন্থীর সংক্ষিপ্ত ভাবারূপ) প্রভৃতি আজিও অত্যন্ত নিন্দাসূচক গালাগালি।[২২] অপরপক্ষে দাক্ষিণাত্যের বসবপ্রবর্তিত লিঙ্গায়েৎ শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ কোটির দার্শনিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। ভক্তির দ্বারা জীবের সহিত শিবের মিলনই ইহাদের লক্ষ্য। সামাজিক ক্ষেত্রে ইহাদের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অধিক। ইঁহাদের

দ্বারা বহু সামাজিক সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ইঁহারা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সমাজভুক্ত ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য অস্বীকার করিতেন এবং জাতিভেদকে বিশেষ আমল দিতেন না।[২৩]

শৈব উপাসনার ক্ষেত্রে মূর্তিপূজা অপেক্ষা লিঙ্গ পূজার প্রচলন বেশী। ইহার সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি ছিল। বাংলাদেশের অসংখ্য মন্দিরে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে শিবলিঙ্গ এবং শিব একার্থক। শিব শুধু ধ্বংসের দেবতাই নহেন, তাঁহার মধ্যে সৃষ্টির শুভ ও কল্যাণ নিহিত আছে বলিয়া সৃষ্টির কোন রূপকল্প দিয়া তাঁহাকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এইজন্যই শিবের কোন ধ্যানের মূর্তি অপেক্ষা লিঙ্গ মাধ্যমে উপাসনা করা সহজ সাধ্য হইয়াছে। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাপক শিবলিঙ্গ স্থাপনের আরও একটি কারণ অনুমান করিয়াছেন। সকল দেশেই স্বর্গত পিতৃপুরুষদের স্মরণ চিহ্ন হিসাবে স্তম্ভ স্থাপনের প্রথা আছে। ভারতবর্ষে শিবলিঙ্গের প্রাচুর্যের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা কার্যকরী হইয়াছে। এদেশেও মহাত্মাদিগের সমাধি বা শ্মশানক্ষেত্রে এবং স্বর্গত নৃপতিবর্গের শ্মশানক্ষেত্রে তাঁহাদের নামে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।[২৪]

বাংলাদেশে শৈব উপাসনার ধারা বিলুপ্ত হয় নাই। এদেশে অসংখ্য শিব মন্দির আছে। এই দেবালয়গুলিতে শিবের কোন মূর্তি নাই, তিনি অনাদি লিঙ্গ মূর্তি। পুরাণে যে লিঙ্গ পূজার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ফলেই অনুমান করা যায় শিবের লিঙ্গ মূর্তির পূজা অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। এই মন্দিরগুলিতে আবার অনেক রকম শিবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বর শিব, রত্নেশ্বর শিব, ভুবনেশ্বর শিব, এক্তেশ্বর শিব, বুড়ো শিব ইত্যাদি শিবের নানা রকম নাম আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিবের নাম অনুসারে গ্রামের নামও হইয়াছে।[২৫] মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহের নিত্য পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও বৎসরের মধ্যে শিবের পূজার আবার বিশেষ সময় রহিয়াছে। একটি সময় হইল বসন্তের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথি। এই সময় শিবরাত্রি পূজা হয়। ইহা শিবচতুর্দশী নামে খ্যাত। ইহার মধ্যে পৌরাণিক প্রসঙ্গটি একান্ত স্পষ্ট। ভক্তব্যাধ এমনি এক অমারাত্রিতে শিবের কৃপা লাভ করিয়াছিল। আশুতোষ শিবের সেই দাক্ষিণ্যকে কামনা করিয়া ভক্তগণ সারারাত্রি জাগিয়া এই ব্রত উদযাপন করে।

শিব পূজার অন্য বিশেষ ক্ষণটি হইল চৈত্র সংক্রান্তির সময়। শিবের এই উপাসনায় যোগদানকারী ভক্ত সম্প্রদায় সন্ন্যাসী নামে অভিহিত। সমাজের

নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই সন্ন্যাসী হওয়ার চলন বেশী। শিব যে বিশেষ ভাবে গণদেবতা, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। চৈত্র মাসে শিবের গাজন এখনও গ্রাম বাংলার বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। গাজন অবশ্য মূলতঃ শিব সম্পর্কিত নহে, ইহা ধর্মঠাকুরের উৎসব। বিভিন্ন ধর্মাচার ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর রাঢ়দেশে গ্রাম দেবতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। এই ধর্মঠাকুরের গ্রাম্য জনোৎসবের নামই গাজন। শিব ক্রমে ক্রমে গ্রাম দেবতায় রূপান্তরিত হইলে ধর্মের গাজন শিবের গাজনে পরিণত হয়।[২৩] এই গাজনের মধ্যে শিবের লৌকিক রূপটি বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়। শিবের কৃষিকার্য ও গৃহস্থালীর নানা আরোপিত সংবাদ গাজন এর মধ্যে গীত ও অভিনীত হয়। কৃষি নির্ভর গ্রাম বাংলার নিত্য সংবাদের সহিত উপাস্য দেবতার সংসার সংবাদ একেবারে মিশিয়া গিয়াছে।

চৈত্র উৎসবে সন্ন্যাসীগণ শিবের উদ্দেশ্যে নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকে। আগুন ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ, বঁটি ঝাঁপ ইত্যাদির মধ্যে ভক্তদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভক্তদের পিঠে বাণ ফোঁড়ার মত কৃচ্ছ্র সাধনও করিতে দেখা যায়। বাণ ফোঁড়ার নানা বিবরণ দেশের নানাস্থানে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঁকুড়ার বাহুলাড়ায় শিবের মেলায় চৈত্র সংক্রান্তিতে ভক্তদের পিঠে বাণ ফুঁড়িয়া চড়ক গাছে পাক খাইতে দেখা যাইত।[২৭] বাঁকুড়ার অন্য এক শৈব তীর্থ এক্তেশ্বরেও দেখা যাইত 'ভক্তারা পিঠে লোহার বড়শী বিঁধে শালের চড়ক গাছে পাক খেতেন। আর নিচে থেকে শিবশঙ্কর ধ্বনি দিতেন অন্যান্য ভক্তারা।'[২৮] বর্তমানে এইরূপ পিঠে বাণ ফোঁড়া বে-আইনি হিসাবে গণ্য হইয়াছে। তবে সুদূর পল্লী অঞ্চলে জিববাণ, কপাল বাণ প্রভৃতি বাণ ফোঁড়া প্রক্রিয়া আজিও একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

বাংলার কোন কোন অঞ্চলে আবার রুদ্র শিবের সম্মুখে 'কাল্‌কে পাতারি নৃত্য' হয়। এই নৃত্য আসিয়াছে ধর্মের গাজনের আনুষঙ্গিক রূপে। রাঢ় দেশে এক সময় ধর্মের গাজনে নরমুণ্ড নৃত্য হইত। ধর্মের গাজনের এই নৃত্য অনুষ্ঠান পরে শিবের গাজনেও অনুষ্ঠিত হয়।[২৯] আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এইরূপ বীভৎস নৃত্যকে অনার্য উদ্ভব বলিয়া অনুমান করিয়াছেন—"শ্মশানবাসী মহাদেবের কালাগ্নি রুদ্র মূর্তির সম্মুখে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু ইহার অনার্যত্বে সংশয় নাই।"[৩০] যাহা হউক, এই নৃত্যের মধ্য দিয়া ভক্তগণ যে শিবের রুদ্রত্বকে স্মরণ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা দেশের দূর পল্লীতে 'কাল্‌কে পাতারি নৃত্যে'র অপভ্রংশ রূপ এখনও বিদ্যমান।

চড়ক পূজার আগের দিন সন্তানবতী নারীরা নীলের উপবাস করে। নীলের ঘরে বাতি দিয়া জননীগণ সন্তানদের দীর্ঘায়ুলাভ করিবার প্রার্থনা জানায়। ডঃ সুকুমার সেন নীলকে শিবের আবরণ দেবতা এবং ধর্মের কামিল্যা বলিয়া মনে করেন।[৩১] নীল দেবতার উৎপত্তির পিছনে এইরূপ একটি মিশ্র সংস্কৃতি কাজ করিলেও বঙ্গনারীগণ তাঁহাকে শিবের সহিত অভিন্ন করিয়া লইয়াছেন এবং নীলরূপী মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট আপনাপন সন্তানদের দীর্ঘ আয়ু মাগিয়া থাকেন। ইহা পল্লী বাংলার জননীকুলের একটি প্রধান উৎসব।

বাংলা দেশের বিচিত্র মনোধর্মে শিবের রূপ বিপুল পরিবর্তিত হইয়াছে। শিব কন্যাকুমারীর ধ্যানের বিগ্রহ, এয়োতির অভয়মন্ত্র লাভে সমগ্র নারী সমাজে শিবের আরাধনা, আর সর্বোপরি দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে শিবের আশীর্বাদ ভিক্ষা। বাঙ্গালী নারী স্বামী অর্থে 'শিব' শব্দ ব্যবহার করেন, শিবের পৌরাণিক জীবন-ধারাকে অপূর্ব সহজ ভঙ্গীতে আপন জীবনে প্রকটিত করেন। দুর্গার শংখ পরিধান, পিতৃগৃহে যাত্রার অভিমান ইত্যাদি কাহিনীর মধ্যে শিবের গার্হস্থ্য জীবনের ছবি অপরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। বাঙ্গালী নারী শিব দুর্গার দাম্পত্য জীবনকে অনুসরণ করিয়া তাহার অস্বচ্ছল সংসার ক্ষেত্রকে দুঃখের স্বর্গ করিযা তুলিযাছে।

পৌরাণিক শক্তি পূজা বাংলার জীবন ও সমাজে প্রভূত প্রভাব রাখিয়া দিযাছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্যের সহিত এই শক্তি পূজা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সেখানে দেবী দৈত্য ও অসুরগণের বিনাশ সাধন করিয়া দেবতাদের ভয় মুক্ত করিয়াছেন। একত্রীভূত দেবশক্তি সম্ভবা নারী অতুল বিক্রমে অসুর-গণের বিনাশ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর এই রূপটিই দুর্গা পূজা রূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। দেবী মাহাত্ম্যে এই পূজার কাল বসন্তকাল ছিল। কালিকাপুরাণেই প্রথম দেবগণ কর্তৃক শরৎকালে মহাদেবীর আরাধনা দেখা যায়। আরও পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসের সুবিপুল প্রভাবে রামচন্দ্র কর্তৃক অকালবোধনের কথা বাঙ্গালীর মর্মাবেদন করিয়াছে।[৩২] আজ পর্যন্ত বাঙ্গালী এই ধারাই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। প্রতিমার রূপ সম্বন্ধে স্মৃতি নিবন্ধকারগণ দেখাইয়াছেন যে মৃন্ময়ী প্রতিমায় দেবীর পূজার্চনা প্রায় ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে কোন এক সময় দেবীর মহিষমর্দিনী রূপের সহিত অতিরিক্ত পরিবার দেবতাগণেরও রূপ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।[৩৩]

এইভাবে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী চণ্ডিকা নূতনভাবে শারদীয়া দুর্গাপূজায় গৃহীত হইয়াছেন। তিনি দশ প্রহরণ ধারিণী শক্তিরূপা, তিনি স্বামী পুত্র-কন্যা

পরিবৃত্তা মাতৃ মূর্তি এবং সংশ্লিষ্ট নব পত্রিকায় তিনি উদ্ভিজ্জ সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বাঙ্গালী তাহার শ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসবে পুরাণ কথার সহিত গার্হস্থ্য কথা এবং জীবিকা সম্পর্কিত কৃষি কথাকে মিশাইয়া দিয়াছে।

পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ কাহিনী হইতে শক্তি পূজার আর একটি রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের উত্তর ও পূর্বভাগে ছিন্ন সতীদেহ ৫১টি অংশে বিভক্ত হইয়া এক একটি স্থানে পতিত হইয়াছে বলিয়া পুরাণে কথিত। ইহার প্রত্যেকটি স্থান শক্তি পীঠরূপে পরিগণিত হইয়াছে। শিবের পত্নী-প্রেম এত গভীর ছিল যে প্রত্যেকটি পীঠে তিনি ভৈরবরূপে অবস্থান করিয়া ইহার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া থাকেন। এইজন্য শাক্ত পীঠের সহিত সর্বত্রই প্রায় ভৈরবের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশে এই শাক্ত পীঠের মাহাত্ম্য গভীরভাবে স্বীকৃত।

সর্বশেষে তান্ত্রিক শক্তি উপাসনা। বাংলা দেশে ইহার প্রভাব আজিও সুবিপুল। বাঙ্গালীর জীবনচর্যায় তান্ত্রিক শক্তি সাধনা সহজসিদ্ধ। এই তান্ত্রিক শক্তি সাধনার প্রধান আশ্রয়স্থল কালিকা বিগ্রহ। বাংলার ভূ-প্রকৃতি, বাঙ্গালীর অন্তর প্রকৃতি সব দিয়া এই কালিকার রূপ অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার সহিত তাহার প্রাণের যোগ। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত কালীবাটী তাহার এই সহজাত শক্তি সাধনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাঙ্গালী ইঁহাকে তারা নামেও ডাকিতে অভ্যস্ত। বস্তুতঃ যে নাম মাহাত্ম্য উচ্চারণ তাহার সহজ ধর্ম, তারা নামটিই সেখানে সবিশেষ হৃদয়গ্রাহী। "রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামদেব প্রভৃতি সাধক-কবির কণ্ঠে 'তারা' নাম যেমন ভাবে উৎসারিত হয়ে উঠেছে, এমন আর কোন নাম হয়নি। উচ্চারণের সাবলীলতার দিক থেকে অন্য নামের কোথায় বাধা আছে যেন। 'মা'ও তার সঙ্গে 'তারা' বাংলার শ্যামা সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে লোককণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সহজে।"[৩৪] এই শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে বাঙ্গালীর মাতৃ উপাসনার স্বভাব ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের আবেদন অম্লান রহিয়া গিয়াছে।

অতঃপর সৌর উপাসনার কথা। ইহার প্রভাব ব্যাপক না হইলেও কিছুটা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুভূত হয়। ঋগ্বেদ হইতে যে গায়ত্রী মন্ত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক স্তর কাটাইয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ নিষ্ঠাবান হিন্দুর নিকট ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র আবৃত্তি তাঁহার নিত্য দিনের ধর্মাচরণের অপরিহার্য অঙ্গ। সামাজিক দিকে সৌর উপাসনায় শকদ্বীপী পুরোহিত সম্প্রদায় এ দেশে ভোজক, দৈবজ্ঞ ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণ সমাজ

সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথম দিকে ইঁহাদের সামাজিক মর্যাদা থাকিলেও বর্তমানে ইঁহারা অপাংক্তেয় হইয়া পড়িয়াছেন।[৩৫] ধর্মাচরণের কতকগুলি ক্ষেত্রে সূর্যোপাসনার ধারা বর্তমান আছে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন বাংলা দেশের 'ইতুপূজা' এইরূপ সূর্যোপাসনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বহন করিতেছে।[৩৬]

এইভাবে বিষ্ণু, মহেশ্বর, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, সূর্য প্রভৃতি দেবতাদের মাহাত্ম্য কীর্তনে যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর পুরাণগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের দেব মহিমা পরবর্তীকালে স্মার্ত পঞ্চোপাসনার মধ্য দিয়া সমাজে সঞ্চারিত হইয়াছে। এই পৌরাণিক ও স্মার্ত যুগের চিন্তা বিনিময়ের সময় বৈদিক দেবতা ব্রহ্মার অবলুপ্তি ঘটে এবং লৌকিক দেবতা গণপতির প্রতিষ্ঠা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরাণগুলিতে যে বিশিষ্ট দেবমহিমার উল্লেখ দেখা যায়, স্মার্ত পঞ্চোপাসনায় তাহা বহুলাংশে সহনশীলতার প্রভাবে অসাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আধুনিক গণমানসে স্মার্ত প্রভাবই বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। স্মৃতি নিবন্ধ সমূহের মধ্য দিয়া যেমন পৌরাণিক আচার অনুষ্ঠানগুলি সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত হইয়াছে, তেমনি পঞ্চোপাসনার মধ্য দিয়া বিভিন্ন দেবমহিমা একত্রে সমাজের মধ্যে অনুসঞ্চারিত হইয়াছে। পৌরাণিক দেববাদের ইহাই সামাজিক অভিযোজন। বিভিন্ন মার্গীয় জীবনচর্যার মধ্যে পৌরাণিক ভক্তিবাদ সাধারণ ভাবে পরিগৃহীত হইয়াছে।

আধুনিক জীবনে পৌরাণিক সংস্কৃতির সামগ্রিক আবেদন ।। ভারত-ধর্মের ইতিহাসে পৌরাণিক সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র মূল্য রহিয়াছে। গূঢ় বৈদিক জীবনচর্যা লোকজীবনের আয়ত্ত বহির্ভূত হইলে মহাকাব্য পুরাণের নির্দেশবাণী তাহাদের উজ্জীবিত করিয়াছে। আবার ভারত সংস্কৃতি কতকগুলি স্বপ্রকৃতি বিরোধী ধর্ম ও চেতনার দ্বারা আক্রান্ত হইলে পৌরাণিক সংস্কৃতিই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উচ্চ ঘোষণার দ্বারা তাহার অস্তিত্বকে রক্ষা করিয়াছে। পরিশেষে মহাকাব্য পুরাণের অনুপম কাব্য সম্পদ দেশের বিদগ্ধ ও সাধারণ লোক সমাজকে সমান ভাবে আনন্দ দান করিয়াছে। কেহ ইহাদের রসাস্বাদন করিয়া নূতন সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করিয়াছে, কেহ বা ইহাদের মধ্যে চিরকালের আদর্শ খুঁজিয়া পাইয়া তৃপ্ত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে পৌরাণিক সংস্কৃতি নূতন প্রেক্ষাপটে অনুরূপ কাজই করিয়াছে। বেদান্ত ধর্মের উজ্জীবন প্রচেষ্টা সুরু হইলেও তাহা লোকমনে গৃহীত হয় নাই, আবার হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি বিধর্মী ভাবধারা ও সংস্কৃতি দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্তও হইয়াছে। সমগ্র শতাব্দী বাংলার সমাজ

অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য বিপুল প্রচেষ্টা করিয়াছে। অসংখ্য মনীষী ইহার পথ নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ভারত ধর্মের সহিত যেখানে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সমাজ সংস্কারের চেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই ইহা সফল হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে পৌরাণিক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে আস্থা ফিরিয়াছে। বাংলাদেশের বৃহৎ লোক জীবন শত বহিঃ সংঘাতের মধ্যে কিভাবে আপনার ধর্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে পৌরাণিক-সংস্কৃতির কালজয়ী প্রভাবের কথা স্মরণ করিতে হয়। পৌরাণিক কথা কাহিনী বিচিত্রভাবে যুগ পরম্পরায় এ দেশের জীবনের উপর দিয়া জাহ্নবী ধারার মত বহিয়া চলিয়াছে। মহাকাব্য পুরাণের ছত্রে ছত্রে যে জীবনাদর্শ ও নৈতিকবোধের পরিচয় আছে, তাহা যুগ যুগান্ত ধরিয়া দুর্ভর জীবনকে রসে ও অনুভূতিতে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। এইজন্য ইহাদের কেন্দ্র করিয়া একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা জাতীয় মানসের এক মৌলিক দৃষ্টি। বর্তমান যুগের সংশয়, জিজ্ঞাসা বা নাস্তিক্যবোধ এই দৃষ্টিকে সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই, পরন্তু তাহা বর্তমান যুগের নূতন অভিঘাতগুলিতে নূতন ভাবে গ্রহণ করিতে সাহস সঞ্চার করিয়াছে। আধুনিক বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিকে পৌরাণিক সংস্কৃতি মোটামুটি এইরূপ প্রভাব রাখিয়া দিয়াছে :

১। সামাজিক ক্ষেত্রে বিধি বিধান ও আচারের মধ্যে পৌরাণিক নির্দেশ ও শাস্ত্র অনুশাসন বহুল পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে কিছুটা ব্যাহত হইলেও মোটামুটিভাবে এই বিধানগুলি সর্বত্র গ্রাহ্য ও অনুসৃত।

২। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভক্তিবাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে জড়বাদ ও যুক্তিবাদের আংশিক প্রভাব দৃষ্ট হইলেও পৌরাণিক ভক্তিবাদ সাধারণ গণমানসে আজিও আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

৩। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবোধের ও জাতীয় আদর্শকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। যুগচিন্তার প্রেক্ষাপটে এইরূপ চিরন্তন ভাবসম্পদগুলিকে একেবারে নির্মূল করা যায় নাই।

৪। জাতীয় চিন্তার সাধারণ ক্ষেত্রে যে সমস্ত নূতন জিজ্ঞাসার উদ্ভব হইয়াছে পৌরাণিক চেতনাকেও সেই আলোকে কিছুটা রূপান্তরিত

করা হইয়াছে। পৌরাণিক চরিত্র ও কথা নবযুগের মানবতাবাদ ও জীবন মহিমাকে প্রকাশ করিয়াছে।

৫। সর্বশেষে সাহিত্য ক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের ক্ল্যাসিক উপাদানগুলির নবীকরণ করিয়া ইহাদের গল্পরস ও কাব্য সৌন্দর্যকে নব যুগের উপযোগী করিয়া পরিবেশন করা হইয়াছে।

পাদটীকা

১। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী—নরহরি, কবিরাজ পৃঃ ১৫২
২। কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৩৪৮
৩। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা—রবীন্দ্রনাথ
৪। রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি, রামায়েত ধর্ম—প্রবোধচন্দ্র সেন পৃঃ ৬৪—৮৫
৫। লোকসাহিত্য, গ্রাম্যসাহিত্য—রবীন্দ্র রচনাবলী। বিশ্বভারতী সং। ষষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৬৬৪
৬। সাহিত্য, সাহিত্য সৃষ্টি—ঐ অষ্টম খণ্ড পৃঃ ৪১০—৪১১
৭। বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন পৃঃ ১২৬
৮। রামায়ণের সমাজ—কেদারনাথ মজুমদার পৃঃ ৪১৫
৯। রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি—প্রবোধচন্দ্র সেন পৃঃ ১১৪
১০। ঐ পৃঃ ১২১
১১। মহাভারতের সমাজ—সুখময় ভট্টাচার্য পৃঃ ২৭৫
১২। ঐ পৃঃ ২৭৬
১৩। ঐ পৃঃ ২৮২
১৪। ঐ পৃঃ ৪৮০
১৫। ভারত প্রেমকথা—সুবোধ ঘোষ, মুখবন্ধ পৃঃ ১৵—১।০
১৬। স্মৃতি শাস্ত্রে বাঙ্গালী—ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩
১৭। ঐ পৃঃ ২১—৫৫
১৮। ঐ পৃঃ ১৯৭
১৯। পঞ্চোপাসনা—ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৩
২০। ঐ পৃঃ ৩২
২১। ঐ পৃঃ ৪৯
২২। ঐ পৃঃ ১৬৮
২৩। ঐ পৃঃ ২১১
২৪। ঐ পৃঃ ১৩৯

২৫। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ পৃঃ ১১০

২৬। ঐ পৃঃ ৪৯

২৭। ঐ পৃঃ ১০৭

২৮। ঐ পৃঃ ১১৪

২৯। ঐ পৃঃ ৫০

৩০। গ্রাম দেবতা—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৬ সন, ১ম সংখ্যা।

৩১। ধর্মঠাকুর ও মনসা—ডঃ সুকুমার সেন (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ) পৃঃ ০৫৬

৩২। পঞ্চোপাসনা—ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২৮০

৩৩। ঐ পৃঃ ২৮২

৩৪। পশ্চিবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ পৃঃ ১০৫

৩৫। পঞ্চোপাসনা—ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩০৮

৩৬। ঐ পৃঃ ৩২০-

নির্ঘণ্ট

(উদ্ধার চিহ্নের দ্বারা গ্রন্থ নির্দেশিত)